মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও
পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি
ডক্টর অব ফিলোসফি (Ph.D.) ডিগ্রি অর্জনের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
পিএইচডি গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ২৩৪/২০১১-২০১২

নবপর্যায়ে যোগদান ঃ ০৩-০২-২০১৩

১ম রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ৫/২০০২-০৩

যোগদানের তারিখ ঃ ১৯-১২-২০০২

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম*** শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভটি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত তথ্য, উদ্ধৃত আলোচ্য ও উপাত্ত ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি পূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক

১৯৭২ সালে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় যাঁর অসাধারণ পাঠদান
আমাকে ইতিহাস পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল

অধ্যাপক রেজাউল ইসলাম

এবং

অধ্যাপক আশরাফ আলী

রাষ্ট্রীয় সশস্ত্রবাহিনীতে যোগদান না করে বরং
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় যিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে আমার দুজন পিতৃতুল্য শিক্ষক

যাঁরা আমার জীবনের গতিমুখ বদলে দিয়েছেন

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে **মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম** শীর্ষক আমার পিএইচডি গবেষণা যাঁর সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় এগিয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আহমেদ কামাল। বাংলাদেশে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার এই পথিকৃতের সুচিন্তিত মতামত ও অকৃত্রিম সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণার ব্যঞ্জনা ভিন্নতর হতো। আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি তাঁকে। একই সাথে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ্যাডভোকেট নিলুফার বানুর প্রতি; তার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহায়তা ছাড়া নানাবিধ ব্যস্ততায় আমার পিএইচডি'র এই গবেষণা কার্যক্রম হয়তো কখনই সমাপ্তির মুখ দেখতো না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হওয়ায় সেখানকার বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তাকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি গবেষণা এলাকার সাধারণ জনগণকে যারা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব এবং বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শান্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের যারা দিনের পর দিন ধরে তাদের মূল্যবান সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং আমার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গবেষণার কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, গৌতম কুমার চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা, হানাচরণ ত্রিপুরা, সুধাসিন্ধু খীসা, লালিয়ান থাংগা, কে এস মং, লয়েল ডেভিড ব্যোম, মং শৈ প্রু খিয়াং, ম্রাও মাস্টার, দোনুক প্রু মারমা, থাংকু খুমী, অং খোয়াই চিং মারমা, রামথন ব্যোম-সহ আরও অনেকে।

শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যাঁর জন্য যথেষ্ঠ হবেনা, যাঁর বক্তব্য পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংঘাতের প্রকৃতি বোঝার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, যিনি তাঁর বহু মূল্যবান সময় আমাকে দিয়েছেন, যাঁর সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে ও নতুন নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে তিনি হলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। আমি তাঁর নিকট চিরঋণী।

গবেষণা কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিশেষতঃ দুই কন্যা মুনাসীর কামাল ও মৃত্তিকা কামাল। গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)-এর অনেকে আমাকে সংগৃহীত সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য আহরণের কাজে সহায়তা করেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষতঃ প্রথম পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)-তে আমার তখনকার সহকর্মী (ড.) আরিফাতুল কিবরিয়া মুন্নী (বর্তমানে University of Information Technology and Sciences-এর সহকারী অধ্যাপক) ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী (বর্তমানে RDC ট্রাস্টী বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক) এবং পরবর্তী পর্যায়ে মাহবুবা খানমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

গবেষণার তথ্য আহরণের প্রয়োজনে বাংলাদেশের জাতীয় আর্কাইভস, ভারতের আগরতলায় অবস্থিত ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবাল কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট এ্যান্ড মিউজিয়াম লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)-এর ড. আবদুল গফুর রিসোর্স সেন্টার এবং রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের দায়িত্বে যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

সর্বোপরি, অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখক ও গবেষকের বই, প্রবন্ধ, জার্নাল ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেগুলো যথাযথভাবে উল্লেখের চেষ্টা করেছি। সংশ্লিষ্ট লেখক ও গবেষকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইলো।

RDC-তে আমার অনুজপ্রতীম সহকর্মী বৃতিসুন্দর গায়েন গবেষণা অভিসন্দর্ভ চূড়ান্তকরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার আন্দোলনের সাবিনা আক্তার, রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসের প্রভাষক স্নেহের সোনিয়া আক্তার এবং আমার ছাত্রী লিসা চাম্বুগং ও উম্মে হাবিবা ইয়াছমিন, ছাত্র মোঃ শাহীনুজ্জামান ও RDC-র সহকর্মী মুহাম্মদ কায়সার আলী একেবারে শেষ পর্যায়ের সংশোধন-সংযোজনীতে সহায়তা জুগিয়েছে। তাদের জন্য রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমার বন্ধু সমাজতত্ত্ববিদ আবু নাসের-সহ RDC-র সকল নিয়মিত সদস্যকে তাদের সহায়তার জন্য জানাই আন্তরিক প্রীতি।

আমার প্রয়াত পিতা ড. মনজুর আহমেদ খুব চেয়েছিলেন আমি Ph.D. অভিসন্দর্ভের কাজটি শেষ করি। আজ তাঁর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। সেই সাথে আমার প্রয়াত মা মিসেস আখতারুন্নেসাকেও স্মরণ করছি।

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ

প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যা

সূচিপত্র

সারণি তালিকা ১৮

মানচিত্র তালিকা ১৯

চিত্র তালিকা ১৯

লেখচিত্র তালিকা ১৯

শব্দ সংক্ষেপ ২০

প্রথম অধ্যায় : উপক্রমণিকা ২২

১. প্রাককথন ২২

২. গবেষণার বিভিন্ন দিক ২৯

২.১. কেন এই গবেষণা ২৯

২.২. গবেষণার পরিধি ৩০

২.৩. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩১

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ৩২

৩.১. অবস্থান ও আয়তন ৩২

৩.২. সীমানা ৩৩

৩.৩. জলবায়ু ৩৫

৩.৪. ভূমিরূপ ৩৫

৩.৫. ভূমির শ্রেণিবিভাগ ৩৬

৩.৬. উদ্ভিদ ও প্রাণী ৩৭

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ৩৮

৪.১. জনগোষ্ঠীর পরিচয় ৩৮

৪.২. নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৪০

৪.৩. পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও বর্গবিভাজন ৬০

৪.৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ৬৬

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য ৬৭

৫.১. প্রশাসনিক কাঠামো ৬৭

৫.২. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৬৮

৫.২.১. সুলতানী শাসনামল ৬৯

৫.২.২. মোগল শাসনামল ৭০

৫.২.৩. ব্রিটিশ শাসনামল ৭০

৫.২.৪. ১৯০০ সালের ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি’ ৭২

৫.২.৫. ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ ৭৫

৫.২.৬. ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ ৭৫
৫.৩. ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ৭৭
৫.৩.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম নেতৃবৃন্দের পাকিস্তানে সংযুক্তির বিরোধিতা ঃ স্নেহকুমার চাকমার বিবরণ ৭৮
৫.৩.২. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন ৮১
৫.৪. পাকিস্তানের সংবিধান ও আদিবাসী ৮২
৫.৫. বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী ৮৩
৫.৬. পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক কাঠামো, আইন ও বিচার ব্যবস্থা ৮৪
৫.৭. পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থা ৮৭
৫.৮. পার্বত্যাঞ্চলের সংস্কৃতি ৮৮
৬. পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ৮৯
৬.১. পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও সামন্ত-শোষণ ৯১
৬.২. সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আন্দোলন কৌশল ৯৪
৬.৩. বাঙালি ব্যবসায়ী ও মহাজনী শোষণ ৯৫
৬.৪. বাঙালি প্রশাসনের শোষণ ৯৬
৬.৫. পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আন্দোলন-সংগ্রামের পথিকৃত ৯৭
৬.৬. সরকারি উদ্যোগে ভারত থেকে আগত মোহাজিরদের পার্বত্যাঞ্চলে পুনর্বাসন ৯৯
৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার ৯৯
৮. আনুষঙ্গিক রচনাদি পর্যালোচনা ১০১
৯. উপসংহার ১৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শিক প্রস্তুতি ১৬৬
১. সূচনা **১৬৬**
২. মহাপুরম গ্রাম ও এম. এন. লারমার জীবনধারা ১৬৬
৩. জন্ম ও শৈশব জীবন ১৬৮
৪. পরিবার-পরিজন ও লারমার ব্যক্তিত্ব গঠন **১৭১**
৫. পারিবারিক বৈশিষ্ট্য ১৭৭
৬. শিক্ষা-জীবন ১৭৮
৬.১. পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ও পাঠাভ্যাসে একনিষ্ঠতা ১৭৯
৬.২. আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূতিকাগার মহাপুরম স্কুল ১৭৯
৭. পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'র প্রতিষ্ঠা ও মনোভূমি নির্মাণে প্রভাব ১৮০
৮. উপসংহার ১৮১

তৃতীয় অধ্যায় : কাপ্তাই বাঁধ থেকে মুক্তিযুদ্ধ ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের সূত্রপাত ১৮২

১. সূচনা ১৮২

২. কাপ্তাই বাঁধ ও বাঁধের প্রভাব ঃ ১ লক্ষ আদিবাসী উদ্বাস্তু, ৬০ হাজার দেশান্তরী ১৮২

৩. সরকার কর্তৃক দায়সারা পুনর্বাসন ঃ ভূমি-মালিকানার ঐতিহ্যগত ও সামষ্টিক রীতি'র প্রতি অননুমোদন ও ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকৃতি ১৮৮

৪. পাহাড়িদের দৃষ্টিতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ "চোখের জলের কাপ্তাই লেক" ও 'কালেকটিভ ট্রমা' ১৮৯

৫. কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম ১৯২

৫.১. পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা ১৯২

৫.২. পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'র আন্দোলন ১৯৩

৫.৩. সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ ঃ পাহাড়ি যুবকদের শিক্ষা গ্রহণে আহ্বান ১৯৩

৬. আন্দোলন দমনে সরকারি তৎপরতা ১৯৫

৬.১. সরকারি সার্কেল অফিসার কর্তৃত্ববাদী আচরণ ১৯৬

৬.২. গোয়েন্দা তৎপরতা ১৯৬

৭. রাজনৈতিক সংগঠন : চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন-এর জন্ম ১৯৬

৮. ঐতিহাসিক ৬ দফা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৮

৯. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান : পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক চেতনা ১৯৯

৯.১. পাহাড়ি জনগণের ভূমি বেদখল ২০১

১০. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি ২০২

১১. ১৯৭০-এর নির্বাচনে রাজপরিবার ও আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাজিত ক'রে প্রাদেশিক পরিষদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বিজয় ২০৪

১২. উপসংহার ২০৭

চতুর্থ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য আদিবাসী ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং চাকমা রাজা ও লালডেঙ্গার 'মিজো বাহিনী'র কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ২০৮

১. সূচনা ২০৮

২. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও পাহাড়ি-বাঙালি সম্মিলিত প্রতিরোধ ২০৮

৩. এম. এন. লারমার নেতৃত্বে পাহাড়িদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ২১০

৪. পাহাড়িদের সম্পর্কে বাঙালিদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস ২১০

৫. পাকিস্তানি বাহিনী ও মিজোবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ ২১৩

৬. উপসংহার ২৪১

পঞ্চম অধ্যায় : পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক "জুম্ম-জাতীয়তাবাদ"-এর তত্ত্বায়ন ও তার প্রয়োগ ২৪৩

১. সূচনা ২৪৩

২. স্বাধীনতার উষালগ্নে পার্বত্য আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ ২৪৩

২.১. মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে হত্যাকান্ড ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞের অভিযোগ ২৪৪

২.২. রাজাকারদের চুরি-ডাকাতি-লুটতরাজ এবং রাজাকার দমনের নামে বিডিআর ও পুলিশের নির্যাতন ২৪৬

২.৩. সমস্যা নিরসনে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ ২৪৬

২.৪. বিডিআর ও পুলিশের অব্যাহত অপতৎপরতা ঃ রাজাকার খোঁজার নামে গ্রামবাসীদের মারধর, লুট, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ২৪৭

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ২৪৯

৩.১ বঙ্গবন্ধুর কাছে উত্থাপিত দাবিসমূহ ২৪৯

৩.২. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন চেয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ২৪৯

৪. প্রধানমন্ত্রী ও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মারকলিপি ২৫০

৫. বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিগত বহুমাত্রিকতার অস্বীকৃতি ২৫১

৫.১. বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে সংবিধান সভায় বিতর্ক ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অবস্থান **২৫২**

৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামরুজ্জামান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের সাথে বৈঠক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 'এয়ার-স্ট্রাপিং'-এর হুমকি ২৫৮

৭. মওলানা ভাসানীর সাথে এম.এন. লারমার সাক্ষাৎ ঃ সশস্ত্র সংগ্রামে'র প্রণোদনা লাভ ২৬১

৭.১. মওলানা ভাসানীর সাথে রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎ ঃ বিলেত যাত্রা ও আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের পরামর্শ ২৬১

৮. পাহাড়িদের জাতি-ভাবনার মিলন ও জুম্ম-জাতীয়তাবাদের দর্শন ২৬২

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র জন্ম ঃ সাংগঠনিক প্রেক্ষাপট ২৬৫

৯.১. চাকমা যুবক সমিতি ২৬৫

৯.২. চাকমা যুবক সংঘ ২৬৫

৯.৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি ২৬৬

৯.৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি ২৬৬

৯.৫. হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ২৬৭

৯.৬. ট্রাইবাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ২৬৭

৯.৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি ২৬৮

৯.৮. রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি ২৬৮

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন ২৬৯

১০.১. জনসংহতি সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৭১

১০.২. জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো ২৭১

১১. শান্তিবাহিনীর জন্ম ২৭৩

১২. বঙ্গবন্ধুর রাঙ্গামাটি সফর ও 'উপজাতি'দের বাঙালি হয়ে যাবার নির্দেশ ২৭৪

১৩. ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজপরিবার ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত ক'রে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র জয়লাভ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনঃউত্থাপন ২৭৫

১৪. ১৯৭৪-এ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সম্মতি ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বাকশালে যোগদান ২৭৮

১৫. বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও সামরিক শাসন জারি ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র আত্মগোপন ২৮০

১৬. উপসংহার ২৮০

ষষ্ঠ অধ্যায় : পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন, সেনা কর্তৃত্বে বাঙালি সেটলারদের বসতি স্থাপন এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম ২৮২

১. সূচনা ২৮২

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন ২৮৩

৩. জিয়াউর রহমান কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটলারদের বসতি স্থাপন ২৮৫

৪. সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৯৭

৪.১. অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড ২৯৭

৪.২. গণহত্যা ২৯৮

৪.২.১. কাউখালী গণহত্যা (২৫ মার্চ ১৯৮০) ২৯৮

৪.২.২.বানরাইবারি, বেলতলা ও বেলছড়ি গণহত্যা (২৬ জুন ১৯৮১) ৩০১

৪.২.৩.তেলাকাং, আশালং, গুরানগাপাড়া, এবলাছড়ি ও বায়নালা গণহত্যা (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১) ৩০২

৪.২.৪. গোলাকপতিমাছড়া, তারাবানছড়ি গণহত্যা (জুন-আগস্ট ১৯৮৩) ৩০২

৪.৩. ধর্ষণ ৩০৩

৪.৪. ধর্মীয় নিপীড়ন ৩০৩

৪.৫. জোরপূর্বক উচ্ছেদ (১৯৭৫-১৯৮৩) ৩০৪

৫. শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম ৩০৬

৫.১. স্বাধিকার আন্দোলন ও শান্তিবাহিনী ৩০৬

৫.২. শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম ৩০৭

৬. শান্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ৩১৩

৭. শান্তিবাহিনীর সেক্টরসমূহ ৩১৩

৮. শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব ৩১৬

৯. সশস্ত্র সংগ্রামে পাহাড়ি নারী ৩১৭

১০. শান্তিবাহিনীর তৎপরতা ও জনসমর্থন ঃ **‘শ্যাডো গভর্নমেন্ট’** ৩১৮

১১. পাহাড়ি আদিবাসী বিভিন্ন জাতির সমর্থন ৩২০

১১.১. ত্রিপুরা জাতি ৩২০

১১.২. মারমা জাতি ৩২১

১১.৩. মুরং জাতি ৩২১

১১.৪. বম জাতি ৩২২

১১.৫. খিয়াং জাতি ৩২৩

১১.৬. খুমী জাতি ৩২৩

১১.৭. লুসাই জাতি ৩২৪

১১.৮. তঞ্চঙ্গ্যা জাতি ৩২৪

১২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩২৫

১৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগ ৩২৬

১৩.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন ৩২৬

১৩.২. ট্রাইবাল কনভেনশন গঠন ৩২৮

১৩.২.১. জনসংহতি সমিতির সাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের আলোচনা ৩২৯

১৩.২.২. জনসংহতি সমিতির সাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের আলোচনা ৩৩০

১৩.২.৩. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে ট্রাইবাল কনভেনশনে নেতৃবৃন্দের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ ৩৩০

১৩.২.৪. ট্রাইবাল কনভেনশনের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে জিয়া সরকারের ভূমিকা ৩৩১

১৩.২.৫. ট্রাইবাল কনভেনশনের ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদের উদ্যোগ ৩৩২

১৩.২.৬. ট্রাইবাল কনভেনশনের গ্রহণযোগ্যতার সংকট ৩৩৩

১৩.৩. শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ ৩৩৫

১৩.৩.১. পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ৩৩৫

১৩.৩.২. খিয়াং ডাকাত দল ৩৩৮

১৩.৩.৩. মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট ৩৩৮

১৩.৩.৪. চাকমা পিপলস পার্টি ৩৪০

১৩.৩.৫. ‘বামাঞ্ঞাতা’ সংগঠন ৩৪০

১৩.৩.৬. পাহাড়ি যুবক সংঘ ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

১৪. জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ৩৪১

১৫. ঐক্যবদ্ধতার আবরণ ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হত্যাকান্ড ৩৪৫

১৬. উপসংহার ৩৪৮

সপ্তম অধ্যায় : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ঃ সন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন, রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা, সমঝোতা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ৩৪৯

১. সূচনা ৩৪৯

২. সন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন ৩৪৯

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা ৩৫১

৪. ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড (১৯৮৪-১৯৯৭) ৩৫১

৫. গণহত্যা (১৯৮৪-১৯৯৭) ৩৫৬

৫.১. ভূষণছড়া গণহত্যা (৩১ মে ১৯৮৪) ৩৫৬

৫.২. খাগড়াছড়ি-পানছড়ি গণহত্যা (১ মে ১৯৮৬) ৩৫৯

৫.৩ মাটিরাঙা গণহত্যা (মে ১৯৮৬) ৩৬৪

৫.৪ কুমিল্লাটিল্লা-তাইদং গণহত্যা (১৮-১৯ মে, ১৯৮৬) ৩৬৬

৫.৫ হিরাছড়ি-শরবতালি-খাগড়াছড়ি-পাবলাখালি গণহত্যা (৮-১০ আগস্ট ১৯৮৮) ৩৬৮

৫.৬ লংগদু গণহত্যা (৪ মে ১৯৮৯) ৩৬৯

৫.৭ মালয়া গণহত্যা (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২) ৩৭০

৫.৮. লোগাং গণহত্যা (১০ এপ্রিল ১৯৯২) ৩৭০

৫.৯. নানিয়াচরে গণহত্যা (১৭ নভেম্বর ১৯৯৩) ৩৭১

৬. ধর্মান্তর ও নির্যাতন (১৯৮৪-১৯৯৭) ৩৭২

৬.১ ধর্মীয় ক্ষেত্রে ৩৭৩

৬.২ ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করা ৩৭৬

৬.৩ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ ৩৭৭

৬.৪. ধর্মীয় ভ্রমণে বাধা ৩৭৭

৬.৫. ধর্মীয় নিপীড়ন নিয়ে জাতিসংঘে বৌদ্ধ রাজগুরু অজ্ঞবংশ মহাথেরো'র বিবৃতি ৩৭৮

৭. সহিংসতা ৩৮২

৭.১ সহিংসতা ঃ আদিবাসী নারীর প্রতি ৩৮২

৭.২. কল্পনা চাকমা ঃ সামরিক সহিংসতার বলি ৩৮৩

৭.৩ জোরপূর্বক বিয়ে ৩৮৬

৭.৪ গুচ্ছগ্রাম ৩৮৯

৮. আদিবাসী শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ৩৯১

৮.১. পার্বত্য সংঘাতের কারণে সৃষ্ট শরণার্থী ৩৯১

৮.২ পার্বত্য সংঘাতের কারণে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ৩৯৪
৯. শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ – ২ ৩৯৫
৯.১. রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের স্থানীয় সংবাদপত্র ঃ দৈনিক গিরিদর্পণ ও সাপ্তাহিক বনভূমি ৩৯৫
৯.২. মুরংদের 'গরম বাহিনী' ৪০৯
১০. সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত ৪১০
১০.১ নিরাপত্তাবাহিনীর নেতৃত্বে সংঘাত ৪১০
১০.২. শান্তিবাহিনীর অপারেশন ৪১২
১০.৩. কর সংগ্রহ ৪২০
১১. সমঝোতা উদ্যোগ ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র মৃত্যু-উত্তরকালে ৪২২
১১.১. পুনর্গঠিত ট্রাইবাল কনভেনশনে'র সমঝোতা উদ্যোগ ৪২২
১১.২. জাতীয় কমিটি গঠন ৪২৪
১১.৩. জাতীয় কমিটির সাথে পাহাড়ি নেতাদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক ঃ ৪২৭
১২. আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন ৪২৯
১২.১ ইনভেস্টিগেশন টিম-এর আগমন ৪৩৫
১৩. উনিশশ নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ৪৩৮
১৩.১ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র শাসনামল ৪৩৮
১৩.২ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের প্রতি প্রলোভন ৪৪২
১৪. আওয়ামী লীগের শাসনকাল ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ৪৪৩
১৪.১ ২৮ কাঠুরিয়া হত্যা ৪৪৪
১৪.২ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের শান্তি উদ্যোগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ৪৪৪
১৪.৩ চুক্তি পরবর্তী আইন প্রণয়ন ও সংশোধন ৪৪৬
১৪.৪ অস্ত্র সমর্পণ ৪৪৬
১৪.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির তাৎপর্য ৪৪৬
১৫. উপসংহার ৪৪৮

অষ্টম অধ্যায় : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতাদর্শিক অবস্থান ও ব্যক্তিত্বের অবয়ব ৪৫১
১. সূচনা ৪৫১
২. জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ ৪৫১
৩. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ৪৫২
৪. শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর ৪৫৩
৫. নারী অধিকারের প্রবক্তা ৪৫৫
৬. সমতলের আদিবাসী সম্পর্কে সচেতনতা ৪৫৫
৭. শিক্ষা-আন্দোলন সংগঠক ৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৮. রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ৪৫৮

৯. কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক ৪৫৮

১০. পরিবেশ ভাবনা ও জীবে প্রেম ৪৬০

১১. সাধারণ সংযমী জীবন এবং শিল্পচর্চা ও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ ৪৬৩

১২. উপসংহার ৪৬৩

নবম অধ্যায় : পরিশেষ ৪৬৪

গ্রন্থপঞ্জি ৪৭৪

পরিশিষ্ট ৪৮৬

পরিশিষ্ট ১ : Excerpt from Sneha Kumar Chakma's Memorandum to CHADIGANG CONFERERNCE, Amsterdam, 10 - 11 October, 1986 ৪৮৭

পরিশিষ্ট ২ : The Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation, 1958 ৪৯২

পরিশিষ্ট ৩ : Memorandum of Karnafuli Hydroelectric Project ৪৯৫

পরিশিষ্ট ৪ : বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার আবেদনপত্র ৫০৬

পরিশিষ্ট ৫ : বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক ঃ সংবিধান বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য- ১৯৭২ ৫১০

পরিশিষ্ট ৬ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য- ১৯৭৪ ৫২৩

পরিশিষ্ট ৭ : An Urgent Statement of Jana Samhati Samiti ৫৪১

পরিশিষ্ট ৮ : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পার্বত্য উপজাতীয় শরণার্থীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত যৌথ ঘোষণা ৫৬১

পরিশিষ্ট ৯ : শরণার্থী প্রত্যাগমন প্রতিনিধিদলের কাছে সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের চিঠি ৫৬৬

পরিশিষ্ট ১০ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি ৫৬৮

পরিশিষ্ট ১১: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন ৫৮০

পরিশিষ্ট ১২ : পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও করণীয় ৫৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

সারণি ১	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন সার্কেল চীফ ও তাদের নিয়ন্ত্রিত গ্রাম, পরিবার ও জনসংখ্যা	৬০
সারণি ২	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকানুযায়ী জাতি, জনজাতি ও বর্ণের বিন্যাস	৬১
সারণি ৩	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনসংখ্যা	৬২
সারণি ৪	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ও পরিজন সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য	৬৩
সারণি ৫	ঃ আদমশুমারি-ভিত্তিক পাহাড়ি ও বাঙালি জনসংখ্যা ও হার	৬৬
সারণি ৬	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক বিভাজন	৬৮
সারণি ৭	ঃ জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন	২৭৩
সারণি ৮	ঃ পুনর্বাসিত জোন ও পরিবার সংখ্যা	২৯২
সারণি ৯	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহ ও বাঙালিদের উপজেলাওয়ারী অবস্থান	২৯৫
সারণি ১০	ঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বাঙালি সেটলার কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের নাম	৩৬০
সারণি ১১	ঃ মাটিরাঙা গণহত্যায় নিহতদের তালিকা	৩৬৫
সারণি ১২	ঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড	৩৮৭
সারণি ১৩	ঃ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরণ	৩৯২
সারণি ১৪	ঃ শরণার্থী শিবির	৩৯৩
সারণি ১৫	ঃ থানাওয়ারী শরণার্থী পরিবার ও সদস্য সংখ্যা	৩৯৩
সারণি ১৬	ঃ দৈনিক গিরিদর্পন ও সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ	৩৯৬
সারণি ১৭	ঃ নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনে আহত, নিহত ও গ্রেফতারকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্য তালিকা	৪১১
সারণি ১৮	ঃ শান্তিবাহিনীর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা	৪১১
সারণি ১৯	ঃ বাঙালি ও আদিবাসী নিহত, আহত ও অপহরণ তালিকা	৪১৭

মানচিত্র তালিকা

মানচিত্র ১	ঃ বাংলাদেশের মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান	২১
মানচিত্র ২	ঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান	৩৩
মানচিত্র ৩	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা ও উপজেলাসমূহের অবস্থান	৩৪
মানচিত্র ৪	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহের অবস্থান	৩৯

চিত্র তালিকা

চিত্র ১ ঃ	কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল ফটক	১৮৪
চিত্র ২ ঃ	কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ	১৮৫
চিত্র ৩ ঃ	কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে জলমগ্ন এলাকা	১৯১

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র ১	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে জনমিতির রূপান্তর	২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

ADB	:	Asian Development Bank
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
CHT	:	Chittagong Hill Tracts
CAF	:	Central Armed Forces
EPR	:	East Pakistan Regiment
GHQ	:	General Head Quarters
HRPF	:	Human Rights Protection Forum
ILO	:	International Labour Organization
IWGIA	:	International Work Group for Indigenous Affairs
JSS	:	Jana Samhati Samiti
MRG	:	Minority Rights Group
MNA	:	Member of National Assembly
MPA	:	Member of Provincial Assembly
MLA	:	Member of Legislative Assembly
UNDP	:	United Nations Development Program
UNPO	:	United Nations Peoples' Organization
VDP	:	Village Defence Party
WCIP	:	World Council of Indigenous Peoples
WFB	:	World Fellowship of Buddhists

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র ঃ ১

বাংলাদেশের মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান

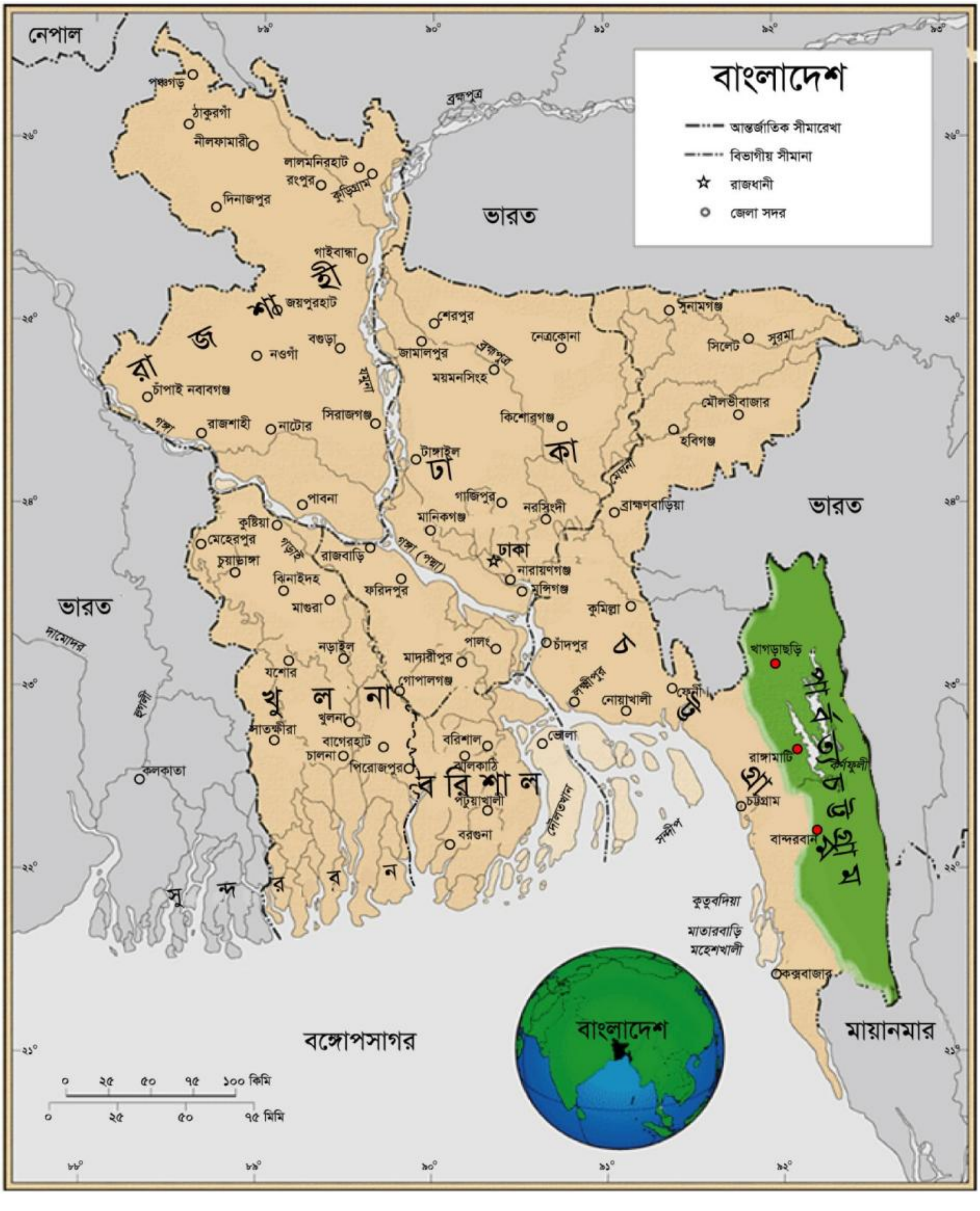

সূত্রঃ ড. আব্দুল গফুর রিসোর্স সেন্টার, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম

(পিএইচডি থিসিস ঃ সারমর্ম)

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৫

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও
পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম
(পিএইচডি থিসিস ঃ সারমর্ম)

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্য দিয়ে। আলোচনায় বলা হয়েছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিগত বৈষম্য দূর করা এবং সকল জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে এই ঐক্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন 'জুম্ম জাতীয়তাবাদে'র ধারণা। তিনি তার রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশের বৃহত্তম জাতি বাঙালিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। তার এই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশে কর্তৃত্বকারী বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ডিসকোর্স। বস্তুত পার্বত্য অঞ্চলের এযাবৎকালের সংঘাতের নেপথ্যে রয়েছে এই পরস্পর সাংঘর্ষিক এই দুটি জাতীয়তাবাদী ধারণা। বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ফলে বাঙালিকরণ ও ইসলামিকরণের আগ্রাসন পাহাড়ি জনজীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ বয়ে এনেছে। তাদের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানকে উপেক্ষা করে সামরিক সমাধানের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাহাড়িদের জীবনকে এক সময় ঠেলে দিয়েছে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামে। বস্তুত, এই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকাকে অনুধাবন ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, ভূমিরূপ, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল, পার্বত্য চট্টগ্রামের বসাবাসরত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও বর্গবিভাজন, বাঙালি জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য, অতীতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক শাসনামলে অনুসৃত প্রশাসনিক নীতি, ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দোলাচল, পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য অঞ্চলের সাংবিধানিক মর্যাদা, বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের সাংবিধানিক অবস্থান, পার্বত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক কাঠামো, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, পাহাড়ি উচ্চস্থানীয়দের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও তার বিরুদ্ধে সাধারণ পাহাড়ি জনগণের সংগ্রাম, ব্যবসায়ী ও মহাজনী শোষণ, বাঙালি প্রশাসনের শোষণ প্রভৃতি বিষয়। এই অধ্যায়ের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাহিত্য পর্যালোচনা। এখানে আলোচিত গ্রন্থসমূহ চার ভাগে বিন্যস্ত, প্রথমতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগুলির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, আদিবাসীদের ঐতিহাসিক পটভূমি, জনসংখ্যা, খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ক; দ্বিতীয়তঃ পাহাড়ি জাতিসমূহের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অস্বীকৃতি বিষয়ক; তৃতীয়তঃ

পাহাড়ি জাতিসমূহের অধিকার ও সংগ্রাম বিষয়ক; চতুর্থতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-কেন্দ্রক প্রকাশনাসমূহ। এসব গ্রন্থ পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ১৯৪৭ সালে পাহাড়িদের 'ভারতপন্থী' এবং ১৯৭১ সালে 'পাকিস্তানপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন? কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়িদের জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল? পাহাড়িদের সশস্ত্র সংগ্রাম না করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবি আদায় সম্ভব ছিল কিনা? জুম্ম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির কারণ কি ছিল? এবং নেতা ও ব্যক্তি হিসেবে এম. এন. লারমা কেমন ছিলেন এবং রাজনীতিতে তার ভূমিকা কি ছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও আদর্শিক প্রস্তুতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনা শুরু হয়েছে মহাপুরম গ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম ও বেড়ে ওঠার বর্ণনার মধ্য দিয়ে, ক্রমান্বয়ে এসেছে তার পারিবারিক পরিমন্ডল, তার পিতামহ চানমনি চাকমা, পিতা চিত্তকিশোর লারমা, মাতা সুভাষিণী দেওয়ান ও ভাইবোনদের ব্যক্তিজীবন এমএন লারমার ব্যক্তিত্ব গঠনে কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার আলোচনা। এখানের আলোচনায় জানা যায় যে, এম. এন. লারমার বাবা চিত্তকিশোর লারমাই সর্বপ্রথম 'নামের আগে বা পরে জাতির নাম' ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্য হলো, বিশ্বের কোন দেশেই কোন ব্যক্তির নামের আগে বা পরে তার জাতির নাম লেখা হয় না। সুতরাং চাকমাদের নামের আগে বা পরে জাতির নাম থাকবে কেন? থাকতে পারে নিজস্ব গোষ্ঠী বা পরিবারের টাইটেল। নামের শেষে জাতির নামের সংযুক্তি ছিল ব্রিটিশদের শাসন সংক্রান্ত সুবিধা স্বার্থে। ব্রিটিশরা সংখ্যাল্প জাতিকে চিহ্নিত করার জন্য এটা করেছিল। তিনি তাই ব্রিটিশদের এই অযৌক্তিক নিয়মের অনুসরণ না করে নিজের ও সন্তানদের নামের শেষে লারমা টাইটেল যোগ করেন। এ অধ্যায়ে এম. এন. লারমার শিক্ষাজীবন, আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনে মহাপুরম স্কুলের ভূমিকা, পাহাড়ী ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠা ও মনোভূমি নির্মাণে প্রভাব, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পাহাড়ি জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা, পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে আসা, কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার পরিধিকালের প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও তার প্রতিক্রিয়ায় সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের সূত্রপাত প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের প্রভাবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নানামুখী ক্ষতি ও দুর্গতি এবং তার বিপরীতে সরকারের দায়সারা পুনর্বাসন, কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে *পাহাড়ী ছাত্র সমিতি*'র ভূমিকা ও আন্দোলনে তাদের সম্পৃক্ততা, দীর্ঘ মেয়াদি সংগ্রামের কৌশল হিসেবে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা, রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে *চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন*-এর জন্ম ও বিকাশ এবং ঐ আন্দোলন দমনে সরকারী নানা তৎপরতার কথা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির বিকাশ প্রসঙ্গ, যেমন ঐতিহাসিক ৬ দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। এখানে বলা হয়েছে পাহাড়ি জনগণকে নিজ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি থেকে বিতাড়িত করার যে প্রক্রিয়া কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পাকিস্তান আমল থেকে শুরু হয় তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই মূলত পাহাড়িরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে নিজেদের লড়াই শুরু করেন। এ লড়াই পরবর্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী সংগ্রামে পাহাড়িদের যুক্ত করে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে জোরালো করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পার্বত্য আদিবাসীদের ভূমিকার কথা। ১৯৭১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন, পাহাড়ি ও বাঙালি সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এম. এন. লারমার নেতৃত্বে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের বিবরণী এতে রয়েছে। এ যুদ্ধে বাঙালিদের পাশপাশি পার্বত্য আদিবাসীরা অংশগ্রহণ করলেও কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ শেষে পাহাড়িদের সম্পর্কে বাঙালি স্থানীয় নেতৃত্বের সন্দেহ ও অবিশ্বাস একপর্যায়ে সংঘাতের রূপ নিয়েছে। তবে এসব বিষয়কে ছাপিয়ে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে পাহাড়িদের মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণের ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও জুম্ম-জাতীয়তাবাদের বিকাশ'। এই আলোচনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিগত বহুমাত্রিকতার অস্বীকৃতি। 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা জাতিতে বাঙালি নয়' এটি কখনও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা ও রাষ্ট্রনায়কেরা অনুধাবন অথবা স্বীকার করেননি। এর ফলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদের বক্তব্যে স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে তিনি জাতিতে চাকমা, তার জাতি-পরিচয় কখনই বাঙালি হতে পারে না। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকেরা তার এই বক্তব্যকে স্বীকার না করায় এম এন লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পাহাড়ি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। জনসংহতি সমিতি পরবর্তীতে এই দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলে।

এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজাকার দমনের নামে নির্বিচারে আদিবাসীদের বিশেষত চাকমাদের উপর মুক্তিবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনা এবং তা নিরসনে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ নীতি-নির্ধারকদের সাথে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ। এসময় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকেও জোরালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এসব ঘটনার ধারাবাহিকতায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়েছে যা আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম'। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসনের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনাশাসনের আওতায় আসে। কারণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে প্রথমত মুক্তিযুদ্ধে পাহাড়ি জনগণের অংশগ্রহণ নিয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের ভ্রান্ত ধারণা ও পাহাড়িদেরকে রাজাকার হিসেবে প্রতিপন্ন করা, যা চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করাকে কেন্দ্র করে ঘনিভূত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল মিজো বাহিনীর আধিপত্য যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর সমর্থনে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে

তাদের নির্মূলের লক্ষ্যে পাহাড়ে সেনা অভিযান, তৃতীয়ত, নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক একটি রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়াও শান্তিবাহিনীর তৎপরতাকে দমন পাহাড়ে সেনা মোতায়েনের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে প্রাধান্য পায়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে সেনাশাসনের অধীন হয়। এ সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অসাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূল ভূমিকায় জায়গা করে নেয় সেনাবাহিনী – পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যতঃ প্রবর্তিত হয় সেনাশাসনের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত"। সেনাবাহিনী প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে হস্তগত এবং নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর বিপরীতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রবলতর হতে থাকে।

সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পাহাড়ের বিদ্রোহ দমন প্রক্রিয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা তাদের পরিচয় মুছে ফেলার রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়। যে-কোনো সভা-সমাবেশ এমনকি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা আয়োজনের জন্যও সেনাবাহিনীর অনুমতি আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সামরিকীকরণের নিয়ন্ত্রণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেখানে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ভঙ্গ করে সেনা কর্তৃত্বে বাঙালি সেটলারদের বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য পাহাড়িদের নিজস্ব জমি থেকে উচ্ছেদ করে সমতলের জেলাসমূহ থেকে লোক এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা এবং এবং পাহাড়ের আদিবাসী জাতিসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে এমনভাবে বিলুপ্ত-প্রায় করে তোলা যাতে ক'রে তারা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে না পারে। এই লক্ষ্য পূরণে ৪,০০,০০০-এর বেশি বাঙালিকে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করানো হয়, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। এভাবেই এগিয়ে চলে বাঙালিকরণ ও ইসলামীকরণের কাজ। এরকম বিপুল পরিমাণে বাঙালি সেটলারদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আদিবাসীরা তাদের নিজ আবাস ভূমিতেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। একের পর এক ঘটতে থাকে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার কর্তৃক পাহাড়িদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও উঠে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক উচ্ছেদ, ধর্মীয় নিপীড়নের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ। বিপুল সংখ্যক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে শরণার্থী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। ফলে বিভিন্ন পাহাড়ি জাতির অকুণ্ঠ সংহতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এরূপ পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের উপায় খুজতে থাকেন। গঠিত হয় ট্রাইবাল কনভেনশন। ইতোমধ্যে সরকারি বাহিনী ছাড়াও শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। কৌশলগত কারণে এম. এন. লারমা আত্মগোপন করেন। পাহাড়িদের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর শান্তিবাহিনীরই উপদল প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন এম এন লারমা ।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন, রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা, সমঝোতা ও শান্তিচুক্তি বিষয়ে। আলোচনায় বলা হয়েছে এম এন লারমা নিহত হওয়ার পর দলের নেতৃত্বে আসেন তার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধানের পাশাপাশি এর সশস্ত্র শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাদের অন্যতম প্রতিপক্ষ ও এম এন লারমার হত্যাকারী প্রীতি গ্রুপের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে সম্পূর্ণরূপে কোনঠাসা করে ফেলেন। শান্তিবাহিনী ও সরকারি বাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণের তীব্রতায় ১৯৮৫ সালে শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপ সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে এবং কয়েকদফা আলোচনা শেষে ঐকমত্যে পৌঁছে এবং ঐ বছরের ২০ এপ্রিল প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন সদস্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করে। প্রীতি গ্রুপের বিলুপ্তির পর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে একচ্ছত্রভাবে আসীন হন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। সমগ্র ১৯৮০-এর দশকব্যাপী সন্তু লারমার নেতৃত্বে পুনর্গঠিত শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহী কার্যকলাপের মাত্রা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনী এবং সরকারি ও বাঙালি অসামরিক লোকজন বিভিন্নভাবে তাদের হামলার শিকার হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকারও নানাভাবে সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াতে থাকে। ফলে এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে।

এ সময় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মোহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকার শান্তিবাহিনীর তৎপরতার বন্ধের লক্ষ্যে দ্বৈতনীতি গ্রহণ করে। তারা একদিকে শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার কথা বলে, অন্যদিকে পার্বত্য জনগণ ও শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানকে জোরদার করতে থাকে। এ সময়ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ড, গণহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মীয় নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। এ সময়ের উল্লেখ যোগ্য গণহত্যাগুলো হলো: ভূষণছড়া গণহত্যা (৩১ মে ১৯৮৪), খাগড়াছড়ি-পানছড়ি গণহত্যা (১ মে ১৯৮৬), মাটিরাঙা গণহত্যা (মে ১৯৮৬), কুমিল্লাটিল্লা-তাইদং গণহত্যা (১৮-১৯ মে, ১৯৮৬), হিরাছড়ি-শরবতালি-খাগড়াছড়ি-পাবলাখালি গণহত্যা (৮-১০ আগস্ট ১৯৮৮), লংগদু গণহত্যা (৪ মে ১৯৮৯), মালয়া গণহত্যা (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২), লোগাং গণহত্যা (১০ এপ্রিল ১৯৯২), নানিয়াচরে গণহত্যা (১৭ নভেম্বর ১৯৯৩)।

এ অধ্যায়ের আরও আলোচিত হয়েছে উনিশশ নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে চলমান পরিস্থিতির ক্রমপরিণতি বিষয়ে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হ'লে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিল, ভারত থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে আনাসহ কতিপয় দাবি তুলে ধরেন। তারা ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে নির্বাচন স্থগিত রাখারও দাবি জানান।

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর ঐ বছরের ৯ জুন অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে দ্রুততার সাথে ২২টি বিভাগের মধ্যে ১৯টি বিভাগ তথা ১৯টি বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষমতা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদেরসমূহের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বড় অংশই ক্ষুব্ধ হন।

১৯৯২ সালের ৮ জুলাই স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সরকার সংসদে বিল উত্থাপন করে। আওয়ামী লীগ সাংসদরা সংসদে স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবি জানালে কণ্ঠ ভোটে হেরে যায়। পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলে ১০ জুলাই পার্বত্য অঞ্চলের সংসদ সদস্যবৃন্দ তাদেরকে বাদ দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায়। তাদের দাবির মুখে সরকার খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করে। বিএনপি সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের কোন সুনিদিষ্ট রূপরেখা না থাকায় এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। হঠাৎ করে শান্তিবাহিনী ১৯৯২ সালের ১ আগষ্ট থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত একতরফাভাবে অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে এবং রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। পরবর্তীতে বিশেষ কমিটি তিন পার্বত্য জেলা সফর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পাহাড়ি ও অপাহাড়িদের সাথে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মত বিনিময় করে।

এ পর্যায়ে ১৯৯১ সালের ২২ অক্টোবর সরকারের পক্ষ থেকে শান্তি বাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মেজর মিহির ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে উল্লেখ ক'রে সরকারের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেন। জনসংহতি সমিতিও একইভাবে এ ঘোষণাকে চলমান শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করে।

যোগাযোগ কমিটির চেষ্টায় ১৯৯২ সালের ৫ই নভেম্বর খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে জনসংহতি সমিতি ও বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে পাহাড়িদের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে বিশেষ কমিটির বৈঠকগুলো কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

১৯৯২ সালের ৩০ জুলাই চট্টগ্রামের ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে মত প্রকাশ করেন যে, পার্বত্য এলাকায় মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনী দ্বারা নিরীহ ও নিরস্ত্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নির্যাতন বা গ্রেফতারের শিকার হবেনা। সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে জিওসির এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে তিনমাসের অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে। এরপরে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের বেশ কয়েকদফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতীত কোন মৌলিক অগ্রগতি হয়নি। ১৯৯৬ সালের ৩০শে মার্চ খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে খালেদা জিয়ার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

এরপর ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে দেশে বিরাজমান অন্যতম একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। ঐ বছরের ২১ ডিসেম্বও আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি প্রথম শান্তিবাহিনীর সাথে খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে

বৈঠক করে। ইতিমধ্যে ১১ সদস্যের জাতীয় কমিটির প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় গমন করেন শরণার্থী নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য। ১৯৯৭ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত চার দিন ধরে ঢাকায় উভয় পক্ষের পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জনসংহতি সমিতির ২২ পৃষ্ঠার ৪৪টি উপদাবি সম্বলিত পাঁচ দফা দাবিনামা। জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটির পঞ্চম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জুলাই থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। ঢাকায় ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। এ বৈঠকের পর ১৭ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমা ঘোষণা দেন, জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটি একটি খসড়া শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয় ১৯৯৭ সালের ২৬ নভেম্বর। ৩০ নভেম্বর মধ্যরাতে উভয় পক্ষ চুক্তির সকল বিষয়ে একমত হতে সম্মত হয়।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘ দুই দশকের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, উভয় পক্ষে যোগাযোগ ও বৈঠকের পর বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শান্তিবাহিনী অস্ত্র ফেলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

অষ্টম অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতাদর্শিক অবস্থান ও ব্যক্তিত্বের অবয়ব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথমেই যে বিষয়টি এসেছে তা হলো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বদেশ প্রেম ও জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ। এ প্রসঙ্গে কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে তাদের বসতবাড়ি যখন জলমগ্ন হয়ে যায় তখন তার সেই সময়ের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ বিধৃত হয়েছে যা খুবই মর্মস্পর্শী। এরপর আলোচিত হয়েছে এম এন লারমার অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিষয়ে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, পাহাড়ি বা বাঙালি, সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদে তাঁর বক্তব্য, ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রারম্ভে শুধু পবিত্র কোরআন এবং গীতা পাঠের নিয়মের স্থলে তার গঠনমূলক প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকেও পাঠের প্রচলন, যেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে।

এম. এন. লারমা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করেছেন যার প্রমাণ মেলে গণ পরিষদে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর তার বক্তব্যে। তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, যারা কল-কারখানার চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাদের রক্ত চুঁইয়ে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ প্রতিটি জিনিস তৈরি হচ্ছে সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে স্থান পায়নি। নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও তিনি সোচ্চার ছিলেন তা এই অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে। তিনি গণ পরিষদে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্যে গোটা দেশের অবহেলিত নারী সমাজ প্রসঙ্গে বলেন যে, নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। অষ্টম অধ্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এম এন লারমার অবদানের কথা ছাড়াও আরও আলোচিত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বিষয়, তাঁর পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা, সাধারণ সংযমী জীবন এবং শিল্পচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়।

নবম অধ্যায় এ অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ডিসকোর্সের বিপরীতে পাহাড়ি জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং তার অভিঘাতে পাহাড়িদের স্বাধিকার আন্দোলনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকার কথা পর্যালোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

১. প্রাককথন

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিগত বৈষম্য দূর করা এবং সকল জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আর এই কাজে জুম চাষের উত্তরাধিকার বহনকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেন এবং এই ঐক্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নির্মাণ করেন 'জুম্ম জাতীয়তাবাদে'র ধারণা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পাহাড় ঘেরা অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশের বৃহত্তম জাতি বাঙালিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। এই স্বতন্ত্র সত্তা তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জাতি-পরিচয়ে, যে পরিচয় সমষ্টিগতভাবে আদিবাসী হিসেবে বিধৃত। তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সার্বিকভাবে জুম উৎপাদন পদ্ধতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উদ্ভাসিত। মুখ্যত জুম উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই তাদের সংস্কৃতি তথা ভাষা, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, মনন, আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, জীবনধারা, সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস প্রভৃতি গড়ে উঠেছে; এবং তাদের মধ্যে একে অপরের এবং এক জাতিসত্তার সাথে আর এক জাতিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক, বন্ধন, ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সংহতি ও প্রতিযোগিতা ওতোপ্রোতভাবে গ্রথিত ও রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সমতল অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পার্বত্য জনপদের এই স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলাদেশের সকল জাতির সমানাধিকার অর্জনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আর এই কাজে তাকে লড়তে হয়েছে কর্তৃত্বকারী আরেক "জাতীয়তাবাদ"-এর সাথে।

বাংলাদেশে কর্তৃত্বকারী এই "জাতীয়তাবাদ"-এর রয়েছে আবার দুই অবয়ব – বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বস্তুত জন্মাবধি বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই দুই অবয়বের জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স। ভেলাম ভন স্যান্ডাল এদের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন নিম্নরূপেঃ [১]

> æThe first deals with the '*struggle for Bengali Nationhood.'* It creates, celebrates and naturalises an ethnic category, the Bengali, and traces its tortuous rise to power and self-esteem. The second is the '*Emancipation of the Muslim, '* which does the same for a religious category. Today, the big debates in Bangladesh swirl around these two narratives and how they impinge on

১ Willem van Schendel, Wolfgang Mey and Aditya Kumar Dewan, *The Chittagong Hill Tracts : Living in a Borderland*, White Lotus Press, Bangkok, 2000, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

> individual and group identities, the state, and the destiny of Bangladesh society.”

‘জাতি’ ও ‘ধর্ম’-ভিত্তিক এই দুই অবয়বের জাতীয়তাবাদের কর্তৃত্ববাদিতার কারণে অন্যান্য সকল ধারার ইতিহাস ও ইতিহাস-চর্চা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে; কেননা, ভেলাম ভন স্যান্ডালের ভাষায়, “the intensity of these debates has made it easy to ignore, marginalise and suppress other accounts of the history of Bangladesh।”[২] যেসব ধারার ইতিহাস এই কর্তৃত্ববাদিতার শিকার হয়ে প্রান্তিকতায় পর্যবসিত (যেমন নিম্নবর্গের বা নারীর ইতিহাস), তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসত্তার ইতিহাস, বিশেষত আদিবাসীর ইতিহাস; আর বাংলাদেশের সকল জেলাতে আদিবাসীর বসবাস থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জনসংখ্যানুপাত অন্যত্রের তুলনায় বেশি, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস হয়েছে উপেক্ষিত। তবে বিদ্রোহের আকরে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশ্বের, প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছেন বাংলাদেশের ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সকে; তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাম্প্রতিক সংগ্রামকে অনুধাবন ও তার ইতিহাস প্রণয়ন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিশ্বজুড়ে ইতিহাস চর্চার ধারায় অধুনা যেসব পরিবর্তন এসেছে, তার সূত্র ধরে জাতীয়তাবাদী বয়ান-কে নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে।[৩] ভেলাম ভন স্যান্ডাল এই প্রয়োজনীয়তাকে উপস্থাপন করেছেন নিম্নলিখিতভাবে:[৪]

> æToday emancipatory narratives of the nation are being questioned, not only in Bangladesh but all over the world: it is high time for us to explore the multitude of alternative histories that these narratives have covered up.”

জাতীয়তাবাদের রাজনীতি আধুনিককালে নতুন তো নয়ই, বরং বহুল ব্যবহৃত একটি মতাদর্শ। বাংলাদেশে শুধু নয়, বিশ্বের প্রায় সকল দেশে এখনও জাতীয়তাবাদই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা রাষ্ট্র-কেন্দ্রীকতা এবং অঙ্গীভূতকরণকে জাতিসত্তার মডেল হিসেবে বিবেচনা করে সকল জাতিকে একীভূত করতে চেয়েছেন। এই সূত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতারা প্রধান জাতিকে মডেল হিসেবে ধরে সংখ্যালঘু জাতি ও সম্প্রদায়গুলোকে মূলস্রোতধারার জাতির সাথে একত্রীভূত করতে চেয়েছেন। এই রাজনীতিবিদগণ “রাষ্ট্র” এবং “জাতি”-কে একই অর্থবোধক করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সামরিক নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। এসব

---

[২] ঐ।

[৩] উদাহরণ হিসেবে দেখুন ইলিরা দেওয়ান ও মানস চৌধুরী, ‘জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন’ ঃ কার স্বার্থ? কোন জাতি?’ প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া সম্পাদিত *বিপন্ন ভূমিজ ঃ অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪-৮২। আরও দেখুন মাহমুদুল হাসান সুমন ও সাঈদ ফেরদৌস, ‘ইন্ডিজেনাস’-এর অনুসন্ধান ঃ বাংলাদেশের বিদ্যায়তনিক জগতের দোনোমনা’, প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩-৫৯।

[৪] Willem van Schendel, Wolfgang Mey and Aditya Kumar Dewan, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

নীতিমালা 'রাষ্ট্রে'র তথা 'জাতি'র স্বার্থে গৃহীত বলে তারা প্রচার করলেও মূলতঃ এর মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ববান মূলস্রোতধারার জাতিকেই শক্তিশালী করা হয়েছে।[৫] ব্রিটিশ শাসকরা উপনিবেশ স্থাপন করে ভারতবাসীর উপর যে হীন আচরণ করতেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতারাও বাঙালিদের ওপর সেই আচরণ করেন। তারা বাঙালিদের ভাষা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের কারণে তা ব্যর্থ হয়। তারা চাকরির কোটা, পদোন্নতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করে। দক্ষিণ এশিয়ায় কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন বেশ কিছু ভাষার স্বীকৃতি রয়েছে তেমনি অস্বীকৃত অনেক ভাষাও রয়েছে। এই অঞ্চলে জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এক বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু জাতি/ বর্ণ/ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের সমাজগুলোতে বৃহৎ জাতিকেন্দ্রিক 'জাতি-রাষ্ট্র' গঠন করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। শ্রীলংকায় তামিল জাতির নিজস্ব পৃথক আবাসভূমির দাবির মুখে শ্রীলংকার আঞ্চলিক 'সংহতি' এখন হুমকির মুখে। একইভাবে ভারতকে রাষ্ট্রের একতা রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত নাগা, মিজো, আসামের জনগণসহ আরও অনেক জাতির জাতিত্বের স্বীকৃতির দাবি এবং কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। পাকিস্তানে পাঞ্জাবিদের কর্তৃত্বের কারণে বেলুচি, সিন্ধি এবং পাঠান জাতির সাথে সংহতি দৃশ্যত হারিয়েছে বললেই চলে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ বাঙালি, মাত্র দুই ভাগ আদিবাসীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির বাস। তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জাতি-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার দাবি বাংলাদেশ সরকারের নিকট একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।[৬]

জাতীয়তাবাদ হলো নেতৃত্বের একটি হাতিয়ার। নেতৃত্ব জাতীয়তাবোধের একটি আদর্শ তৈরি করে তাতে সেইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যা ঐ সময়ে প্রধান জনগোষ্ঠীর শাসকবর্গের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। ফলে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ ঐ মতাদর্শের মধ্যে নিজ স্বার্থের প্রতিফলন পায় না। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই; তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে নিজেদের খুঁজে পায় না। জন্মাবধি বাংলাদেশের নেতারা পুরো বাংলাদেশকে বাঙালিকরণের চেষ্টা করেছেন। ফলে আদিবাসীদের জাতিসত্তা, ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুরোপুরি হুমকির মুখে পড়েছে। জাতীয়তা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক কৌশল। এটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে একীভূত করার উপর জোর দেয়। বাংলাদেশে যে বাঙালি ছাড়া অন্য কোনো জাতি আছে তা সম্ভ্রান্ত বাঙালি নেতাদের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্য-আগস্ট পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ১৯৭৫-এর মধ্য-আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আদিবাসীর অস্তিত্ব ও জীবনকে অস্বীকার করেছে প্রায় একই সুরে।

---

[৫] এ সংক্রান্ত আরও আলোচনার জন্য দেখুন Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism*, The University Press Limited, Dhaka, 2002, পৃষ্ঠা ঃ ১-২।

[৬] ঐ, পৃ ঃ ২-৩।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে বিভিন্ন বিষয় যুক্ত করেছেন। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রধান হাতিয়ার ছিল জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি। পরবর্তীকালের সরকারগুলো ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগের পরবর্তীতে সামরিক শাসকরা 'বাঙালি আদর্শ'-কে 'বাংলাদেশী আদর্শ'-এ পরিণত করেছে। জিয়ার সময় ইসলামের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং এরশাদের সময় পুরো দেশকে ইসলামী সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে। প্রত্যেক শাসকই চেয়েছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সস্তা সমর্থন আদায় করতে; ফলে তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। পাহাড়ি জনগণ জাতিগত স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেয়েছে, কিন্তু সাংবিধানিক অস্বীকৃতির কারণে তা সম্ভব হয় নি। উপরন্তু, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপক হারে বাঙালিদের বসতি স্থাপনের কারণে তারা ভূমির অধিকার হারাতে থাকে। ক্রমান্বয়ে পাহাড়িদের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ভূমি সমস্যা। ফলে তারা দাবি আদায়ে অর্থাৎ নিজস্ব জাতীয়তা ও ভূমিস্বত্ব বজায় রাখতে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার পাহাড়িদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত করে। সেটেলার বাঙালি ও নিরাপত্তা বাহিনী পাহাড়ি জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের দমন নির্যাতন চালায়। তারা পাহাড়িদের হত্যা ও মারধর করে, জমিজমা দখল করে নেয়, বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় ও মেয়েদের ধর্ষণ করে। [৭] সেই সাথে যুক্ত হয় ইসলামিকরণ। [৮] পাল্টে ফেলার চেষ্টা করা হয় তার পরিচয়কে। এ সবই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে, গভীরভাবে বেদনার্ত করে তাদের। সেই গভীর মনোবেদনার ছাপ পাওয়া যায় সুদীপ্ত চাকমা মিকাডো'র কবিতায় ঃ[৯]

æWhat should my identity be,
I wonder.
Am I tribal? An indigenous man?
A minority?
Abuse greets me
when I introduce myself.
Ah, so you're tribal?
Does the government classify
you as an indigenous people yet?
Which answer would make
the government happy,
I wonder.
This is no country for indigenous men.

[৭] ঐ।

[৮] ঐ।

[৯] Sudipta Chakma Mikado, 'Identity', published as '*Two Poems from the Chakma'* in the periodical *World Litereture Today*, vol. 87, Issue 3, May-June 2013, p-53. Translation into English By Quamrul Hassan with David Shook.

We vote for them dreaming of change,
of reading things in our mother tongue.
I want to go to school,
I dream of making something of myself,
of doing things for my country.
Day and night
I'm haunted by
land grabbing and arson,
the rape of my mothers and sisters.
Another Baisabi Fair is knocking at the door.
I fear what's coming next.
In the market, I'm asked many things.
They scan my entire body with their eyes.
When asked
I show them the deeds to my land.
They just tear them up
and say
It's too old.
Show me the new one,
the one from the days of Mohammad Ali."

সমসংস্কৃতি ও এককেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের পক্ষে নিজ পরিচয় ও সংস্কৃতি নিয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম খুব সহজ ছিলনা। কাপ্তাই বাঁধের কারণে ভূমিচ্যুতি, ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান সত্ত্বেও অবিশ্বাস, স্বাধীন দেশে সাংবিধানিক অস্বীকৃতি, নির্যাতন, সামরিকায়ন, বাঙালিকরণ ও ইসলামিকরণ, ভূমি-দখল ও লুন্ঠন এবং হত্যা, গণহত্যা ও ধর্ষণ, দেশান্তর ও শরণার্থী জীবন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা এবং নিরাপত্তাহীনতা মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর জীবনে যে বেদনাবোধ ও ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। আর এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এল সালভেদর-প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ইগ্নাশিও মার্টিন ব্যারো'র[১০] 'কালচারাল ট্রমা'[১১] সংক্রান্ত ধারণাকে যার ভিতর রয়েছে অবরুদ্ধ রাজনীতির নানান মানসিক মাত্রা, এবং মানসিক

---

[১০] উত্তর আমেরিকার এক শিক্ষক-সহকর্মীকে ইগ্নাশিও মার্টিন ব্যারো বলেছিলেন,"তোমাদের দেশের নিয়ম হলো 'হয় প্রকাশনা করো অথবা হারিয়ে যাও'; আর আমাদের এখানকার নিয়ম হলো 'প্রকাশনা করো এবং মৃত্যুবরণ করো"। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে সালভাদরের ডেথ স্কোয়াড তার এই অলংকারপূর্ণ স্বর নির্বাপন করে দেয়। মার্টিন ব্যারো, স্পেনে জন্মানো একজন জেসুইট পুরোহিত, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর পড়াশোনা করেছিলেন এবং মনোবিজ্ঞানের আলোকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানবিকতাকে জাগরিত করতে তার বেছে নেয়া দেশ এল সালভাদরের বঞ্চিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

[১১] Ignacio Martín-Baro, *Writings for a Liberation Psychology* (edited by Adrianne Aron, Shawn Corne), Harvard University Press, 1996. 'কালচারাল ট্রমা' নিয়ে অন্যান্যের মধ্যে আরও লিখেছেন Jeffrey C.

স্বাস্থ্যের উপর হিংস্রতা ও আঘাতের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা, ভাবাদর্শের সাধনী হিসেবে রাজনীতি এবং ধর্মের ব্যবহার, এবং রাষ্ট্রের সহিংসতা ও উৎপীড়নে কোনটা 'বাস্তবিক' এবং কোনটা 'নিয়মমাফিক' তার পর্যালোচনা। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যে জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের নীতিনির্ধারণে সম্পর্কযুক্ত সে কথা মার্টিন ব্যারো স্পষ্ট করে তোলেন। এর মাঝেই মার্টিন ব্যারো মানসিক স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূনর্যোগ ঘটিয়ে দেন। সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কিত তার বিশ্লেষণ সেইসব সমস্যাকে চিনিয়ে দেয় যা চেনাতে সমসাময়িক সামাজিক বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে। মার্টিন ব্যারো বস্তুগতভাবে এবং বিচারিক আবেগময় উষ্ণতা দিয়ে নিপীড়িত সমাজ এবং তার মুক্তি সংগ্রামকে গভীরভাবে অনুধাবনে সহায়তা করেন। রাজনৈতিক মনোবিদ্যা, যুদ্ধ ও আঘাত, এবং ভাবতত্ত্বের বাস্তবতা তার লেখাকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা এনে দিয়েছে। মার্টিন ব্যারো দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সাধনী হিসেবে ধর্মে ছুঁয়ে যায় এবং তা অবদমিত সমাজের বাস্তবতাকে রাজনৈতিকভাবে খণ্ডিত করে। তিনি মনে করেন যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই নিপীড়নের অবসান হতে পারে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই নিপীড়িতের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন ঃ[১২]

> "It is clear that no one is going to return to the imprisoned dissident his youth; to the young woman who has been raped her innocence; to the person who has been tortured his or her integrity. Nobody is going to return the dead and the disappeared to their families. What can and must be publicly restored [are] the victims' names and their dignity, through a formal recognition of the injustice of what has occurred, and, wherever possible, material reparation.... Those who clamour for social reparation are not asking for vengeance. Nor are they blindly adding difficulties to a historical process that is already by no means easy. On the contrary, they are promoting the personal and social viability of a new society, truly democratic."

এই গবেষণায় ইগ্নাশিও মার্টিন ব্যারো'র ভাবনার আলোকে রাষ্ট্রের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ সংঘাতে সেখানকার আদিবাসী মানুষের মনে যে সুগভীর ক্ষত বা ট্রমা তৈরি হয়েছে তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা তথা বাংলাদেশের জাতিগত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানকে উপেক্ষা করে সামরিক সমাধানের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দীর্ঘ দুই যুগের চেষ্টাতেও সফলতার মুখ দেখে নি। বরং তৈরি হয়েছে শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যা। আর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারকে পড়তে হয়েছে জবাবদিহিতায়। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা।

Alexander, Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil J. Smelser and Piotr Sztompka, *Cultural Trauma and Collective Identity,* University of California Press, 2004.

১২ Ignacio Martin-Baro, 'Reparations: Attention Must be Paid', published in Neil Kritz (Ed), *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes,* United States Institute of Peace Press, Washington DC, 1995), p 570. (Original - posthumously; Ignacio Martin-Baro, 'Reperations: Attention Must be Paid', *Commonweal*, March 23, 1990, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৪-১৮৬)।

ফলে উভয় তরফেই প্রয়োজন পড়ে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতি শান্তি স্থাপনে একমত হয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।[১৩]

জাতীয়তাবাদী রাজনীতিও ইসলামিকরণ এবং তার বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা চেষ্টার এই ইতিবৃত্তের মধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকাকে অনুধাবন ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সূত্রপাত যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্তত এক যুগ আগে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বের সোপান সেখান থেকেই শুরু, তাই এই গবেষণার সময়কাল শুরু হয়েছে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ থেকে।

১৯৩৯ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর থানার বুড়িঘাট মৌজার মহাপুরম গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম মঞ্জু। পিতার নাম চিত্ত কিশোর লারমা এবং মাতার নাম সুভাষিণী দেওয়ান। তারা ছিলেন চার ভাইবোন। তিনি তার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় হলেন বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু)। তারপর শুভেন্দু প্রভাস লারমা (বুলু)। এরপর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু), এবং সর্বকনিষ্ঠ হলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যিনি সন্তু লারমা নামে সকলের কাছে পরিচিত। এম এন লারমার পিতা চিত্তকিশোর লারমা ছিলেন শিক্ষক, দক্ষ সংগঠক ও সমাজকর্মী। তিনি শিক্ষকতা করতেন মহাপুরম প্রাইমারি স্কুলে, যেটা পরবর্তীতে মহাপুরম হাই স্কুলে পরিণত হয়। মাতা সুভাষিণী দেওয়ান ছিলেন গৃহিণী। এম এন লারমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছিল মা সুভাষিণী দেওয়ানের কাছে। মহাপুরম জুনিয়র স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন, নবম শ্রেণিতে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র সরকারি স্কুল 'রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[১৪] পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত অবহেলিত ছিল সেই সময়। ১৯৬৫ সালে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে একমাত্র রাঙ্গামাটি শহরে একটি সরকারী স্কুল ও একটি বেসরকারি হাই স্কুল ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো কলেজ না থাকায় তিনি 'চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ' থেকে আইএ পাশ করেন। ছাত্রজীবন থেকে গ্রামসমাজের সাথে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা গড়ে উঠেছিল। তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের নানামুখী সামাজিকতায় কেউ বিপদে পড়লে বা সাহায্য চাইলে তিনি এগিয়ে যেতেন, খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি ১৯৬৩ সালে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরোধিতাকালে 'রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের' অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, এ সময় তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বিএ পড়েন। ১৯৬৫ সালে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে প্যারোলে থেকে তিনি বিএ এবং ১৯৬৮ সালে বিএড পাশ করেন। অতপর ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম আদিবাসী আইনজীবী হিসেবে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগ দেন। সমকালীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে বিকল্প দর্শন উপস্থাপনকারী এই রাজনীতিবিদের কর্ম পরিধি অতিক্রম করেছে

---

[১৩] দেখুন পরিশিষ্ট ৮ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি।

[১৪] ভাইবোনদের বিবেচনায় ছাত্র হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা 'অত্যন্ত মেধাবী ও চৌকস' ছিলেন, যা তার পরীক্ষার ফলাফলে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কেননা অসুস্থ অবস্থায় তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ হলেও তিনি 'ভালো নম্বর' পেয়েছিলেন। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে তো বটেই, এমনকি ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়াও কষ্টসাধ্য ছিল এবং তা 'ভালো ফল' হিসেবে সমাজে বিবেচিত হতো।

তার জীবনকালকে। এ কারণেই তার মৃত্যুর (১৯৮৩) তিন দশক পরেও, তাকে নিয়ে এবং তার দর্শন ও তার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন পড়ছে।

মূলত দুই ধরনের উপাত্তের উপর নির্ভর করে এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথমত প্রাথমিক বা মূল উপাত্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমান আন্দোলন-সংঘাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দ, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, শান্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, সামাজিক সংগঠনের সংগঠকবৃন্দ এবং এম এন লারমার সহোদর ও রাজনৈতিক উত্তরসূরি সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয়ত, সহকারী উপাত্ত হিসেবে গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য রচনা, গবেষণা কর্ম, স্মৃতিকথা, স্মরণিকা, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাবনার প্রতিফলন পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো তার নির্বাচিত গণপরিষদ ও সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময় ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত দুদফার সংসদীয় কার্যবিবরণী। তাই এই কার্যবিবরণীকেও উপাত্তের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকার সাধারণ জনগণের মানস ও অভিমত অনুধাবনের উদ্দেশ্যে বহুবার গবেষণা এলাকা সফর করা হয়েছে এবং সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিষয়বস্তুর গভীরে পৌঁছানোর এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মনোবেদনাকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. গবেষণার বিভিন্ন দিক

২.১. কেন এই গবেষণা

ভূ-প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ থেকে চট্টগ্রামের জনবিন্যাস ও জাতিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পৃথক। কমপক্ষে এগারোটি সংখ্যালঘু আদিবাসী জাতির বাস সেখানে। [১৫] সংখ্যায় কম হওয়ার সুবাদে সংখ্যাগুরু জাতির সংস্কৃতিতে তারা চিহ্নিত হন "উপজাতি" হিসেবে। [১৬] অপরদিকে, দেশের নয়-দশমাংশ সমতলে সংখ্যায় গরিষ্ঠ যে বাঙালি জাতি, ১৯৪১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা ছিলেন জনসংখ্যার মাত্র ২.৯৪ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা ক্রমাগত বেড়ে ২০০১ সালে ৪৫.১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। [১৭] জনমিতির এই রূপান্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার ফলে যে সংকটের সূচনা হয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের প্রতি রাষ্ট্রের অস্বীকৃতি এবং একের পর এক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিকরণ ও ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা সে সংকটকে আরও বেশি ঘনীভূত করেছে যা অনিবার্যভাবে সশস্ত্র সংঘাতের রূপ পরিগ্রহণ করে। ষাট দশকের গোড়ার দিক থেকেই পাহাড়ি জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে সংগঠিত বিক্ষোভে রূপান্তরিত করার কাজে নেতৃত্ব দেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

[১৫] হিরণ মিত্র চাকমা ও মংসিংঞ্রো মারমা, 'পটভূমিকা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮।

[১৬] অনুচ্ছেদ ২৩ক, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১।

[১৭] হিরণ মিত্র চাকমা ও মংসিংঞ্রো মারমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮।

অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক হিসেবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের এগারো জাতির মানুষকে বাঙালি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে প্রতিরোধ এবং পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সে লড়াইকে পাহাড়ি জনগণের অনুকূলে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরণ সক্রিয় থাকেন। আর এ কাজে পাহাড়ি জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনে তিনি 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' তত্ত্বের সূচনা করেন।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এক ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে নিহত হবার মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন পাহাড়ি জনগণের অবিসংবাদী নেতা। মৃত্যুত্তোর কালে বাংলাদেশের পাহাড়ি জনমানসে এবং বৃহত্তর বাঙালি সমাজে তার অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। বর্তমানের সংঘাতময় রাজনীতি ও পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় তার মতো দক্ষ ও উদার রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উপর আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়নি। এছাড়া নির্যাতিত ও নিপীড়িত পার্বত্য আদিবাসীদের সমাজে-রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সমানাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর গবেষণা রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার তাগিদেই একান্ত অপরিহার্য।

২.২. গবেষণার পরিধি

এই গবেষণা কর্মের পরিধি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ঘটনা থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সালে সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত সময়কালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষোভের জন্ম দেয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প। রাষ্ট্রের এ 'উন্নয়ন' পদক্ষেপের সূত্র ধরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের সূচনা হলেও এর প্রবাহ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। এই বাঁধের ফলে ৩০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিশাল জলাধারের সৃষ্টি হয়। ৫৪,০০০ একর উর্বর কৃষি জমি ও বসতি এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এতে এক লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সহায়-সম্পদ হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ হৃদয় থেকে সরে যেতে না যেতেই ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কোন রকম মতামত না নিয়েই 'বিশেষ এলাকার মর্যাদা' বাতিল করে দেয়। পাকিস্তান সরকারের এরূপ অগণতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনোরূপ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না পেরে ১৯৬৪ সালে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী ভারতে আশ্রয় লাভের জন্য সীমান্ত পাড়ি দেন এবং ৩০ হাজার নর-নারী বার্মায় চলে যান। বাকিরা উপায়হীন হয়ে স্বদেশে থেকে যান। [১৮] যথাযথ ও গঠনমূলকভাবে পুনর্বাসন করতে সরকার ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা পাহাড়িদের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয়। [১৯] স্বাধীন দেশে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা তাদের

[১৮] প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

[১৯] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩-৮৪।

প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেরই নামান্তর। এ সময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ি জাতিসমূহের গণদাবিকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি পাহাড়ি জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি তাদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। কাপ্তাই বাঁধের উপর প্রবন্ধ লিখে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং তাকে 'রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ'-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরেও পাহাড়ি জাতিসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবি স্বীকৃতি লাভের রাজনৈতিক পরিবেশ ধূসর হতে থাকলে তিনি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে পাহাড়ি জাতিসমূহের প্রথম রাজনৈতিক দল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠন করেন এবং পরবর্তীতে গঠিত হয় এরই সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী'। রাজনৈতিক দলে সশস্ত্রবাহিনীর উপস্থিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যত্যয় বলে মনে হলেও এম এন লারমার সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবল তাকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হাতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন। এম এন লারমা নিহত হওয়ার পরও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর এম এন লারমার উত্তরসূরি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৩ সালে এম এন লারমার মৃত্যু হলেও তাঁর প্রদর্শিত পথে সংগ্রাম করে শান্তিচুক্তি অর্জন সম্ভব হয় এবং এরই সাথে শেষ হয় শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম। এই চুক্তি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা ও অনুসৃত পথের সাথে কতখানি সংগতিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। ১৯৯৭-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি গবেষণা সময়কালের সমাপনী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে উপরোক্ত ঘটনার আলোকে গবেষণার পরিধিকাল ১৯৬০ থেকে ১৯৯৭ সাল নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

২.৩. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আত্মগোপনকারী সংগঠন হিসেবে কাজ করায় সেই সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংঘাত সম্পর্কে এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও তার সহযোগীদের জানার জন্য প্রতিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ ও তথ্য নির্ভর বই পাওয়া সম্ভব হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কিছু প্রকাশনা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এ বিষয়ে কিছু প্রকাশনা থাকলেও উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য অনুযায়ী সেগুলি নিরপেক্ষতার দাবি রাখেনা। উভয় পক্ষের বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে যেগুলির কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই সময়ের রাজনৈতিক কৌশল ও নিরাপত্তার স্বার্থে গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও শান্তিবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত কিছু ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রাম ও সংঘাতের কিছু দিক অজানা রয়েছে। তথ্য সংগ্রহ কালে পাহাড়ি আদিবাসী এবং সরকারের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্য লুকানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যার কিছুটা হলেও প্রভাব পড়েছে নিরপেক্ষ তথ্য প্রাপ্তি ও অভিসন্দর্ভ রচনায়।

গবেষণা স্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় প্রয়োজনীয় সকল স্থানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে সকল স্থানের আদিবাসী ও স্থান সম্পর্কে ধারণার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য

৩.১. অবস্থান ও আয়তন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পাহাড়, হ্রদ ও অরণ্যসংকুল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। দেশের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী অঞ্চল হিসেবেও এর পরিচিতি রয়েছে। ভূ-প্রকৃতি ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করেন।

বাংলার প্রধান জেলাগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম একটি। যা উত্তরে স্বাধীন ত্রিপুরা দ্বারা বেষ্টিত, পূর্বে ইয়ামাডং (Youmadoung) পর্বতশ্রেণি বার্মা থেকে এই অঞ্চলকে পৃথক করেছে এবং দক্ষিণে আরাকান ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এর দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ১৮৫ মাইল এবং প্রস্থ ১০০ মাইল। এর সাথে সংযুক্ত ২,৭১৭ বর্গ মাইল (যার সম্মুখ পূর্বাঞ্চল অনিয়মিত উঁচু ও কাঠ সমৃদ্ধ এবং বসতি স্থাপনকারীরা পাহাড়ি "উপজাতি")। পার্বত্য অঞ্চলটি বড় শিকলের ন্যায় একটি অংশ যা আসাম দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু করে কেপা নিগ্রেস (Capa Negrais) পর্যন্ত গিয়েছে এবং নীল পর্বতে গিয়ে ঠেকেছে যা চট্টগ্রামের সম্মুখ ভাগ এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৮, ০০০ ফুট উঁচু। এই অঞ্চল কয়েকটি নদী দ্বারা প্রসারিত। তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো কুরুমফুলী (কর্ণফুলী) যা পশ্চিম দিকে যেয়ে চট্টগ্রাম শহর বা ইসলামাবাদ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। চট্টগ্রাম সম্পর্কে এই বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় Edward Thornton-এর গ্রন্থ থেকে।[২০] গ্রন্থটি ১৮৫৮ সালে লেখা হয়। এর দুই বছর পর অর্থাৎ ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আলাদা হয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের এই অঞ্চলটি পাহাড়ি অঞ্চল নামে খ্যাত। দক্ষিণ এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কিছু অংশ এই অঞ্চলে বাস করে। ২১°২৫ হতে ২৩°৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৪৫ হতে ৯২°৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অবস্থিত।[২১]

৩.২. সীমানা

---

[২০] Edward Thornton, *A Gazetteer of the Territories under the Government of The East-India Company,* Neerag Publishing House, Delhi, 1858, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬।

[২১] Mohammed Ishaq (General Editor), Bangladesh District Gazetteers : Chittagong Hill Tracts, Bangladesh Government Press, Dacca, 1971, পৃষ্ঠা ঃ ০১।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ডটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের আরাকান, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কক্সবাজার জেলা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে তিনটি জেলায় বিভক্ত; উত্তরে খাগড়াছড়ি, মাঝখানে রাঙ্গামাটি ও দক্ষিণে বান্দরবান। [২২]

মানচিত্র ২ ঃ **প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান**

সূত্রঃ ড. আব্দুল গফুর রিসোর্স সেন্টার, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)।

[২২] Mesbah Kamal, Zahidul Islam & Sugata Chakma (Edited), *Indigenous Communities: Cultural Survey of Bangladesh Series, Vol 5*, Asiatic Society of Bangladesh, 2007, পৃষ্ঠা ঃ ০৩।

মানচিত্র ৩ ঃ **পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা ও উপজেলাসমূহের অবস্থান**

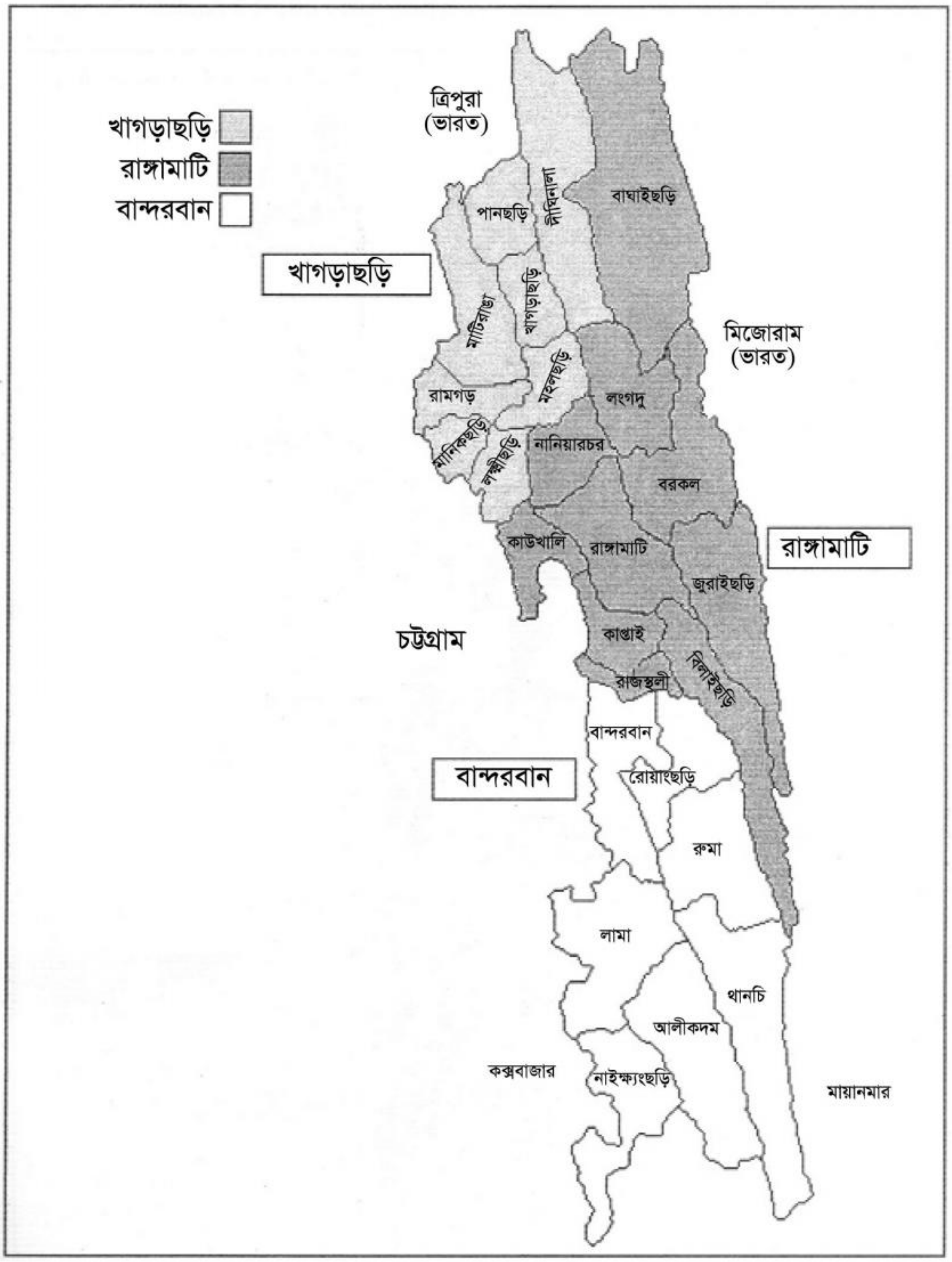

সূত্রঃ ড. আব্দুল গফুর রিসোর্স সেন্টার, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩. জলবায়ু

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ সে.মি.। গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস এবং শীতকালে গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস। তবে গ্রীষ্মকালে অনেক সময় তাপমাত্রা ৪০°/৪২° সেলসিয়াস এবং শীতকালে ৪°/৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয়ে থাকে।

T.H. Lewin-এর গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়, বৈশিষ্ট্যগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জলবায়ু দুই ধরনের। একটি হলো শীতলতম এবং অন্যটি অস্বাস্থ্যকর। সেখানে কোনো গরম বাতাস প্রবাহিত হয়না। বছরের সবচেয়ে গরম সময়ে সমুদ্র উপকূলের শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এই চার মাস স্বাস্থ্যকর। এই সময়গুলোতে রাতে ঘন কুয়াশায় পার্বত্য অঞ্চল ঢাকা থাকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশা কেটে যায়। সারা বছরের মধ্যে এই চার মাস স্বাস্থ্যকর। ফেব্রুয়ারি মাসে কিছু বৃষ্টি হয়। মে অথবা জুনে বর্ষাকাল শুরু হয় এবং তা বিরামহীনভাবে চলতে থাকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি। বর্ষার শেষে কখনো ঝড় ও বজ্রপাত হয়। বছরের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর মাস সেপ্টেম্বর। বর্ষাকালের শেষে কখনো ঝড় ও বজ্রপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। [২৩]

৩.৪. ভূমিরূপ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সাধারণতঃ ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সুবিশাল আরাকান-ইয়োমা পর্বতমালার ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলটি ফেনী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং এদের শাখা-প্রশাখার উপত্যকা দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত। এগুলি হলো- চেঙ্গী, কাসালাং, রাইনখিয়াং ও সাঙ্গু উপত্যকা। ১৯০৯ সালে পুলিশ কর্মকর্তা R.H.Sneyd Hutchinson পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপের বর্ণনায় বলেন ঃ [২৪]

> æ.. a mass of hill, ravine and cliff covered with dense bamboo, trees and creeper jungle. The mountains are steep and difficult to ascent …., the valleys are covered for the most part with dense virgin forest, interspersed with small water courses and swamps of all sizes and description … They are slowly yielding to the advance of civilization and by clearance and drainage is being converted into rich arable land capable of producing food and other grain in abundance.”

ভৌগোলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দুটি বৃহৎ বলয়ে বিভক্ত। একটি হলো পাহাড়ি উপত্যাকা অন্যটি কৃষিকাজের উপযোগী এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা অন্যতম সাতটি নদী হলো ফেনী, কর্নফুলী, চেংগি, মায়ানি, কাসালং, সাংগু এবং মাতামুহুরী। [২৫] এই অঞ্চলের নদ-নদীগুলো অত্যন্ত খরস্রোতা এবং পরস্পরের সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে

---

[২৩] T. H. Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein; With Comparative Vocabularies of the Hill Dialects*, Bengal Printing Company Limited, Calcutta, 1869, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

[২৪] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

[২৫] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১১।

সুবিন্যস্ত। উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে কর্ণফুলী উপত্যকার ৩০০ বর্গমাইল কৃত্রিম হ্রদে পরিণত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উত্তর থেকে দক্ষিণব্যাপী পর্বতপুঞ্জে আবৃত। এগুলোর মধ্যে আছে সুভলং, মায়ানি, কাসালং, সাজেক, হরিং, বরকল, রাইন খিয়াং, চিম্বুক, মিরিঞ্জা ইত্যাদি। পাহাড়গুলো সাধারণত ১০০ থেকে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের নাম কেওক্রাডং, এর উচ্চতা ২৯৬০ ফুট।

৩.৫. ভূমির শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু এখানকার অধিকাংশ অঞ্চল পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে উর্বর ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম। বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ০.২২ একর। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৩.১ শতাংশ অর্থাৎ ১২৪,১৬০ একর। ৯ লক্ষ স্থায়ী অধিবাসীর মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৪ একর। তবে উদ্যান চাষের উপযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১৮.৭ শতাংশ বা ৭৫৫, ৮৪০ একর। এছাড়া ৫.৩ শতাংশ বা ২১৪,৪০০ একর জায়গায় বসতি এলাকা ও পানি রয়েছে। অবশিষ্ট ৭২.৯ শতাংশ অর্থাৎ ২৯৪৩,৩৬০ একর জমি খাড়া পাহাড় ও পর্বত যেখানে কেবলমাত্র বনায়ন করা সম্ভব। [২৬] পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিকা সম্পর্কে T.H. Lewin বলেন [২৭]

> "The soil of the districts is composed for the most part of a rich loam, but in many parts the hills are found to consist of a schistose clay, much resembling sand-stone in appearance, which falls to pieces very easily on force being applied. In the alluvial valleys in water-courses large pieces of dicaly tedonous wood are frequently found lying in a horizontal position: they are usually more or less petrified."

কানাডিয়ান একদল বন বিশেষজ্ঞ ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভূ-প্রকৃতির উপর জরিপ করেন। জরিপে তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মোট ২৩,৫৯,৯১৩ একর ভূমিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। শ্রেণিগুলো হলোঃ

ক. 'এ' শ্রেণিঃ এই শ্রেণিতে মোট জমির পরিমাণ ৭৬,৮৭১ একর। এই জমিতে যে কোনো ফসল চাষ করা যায়।

খ. 'বি' শ্রেণিঃ এই শ্রেণির জমির পরিমাণ ৬৭,৮৭১ একর। এরূপ জমিতে ধাপ কেটে ফসল ফলানো যেতে পারে।

গ. 'সি' শ্রেণিঃ এই শ্রেণিতে সর্বমোট জমির পরিমাণ ৩,৬৬,৬৬২ একর। এই শ্রেণির শতকরা ৪০ ভাগ সাধারণ ঢালু জমি এবং শতকরা ৬০ ভাগ পাহাড়ের পাদদেশ, যেখানে ধাপ কেটে কৃষি কাজ করা যেতে পারে।

---

[২৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, নং- ৩৬, ১৬ বর্ষ, ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩১ এবং প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৫।

[২৭] T.H. Lewin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

ঘ. 'ডি' শ্রেণিঃ এই শ্রেণিতে জমির পরিমাণ ৩২,০২৪ একর। পাহাড়ের চূড়ার জমি এই শ্রেণির। গভীর ধাপ কেটে এই জমিতে চাষকরা যেতে পারে।

ঙ. 'ই' শ্রেণিঃ ১৮,১৬ ৯৩০ একর জমি এই শ্রেণিভুক্ত। এই জমিতে কোনো অবস্থাতেই চাষ করা সম্ভব নয়। তবে এরূপ জমিতে বনায়ন করা যেতে পারে। [২৮]

৩.৬. উদ্ভিদ ও প্রাণী

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ অঞ্চল পাহাড় ও বন দ্বারা আচ্ছাদিত। বনভূমির বৃক্ষরাজি চিরসবুজ ও পর্ণমোচী। W W HUNTER- এর গ্রন্থে পাওয়া যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অসংখ্য মূল্যবান বৃক্ষ দ্বারা পূর্ণ। শুধু এক বা দুই ধরনের বৃক্ষ নয়; বিভিন্ন ধরনের কাঠের গাছ এখানে সেখানে ছড়ানো। উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে সেগুন, গর্জন, চাম্বল, গামার, তৃণ, তেলসুর, কড়ই অন্যতম। এছাড়া রয়েছে চাপালিশ, পিতরাজ, তেলী, বালেশ্বর। এ অঞ্চলের আবহাওয়ায় বাঁশ ও বেত প্রচুর জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ৬,৮৮২ বর্গ মাইলের মধ্যে ৫,৬৭০ বর্গ মাইল বনাঞ্চল। এর মধ্যে সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চলও রয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ উৎপন্ন হয়। ১৮৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ছিল ৩,৭১,৫২০ একর। সেই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর হেলিঙ্গামারা (Halingamara) ও সীতা পাহাড় (Sita-Pahar)-এ সেগুন কাঠের গাছ লাগানো হয়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১ ধরনের বাঁশ পাওয়া যায়। [২৯] বর্তমানে বিভিন্ন কারণে বনভূমি ও বনজ সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এখন মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭,০৪৬ বর্গ কিলোমিটার। বৃক্ষ সম্পদের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অধিকাংশ পাহাড় বৃক্ষহীন, ন্যাড়া।

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন বনে প্রচুর হাতির বাস ছিল। সরকারের রাজকাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় হাতি এখান থেকে সরবরাহ করা হতো। হাতি ছাড়াও গন্ডার, বাঘ, চিতা বাঘ, কালো ভাল্লুক, গয়াল, বন্য মহিষ, বন্য বিড়াল, হরিণ, উল্লুক, নিশাচর বানর, দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট বানর, অতি ক্ষুদ্র বানর, খরগোশ, ভোদর, কুমির, বিভিন্ন প্রকার টিকটিকি ও বিভিন্ন ধরনের সাপের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল এই অঞ্চল। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর পাখি রয়েছে। ক্যাপ্টেন লুইন (Captain Lewin) তার গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সমস্ত পাখিদের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো বুলবুল, চিল, ভিমরাজ, কাদা খোচা, কোয়েল, কাক, ময়না, হাড়গিলা, সবুজ টিয়া, মাছরাঙা, ময়ুর, মথুরা, পেঁচা, সবুজ কবুতর, বড় কাঠ কবুতর, ঘুঘু, ঈগল এবং কিছু বন্য হাঁস। [৩০] বনভূমি ও অবশিষ্ট বনভূমির বৃক্ষের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে প্রাণীর সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। বাঘ, চিতা বাঘ, কালো ভাল্লুক, বন্য মহিষ, কুমির, বিভিন্ন ধরনের পাখিসহ বহু প্রাণী ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বন্য প্রাণীর মধ্যে বানর, হরিণ, হাতি, বনগরু, বনমোরগ, নানা ধরনের সাপ ও বিভিন্ন ধরনের পাখি রয়েছে।

---

[২৮] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭।

[২৯] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Volume VI, Trubner & Co, London, 1876 (First Reprinted in India, New Delhi, 1971), পৃষ্ঠা ঃ ২৯-৩২।

[৩০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩-৩৪।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা

৪.১. জনগোষ্ঠীর পরিচয়

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মানুষের প্রথম পদচারণার সঠিক ইতিহাস আজও জানা সম্ভব হয়নি। আদিম যুগে অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, মধ্য-উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও উপকূল অঞ্চল থেকে বার্মার আরাকান পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। মধ্যযুগে হিমালয়ের পাদদেশ আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে কামতা, অহোম, কাছারি, চুটিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতির আবাসস্থল ছিল। ত্রিপুরা মহারাজার রাজ্য বিস্তৃত ছিল সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রামের কিছু অংশ, চাঁদপুর ও মেঘনা নদীর পূর্ব পাড় পর্যন্ত। মধ্যযুগে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন চাকমা রাজ্যের উপস্থিতি ছিল। কখনো কখনো এই অঞ্চল আরাকান রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মোঘল ও নবাবী আমলে চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল 'কার্পাস মহল' নামে পরিচিত ছিল। সমতলের সাথে আদিবাসীদের পণ্য বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধার জন্য চাকমা রাজারা মোঘল রাজপ্রতিনিধিকে কার্পাস প্রদান করতেন। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক-উপনিবেশিক যুগ থেকেই এ অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে। [৩১]

তবে মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম তাঁর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পারস্থিতির মূল্যায়ন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "নৃ-তাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কোনো জনগোষ্ঠীই এখানকার মূল আদিবাসী বা ভূমিপুত্রের দাবিদার হতে পারে না।" আসলে উক্তিটির বিপরীতেও তথ্য পাওয়া যায় যে, বরফ যুগের শেষ পর্যায়ে চীন, মানচুরিয়া অঞ্চল ও পামির মালভূমিতে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে পড়লে সেখানকার জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশ নিম্ন এলাকার খোঁজে বের হয়। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে তিব্বত, ভুটান ও আসাম হয়ে বাংলাদেশে আসে। আবার কোনো শাখা থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, বার্মা প্রভৃতি দেশ হয়ে বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশে কালক্রমে তাদের বিভিন্ন শাখার আগমন ঘটে।[৩২] পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরা মূলত মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত। ঐতিহাসিক কাল থেকে মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সাথে ভারতবর্ষের ঘনিষ্টতম সম্পর্ক। মঙ্গোলীয় এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়েছে, ভারতবর্ষ এর ব্যতিক্রম নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে মঙ্গোলীয়দের একটি ধারা ভারতের ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও ভারতের আসাম, উত্তরে হিমালয়ের নেপাল-ভুটান পর্যন্ত মঙ্গোলীয় জনপ্রবাহের স্পর্শ পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে যে মঙ্গোলীয় জনপ্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায় তারা ত্রিপুরা

---

৩১ মঙ্গল কুমার চাকমা ও পল্লব চাকমা, 'বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সার্বিক অবস্থা', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৪-২৮।

৩২ মোঃ শহীদুর রহমান, *আদি বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯।

জেলার চাকমা, টিপরা, আরাকান এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগদের সমগোত্রীয়।[৩৩] বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মগ, কুকি, লুসাই, মুরং, পাংখোয়া, খুমি প্রভৃতি জাতি এখনও তাদের আদিম স্বাতন্ত্র বাঁচিয়ে রেখেছে।[৩৪]

মানচিত্র ৪ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহের অবস্থান

সূত্র : International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Denmark

[৩৩] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪।

[৩৪] মোঃ শহীদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯।

৪.২. নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীরা নৃ-তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। তাদের দেহের গড়ন, জীবন-জীবিকা, লোক-লৌকিকতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, ধর্ম, আচার-রীতি, ভাষা, সামাজিক আইন-কানুন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের থেকে আলাদা। এখানে ১০ ভাষা-ভাষী ১১টি জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করে আসছে। এগুলি হলো চাকমা, মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, লুসাই, খুমি, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, খিয়াং, পাংখোয়া এবং চাক।

চাকমা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ঘেরা, সবুজ অরণ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নামে খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা জনগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম।[৩৫] চাকমা ভাষায় তারা নিজেদের 'চাঙমা' (Changma) বলে। এছাড়া তাদের অন্যান্য নামেও ডাকা হয়। যেমন: লুসাই পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের বলে 'তাকাম' (Takam), আবার বর্মী, রাখাইন ও আরাকান লেখকেরা চাকমাদের 'সাক' (Sak), 'থাক' (Thak) বা 'থেক' (Thek) বলে থাকে।[৩৬]

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা চাকমা জাতির মূল আবাস ভূমি। তবে কক্সবাজার জেলার টেকনাফেও তারা বাস করে। এছাড়া ভারতের ত্রিপুরা, মিকিরহিল, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যেও তাদের বাস রয়েছে। চাকমারা দাবি করে তঞ্চঙ্গ্যাদের নাম আলাদা হলেও তারা চাকমাদেরই একটি শাখা। মায়ানমারের আরাকানে দৈংনাক (Doingnak) নামে চাকমাদের একটি শাখা রয়েছে। নৃতত্ত্বের বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর তিব্বতী-বর্মণ (Tibeto-Burman) জনগোষ্ঠী বলে পরিচিত। [৩৭]

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে একমাত্র চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের 'ইন্দো-এরিয়ান শাখার অর্থাৎ আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত। চাকমা ভাষার মূল শব্দগুলিও এসেছে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি আর্যভাষা থেকে। ভারতবর্ষের ইন্দো-এরিয়ান শাখাভুক্ত বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার মৌলিক শব্দগুলির সাথে চাকমা ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তবে বর্ণগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না।[৩৮]

---

৩৫ H H Risley, *The Tribes and Castes of Bengal : Ethnographic Glossary*, Vol. 1, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1998 (First published in 1891), পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮-১৭৪। আরও দেখুন সজীব চাকমা, 'চাকমা', প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ২০২।

৩৬ Sugata Chakma, 'Chakma', published in Mesbah Kamal &et. al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬-৩৮.

৩৭ ব্রজেন্দু শেখর চাকমা, 'চাকমা জাতি ও তার সংস্কৃতি', প্রকাশিত হয়েছে মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৬০।

৩৮ সজীব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২২৮-২৩০।

অতীতকাল থেকেই চাকমাদের মূল পেশা ছিল কৃষি। 'জুম' নামক চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে তারা ফসল উৎপাদন করে। ধীরে ধীরে এই কৃষিভিত্তিক সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন হলেও এখনও অধিকাংশ চাকমা কৃষি কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাচীন কাল থেকে ভূমির মালিকানার প্রমাণ হিসেবে দলিল-দস্তাবেজের প্রচলন চাকমাদের মধ্যে নাই। যুগ যুগ ধরে চাকমারা এই অঞ্চলে বসবাস ও ভূমিগুলো আবাদ করে আসছে বলে চাকমারা এই ভূমিকে তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি বলেই জানে এবং তাদের বিশ্বাস তারাই এই ভূমির বৈধ মালিক।

চাকমা সমাজে পিতার সিদ্ধান্তকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর পরে মাতার স্থান। মাতার পরে জ্যেষ্ঠপুত্র ও অন্যান্যরা বয়সানুসারে গুরুত্ব লাভ করে।[৩৯] চাকমা সমাজে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত পুত্রসন্তান। কন্যাসন্তান কেবলমাত্র বিবাহকাল পর্যন্ত ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা পিতা ও মাতার সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। সাধারণভাবে বিধবা নারী স্বামীর সম্পত্তির কোনো ভাগ পায় না এবং মৃত স্ত্রীর সম্পত্তিও স্বামী দাবি করতে পারেনা।[৪০]

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস এবং শাক-সবজি। চাকমাদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদে স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে। চাকমা মহিলারা তাঁত শিল্পে দক্ষ, তাঁতে তারা নিজেদের পোশাক তৈরি করে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবেও এ সকল পোশাকের যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তা রয়েছে। চাকমা মহিলারা সোনা, রূপা ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা রকম অলংকার যেমন, 'হালছরা' (চন্দ্রহার), হাসুলি, 'তেড়াছরা' (টাকার মালা), 'তাজ্জুর' চুড়ি, কানের দুল, পায়ে রূপার তৈরি 'থেংখারু' ব্যবহার করতে ভালবাসে।[৪১]

চাকমারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ হিসেবে চাকমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো হলো-কঠিন চীবর দান, বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, মহাসংঘ দান ইত্যাদি।[৪২] চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও এখনও তারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপর বিশ্বাসী। বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ লক্ষণীয়। সামাজিক উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে চাকমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটে। এই উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিজু। চাকমা সমাজে কারো মৃত্যু হলে মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর উপায় হিসেবে বিশেষ তালে ঢোল বাজানো হয়। মৃতের আত্মার শান্তির জন্য মরদেহ স্নান করানো, বৌদ্ধ ভিক্ষুর মাধ্যমে মঙ্গলসূত্র পাঠসহ ধর্মীয় ও সামাজিক কিছু আচার পালনের মাধ্যমে মৃতদেহ সৎকার করা হয়।[৪৩]

---

[৩৯] সুগত চাকমা, 'চাকমা', মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩-৬৬।

[৪০] Abul Barkat, Sadeka Halim, Asmar Osman, Md. Ismail Hossain, Manzuma Ahsan, *Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Human Development Reserch Centre, Dhaka, 2010, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-২৭।

[৪১] ব্রজেন্দু শেখর চাকমা, পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।

[৪২] সজীব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২২২-২২৩।

[৪৩] *ঐ*, পৃষ্ঠা ঃ ২২০-২২২।

চাকমাদের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে ছড়া, ধাঁধা, ঘুমপাড়ানি গান, রূপকথা, কিংবদন্তি, গল্প, পালাগান, প্রবাদবাক্য, বাগধারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'বারোমাসী' বাংলা কাব্যের অনুসরণে রচিত মধ্যযুগের রচনা। মৌখিক ও লিখিত দু'ভাবেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। [৪৪]

শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকমারা অগ্রসর। পার্বত্য অঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ভূমি দখল ইত্যাদি কারণে শত শত চাকমা পরিবার কাজের সন্ধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বিভিন্ন শহরাঞ্চলে গমন করছে। শহরকেন্দ্রিকতার ফলে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থা হুমকির সম্মুখিন অর্থাৎ কিছুটা হারিয়ে যেতে বসেছে। [৪৫]

মারমা

মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। অধিকাংশ মারমারা বসবাস করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে। কিছু সংখ্যক মারমা উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালিতেও বাস করে। মারমা লেখক ক্য শৈ প্রুসহ অনেকের মতে মায়ানমারের জাতিগত ধারণা 'ম্রাইমা' থেকে 'মারমা' শব্দের উৎপত্তি। অতীতে ইংরেজ ও বাঙালিদের মতো পার্বত্য জনগোষ্ঠীর চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা জাতির লোকেরা মারমাদের 'মগ' নামে অভিহিত করতো। মারমাদের ভাষায় বা বার্মিজ অভিধানে মগ নামে কোনো শব্দ না থাকার কারণে অনেকে মনে করেন মারমাদের মগ নামে ডাকা যুক্তিসংগত নয়। মারমা জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য জানা না গেলেও বার্মিজ এবং মারমাদের মধ্যে জাতিগত যোগসূত্রকে অস্বীকার করা যায় না।

সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও প্রচলিত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে মারমাদের প্রথাগত ও পারিবারিক আইন গড়ে উঠেছে। মারমাদের সামাজিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র স্থলে রয়েছে রাজা। রাজা কর্তৃক সার্কেলের সভাপর্ষদ গঠিত হয়। সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা রাখা এই সভাপর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে।

মারমাদের ভাষার আদিরূপ ভোট ব্রাহ্ম। মারমা লিপি 'মারমাজা' বাম থেকে ডান দিকে লেখার রীতি অনুসারী বর্ণমালা। মারমারা তাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষা করে গ্রামের পাঠশালা, টোল বা বৌদ্ধ মন্দিরে। মারমা সমাজে পরিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের কার্যকলাপ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। মারমা সমাজে একক এবং যৌথ দুই ধরনের পরিবার দেখা যায়, তবে একক পরিবারের সংখ্যাই বেশি। [৪৬]

মারমাদের উত্তরাধিকার প্রথা বোমাং, মং এবং চাকমা সার্কেলে ভিন্ন ভিন্ন। বোমাং সার্কেলে পুত্র এবং কন্যা উভয়ে সম্পদের মালিক হয়। মং এবং চাকমা সার্কেলে কেবলমাত্র পুত্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। বোমাং সার্কেলে

---

[৪৪] হাফিজ রশিদ খান, *আদিবাসী জীবন আদিবাসী সংস্কৃতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

[৪৫] সজীব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৪-২০৫।

[৪৬] মংসিংঞো মারমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৫।

বসবাসরত মারমাদের প্রথা অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর মাতা সম্পদের অধিকারী হয় এবং সেই সম্পদ সে ভোগ করতে পারে। [৪৭]

পাহাড়ি জাতিসমূহের ন্যায় জুম চাষ মারমাদেরও ঐতিহ্যগত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ভাত, মাছ-মাংস ও শাক-সবজি প্রধান খাদ্য। [৪৮] মারমাদের পোশাক এবং ডিজাইনের সাথে বর্মিদের পোশাক ও ডিজাইনের মিল রয়েছে। পূর্বে মারমা পুরুষরা 'ধেয়াঃ' নামে একপ্রকার তাঁতে বোনা ধুতি এবং মাথায় 'গবং' অর্থাৎ পাগড়ি ব্যবহার করতো। মারমা নারীরা অন্যান্য নারীদের মতো অলংকার পছন্দ করে। তাদের অলংকারের মধ্যে ন্‌দঙঃ (কানের দুল), লাক্কক্ (চুড়ি), কখ্যাঙঃ (পায়ের মল), খাঃপ্রোঃ (কোমর বন্ধনি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। [৪৯]

মারমাদের প্রথাগত ও পারিবারিক আইন তাদের সামাজিক, গোষ্ঠীগত ও প্রচলিত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মারমারা অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তবে তারা সর্বপ্রাণবাদেও বিশ্বাস করে। তাদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে কছুংলাব্রে (বৈশাখী পূর্ণিমা). ওয়াছো (আষাঢ়ী পূর্ণিমা), ওয়াগ্যোওয়াই (আশ্বিনী পূর্ণিমা)। তাদের সামাজিক উৎসবের মধ্যে প্রধান এবং একটি বড় উৎসব হলো সাংগ্রাই। পুরাতন দিনের যা কিছু অমঙ্গল, অশুভ তা বর্জন করে নতুনের আহ্বান নিয়ে নববর্ষের উৎসব সাংগ্রাই। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এ উৎসবে তরুণ-তরুণীরা মৈত্রীর পানি ছিটিয়ে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে। [৫০] মারমা আদিবাসী লোক সমাজ তাদের কল্পনাশক্তির দ্বারা অসংখ্য সাহিত্যিক উপাদান সৃষ্টি করেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম কাহিনিভিত্তিক পালাগান থামরা, ওয়েসেন্দ্রা, সুরিয়াহ গুংমা, সিহদ্দেথা ইত্যাদি। এছাড়া লোককাব্যের মনহরি-সাথানু পৌরাণিক উপাখ্যানটি মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। [৫১]

ম্রো

ম্রোদের বসবাস মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায়। ম্রোদের দৈহিক গড়নের মধ্যে মঙ্গোলয়েড এর মালয়ী ইন্দোনেশীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই ধরনের জনগোষ্ঠী ভুটান, মায়ানমার, তিব্বত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। [৫২]

ম্রো'রা নিজেদেরকে মারুচা বলে অভিহিত করে। ম্রো ভাষায় 'মারু' শব্দের অর্থ মানুষ। অনেকে ধারণা করেন, 'মারু' শব্দ থেকেই ম্রো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ম্রোদের সমাজে কয়েকটি পরিবার মিলে একটি গোত্র গঠিত হয় এবং গোত্রের যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য গোত্রগুলো হলো- ঙারুয়া, নাইচাহ্, তাম-তু-চাহ্, ইয়ম্‌রে, কানবক, দেং, প্রেনজু, তাং, খউ, ঙারিংচাহ্ ইত্যাদি। অতীতে ম্রোদের সামাজিক কাঠামো নির্ভর করতো দল ও গোত্রের প্রধানদের উপর। কিন্তু ১৯০০ সালের পর থেকে হেডম্যান ও রোয়াজা পদ চালু হওয়ায় বর্তমানে গ্রাম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা

---

[৪৭] Abul Barkat & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৭।

[৪৮] U Saw Nau, 'Marma', published in Mesbah Kamal & et.al, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮।

[৪৯] মংসিংঞ্জো মারমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৭।

[৫০] U Saw Nau, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২২-১২৩।

[৫১] হাফিজ রশিদ খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪।

[৫২] মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন, *বাংলাদেশের ম্রো উপজাতির জীবনধারা*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৩।

প্রচলিত রয়েছে। ম্রো পিতৃপ্রধান পরিবার। তাদের সমাজে পিতার সূত্র ধরে সন্তানের বংশ বা গোত্র নির্ণয় করা হয়। গোত্রের নামগুলো আনেকটা উদ্ভিদের নামের সাথে সম্পৃক্ত।[৫৩]

ম্রো ভাষা তিব্বতি-বর্মী ভাষাভুক্ত। ম্রোদের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না, মৌখিক উত্তরাধিকার সূত্রে তারা তাদের রপ্ত করে আসছে এবং এ প্রক্রিয়াই তাদের ভাষা বংশ পরম্পরায় টিকে আছে। তবে সম্প্রতি ম্রোদের নিজস্ব বর্ণমালা তৈরি হয়েছে। মেনলে ম্রো ১৯৮৬ সালে ম্রো বর্ণমালা আবিষ্কার করেন।[৫৪]

ম্রো সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সমাজে একক ও যৌথ পরিবার প্রথা রয়েছে। পিতার বংশ পরিচয় অনুযায়ী সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয়। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিতা গ্রহণ করে। পিতার অনুপস্থিতিতে বড় ভাই বা বড় ছেলে দায়িত্ব পালন করে।[৫৫] উত্তরাধিকার সূত্রে ম্রো পরিবারের পুত্র সন্তান পারিবারিক সম্পদের অধিকারী হয়। পুত্র সন্তানের অনুপস্থিতিতে পিতার কোনো নিকট আত্মীয়ের পুত্র মৃতের সম্পদ ভোগদখল করে। ম্রো সমাজে মেয়েদের সম্পদের অধিকার থাকেনা।[৫৬] জুম চাষ ম্রোদের প্রধান পেশা। ম্রোরা নারী-পুরুষ উভয়ে জুম চাষ করে। পুরুষের তুলনায় ম্রো নারীরা অধিক পরিশ্রমী। [৫৭] ম্রোদের মূল খাদ্য মাছ, মাংস, ভাত, সবজি। তবে নাপ্পি তাদের অন্যতম একটি পছন্দের খাবার। [৫৮]

ম্রো'রা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিধান করে। সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে কাপড় পরার নির্দেশ পাননি বলে তারা সংক্ষিপ্ত কাপড় ব্যবহার করে। তবে 'রয়ানচা' নামক চাদরের ন্যায় কাপড় গায়ে জড়িয়ে নেয়। ম্রো পুরুষরা নেংটি পরিধান করে যা তাদের ভাষায় 'দং' বলে পরিচিত কে 'নাপং' বলে। [৫৯] ম্রো নারী-পুরুষ উভয়ে অলংকার ব্যবহার করে। তারা সাধারণত রূপা, তামা ও এনামেলের অলংকার ব্যবহার করে। নারীরা বড় আকৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কানের অলংকার ব্যবহার করে। উভয়ে নিজেদের ফুল দিয়ে সাজাতে পছন্দ করে। [৬০]

অন্যান্য আদিবাসীর ন্যায় ম্রোদের বিবাহেও নিজস্ব রীতি রয়েছে। তাদের সমাজে দুই ধরনের বিবাহ প্রথা রয়েছে। যথাঃ ১। দিনে বউ আনা (নিমাঙ) : দিনের বেলা বিবাহ সম্পন্ন হওয়াকে নিমাঙ বলে। বর ও কনের পিতা-মাতা উভয়ই অর্থশালী হলে এই ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ২। রাতে বউ আনা (ওয়ামাং) : বর ও কনের পিতা-মাতা গরিব হলে ওয়ামাং পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে গ্রামের সব লোক ঘুমিয়ে গেলে বর তার বন্ধু-বান্ধবসহ বউ চুরি করে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে।

---

[৫৩] Mohammed Abdul Baten, 'Mro', Mesbah Kamal & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪২।

[৫৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯৭।

[৫৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭২।

[৫৬] Abul Barkat & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

[৫৭] Mohammed Abdul Baten, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮-১৪৯।

[৫৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫০।

[৫৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯।

[৬০] সিংইয়ং ম্রো, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫০৮।

ম্রো সমাজে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে কুকুর আত্মাকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করবে এবং মুরগি সঙ্গী হবে এই রূপক প্রকাশ হিসেবে একটি কুকুর ও একটি মুরগি হত্যা করা হয় এবং বিভিন্ন আচার পালন করে খাল বা নদীর ধারে মৃতের দাহ করা হয়। তাদের কেউ বৌদ্ধ ধর্ম, কেউ খ্রিষ্টান ধর্ম, আবার অনেকে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। ম্রোরা সাধারণত সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতি পূজারী। তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে।[৬১]

ম্রোদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। বিনোদনপ্রিয় জাতি হিসেবে ম্রোদের নাম রয়েছে। তাদের সংস্কৃতিতে রয়েছে নিজস্ব গান, ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি। ম্রোদের লোকগীতি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। এই লোকগীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে অরণ্যের বন্দনা, ম্রোদের দুঃখ, ভালোবাসা, জীবন-জীবিকা, যুদ্ধের বীরত্ব গাথা ইত্যাদি। তাদের লোক-নৃত্য বৈচিত্র্যময়।[৬২] বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ম্রোরা লোক-নৃত্যের আয়োজন করে থাকে। আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্যে ম্রোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা জাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে তৃতীয়। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এই তিনটি জেলায় ত্রিপুরারা অধিক হারে বসবাস করে।[৬৩] ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি। এছাড়া আসাম, মিজোরাম ও মায়ানমারে ত্রিপুরাদের জনবসতি রয়েছে। ত্রিপুরারা নিজেদের ‘তিপারা’ বলে এবং অন্যান্য জাতি যেমনঃ মারমারা ‘ম্রং, লুসেইরা ‘তুইকুক’, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা ‘টিবিরা’ ও খেয়াংরা ‘লুন’ বলে ডাকেন। ত্রিপুরা জাতি ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে ‘ত্রিপুরা’ নামে পরিচিত।[৬৪]

ত্রিপুরা জাতি মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। ঐতিহাসিকদের মতে, ৫ হাজার বছর আগে মঙ্গোলিয়া থেকে তিব্বত ও সাইবেরিয়া অতিক্রম করে ভারতবর্ষে তাদের পূর্বপুরুষদের আগমন ঘটে। আর্যদের আগমনের পূর্বে তারা এদেশে আগমন করে। পরবর্তীতে তারা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ইত্যাদি নদী অববাহিকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে শক্তিশালী এই জাতিই ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়।[৬৫] নিজেদের সমাজে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। দলকে তারা দফা বলে। সে হিসেবে ত্রিপুরা জাতি ৩৬টি দফায় বিভক্ত। প্রতেকটি দফার পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদিতে কিছু ভিন্নতা রয়েছে।[৬৬]

ত্রিপুরা ভাষার নাম ‘ককবরক’। ত্রিপুরারা নিজেদের মধ্যে কক-বরক ভাষায় কথা বলে। ‘কক’ অর্থ ভাষা এবং ‘বরক’ অর্থ মানুষ অর্থাৎ মানুষের ভাষা। ত্রিপুরার রাজ আমলে লিখিত ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহৃত হতো। শাসনকার্য ও

---

৬১ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮৬।

৬২ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯৯-৫০৫।

৬৩ শোভা ত্রিপুরা, ‘ত্রিপুরা জাতিসত্তা’, প্রকাশিত হয়েছে মুস্তাফা মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫।

৬৪ এম. এস. দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

৬৫ Probhangshu Tripura, ‘Tripura’, Mesbah Kamal & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০২-২০৩।

৬৬ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬।

সাহিত্যের বাহন হিসেবে বাংলা লেখ্য রূপকে ব্যবহার করা হতো। রাধামোহন দেববর্মণ ঠাকুর সর্বপ্রথম ১৯০০ সালে ককবরক ভাষার লেখ্যরূপ প্রবর্তন করেন। [৬৭]

ত্রিপুরা জাতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। কোনো কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে হেডম্যান তা সমাধান করেন। গ্রামের সকলে তাকে মান্য করে এবং তার বিচার মেনে নেয়। তাকে 'রোয়াজা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। [৬৮] ত্রিপুরা সমাজে একই গোত্র ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহ বৈধ। তবে আপন খালাতো, মামাতো ও চাচাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ত্রিপুরাদের বিবাহ চার প্রকার। যথা: ১. হামজাকলাই লামা ২. খকয়ৈই লামা ৩. উারান খীলায়ে লামা ও ৪. চামিরি কামা। ত্রিপুরাদের বহুবিবাহ সমাজে সিদ্ধ হলেও তা নিন্দনীয়। তাদের বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। [৬৯] ত্রিপুরা জাতি ভাত, মাছ, মাংস এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খায়। তাদের ভাত ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয়। [৭০] ত্রিপুরা জাতি নিজেরা সুতা এবং কাপড় তৈরি করে ব্যবহার করে। ত্রিপুরা নারীরা নকশা করা কাপড় পছন্দ করে। [৭১] ত্রিপুরা নারীরা বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহার করে। তাদের ব্যবহৃত অলংকারের মধ্যে রয়েছে আঁচলি, লৌক, চন্দ্রহার, রামতাং, ওয়াখুম, তয়া, সুরাম, তাল, খার্চী, চাংখুং, বাতাং, সাংগে ইত্যাদি। অতীতে পুরুষরা অলংকার ব্যবহার করলেও বর্তমানে তেমন দেখা যায়না। [৭২]

ত্রিপুরা সমাজের রীতি অনুযায়ী পিতার সকল সম্পদের অধিকারী হয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে নেয়। কন্যারা পায় মাতার জমি। পরিবারে পুত্র না থাকলে কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পিতা ইচ্ছে করলে কন্যাকে সম্পত্তি দিতে পারে। তবে কোনো নারী ধর্মান্তরিত হয় বা অন্য জাতির সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহলে সে তার পারিবারিক সম্পদের অধিকার হারায়। [৭৩]

ধর্মের দিক থেকে ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং তারা নির্ধারিত ১৪টি দেবদেবীর পূজা করে। ত্রিপুরাদের সামাজিক উৎসবের মধ্যে 'বৈসু' উৎসব উল্লেখযোগ্য। [৭৪] ত্রিপুরা সমাজে মৃতদেহকে দাহ করার রীতি রয়েছে। তবে দাঁত উঠেনি এমন শিশু ও দূরারোগ্য বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত লোক মারা গেলে তাদের কবর দেওয়া হয়। [৭৫]

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ত্রিপুরাদের নিজস্ব মৌলিকত্ব রয়েছে। ত্রিপুরাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অত্যন্ত উঁচুমানের মর্মে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের প্রাচীন বাঁশীর সুর এবং বোতল ও গড়াইয়া নৃত্য দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন

---

[৬৭] কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী, *ত্রিপুরার ভাষাচর্যা ঃ বাংলা ও ককবরক*, অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ৯ ও ৮৭।

[৬৮] শোভা ত্রিপুরা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬।

[৬৯] শক্তিপদ ত্রিপুরা ও সন্তোষ বিকাশ ত্রিপুরা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৬-৩১৯।

[৭০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২২।

[৭১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩০-৩৩১।

[৭২] Probhangshu Tripura, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২১৮ ।

[৭৩] Abul Barkat & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮।

[৭৪] Probhangshu Tripura, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৫, ২১২-১৫।

[৭৫] শক্তিপদ ত্রিপুরা ও সন্তোষ বিকাশ ত্রিপুরা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৯।

করেছে। ককবরক ভাষায় অতীত স্মৃতি বিজড়িত ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ বহু গীতিকাব্য ও কবিতা রচিত হয়েছে। ত্রিপুরারা প্রাচীন কাল থেকে সংগীতে পারদর্শী। লোকসংগীতেও তারা সমৃদ্ধ। ত্রিপুরা ভাষায় 'কৃষ্ণলীলা' 'রাসলীলা' অত্যন্ত সমৃদ্ধ লোকগীতি। এছাড়া ত্রিপুরা সমাজে নানা রকম ধাঁধাঁ ও ছড়া প্রচলিত আছে। [৭৬] গোমতি নদীকে ত্রিপুরারা দুগ্ধস্রোতরূপী মাতৃনদী বলে মান্য করে। গোমতির পূজো পাপ ক্ষয় ও পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এই পৌরাণিক আখ্যানের জন্য ত্রিপুরা সমাজে গোমতি নৃত্য প্রচলিত রয়েছে। [৭৭]

তঞ্চঙ্গ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা অন্যতম। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার বইস্যাবিলি, কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে তঞ্চঙ্গ্যারা বসবাস করে। দেশের বাইরে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল ও মনিপুরে তঞ্চঙ্গ্যা জাতি বাস করে। এছাড়া মায়ানমারেও তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস রয়েছে বলে জানা যায়। মায়ানমারে তঞ্চঙ্গ্যাদের দৈংনাক্ বলে। তঞ্চঙ্গ্যাদের পরিচিতি প্রসঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমাদের একাংশ বলে মনে করেন। [৭৮]

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। জার্মান পণ্ডিত ড. জি এ গিয়ারসন চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা আলাদা হলেও উভয় ভাষাকে ইন্দো-এ্যারিয়ান ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব লিপি রয়েছে। তাদের লিপি বার্মিজ লিপির অনুরূপ। বর্তমানের তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা হলো দাইনাক বর্ণমালা। [৭৯]

অন্যান্য পাহাড়ি আদিবাসীদের ন্যায় তঞ্চঙ্গ্যারাও জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে জুমের জমি হ্রাস পাওয়ায় অনেকে সমতল ভূমিতে ধান এবং বিভিন্ন মৌসুমী ফসল উৎপাদন করছে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার বহু তঞ্চঙ্গ্যা ভূমির অভাবে মৎস্য চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। [৮০]

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তির মালিক হয়। পুত্র না থাকলে পিতার নিকট আত্মীয়ের পুত্রদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। কন্যারা পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হয়না। [৮১] তঞ্চঙ্গ্যাদের বিচারিক ব্যবস্থা অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই। পাড়া বা গ্রামের প্রধানকে কার্বারি বলা হয়। তাকে জনগণ নয়, হেডম্যান নির্বাচন করে। তিনি গ্রামের লোকের বিচার সম্পন্ন করেন ছোট-খাট সামাজিক বিষয়ে কার্বারি মত প্রদান করেন এবং সমাধান দেন এবং জটিল বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হেডম্যানের সাহায্য গ্রহণ করেন। [৮২]

---

[৭৬] শোভা ত্রিপুরা, পূর্বে উল্লিখিত নিবন্ধ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯-২০৪।

[৭৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯-২০৪।

[৭৮] Dinonath Tanchanga, 'Tanchanga', published in Mesbah Kamal & et.al, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৬।

[৭৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৯-২৯০।

[৮০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৮০-২৮৬।

[৮১] Abul Barkat & et.al, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯।

[৮২] বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮০।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো তঞ্চঙ্গ্যাদেরও শুঁটকি মাছ অতি প্রিয়। চিংড়ি, ছুরি, হাঙ্গর ইত্যাদির শুঁটকি তাদের প্রতিদিনের খাদ্য। সিদ্ধ তরকারিকে তারা 'উসনা চন' বলে। এই 'উসনা চন' তারা প্রতিবেলা খেয়ে থাকে। এছাড়া তারা তরকারিতে নাপ্পি নামে এক ধরনের শুঁটকি ব্যবহার করে। [৮৩] তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ স্বকীয় হওয়ায় তাদের অতি সহজেই সনাক্ত করা যায়। তারা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পছন্দ করে। তারা মাথায় সাদা রঙের 'খবং' এবং ফুলের কাজ করা ফাদুই (কোমরবন্ধনী) ব্যবহার করে থাকে। পোশাকে তাদের ভিন্ন ঐতিহ্য থাকলেও বর্তমানে এর প্রচলন অনেকটাই কমেছে। তারা পায়ে রূপার খাড়ু বা মল, কনুই বা হাতে সোনা বা রূপার তৈরি কুচি খাড়ু, বাঘোর বা চুড়ি ব্যবহার করে। বাহুতে বাজুবন্ধ, কানে রাজজোড়, ঝংগা, গলায় চন্দ্রহার, রূপার টাকার ছড়া এবং খোঁপায় রূপার কাঁটা ব্যবহার করে। [৮৪]

উভয় পরিবারের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করাই হলো তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সামাজিক রীতি। বিবাহযোগ্য হলে তঞ্চঙ্গ্যা পুরুষকে কমপক্ষে তিন দিন শ্রমণ হয়ে শ্রামণ্য ধর্ম পালন করার রীতি প্রচলিত। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। [৮৫] তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে পরপারের খরচের জন্য মৃত্যুর সাথে সাথে তার মুখের ভিতর রূপার মুদ্রা রাখা হয়। মৃতদেহকে গোসল করিয়ে শুভ্র কাপড় পরিধান করানোর প্রচলন রয়েছে। [৮৬] তঞ্চঙ্গ্যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে কাল্পনিক কিছু দেবদেবীর পূজাও তারা করে। যেমন, গাঙপূজা, ভূতপূজা, চুমুলাংপূজা, মিত্তিনীপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইাতাদি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা বুদ্ধপূজা, সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, কঠিন চীবর দান, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করে। [৮৭]

তঞ্চঙ্গ্যাদের সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের বিভিন্ন রূপকথা, লোককাহিনী-কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। উভাগীত অর্থাৎ প্রেমের গান তাদের সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে। উভাগীত সাধারণত প্রেমের গান হয়ে থাকে। পালাগান ও নাটকেও তাদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। [৮৮]

পাংখোয়া

পাংখোয়ারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী একটি জাতি। পাংখোয়াদের বিশ্বাস অতীতে তারা লুসাই পাহাড়ে 'পাংখোয়া' নামক এক গ্রামে বসবাস করতেন। তাদের ভাষায় 'পাং' অর্থ শিমুল ফুল আর 'খোয়া' অর্থ গ্রাম। যার বাংলা অর্থ শিমুল ফুলের গ্রাম। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে তাদের বসবাস রয়েছে। [৮৯]

---

[৮৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৪।

[৮৪] Dinonath Tanchanga, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০-১৯১।

[৮৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯১।

[৮৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫-১৯৬।

[৮৭] দীননাথ তন্চংগ্যা, 'তঞ্চঙ্গা', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮-১০২।

[৮৮] বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯০-২৯২।

[৮৯] Hafiz Rashid Khan, 'Pangkhoa', published in Mesbah Kamal & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯-১৬০।

বিভিন্ন লেখক গবেষক পাংখোয়াদের 'পাংখউই', 'পাংহয়', 'পাংকুয়া', 'পানখুয়া', 'পাংখুয়া' নাম উল্লেখ করেছেন। পাংখোয়ারা নিজেদের 'পাংখোয়া' বা 'পাংখু' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। পাংখোয়ারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী। আর. এইচ. এস. হাচিনসন পাংখোয়া ও বমদের দৈহিক গড়ন, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতির ক্ষেত্রে মিল থাকায় তারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন।[৯০] টি. এইচ. লুইন মনে করেন এরা লুসাই ও কুকিদের অন্তর্ভুক্ত জাতি। জে শেক্সপেয়ারের মতে এদের দেহে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর রক্তধারা প্রবাহিত। পাংখোয়াদের ২৫টি গোত্রের কথা জানা যায়। নামের আগে বা পরে গোত্রের নাম ব্যবহার করেনা বিধায় তারা কোনো গোত্রের তা সহজে শনাক্ত করা যায়না।[৯১]

পাংখোয়াদের ভাষা উত্তর 'কুকি-চীন' ভাষা পরিবারভুক্ত। তাদের লিখিতরূপে ব্যবহারের জন্য নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। লেখার জন্য পাংখোয়ারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে। পাংখোয়ারা তাদের নাম এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত অনেক শব্দ বাংলাসহ অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করেছে।[৯২]

ক্রমশ জমি সংকুচিত হতে থাকলেও এখনও শতকরা ৯০ ভাগ পাংখোয়া জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।[৯৩] পাংখোয়াদের খাবারে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। বন্য মাংস তাদের খুব পছন্দ। এর জোগানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ফাঁদ দিয়ে পশু-পাখি শিকার করে। পাংখোয়াদের খাদ্য তালিকায় সিদ্ধ খাবার, পচা চর্বি ও নাপ্পি উল্লেখযোগ্য।[৯৪] পাংখোয়া মেয়েরা তাঁতে কাপড় বুনতে পারদর্শী। কাপড়ে বিভিন্ন ফুলের নকশা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৯৫] পাংখোয়া নারীদের অলংকারে বৈচিত্র্য রয়েছে। তারা হাতির দাঁতের তৈরি নাক ফুল বা মি-সি ব্যবহার করে।[৯৬] পাংখোয়াদের বাঁশ ও বেত শিল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। বাঁশ ও বেত সামগ্রী তৈরিতে তাদের শৈল্পিক নিপুণতা ফুটে উঠে। পুরুষরা তাদের সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি করে। জীবন ও জগতের প্রতি তাদের বেশি উচ্চাশা নাই তাই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হলেই তাদের চলে।[৯৭]

পাংখোয়া সমাজে শুধুমাত্র পুত্র সম্পদের মালিক হয়। পরিবারের সম্পদের উপর কন্যাদের কোনো অধিকার থাকেনা। বিধবা শুধুমাত্র তার মৃত স্বামীর সম্পদের জিম্মাদার এবং সন্তানদের প্রয়োজনে স্ত্রী সেই জমি বিক্রি করতে পারে। স্ত্রী

---

[৯০] লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, 'পাংখোয়া', প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫১।

[৯১] Hafiz Rashid Khan, 'Pangkhoa', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬০-১৬১।

[৯২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯-১৭০।

[৯৩] লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৩।

[৯৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৬-৩৭৮।

[৯৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৫।

[৯৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৬।

[৯৭] Hafiz Rashid Khan, 'Pangkhoa', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৩-১৬৪, ১৬৯।

দ্বিতীয় বিবাহ করলে সেই অধিকার হারায়। [৯৮] প্রাচীন কাল থেকে পাংখোয়া সমাজে নিজস্ব রীতি অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হয়। [৯৯]

পাংখোয়ারা প্রকৃতি পূজারি। আদিম যুগে পাংখোয়ারা বট গাছের নিচে শিবের পূজা করতো। বর্তমানে পাংখোয়ারা খ্রিষ্ট ধর্ম পালন করে। [১০০] টিএইচ লুইন (১৮৬৯) পাংখোয়াদের সম্পর্কে বলেন যে, ভালোবাসার যোগ্য অনেক গুনাবলি তাদের আছে। তারা সহজ-সরল, সৎ, প্রফুল্ল। মন, কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণায় নেই এবং প্রকৃতির সাথে মিশে একাত্ম হয়ে বেঁচে থাকার স্টোয়িক দর্শনের ন্যায় তারা জীবন ধারণ সহজে সবাইকে প্রলুব্ধ করে। [১০১]

পাংখোয়ারা জন্মগতভাবে গান বাজনায় পারদর্শী। প্রায় প্রত্যেকেই সাংস্কৃতিক চর্চায় অভ্যস্থ। তাদের নৃত্যের উল্লেখযোগ্য হলো লামদেপ, সালু মালাম, জামা লাম, চাম রাপাল দেং ইত্যাদি। পাংখোয়া সমাজে অনেক রূপকথা ও লোককাহিনী প্রচলিত আছে। যা বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। [১০২]

খিয়াং

পার্বত্য চট্টগ্রামের আরও একটি সংখ্যাল্প জাতি হলো খিয়াং। খিয়াং শব্দের অর্থ ইচ্ছা। খিয়াংরা অন্যান্য আদিবাসীদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগযুগ ধরে বসবাস করে আসছে। তারা নিজেদের হ্যউ (Hiou) বলে। হ্যউ শব্দের অর্থ ভাসমান ও কাছাকাছি। [১০৩]

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলি, কাপ্তাই এবং বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা, বান্দরবান সদর ও থানচি উপজেলায় খিয়াংদের বসবাস রয়েছে। [১০৪] খিয়াং জাতির লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র খিয়াং সমাজে টোটেম-ভিত্তিক গোত্রের নাম পাওয়া যায়। তারা সাধারণত প্রাকৃতিক জড় পদার্থের নামানুসারে গোত্রের নামকরণ করে। প্রতিটি গোত্রের নামকরণের পিছনে রয়েছে অতীত ইতিহাস। বাংলাদেশে বসবাসকারী খিয়াংরা দুই ভাগে বিভক্ত– কোংতু ও লাইতু। যারা পাহাড়ি এলাকায় বাসবাস করে তাদেরকে ‘কোংতু’ বলে। তারা পেশা হিসেবে জুম চাষ করে। আর যারা সমতল ভূমিতে বসবাস করে ও পেশা হিসেবে জমি চাষ করে তাদের ‘লাইতু’ বলে। খিয়াংদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। তাদের ভাষা সিনো-টিবেটান পরিবারের তিব্বতি-ব্রহ্ম শাখার কুকী, চীনদলের

---

[৯৮] Abul Barkat & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

[৯৯] লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৬।

[১০০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৭-৩৭০।

[১০১] হাফিজ রশিদ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ১১০।

[১০২] লাল ছোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭২-৩৭৯।

[১০৩] Thoisafure Khyang, ‘Khyang’, published in Mesbah Kamal & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪।

[১০৪] বাছা খিয়াং, ‘খিয়াং’, প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫।

একটি ভাষা। তাদের ভাষায় একই শব্দের উচ্চারণ ভেদে বিভিন্ন অর্থ বুঝায়। যেমন, 'চি' শব্দের অর্থ লবণ এবং 'চী' শব্দের অর্থ বড় বোন। [১০৫]

খিয়াংদের প্রধান খাদ্য ভাত ও শাকসবজি। অধিকাংশ সবজি তারা সিদ্ধ করে খায়। নাপ্পি তাদের পছন্দের খাদ্য। ঘরে তৈরি মদ তাদের অন্যতম পানীয়। [১০৬]

খিয়াংদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক রয়েছে। তারা নিজেদের তৈরি পোশাক ব্যবহার করে। নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ অনেকটা রাখাইনদের মতো। তারা নিচের অংশে রঙিন ও কালো সুতা দিয়ে থামি তৈরি করে ব্যবহার করে। উপরের অংশে পাঞ্জাবীর মতো পোশাক পরিধান করে। পুরুষরা মোটা কাপড়ের খাটো ধুতি এবং হাতাকাটা কোটের মতো ঢিলা কোট ব্যবহার করে। [১০৭]

খিয়াং নারীরা বিচিত্র ধরনের রূপার তৈরি অলংকারে নিজেদের সাজাতে পছন্দ করে। [১০৮] খিয়াংদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তাই পিতাই পরিবারের নীতি-নির্ধারণকারী। বিচার ও সালিশে পুরুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খিয়াং সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে হেডম্যান বা কারবারী। [১০৯] খিয়াং সমাজে পিতার সম্পদের অধিকারী হয় পুত্ররা। পুত্র না থাকলে পিতার নিকটতম ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করে। খিয়াং নারীরা পিতা-মাতা বা স্বামীর সম্পদ দাবি করতে পারেনা। তবে খিয়াং সমাজে উত্তরাধিকার প্রথা বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন ধরনের। [১১০] খিয়াংদের বিবাহের কিছু নিজস্ব নিয়মনীতি রয়েছে। তাদের একই গোত্র ও চাচাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বিবাহ হলে দম্পতিকে সমাজচ্যুত করা হয়। তবে কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তারা পুনরায় সমাজভুক্ত হতে পারে। খিয়াং সমাজে পণ হিসেবে মেয়ের পিতা-মাতাকে নগদ টাকা বা খিয়াং ভাষায় 'দাফা' দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। [১১১] খিয়াং সমাজে মৃতদেহকে দাহ করার রীতি রয়েছে। [১১২]

অতীতে খিয়াংরা ছিল প্রকৃতি পূজারি। তারা ঈশ্বরকে 'হ্নদাগা' বলে। তারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করলেও ঈশ্বরকেই সর্বশক্তিমান বলে মনে করে। বর্তমানে অনেকে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী খিয়াংদের বড় ধর্মীয় উৎসবের নাম হলো 'সাংলান' যা চাকমা ও মারমাদের কাছে 'বিজু' ও 'সাংগ্রাই' নামে পরিচিত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী

---

[১০৫] Thoisafure Khyang, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯।

[১০৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৯।

[১০৭] মং চান শৈ ম্যা এবং চাই থোয়াই প্রু খিয়াং, 'খিয়াং জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত', ড. মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৪।

[১০৮] Thoisafure Khyang, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।

[১০৯] থয়সা প্রু খিয়াং, 'খিয়াং', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।

[১১০] Abul Barkat & et.al., পৃষ্ঠা ঃ ৩১-৩২।

[১১১] মং শৈ প্রু খিয়াং-এর সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩।

[১১২] Thoisafure Khyang, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪-৯৫।

খিয়াংরা ফুল দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে বুদ্ধের পূজা অর্চনা করে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী খিয়াংরা যীশুখ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বড়দিন পালন করে। সামাজিক উৎসবের মধ্যে রয়েছে 'ওপেল' উৎসব। [১১৩]

খিয়াংদের নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় তাদের লিখিত সাহিত্য তেমন দেখা যায়না। তবে মৌখিক সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। পৃথিবী ও চন্দ্র সৃষ্টির ইতিহাস, সূর্যগ্রহণ ও মানব সৃষ্টির ইতিহাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি নিয়ে খিয়াংদের সমৃদ্ধ লোককাহিনি রয়েছে। [১১৪]

খুমী

খুমী পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাল্প জাতিগুলির মধ্যে একটি জাতি। শুধু বান্দরবান জেলার রুমা, রোয়াংছড়ি ও থানচি এই তিন উপজেলায় খুমীরা বাস করে। খুমীরা মনে করে 'খা' অর্থ মানুষ এবং 'মী' অর্থ উত্তম। অর্থাৎ খামী অর্থ উত্তম মানুষ। খামী কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে খুমী হয়েছে। [১১৫] আবার লেখক লেলং খুমী বলেছেন যে, 'খু শব্দের অর্থ 'গভীর জঙ্গল' এবং 'মী' শব্দের অর্থ মানুষ বা জীব। তাই এই শব্দের প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষ। [১১৬]

যদিও এদের নিজস্ব ভাষা আছে কিন্তু বর্ণমালা নেই। খুমীদের ভাষা দক্ষিণাঞ্চলীয় তিব্বতি-বর্মন ভাষা পরিবারের একটি অংশ। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ভাষা এখনও অপরিবর্তিত আছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন খুমীরা নিজেদের ভাষা অন্যদের শিখাতে বা আন্যের ভাষা শিখতে উৎসাহ বোধ করে না। [১১৭]

খুমীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। একই গোত্রের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগোত্র রয়েছে। [১১৮]

খুমীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে। তারা এখনও দলপতি মনোনীত করে এবং দলপতিকে শ্রদ্ধা ও তাঁর নির্দেশ মান্য করে। সামাজিক বিচার-ব্যবস্থায় দলপতির আদেশ শিরোধার্য। রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। তারা বোমাং রাজার অধীনস্থতা স্বীকার করে এবং এ সার্কেলের নিয়ম কানুন মেনে চলে। [১১৯]

খুমীদের গ্রামগুলো সাধারণত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তারা মাটি থেকে ৩/4 ফুট উপরে ঘর তৈরি করে। অনেক জায়গায় গাছের ডালের উপরেও তারা ঘর তৈরি করে। [১২০] প্রধানত খুমীরা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। নারী পুরুষ

---

[১১৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯১-৯৫।

[১১৪] বাছা খিয়াং, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:১১২-১১৪।

[১১৫] Thoisafure Khyang, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৫-২৯।

[১১৬] লেলুং খুমী 'খুমী' ' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২২-১২৩।

[১১৭] Mohammad Abdul Baten, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০২।

[১১৮] লেলুং খুমী 'খুমী' ' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:১২৪-১২৫।

[১১৯] Mohammad Abdul Baten, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩-১০৪।

[১২০] লেলুং খুমী 'খুমী' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯।

উভয়ে মিলে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জুম চাষ করে। [১২১] খুমীরা সাধারণত ভাত, মাছ, মাংস ও শাকসবজি খায়। তারা প্রয়োজনীয় শাকসবজি জুমে চাষ করে এবং কিছু জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় নাপ্পি তাদেরও প্রিয় খাবার। [১২২]

খুমী মহিলারা নিজেদের তাঁতে বোনা লম্বা থামি পরিধান করে। থামিতে বিভিন্ন রঙিন সুতা দিয়ে নকশা করা হয়। থামিকে খুমী ভাষায় 'নেনা' বলে। তারা মাথায় সাদা পাগড়ি ব্যবহার করে। এই সাদা পাগড়িকে 'লুপ্যা' বলে। পুরুষের ঐতিহ্যবাহী পোশাক নেংটি ও লুঙ্গি হলেও অধিকাংশ পুরুষ এখন নেংটি ব্যবহার করেনা। [১২৩]

খুমীরা সাধারণত রূপা, তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতু ও পুঁতি দিয়ে তৈরি বিচিত্র ধরনের অলংকার যেমন, হাতের চুড়ি, কানের দুল, চুলের কাঁটা, চুলের ফুল, গলার মালা এবং কোমরের চেইন ব্যবহার করে। [১২৪] খুমীদেরও শুধুমাত্র পুত্ররা সম্পদের মালিক হয়। সকল পুত্র সম্পদের সমান ভাগ পায়। কন্যারা সম্পদের ভাগ পায়না। পরিবারে পুত্র সন্তান না থাকলে পিতা তার নিকট আত্মীয়ের পুত্র সন্তানের মাঝে সম্পদ ভাগ করে দেয়। [১২৫]
খুমীদের একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদের চার ধরনের বিবাহ রয়েছে যথা: ১. ধার্য বিবাহ, ২. অনিয়মিত বিবাহ, ৩. বহু বিবাহ ও ৪. বিধবা বিবাহ। [১২৬] খুমী সমাজে কারো মৃত্যু হলে একটি করে শুকর, কুকুর ও মুরগি হত্যা করা হয়। খুমীদের মৃতদেহ চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত ঘরে রাখার প্রচলন রয়েছে। এসময় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মৃতের আত্মার কষ্ট লাঘব করা হয়। [১২৭]

খুমীরা নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিলেও তারা আসলে প্রকৃতি পূজারি। বর্তমানে খুমীদের তিন ধর্মের অনুসারী হিসেবে দেখা যায়। তাদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ খ্রিষ্ট ধর্ম, ৪৫ ভাগ প্রকৃতি পূজা এবং ১০ ভাগ ক্রামা ধর্মের অনুসারী হিসেবে ধারণা করা হয়। এই ত্রিমুখী ধর্ম তাদের সামাজিক জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করছে। যেমন: তাদের সকল উৎসবে মদ আবশ্যকীয় হলেও এখন ক্রামা ও খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের জন্য নিষিদ্ধ। ক্রামা ধর্মের অনুসারীরা 'ক্রামাদি বনবাস গমন' উৎসব পালন করে। খ্রিষ্টানরা ইংরেজি নববর্ষ ও বড়দিন উৎসব পালন করে। আর প্রকৃতি পূজারিরা গৃহ পূজা, পাথর পূজা, ছড়া পূজা, বৃক্ষ পূজা ইত্যাদি পূজা করে থাকে। [১২৮] তাদের সামাজিক উৎসবের মধ্যে সাংগ্রায় উৎসব অন্যতম।[১২৯] খুমীদের লিখিত সাহিত্য নাই তবে অলিখিত সাহিত্যও লোককাহিনি, রূপকথা, লোকসংগীত, গান, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সমৃদ্ধ বলে খ্যাতি রয়েছে। [১৩০]

---

[১২১] মুহাম্মদ আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৭।
[১২২] লেলুং খুমী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪০।
[১২৩] সিং ইয়ং মুরং, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৫।
[১২৪] Mohammad Abdul Baten, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৫।
[১২৫] Abul Barkat & et.al প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।
[১২৬] লেলুং খুমী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৫-১২৬।
[১২৭] সিং ইয়ং মুরং, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৬।
[১২৮] লেলুং খুমী, 'খুমী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩০-১৩১।
[১২৯] বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, 'পার্বত্য জনপদের নববর্ষ বৈসাবি', প্রকাশিত হয়েছে মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত (২০০৫), পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮।
[১৩০] লেলুং খুমী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৭-১৩৮।

লুসাই

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত লুসাইরা রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার সাজেক উপত্যকায় বাস করে। তবে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় সামান্য এবং সিলেট জেলায় খুব সামান্য লুসাই-এর বাস রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মিজোরামে এদের সংখ্যা অধিক। এছাড়া মিয়ানমারের চীন প্রদেশেও লুসাইরা বাস করেন।[১৩১]

লুসাই শব্দটির উৎপত্তি 'লুসেই' থেকে। 'লু' এর অর্থ হলো মাথা এবং 'সেই' এর অর্থ লম্বা। লুসাই পুরুষরা পূর্বে চুল লম্বা রাখত এবং কপালের উপর চুলের খোঁপা বাঁধত। তাই তাদের মাথা দেখতে লম্বা মনে হওয়ায় এরূপ নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। লুসাইদের পূর্বপুরুষ 'চিংলুং' (Rock with a Lid) থেকে এসেছে এবং তারা নিজেদেরকে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করে। তাদের চেহারা ও শারীরিক গঠনের সাথে মঙ্গোলীয়দের মিল রয়েছে।[১৩২]

লুসাইদের মধ্যে গোত্র বিভাজন রয়েছে। পূর্বপুরুষের উলেখযোগ্য ব্যক্তির নাম অনুসারে তাদের গোত্রের নামকরণ করা হয়। লুসাইরা লুসাই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা টিবেটো-বর্মণ ভাষা পরিবারভুক্ত।[১৩৩] লুসাই ভাষার শব্দগুলি রোমান অক্ষরে লেখা হয়। লুসাই ভাষার সাথে খিয়াং ও মণিপুরী ভাষার কিছু কিছু মিল থাকলেও প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ মিল রয়েছে বম ও পাংখোয়া ভাষার সাথে।

লুসাইরা সাধারণত একক পরিবারে বিশ্বাস করে। তবে যৌথ পারিবারিক প্রথাও তাদের মধ্যে দেখা যায়। পরিবারের হেডম্যান দ্বারা পরিচালিত।[১৩৪] উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্ররা সম্পদের মালিক হয় লুসাই সমাজে। পরিবারে কোনো পুত্র সন্তান না থাকলে পিতার নিকট আত্মীয়ের পুত্র সম্পদ ভোগ করে। স্ত্রী বা কন্যারা সম্পদের দাবি করতে পারেনা। কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকার রাখে। বিধবা স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করলে সে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার হারায়।[১৩৫]

বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লুসাইরা ভূমি থেকে উঁচু করে বসতঘর নির্মাণ করে। তারা বনের সহজ প্রাপ্য বাঁশ, গাছ, ছন দিয়ে মাচাংঘর তৈরি করে।[১৩৬] সাধারণত জুম চাষ করে লুসাইরা জীবিকা নির্বাহ করে। তবে বর্তমানে জুম চাষের বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে তারা অন্য পেশার প্রতি মনোযোগী হচ্ছে।[১৩৭]

লুসাইদের প্রধান খাদ্য ভাত ও শাকসবজি। তারা পাহাড়ে জুম চাষের মাধ্যমে ধান, শাকসবজি ইত্যাদির চাষ করে। এছাড়া কখনো ঝর্ণা বা ছড়া থেকে শামুক, কাঁকড়া, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং বনের পশুপাখি শিকার করে। লুসাইরা

---

[১৩১] জনি লুসাই, 'লুসাই', প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২১।

[১৩২] Johny Lushai, 'Lushai', Mesbah Kamal & et. al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯।

[১৩৩] জনি লুসাই, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩০।

[১৩৪] খুরশিদ আলম সাগর, *বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা*, পত্রপুট, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১।

[১৩৫] Abul Barkat & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১-৩১।

[১৩৬] জনি লুসাই, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২৯।

[১৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫২৮।

সাধারণত কম লবণ ও পানি দিয়ে যেকোনো তরকারি সিদ্ধ করে খেতে পছন্দ করে। তাদের প্রিয় খাবারের নাম 'সা-উম-বাই'।[১৩৮]

অতীতে কিছু কিছু গ্রামে লুসাইরা পশুর চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি ও ব্যবহার করত। পরবর্তীতে তুলা থেকে সুতা তৈরি করে কোমর তাঁতে বোনা চাদর পুরুষ ও মহিলা উভয়ই ব্যবহার করতো।[১৩৯]

লুসাই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তাদের মধ্যে পিতার রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। লুসাই সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন মেয়ের নানা 'পু'। নাতনি নানার কাছে কোনো দাবি করলে নানা সাধ্যমতো তা পূরণ করার চেষ্টা করে। পিতামাতা রাজি হলেও নানার অমতে বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা। লুসাইদের মধ্যে কনেপক্ষকে বরপক্ষের পণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে।[১৪০]

লুসাই সমাজে তিন মাসের কম বয়সের শিশু মারা গেলে বিবাহিত ব্যক্তিরা সমাহিত করে। লুসাই ভাষায় এই মৃত শিশুদের 'হ্লামজুই' বলা হয়।[১৪১]

বর্তমানে লুসাইরা শতকরা ৯৬ ভাগ শিক্ষিত এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। লুসাইরা সংগীত প্রিয় ও সংস্কৃতিমনা। তারা নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে সচেতন। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র, অলংকার ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণের সময় তারা বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের উল্লেখযোগ্য নৃত্যের মধ্যে রয়েছে বাঁশ নৃত্য, শিকারি নৃত্য, জুম নৃত্য, যুবক-যুবতীদের নৃত্য ইত্যাদি।[১৪২] লুসাইদের লোক-সংস্কৃতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। তাদের লোক-কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা, প্রচলিত রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে তাদের রূপকথা ও লোককাহিনী প্রচলিত।[১৪৩]

লুসাইরা প্রকৃতি পূজারি হলেও তারা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে। সারা বছর তাদের বিভিন্ন ধরনের পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। তারা খোয়াবং সাখু-আ, তুইহুয়াই, মিভেংগেতু ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করে। লুসাইদের একটি বৃহৎ অংশ বর্তমানে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী। খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা গীর্জায় প্রার্থনা করে।[১৪৪]

চাক

চাক জনগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণাংশে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থানার বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি, কামিছড়া, ক্রোক্ষং, বাকখালী, আলেখ্যং, ক্রোয়াংঝিরি, ডুছড়ি প্রভৃতি এলাকায় বাস করেন। চাক ভাষায় 'চাক' শব্দের অর্থ

---

[১৩৮] Johny Lushai, 'Lushai', published in Mesbah Kamal & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯-১১০।

[১৩৯] জনি লুসাই, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০১।

[১৪০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫২৩-৫২৬।

[১৪১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫২৬-৫২৭।

[১৪২] Johny Lushai, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১১১-১১২।

[১৪৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩৩-৫৩৮।

[১৪৪] খুরশিদ আলম সাগর, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ১৮১।

'দাঁড়ানো'। অন্যান্য জনগোষ্ঠীরা তাদেরকে চাক বললেও তারা নিজেদেরকে আচাক বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে।[১৪৫] দৈহিক গড়নে চাকরা মঙ্গোলয়েড। তাদের ধর্মাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, সংগীত ইত্যাদি চাকমাদের থেকে স্বতন্ত্র। তাদের সাথে আরাকানের প্রাচীন আদিবাসীদের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। [১৪৬]

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে চাক সমাজে পুত্র বিবেচিত হয়। কন্যা কোনো সম্পত্তি পায়না। যদি পুত্র সন্তান না থাকে তবে তার সম্পদের মালিক হয় ভাইপো বা পিতার নিকটাত্মীয় কোনো পুরুষ সদস্য। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী সম্পত্তির কিছুটা অধিকার প্রাপ্ত হয়। চাকদের উত্তরাধিকার প্রথা অনেক সময় চাক অঞ্চলের উপর নির্ভর করে। [১৪৭]

চাকরা বোমাং সার্কেলে বসবাস করে। তাই তাদের উপর বোমাং সার্কেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের সমাজে চীফ প্রধান ব্যক্তি। চীফকে হেডম্যান ও কার্বারী সহযোগিতা করে। চাকরা সুশৃঙ্খল জাতি বলে খ্যাত। [১৪৮] চাক জাতি জুম চাষ ও হাল চাষ উভয় পদ্ধতিতে কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে তাদের একটি বড় অংশ দিনমজুর হিসেবে কর্মরত। এছাড়া কিছু অংশ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। [১৪৯]

চাকদের বাসগৃহ তৈরির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তারা ভূমি থেকে ৫/৬ ফুট উপরে মাচাং ঘর তৈরি করে বসবাস করে। চাকরা বাড়িকে 'কিং' এবং গ্রামকে 'ঠি' বলে। তাদের বাড়ির ঘরগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত যেমন শস্য রাখার স্থান, রান্নার স্থান, বয়স্কদের ঘুমানোর স্থান, গৃহকর্তা-গৃহকর্তী ও পুত্র-কন্যাদের কক্ষ, অতিথিদের ঘুমানোর স্থান, পানি রাখার স্থান ইত্যাদি। চাকরা স্বল্প আহারি। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত ও শাকসবজি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা নিজেদের তৈরি মদ পান করে। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস ও শুঁটকি মাছ খেয়ে থাকে। মদ তাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। [১৫০] চাকরা নিজেদের তাঁতে বোনা পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। পুরুষেরা লুঙ্গি এবং কলারবিহীন জামা ও শার্ট পরিধান করে। মেয়েরা কালো 'নাফিই' পরিধান করে এবং গায়ে 'বৈদই পুজু' ব্যবহার করে। তারা বিশেষভাবে তৈরি 'ব্যাংকেঙবাং' কাপড় দ্বারা শরীর ঢেকে রাখে এবং তারা মনে করে এতে তাদের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। [১৫১] চাকদের ব্যবহৃত অলংকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তারা রূপা, তামা, পুতি ইত্যাদি দিয়ে নিজস্ব ডিজাইনে অলংকার তৈরি করে নেয়। তাদের কানবালা ও নাকফুল সাধারণত বৃহদাকৃতির হয়। এছাড়া তারা হাতের চুড়ি, গলায় মালা ও পায়ের খাড়ু ব্যবহার করে। [১৫২]

চাকদের নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে। কিন্তু এর রূপ পাওয়া যায়না। [১৫৩] চাক জনগোষ্ঠী সিনো-টিবেটান পরিবারের তিব্বতি-বর্মন শাখার 'শাক' বা 'লাই' দলভুক্ত ভাষায় কথা বলে। তাদের নিজস্ব ভাষাকে 'তু' বলা হয়। সরল প্রকৃতির

---

[১৪৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

[১৪৬] ড. মুস্তাফা মজিদ, 'মঙ্গোলীয় আদিবাসী চাক', দেখুন ড. মুস্তাফা মজিদ, প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩১১।

[১৪৭] Abul Barkat & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৩।

[১৪৮] খুরশিদ আলম সাগর, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭।

[১৪৯] Rakhi Roy, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

[১৫০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪।

[১৫১] খুরশিদ আলম সাগর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৮।

[১৫২] Rakhi Roy, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০।

[১৫৩] খুরশিদ আলম সাগর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।

চাক জনগোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ অগ্রসর। চাকরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। মহামতি বুদ্ধের প্রতি তাদের রয়েছে অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে এবং সন্তান জন্মনিলে পূর্বপুরুষদের কেউ তাদের ঘরে এসেছে বলে ধারণা করে।[১৫৪] চাকরা সারা বছর বিভিন্ন উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে। তারা বিভিন্ন মাস ও পূর্ণিমার সাথে মিলিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বিষু উৎসব ইত্যাদি উৎসবে চাকরা দলবদ্ধভাবে বৌদ্ধ বিহারে গমন করে এবং পঞ্চশীল গ্রহণ করে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব সাংগ্রাইন উৎসব।[১৫৫]

চাকদের বিবাহ রীতি অন্যান্য জাতির তুলনায় ভিন্ন। তাদের সমাজে একই গোত্রের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয়না। বিয়ে সাধারণত অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।[১৫৬] চাক পরিবারের কোনো সদস্য মারা গেলে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তার সৎকার করা হয়। এখানেও তাদের গোত্রীয় প্রাধান্য ও নিয়মকানুন অনুসৃত হয়। পুরুষের মৃত্যু হলে মামা অথবা তার বংশীয় ছেলে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে আপন ভাই অথবা ভাইয়ের পুত্র শবদাহ করে।[১৫৭]

চাক জনগোষ্ঠী তাদের সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। চাকদের ব্যবহৃত অলংকারের ডিজাইন সম্পূর্ণ নিজস্ব। গোত্র প্রথার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনার্থে যে সংগীত পরিবেশন করা হয় তাতেও স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে। এছাড়া জীবনের বিভিন্ন ধাপে পালিত কৃষ্টির মাধ্যমে চাকরা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র রেখেছে অন্যান্য জাতি থেকে।[১৫৮]

বম

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জাতি বম। বম শব্দের অর্থ বন্ধন। অতীতে সংখ্যাল্প কয়েকটি জনগোষ্ঠীর লোকেরা যাদের জীবন প্রবাহ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত ইত্যাদি প্রায় একই রকম ছিল তারা নিজেদেরকে বম নামে আখ্যায়িত করতেন। পরবর্তীতে সম্মিলিত এ জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয় বম।[১৫৯]

বম-জো (Bawm-zo) জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা কিংবদন্তিতে আচ্ছন্ন। বমদের প্রথম পরিচিতি ছিল বম-জো নামে। বিভিন্ন লেখকের রচনায় তাদেরকে Bonjogi, Bangoogies, Banjoos, Bangogies, Bom-Zou, Bom নামে উল্লেখ করা হয়। ১৮৬৭ সালে টি এইচ লুইন এদেরকে বনযোগী নামে উল্লেখ করেন। 'বনযোগী' আসলে 'বন-জো'-এর বিকৃত উচ্চারণ।[১৬০] বান্দরবান জেলার রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও সদর থানা এবং রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি

---

[১৫৪] মংমং চাক, চিংহ্লামং চাক, 'চাক', প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮০-১৮১।

[১৫৫] অং খ্যাইন চাক, 'চাকদের ধর্ম ও সংস্কৃতি', দেখুন ড. মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩১৪-৩১৬।

[১৫৬] ড. মুস্তাফা মজিদ, প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩১২।

[১৫৭] পাই থুই চাক, 'কামাঙ চয়েত্ ঠুঙ ঃ চাকদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া', ড. মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩২০-৩২২।

[১৫৮] Rakhi Roy, 'Chak', Published in Mesbah Kamal, & et.al. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫।

[১৫৯] Zing Alh Bawm, 'Bawm', Published in Mesbah Kamal & et.al. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮।

[১৬০] আবদুল মালেক ও মশিউর রহমান, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী 'বম' ঃ আর্থ-সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮২, জুন ২০০৫/ আষাঢ় ১৪১২, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭।

থানায় মোট ৭০টি গ্রামে বমদের বসবাস। বমরা নিজেদেরকে বম নামে পরিচয় দিলেও চাকমা বা তঞ্চঙ্গ্যারা বমদেরকে কুকি নামে এবং খুমী, ম্রো ও খিয়াং জাতির লোকেরা বমদেরকে ল্যাংগে বলে অভিহিত করেন। [১৬১]

অতীতে বম সমাজের প্রতিটি গ্রাম স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে গ্রাম প্রধান দ্বারা শাসিত হতো। কোনো গ্রাম বয়স্কদের সভা-পরিষদ আবার কোনো গ্রাম স্বেচ্ছাচারী হেডম্যানের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। এছাড়া ভূমির উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণকারী ভূম্যধিকারী রয়েছে। তাকে কৃষকরা খাজনা প্রদান করে। গ্রামের প্রধান হচ্ছে চীফ। তার কথা আদেশে পরিণত হয়। নতুন ফসল উঠার পর প্রধানকে গ্রামের প্রতিটি পরিবার তিন ঝুড়ি ধান দেয়। এছাড়া তাকে চাষের উৎকৃষ্ট জমিও দেওয়া হয়। গ্রামের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য মুরুব্বিরা প্রধানকে সহায়তা করে এবং উভয়ে মিলে গ্রামবাসীদের উন্নয়ন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও চাষযোগ্য জমির সমবন্টন করে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রামে প্রচারের জন্য একজন ঘোষক থাকে তাকে যথেষ্ঠ পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। [১৬২]

বমদের দৈহিক গড়নের মধ্যে বৃহত্তর মঙ্গোলীয়দের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বমরা সাধারণত নম্র স্বভাবের এবং তারা পুরুষ ও মহিলা উভয়েই পরিশ্রমী। তবে তুলনামূলকভাবে মহিলারা অধিক পরিশ্রমী। [১৬৩] বম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। ইদানিং রোমান বর্ণমালাকে তারা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছে। ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, উপাসনার গানসহ সামাজিক আইনের গ্রন্থ ইত্যাদি তাদের নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। বম ভাষার ব্যবহার এ অঞ্চলের বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এ ভাষার ব্যবহার ভারতের মিজোরামের কোনো কোনো এলাকায় আছে এবং মায়ানমারের চিন হিলসে বেশিরভাগ লোকের মধ্যেও এ ভাষার প্রচলন দেখা যায়। [১৬৪]

গ্রামের লোকদের সাহায্য করা বমরা নৈতিক দায়িত্ব বলে মলে মনে করে এবং সমাজে এই কাজকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। গোত্রের প্রতি বিশ্বস্ততা বমদেরকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতিটি গোত্রকে বর্ধিত পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বমরা সাহসী এবং লাজুক স্বভাবের। শত্রুর আক্রমণ থেকে গ্রাম এবং গোত্রকে রক্ষা করা প্রত্যেক বম নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে। [১৬৫]

বম জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা জুমচাষ। পাহাড়ের ঢালে বিশেষ কায়দায় জুম চাষের মাধ্যমে তারা ধান, ভুট্টা, মরিচ, শিম, কাকরোল, তিল, কার্পাস, হলুদ, আদা, ঢেড়স, শশা, কুমড়া ইত্যাদি শাকসবজি উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। বমরা ভাত ও মাছ, মাংস খেতে পছন্দ করে। বমরা শাকসবজি তেমন বেশি খায়না। তারা শুটকি মাছ ও নাপ্পি খেতে অভ্যস্ত। [১৬৬] বমরা সাদাসিধে পোশাক পরিধান করে। তারা নিজস্ব কোমর তাঁতে পোশাক তৈরি করে পরিধান করে। এছাড়া নকশাযুক্ত মোটা কাপড়ের তৈরি 'নুফান' কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত পরিধান করে।

---

[১৬১] Zing Alh Bawm, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮।

[১৬২] আবদুল মালেক ও মশিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।

[১৬৩] ড. মুস্তাফা মজিদ, 'বম জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি', দেখুন ড. মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩৪০।

[১৬৪] Zing Alh Bawm, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ০৮-০৯।

[১৬৫] আবদুল মালেক ও মশিউর রহমান,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪।

[১৬৬] Zing Alh Bawm, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২-১৪।

পুরুষদের পোশাক অতি সাধারণ। বম মেয়েরা দেখতে সুন্দর এবং অলংকার প্রিয়। বিভিন্ন অলংকার দিয়ে নিজেদের সাজাতে তারা পছন্দ করে। [১৬৭]

বমরা নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। তারা বন থেকে প্রাপ্ত গাছ, বাঁশ, ছন, পাতা, তুলা, পশুর চামড়া, পাখির পালক, ও লেজ ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ ব্যবহার্য সামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। তারা বাঁশ ও বেত দিয়ে বাচ্চাদের দোলনা ও মাছ ধরার ফাঁদ তৈরি করে। কাঠের ব্যবহারও বোম সমাজে লক্ষণীয়। আদিকাল থেকে বমরা লোহার তৈরি দা ব্যবহার করে। বমদের ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রগুলির মধ্যে বল্লম, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি রয়েছে। [১৬৮]

বমরা দুচালা বিশিষ্ট মাচাং ঘর তৈরি করে বসবাস করে। বাসগৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রেও বমদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তারা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতে পছন্দ করে। [১৬৯] বমদের সামাজিক প্রথা অনুসারে পুত্র সন্তান কেবলমাত্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। সন্তান না থাকলে পিতার নিকটবর্তী আত্মীয়ের পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রথা অনুসারে বম সমাজে মাতা কেবলমাত্র পরিবারের সম্পদের দেখাশুনা করতে পারে। তবে মা এবং বোন সম্পদের ভাগ পায় না। অপরদিকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর মৃত স্ত্রীর সম্পদের পুরো অধিকার লাভ করে তার স্বামী। বম পিতা-মাতারা বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত ছোট ছেলের বাড়িতে থাকে। [১৭০]
একই গোত্রের মধ্যে বমদের বিবাহ হয় না। তাদের সমাজে যৌতুক প্রথা নাই। পুরোহিতরা সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি এবং তারা বিবাহের কাজ সম্পাদন করে। [১৭১]

বমরা মৃতদেহ কবর দেয়। বম সমাজে সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু সামাজিক রীতি-নীতি রয়েছে। মৃত্যুর পর থেকে কবরস্থ করার পূর্ব পর্যন্ত আত্মীয়রা উপবাস থাকে। [১৭২]

বমরা এখন খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করলেও খুজিং-পাথিয়ানকে তারা বিধাতা পুরুষ মানে। তারা মনে করেন বিধাতা কখনো রুষ্ট হন না, তিনি সদা কল্যাণময়ী। তাই বিধাতার উদ্দেশ্যে কোনো অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় না। যত পূজা, যজ্ঞ সবই অপদেবতার উদ্দেশ্যে করা হয়। [১৭৩]

প্রাচীনকাল থেকে বমরা বর্ষবিদায়, বর্ষবরণ ও নবান্ন উৎসব উৎযাপন করে আসছে। তারা ইংরেজি নববর্ষ উৎযাপন করছে। বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে নবান্ন উৎসব বমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বমরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে

---

[১৬৭] ড. মুস্তাফা মজিদ, 'বম জাতিসত্তা', প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩৪১।

[১৬৮] Zing Alh Bawm, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

[১৬৯] ড. মুস্তাফা মজিদ, 'বম জাতিসত্তা', প্রাগুক্ত (২০০৯), পৃষ্ঠা ঃ ৩৪০।

[১৭০] Abul Barkat,& et.al. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯-৩০।

[১৭১] Zing Alh Bawm, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০-১১।

[১৭২] জির কুং সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৪-৩৯৫।

[১৭৩] উ চ নু, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা: উপজাতীয় নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি', মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত *পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ*, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৬।

নবান্ন উৎসব পাড়া ভিত্তিক এক সাথে আয়োজন করে। জুমের ফসলাদি ঘরে এনে ভালো ফসলগুলি গির্জায় নিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করার পর সবাই মিলে এক সাথে ভাগাভাগি করে খায়। [১৭৪]

৪.৩. পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও বর্গবিভাজন

Superintendent of Hill Tribes-এর ১৮৬২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে W W Hunter পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন চীফ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত গ্রাম, পরিবার ও জনসংখ্যার উল্লেখ করেন।

সারণি ১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন সার্কেল চীফ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত গ্রাম, পরিবার ও জনসংখ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ সার্কেল প্রধান	গ্রাম	পরিবার	পুরুষ	নারী	সন্তান	মোট জনসংখ্যা
পোয়াং রাজা (বোমাং)	৫২১	১২,০৫০	১০,৯০৬	৯,৪৯৯	১৫,৬৬৮	৩৬,০৭৩
কালিন্দী রানী (চাকমা)	২৭১	৩,২১৬	৮,০৭৮	৭,৬৮১	১২,৫৮৬	২৮,৩৪৫
খিওজা সেন চৌধুরী (মং)	২৬	৪৩৬	৫০৭	৫৩৯	১, ৩১৪	২,৩৬০
মোট	৮১৮	১৫,৭০২	১৯,৪৯১	১৭,৭১৯	২৯,৫৬৮	৬৬,৭৭৮

সূত্রঃ W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* [1876: 35]

উপরের সারণিতে W W HUNTER ১৮৬২ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা মূলত Superintendent of Hill Tribes প্রদত্ত, তিন সার্কেল চীফ যথাক্রমে পোয়াং রাজা (বোমাং), কালিন্দী রানী (চাকমা), এবং খিওজা সেন চৌধুরী (মং) নিয়ন্ত্রিত গ্রাম, পরিবার ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণীত। সারণিটির সংক্ষিপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই তিনজন সার্কেল প্রধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মোট গ্রামের সংখ্যা তখন ছিল ৮১৮টি, মোট পরিবার ছিল ১৫,৭০২টি, মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৬,৭৭৮ জন, যার মধ্যে পুরুষ, নারী এবং সন্তান ছিল যথাক্রমে ১৯,৪৯১ জন, ১৭,৭১৯ জন এবং ২৯,৫৬৮ জন। লক্ষণীয় যে, তখন মং সার্কেলভুক্ত এলাকা অর্থাৎ বান্দরবানের জনসংখ্যা ছিল খুবই কম, মাত্র ২,৩৬০ জন। অবশ্য Hunter বলছেন যে, তিন সার্কেলেরই প্রদত্ত জনসংখ্যা বাস্তবিক জনসংখ্যার চেয়ে কম দেখানো হয়ে থাকতে পারে, কেননা বর্ণিত জনসংখ্যা অনুযায়ী সার্কেল চীফদেরকে খাজনা প্রদান করতে হয় এবং কম খাজনা দেওয়ার জন্য তারা জনসংখ্য কম দেখিয়ে থাকতে পারেন।[১৭৫]

W W Hunter পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজা ও সরকারী খাস এলাকানুযায়ী জাতি, জনজাতি ও বর্ণভূক্ত জনবিন্যাস প্রদান করেছেন ঃ

[১৭৪] Zing Alh Bawm, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬-১৭।

[১৭৫] ঐ।

সারণি ২ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকানুযায়ী জাতি, জনজাতি ও বর্ণের বিন্যাস

জাতিপরিচয়				মোট সংখ্যা	চাকমা চীফের এলাকা	মং রাজার এলাকা	পোয়াং রাজার এলাকা	সরকারী খাস এলাকা
১. অ-এশীয়	**ইউরোপীয়**							
	ইংরেজ			২	…	…	…	২
	আইরিশ			১	…	…	…	১
	মোট			৩	…	…	…	৩
২. মিশ্র				…	…	…	…	…
৩. এশীয়	**ভারত ও ব্রিটিশ বার্মার বহিস্থঃ জাতি**							
	গুর্খা			৫৭০				৫৭০
	ভারত এবং ব্রিটিশ বার্মার দেশজ জাতি							
	১. আদিবাসী জনজাতি (Aboriginal Tribes)		বনযোগী	৩০৫	…		৩০৫	…
			চাকমা	২৮০৯৭	২৮০৯৭		…	…
			খিয়াং	৩০৬	…		৩০৬	…
			খুমী	৫৩৪	…		৫৩৪	…
			ম্রো	২৩৭৮	…		২৩৭৮	…
			পাংখোয়া	১৭৭	৪৬	…		১৩১
			ত্রিপুরা / মুরং	৮১০০	১৫৯	৫০০১	২০৯৪	৮৪৬
			মোট	৩৯৮৯৭	২৮৩০২	৫০০১	৫৬১৭	৯৭৭
	২. হিন্দুসদৃশ আদিবাসী (Semi-Hinduised Aboriginals)			…	…	…	…	…
	৩. হিন্দু	বর্ণভিত্তিক	বর্মণ	৩	…	…	…	৩
			বৈদ্য	১০	…	…	…	১০
			কায়স্থ	২৭	…	…	…	২৭
			মোট	৪০	…	…	…	৪০
		জাতিভিত্তিক	অসমিয়া	৫৫	…	…	…	৫৫
			মনিপুরী	৪৭	…	…	…	৪৭
			মোট	১০২	…	…	…	১০২
		মোট হিন্দু		১৪২	…	…	…	১৪২
	৪. বর্ণ-অস্বীকারকারী জন্মগত হিন্দু		ভারতীয় খ্রিস্টান	১	…	১	…	…
	৫. মুসলমান		সৈয়দ	২	…	…	…	২
			শেখ	৩৭৫	২৪৭	৩৭	…	৯১
			অন্যান্য	৪	…	…	…	৪
			মোট	৩৮১	২৪৭	৩৭	…	৯৭
	৬. বার্মিজ		মগ	২২,০৬০	৭০১	২,৬৭৩	১৫,৭৯৩	২,৮৯৩
	মোট ভারতীয়			৬২,৪৮১	২৯,২৫০	৭,৭১২	২১,৪১০	৪,১০৯
	মোট এশীয়			৬৩,০৫১	২৯,২৫০	৭,৭১২	২১,৪১০	৪,৬৭৯
	সর্বমোট			**৬৩,০৫৪**	**২৯,২৫০**	**৭,৭১২**	**২১,৪১০**	**৪,৬৮২**

সূত্র ঃ W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* [1876: 34-35]

পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকানুযায়ী জাতি, জনজাতি ও বর্ণের বিন্যাস সম্পর্কিত সারণিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-এশীয় এবং এশীয় জাতিসমূহের অবস্থান উল্লিখিত হয়েছে। অ-এশীয়দের মধ্যে ইংরেজ ছিল মাত্র ২ জন,

আইরিশ ছিল ১ জন। ধারণা করা যায় যে ঐ তিন জনই ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা বা তাদের পরিবারের অংশ এবং লক্ষণীয় যে এত স্বল্প স্বদেশীয় লোকবলের উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মত বিশাল অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। এশীয় জাতিসমূহের মধ্যে গুর্খার সংখ্যা ছিল ৫৭০ জন। মোট ৮টি আদিবাসী জাতির কথা এতে উল্লিখিত হয়েছে যথা ঃ বনযোগী, চাকমা, খিয়াং, খুমী, ম্রো, পাংখোয়া, ত্রিপুরা / মুরং; তবে তখন ত্রিপুরা ও মুরং জাতিকে পৃথক জাতিসত্তায় চিহ্নিত করা হয়নি। এদের সংখ্যা ছিল মোট ৩৯,৮৯৭ জন। উপরের সারণিতে হিন্দু আদিবাসীদের দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে – একটি বর্ণভিত্তিক, অন্যটি জাতিভিত্তিক। বর্ণভিত্তিক হল বর্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ যাদের মোট সংখ্যা ছিল ৪০ জন। অন্যদিকে জাতিভিত্তিক হল অসমিয়া আর মনিপুরী যাদের মোট সংখ্যা ছিল ১০২ জন। এটা কৌতূহল উদ্দীপক যে ভারতীয় খ্রিষ্টানদের বিবরণ দেয়া হয়েছে "বর্ণ-অস্বীকারকারী জন্মগত হিন্দু" হিসেবে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ জন। মুসলমানদের মধ্যে ছিল সৈয়দ, শেখ ও অন্যান্য, এদের সংখ্যা ছিল মোট ৩৮১ জন। তখন বার্মা থেকে আগত যাদেরকে মগ বলা হত,তাদের সংখ্যা ছিল ২২,০৩০ জন। সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ৬৩,০৫৪ জন।

আদিবাসীদের পাশাপাশি বাঙালি জনগোষ্ঠীও এ অঞ্চলে বাস করে। এছাড়া খুব অল্প সংখ্যক গুর্খা, অহমিয়া, রাখাইন ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোকের বাস রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনসংখ্যা

ক্রমিক	জনগোষ্ঠী	১৮৭১	১৯০১	১৯৫১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
১.	চাকমা	২৮,০৯৭	৪৪,৩৯২	১৩৩,০৭৫	২৩০,২৭৩	২৩৯,৪১৮	-	-
২.	তঞ্চঙ্গ্যা	-	-	-	-	১৯,২১১	-	-
৩.	এারমা	২২,০৬০	৩০,৭০৬	৬৫,৮৮৯	১২২,৭৩৪	১৪২,৩৩৪	-	-
৪.	ত্রিপুরা	৮,১০০	২৩,৩৪১	৩৭.২৪৬	৫৪,৩৭৯	৬১,১২৯	-	-
৫.	ম্রো	২,৩৭৮	১০,৫৪০	১৬,১২১	১৭,৮১১	২২, ১৬১	-	-
৬.	বম	৩০৫	৬৯৬	৯৭৭	৫,৭৩৩	৬,৯৭৮	-	-
৭.	খিয়াং	৩০৬	১,৪২৭	১,৩০০	৫,৪৫৩	১,৯৫০	-	-
৮.	পাংখোয়া	১৭৭	২৪১	৬২৭	২,২৭৮	৩,২২৭	-	-
৯.	খুমী	৫৩৪	১,০৫৩	১, ৯৪১	১,১৮৮	১,২৪১	-	-
১০.	লুসাই	-	৬৭৮	৩, ৩৪১	১,০৪১	৬৬২	-	-
১১	চাক	-	-	-	৯১০	২,০০০	-	-
১২	অন্যান্য	-	-	-	-	৮২৮	-	-
মোট		৬১,৯৫৭	১১৩,০৭৪	২৬০,৫১৭	৪৪১,৮০০	৫০১,১৩৯	৭,৩৬,৬৮২	৮,৪৫,৫৪১

উৎস ঃ মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ২০৩।

বিভিন্ন সালের আদমশুমারি রিপোর্টের ভিত্তিতে উপরের সারণিটি প্রণীত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী খিয়াংদের জনসংখ্যা ছিল ৫,৪৫৩ জন কিন্তু ১৯৯১ সালের শুমারি অনুযায়ী ১,৯৫০ জন। ১৯৮১ সালের তুলনায় ১৯৯১ সালের সংখ্যা কমে যাবার কারণ হিসেবে খিয়াং নেতৃবৃন্দ শুমারিতে গণনার ভুলকে দায়ী করেন। খিয়াংদের ২০০৩ সালের নিজস্ব জরিপ অনুসারে জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩,৬০০ জন এবং পরিবারের সংখ্যা ৭০০-এর অধিক।[১৭৬] এক যুগ পরে, ২০১৫-তে, জাতীয় পরিবৃদ্ধির গড় (২০১৪ সালে ১.৬) অনুপাতে এই সংখ্যা বেড়েছে বলে ধারণা করা যায়। এছাড়া, উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১ সালের আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনসংখ্যার জাতিভিত্তিক বিভাজন দেওয়া হয়নি। এমনকি রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির আদমশুমারিতে "ট্রাইবাল" জনসংখ্যা উল্লেখ থাকলেও বান্দরবানের ক্ষেত্রে তাও করা হয়নি। তবে ধর্মীয় যে শুমারি দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে আদিবাসী জনসংখ্যা গণনা করা হয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনসংখ্যার কেবল কয়েকটি জাতির জনসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে, অন্যদেরটি হয়নি এবং তাও সাযুজ্যপূর্ণভাবে নয়। যেমন রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে চাকমাদের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে, বান্দরবানের ক্ষেত্রে তা হয়নি।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা ১৫,০৮,০১৬ জন। তাদের মধ্যে শতকরা ৫২.৯০ জন আদিবাসী। সর্বশেষ এই আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ও পরিজন সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

সারণি ৪ : পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ও পরিজন সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য

বিষয়	বাংলাদেশ	রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবান
	২০১১	২০১১	২০১১	২০১১
জনসংখ্যা (গণনাকৃত)				
পুরুষ-মহিলা একত্রে	১৪,৪০,৪৩,৬৯৭	৫,৯৫,৯৭৯	৬,১৩,৯১৭	২,৯৮,১২০
পুরুষ	৭,২১,০৯,৭৯৬	৩,১৩,০৭৬	৩,১৩,৭৯৩	১,৬২,১৩৩
মহিলা	৭,১৯,৩৩,৯০১	২,৮২,৯০৩	৩,০০,১২৪	১,৩৫,৯৮৭
শহুরে	২,৭৪,৬৮,৭৮৯	৯৭,৮০৭	৯৬,০৪৫	৩২,১৫১
অন্যান্য-শহুরে	৬০,৯৪,৩৯৪	৬১,৮২০	১,১৯,৭৬৩	৬০,৬১৫
গ্রামীণ	১১,০৪,৮০,৫১৪	৪,৩৬,৩৫২	৩,৯৮,১০৯	২,০৫,৩৫৪
বার্ষিক জন্মবৃদ্ধি হার	১.৪৭	১.৫৮	১.৫৪	২.৬০
লিঙ্গানুপাত				
মোট	১০০	১১১	১০৫	১১৯
শহুরে	১১০	১১৫	১১২	১৫৮
অন্যান্য-শহুরে	১০৫	১১৯	১০৫	১২৫
গ্রামীণ	৯৮	১০৯	১০৩	১১৩

[১৭৬] মং শৈ প্রু খিয়াং-এর সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩।

খানা				
মোট	৩,২১,৭৩,৬৩০	১,২৮,৪৯৬	১,৩৩,৭৯২	৬০,১৪১
শহুরে	৬১,৩৩,০১২	২১,১২৯	২০,৪৩১	৬,৩৯২
অন্যান্য-শহুরে	১৩,৬৯,০২৮	১৩,৪৭৩	২৫,৮৩৯	১২,১৯৮
গ্রামীণ	২,৪৬,৭১,৫৯০	৯৩,৮৯৪	৮৭,৫২২	
খানার গড় আকার				
মোট	৪.৪৪	৪.৫৬	৪.৫৩	
শহুরে	৪.৩৬	৪.৪৯	৪.৫৩	
অন্যান্য-শহুরে	৪.৪২	৪.৪৪	৪.৫৭	৪.৯১
গ্রামীণ	৪.৪৬	৪.৬০	৪.৫২	৪.৯৩
সীমানা (বর্গকিমি)	১৪৭৫৬৯.০৬	৬১১৬.১১	২৭৪৯.১৬	
সীমানা (বর্গমাইল)	৫৬৯৭৬.০০	২৩৬১.০০	১০৬১.০০	
ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)	৯৭৬	৯৭	২২৩	
ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)	২৫২৮	২৫২	৫৭৮	
নগরায়ন (%)	২৩.৩০	২৬.৭৮	৩৫.১৫	৩১.১২
সাক্ষরতা (%)				
উভয়-লিঙ্গ	৫১.৮	৪৯.৭	৪৬.১	৩১.৭
পুরুষ	৫৪.১	৫৬.৪	৫১.৯	৩৮.২
মহিলা	৪৯.৪	৪২.৩	৪০.১	২৩.৭
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি (৫ থেকে ২৪ বছর) %				
উভয়-লিঙ্গ	৫২.৭	৫২.৩	৫৩.৯	৩২.৪
পুরুষ	৫৪.৬	৫৪.০	৫৫.৬	৩৫.০
মহিলা	৫০.৮	৫০.৫	৫২.১	২৯.৫
Adjusted জনসংখ্যা				
উভয়-লিঙ্গ	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪	৬,২০,২১৪	৬,৩৮,৯৬৭	
পুরুষ	৭,৪৯,৮০,৩৮৬	৩,২৫,৮২৩	৩,২৬,৬২১	
মহিলা	৭,৪৭,৯১,৯৭৮	২,৯৪,৩৯১	৩,১২,৩৪৬	
ভৌগোলিক একক				
উপজেলা /থানা	৫৪৫	১০	৮	৭
ইউনিয়ন	৪,৫৬২	৪৯	৩৮	২৯
মৌজা	৫৪,৩২৭	১৬২	১২০	৯৭
গ্রাম	৮৭,১৯১	১,৫৫৫	১,৭০২	১,৫০১
সিটি কর্পোরেশন	৬	০	০	০
শহরের ওয়ার্ড	২৮৩	০	০	০
শহরের মহল্লা	১,৯০৯	০	০	০
পৌরসভা	৩১০	২	৩	১
পৌর ওয়ার্ড	২,৯১৪	১৮	২৭	৯
পৌর মহল্লা	৮,৬৬৭	৯০	১৫৪	৬১

সূত্রঃ Population Census 2011, Community Series, Zila : Rangamati, Khagrachhari and Bandarban [2012 :

উপরে উল্লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ও পরিজন সম্পর্কিত সারণিটির সংক্ষিপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা (নারী ও পুরুষ একত্রে) ১৪,৪০,৪৩,৬৯৭ জন। এর মধ্যে তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের মোট জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫,৯৫,৯৭৯; ৬,১৩,৯১৭ এবং ২,৯৮,১২০ জন।

দেশের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৭। এর মধ্যে তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১.৫৮, ১.৫৪ এবং ২.৬০। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের মোট বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে তিন জেলায় এই হার যথাক্রমে ০.১১, ০.৭ এবং ১.১৩ শতাংশ বেশি। এর সহজবোধ্য কারণ ঐ অঞ্চলে অব্যাহতভাবে বাঙালিদের অনুপ্রবেশ এবং বসতি স্থাপন।

দেশের মোট পুরুষের সংখ্যা ৭,২১,০৯,৭৯৬ জন এবং নারীর সংখ্যা ৭,১৯,৩৩,৯০১ জন। এর মধ্যে তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৩,১৩,০৭৬; ৩,১৩,৭৯৩ ও ১,৬২,১৩৩ জন এবং নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,৮২,৯০৩; ৩,০০,১২৪ এবং ১,৩৫,৯৮৭ জন। দেশে মোট খানার সংখ্যা ৩,২১,৭৩,৬৩০ টি যার মধ্যে তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে মোট খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১,২৮,৪৯৬; ১,৩৩,৭৯২ এবং ৬০,১৪১ টি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ ভৌগোলিক গঠন এবং Subsistence Economy-ভিত্তিক প্রান্তিক জীবনধারা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের খানা-সংখ্যাকে বোঝা যেতে পারে। দেশে মোট খানার গড় আকার ৪.৪৪ জন। যার মধ্যে রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িতে মোট খানার গড় যথাক্রমে ৪.৫৬, ৪.৫৩ জন এবং বান্দরবানের তথ্য উল্লিখিত হয়নি।

দেশের নগরায়নের হার ২৩.৩০। যার মধ্যে তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে নগরায়নের হার যথাক্রমে ২৬.৭৮, ৩৫.১৫ এবং ৩১.১২। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই নগরায়ন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ব্যাপকহারে বাঙালিদের অনুপ্রবেশ।

দেশের নারী ও পুরুষের মোট সাক্ষরতার হার ৫১.৮। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৪৯.৭, ৪৬.১ এবং ৩১.৭। দেশের গড় সাক্ষরতার হার থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাক্ষরতার হার কম হওয়ার কারণ একটি কারণ হতে পারে তাদেরকে সরকারী পর্যায়ে কম গুরুত্ব দেয়া ও অবহেলা করা। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকাও তাদের সাক্ষরতার হার কম হওয়ার একটি বিশেষ কারণ হতে পারে।।

দেশের নারী ও পুরুষের মোট বিদ্যালয়ে উপস্থিতির (৫ থেকে ২৪ বছর) হার ৫২.৭। যার মধ্যে তিন জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে এই হার যথাক্রমে ৫২.৩, ৫৩.৯ এবং ৩২.৪। এটিরও অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব এবং তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষাকে গুরুত্ব না দেয়া। এছাড়া

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকাও তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম হওয়ার একটি বিশেষ কারণ হতে পারে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার বড় দুটি কারণ হলো দারিদ্র ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অনুপস্থিতি।[১৭৭]

৪.৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি

১৭৬০ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা স্থিতিশীল ছিল। ১৭৬০ সালে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা আনুমানিক ১,০০,০০০ জন ছিল। ১৮৯২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১,০৭,২৮৬ জন।[১৭৮] W W HUNTER-এর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৩,০৪৫ জন। এর মধ্যে হিন্দু ১৪২ জন বা শতকরা ০.২২, মুসলমান ৩৮১ জন বা শতকরা ০.৬৬ এবং খ্রিষ্টান মাত্র ৪ জন। অবশিষ্ট ৬২,৫২৭ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯৯.৭৮ ভাগ বিভিন্ন জাতির আদিবাসী জনগণ।[১৭৯]

সারণি ৫ : আদমশুমারি-ভিত্তিক পাহাড়ি ও বাঙালি জনসংখ্যা ও হার [১৮০]

সাল	আদিবাসী জনগোষ্ঠী		বাঙালি জনগোষ্ঠী		মোট	উৎস
	জনসংখ্যা	%	জনসংখ্যা	%		
১৮৭১	-	-	-	-	৬৩,০৪৫	
১৮৮১	-	-	-	-	১,০১,৫৯৭	
১৮৯১	-	-	-	-	১,০৭,২৮৬	
১৯০১	-	-	-	-	১,২৪,৭৬২	
১৯১১	-	-	-	-	১,৫৩,৮৩০	
১৯২১	-	-	-	-	১,৭৩,২৪৩	
১৯৩১	-	-	-	-	২,১২,৯২২	
১৯৪১	২,৩৯,৭৮৩	৯৭.০৬	৭,২৭০	২.৯৪	২,৪৭,০৫৩	আদমশুমারি ১৯৪১
১৯৫১	২,৬৯,১৭৭	৯৩.৭১	১৮,০৭০	৬.২৯	২,৮৭,২৪৭	আদমশুমারি ১৯৫১
১৯৬১	৩,৩৯,৭৫৭	৮৮.২৩	৪৫,৩২২	১১.৭৭	৩,৮৫,৬৭৯	আদমশুমারি ১৯৬১
১৯৭০	-	-	৬৬,০০০	-	-	জনসংহতি সমিতি

[১৭৭] মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Mesbah Kamal, Jens Stratmanns, Monis Rafiq and Shah Shamim Ahmed, Mapping of Multilingual Education Programs in Bangladesh, UNESCO Dhaka, Dhaka, 2014.

[১৭৮] শ্রীজগদীশ, 'অনুপ্রবেশ', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বুলেটিন নং-২৭, ৫ বর্ষ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

[১৭৯] WW Hunter, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

[১৮০] পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ওয়েবসাইটে উল্লিখিত হয়েছে, দেখুন http://www.pcjss-cht.org/population-in-cht/

১৯৭৪	৩,৯২,১৯৯	৭৭.১৭	১,১৬,০০০	২২.৮৩	৫,০৮,১৯৯	জনসংহতি সমিতি
১৯৮১	৪,৪১,৭৪৪	৫৮.৭৭	৩,১৩,১৮৮	৪১.৪৮	৭,৫৪,৯৬২	আদমশুমারি ১৯৮১
১৯৯১	৫,০১,১৪৪	৫১.৪০	৪,৭৩,৩০১	৪৮.৬০	৯,৭৪,৪৪৫	আদমশুমারি ১৯৯১
২০০১	৭,৩৬,৬৮২	৫৪.৮৬	৬,০৬,০৫৮	৪৫.১৩	১৩,৪২,৭৪০	আদমশুমারি ২০০১
২০১১	৮,৪৫,৫৪১	৫২.৯০	৭,৫২,৬৯০	৪৭.১০	১৫,৯৮,২৩১	আদমশুমারি ২০১১

সূত্রঃ http://www.pcjss-cht.org/population-in-cht/

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রায় শতভাগের কাছাকাছি ছিল অবাঙালি ও অমুসলিম। কিন্তু ধীরে ধীরে বাঙালিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪৭ সালে বাঙালিদের হার ছিল ৩ শতাংশ, ১৯৫১ সালে ৭ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ১২ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ২৩ শতাংশ, ১৯৮১ সালে ৪১ শতাংশ এবং ১৯৯১ সালে ৪৮ শতাংশ।[১৮১] তবে ২০০১ সালের আদমশুমারিতে বাঙালিদের সংখ্যা ১৯৯১ সালের তুলনায় কমে প্রায় ৪৫ শতাংশ হয়েছে।[১৮২]

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য

৫.১. প্রশাসনিক কাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন ধরনের শাসন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। যথা সরকারের ঢাকা ভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা, ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে প্রণীত ১৯৮৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পাহাড়িদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা, এবং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অনুযায়ী পাহাড়িদের প্রথাগত ও ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত। বাংলাদেশ সরকারের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি হলো জেলা প্রশাসক। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ, পাহাড়ি জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ।[১৮৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন ধরনের প্রশাসনিক সার্কেল রয়েছে। এগুলো হলো চাকমা, মং এবং বোমাং সার্কেল। প্রত্যেক সার্কেল প্রধান 'রাজা' বা 'চীফ' নামে পরিচিত। মং চীফের প্রশাসনিক এলাকা খাগড়াছড়ি জেলা, চাকমা চীফের রাঙ্গামাটি এবং বোমাং চীফের বান্দরবান জেলা। সার্কেল চীফরা পাহাড়ি জেলা পরিষদের সদস্য এবং তারা সরকারের

---

[১৮১] শ্রীজগদীশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

[১৮২] হিরন মিত্র চাকমা ও মংসিংঞো মারমা, 'পটভূমিকা : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত '*বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*', প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

[১৮৩] http://www.mochta.gov.bd/index.php/index/othercontent/CHT-institutions_15/13/0/12

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। সার্কেল চীফের সুপারিশে ডেপুটি কমিশনার হেডম্যান নিয়োগ করেন এবং চীফ কার্বারী নিয়োগ করেন। মৌজার দায়িত্বে থাকেন হেডম্যান এবং গ্রাম বা পাড়ার দায়িত্বে থাকেন কার্বারী। সমাজের দায়িত্ববান শিক্ষিত ব্যক্তিদের হেডম্যান ও কার্বারী করা হয়। হেডম্যান এবং কার্বারী নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আইন বাস্তবায়ন, খাজনা আদায় ও ভূমি ব্যবহার নিবন্ধনের দায়িত্ব পালন করেন। [১৮৪]

সারণি ৬ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক বিভাজন [১৮৫]

জেলা	সীমানা (বর্গ কিলোমিটার)	উপজেলা	পুলিশ স্টেশন	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	মৌজা	পৌরসভা
রাঙ্গামাটি	৬,১১৬.১৩	১০	১১	৪৮/৯	১৯৬	০২
খাগড়াছড়ি	২,৬৯৯.৫৫	০৮	০৯	৩৪/৯	১৪৫	০৩
বান্দরবান	৪,৪৭৯.০৩	০৭	০৭	২৯/৯	১৪১	০১

সূত্র: মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক বিভাজন সম্পর্কিত সারণিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের যে তিনটি জেলা যথা ঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান, এদের মধ্যে রাঙ্গামাটির সীমানা সবচেয়ে বেশি যথা ৬,১১৬.১৩ বর্গকিলোমিটার অন্যদিকে খাগড়াছড়ির সীমানা সবচেয়ে কম যথা ২,৬৯৯.৫৫ বর্গকিলোমিটার ।

৫.২. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সুদূর অতীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে ত্রিপুরা রাজা ও আরাকান রাজার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফল হিসেবে এই অঞ্চলের অবস্থান একাধিকবার এই দুই রাজ্যের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জুবা রূপা আরাকান রাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচলিত বর্ণনানুসারে, ত্রিপুরার রাজা উদয়গিরি কিলাই ও মংলাই নামে দুই ভাইকে দায়িত্ব দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করেন। আরাকান রাজা সুলা সান্দ্র ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় পার্বত্য অঞ্চল দখল করেন। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলটি আবারও ত্রিপুরা রাজার হস্তগত হয়। [১৮৬]

---

[১৮৪] http://www.mochta.gov.bd/index.php/index/othercontent/CHT-institutions_15/13/0/12

[১৮৫] Population Census – 2001, Community Series, Zila : Rangamati, Khagrachhari and Bandarban, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2005.

[১৮৬] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৫।

৫.২.১. সুলতানী শাসনামল

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাচীন বা মধ্যযুগে বাংলা বা বাংলাদেশের শাসনাধীনে ছিল না। স্মরণাতীত কাল থেকে আদিবাসী বিভিন্ন জাতির মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনভাবে বসবাস করতেন। সুয়া মংঝি ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান দখল করে মং রাজা সোমওয়ানকে বিতাড়িত করলে তিনি গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সাহায্য কামনা করেন। সুলতান রাজা মং সোমওয়ানকে সাহায্য করার জন্য চট্টগ্রামে নিযুক্ত সেনাপতি ওয়ালী খানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু সেনাপতি ওয়ালী খান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান তাকে হত্যা করে আরাকান দখল করেন এবং মং সোমওয়ানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। মং সোমওয়ানের উত্তরসূরি মং খা রী ১৪৩৪-৩৯ সাল পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রামু ও টেকনাফ হতে চাকমাদের বিতাড়িত করে দিল্লির সুলতানের নিকট থেকে হারানো ভূমি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। উল্লেখ্য, ১৪১৮ সালে চাকমা রাজা মোয়ান শ্নি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর কারণে ব্রহ্মদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আলী কদমে একজন মুসলিম রাজকর্মচারীর নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই রাজকর্মচারী রামু ও টেকনাফে চাকমাদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে পুনরায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯) স্বল্প সময়ের জন্য এই অঞ্চল আরাকান রাজার দখলে' ছিল। ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্য ১৫১৫ সালে চট্টগ্রাম ও আরাকানের কিছু অংশ দখল করেন। আবার ১৫১৮ সালে আরাকানের মগ রাজা মিনইয়াজা এই অঞ্চলের কিছু অংশ নিজের দখলে নেন। দখল ও পাল্টা দখলের শেষ পর্যায়ে আরাকান রাজা মং ফালাউন ওরফে সিকান্দার শাহ সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল, নোয়াখালীর বেশিরভাগ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ দখল করেন।[১৮৭]

রামু ও টেকনাফ এলাকায়; এবং ওখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন আদিবাসী কুকিরা। তারসাথে ও পরে চাকমা, মারমা (মগ) ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এসে বসতি গড়ে তোলেন।[১৮৮] যদিও এ তথ্য নিয়ে যথেষ্ঠ মতপার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ ১৪৩৩ খ্রিঃ চাকমারা উত্তর আরাকান থেকে বর্মিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বর্তমান আরাকান সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের মাতামুহুরী উপত্যকাভুক্ত আলীকদমে আশ্রয় নেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন চাকমা লোকগীতে, যেমন–

ঘরত গেলে মগে পায়।
ঝারত গেলে বাঘে খায় ॥
বাঘে ন খেলে মগে পায়।
মগে ন পেলে বাঘে খায় ॥
যেই যেই বাপ-ভেই চল যেই।

---

[১৮৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৫-২৬।

[১৮৮] হুমায়ুন আজাদ, *পার্বত্য চটগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝর্ণাধারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩০।

চম্পক নগর ফিরি যেই ॥

এলে মইস্যাং লালস নেই।

ন-এলে মইস্যাং কেলেশ নেই ॥

যেই যেই বাপ-ভেই চল যেই।

চম্পকনগর ফিরি যেই ॥ [১৮৯]

৫.২.২ মোগল শাসনামল

শের শাহের সময়ে পর্তুগীজ নাবিকরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে দিয়াংগা এবং আরাকান উপকূলে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। এ সকল পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা দস্যু প্রকৃতির ছিল। তাদের সাথে আরাকান সরকারের প্রায়ই দ্বন্দ্ব হতে থাকে। তারা চট্টগ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠী মগ্‌দের সহায়তায় সমতল এলাকায় দস্যুবৃত্তি করতো। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মোগল প্রশাসন তাদেরকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ ও আরাকান রাজের দ্বন্দ্বের সুযোগে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করেন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মুগলদের অধিকারে থাকে। [১৯০] এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনভার দেওয়া হয় বাঙলার শাসকের উপর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বাধীন অস্তিত্বের উপর সর্বপ্রথম আঘাত আসে মোঘল শাসক আওরঙ্গজেবের পক্ষ থেকে। পাহাড়ি জনগণ মোঘলদের ঐ আক্রমণ সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রথম বিদ্রোহ। শেষাবধি তারা দিল্লিকে কর দিতে রাজি হলে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায়ের চুক্তিতে মোঘলরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায় এবং এর বিনিময়ে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী নিজেদের ভৌগোলিক এলাকা, স্বায়ত্তশাসন ও গোত্রীয় সত্তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। মোঘলরা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায়ের মধ্যে তাদের শাসন সীমাবদ্ধ রেখেছে, আদিবাসীদের স্বশাসন ব্যবস্থা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর মোটেই হস্তক্ষেপ করেনি। [১৯১]

৫.২.৩. ব্রিটিশ শাসনামল

১৭৬০ সালে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য অংশও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। মীর কাশেম খাঁর কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনের ভার নেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। চাকমারা (এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী) এটা মেনে নেয়নি। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে যা ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত

---

[১৮৯] ড. বিভূতি ভূষণ সরকার, *উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষি*, উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

[১৯০] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬।

[১৯১] হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৭।

অর্থাৎ দীর্ঘ ২৫ বছর চলে। ১৭৭৭ সালে কুকিরাও ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। [১৯২] ইংরেজরা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন এ অঞ্চলকে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত জেলা হিসেবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় ফলে সেখানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর হাতে। অন্যদিকে ইংরেজ শাসক নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকা থেকে কর আদায়ের মধ্যে তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ রাখে। স্বাধীন পাহাড়ি গোত্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং অধীন গোত্রগুলোকে নিরাপত্তা প্রদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬০ সালে একটি আইন প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের নিয়ন্ত্রিত জেলার মর্যাদা পরিবর্তন করে একজন অফিসারকে 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ হিল ট্র্যাক্টস' উপাধি দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্টের অধীনস্থ এলাকাকে এসময় 'হিল ট্র্যাক্টস অফ চিটাগং' অর্থাৎ 'চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা' অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের বাঙলা বা বেঙ্গল নামক প্রদেশের একটি জেলায় পরিণত হয়। [১৯৩]

১৮৬০ সালের নতুন আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কয়েক বছর পর ১৮৬৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। প্রথম প্রশাসক নিযুক্ত হোন কর্নেল টি.এইচ.লুইন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রায় উপাধি গ্রহণ করে ১৮৭৪ সালে হরিশ চন্দ্র রাজা হিসেবে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ব্রিটিশ শাসন আসারও দুইশত বৎসর আগে থেকে পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষত চাকমা প্রধান অঞ্চলে গ্রাম প্রধানকে 'কার্বারী' নামে অভিহিত করা হতো। ব্রিটিশ শাসন আসার পর একাধিক গ্রাম নিয়ে বিভিন্ন আয়তনের মৌজা সৃষ্টি করা হয়। মৌজাগুলোকে মূলত ভূমি-প্রশাসন, ভূমি-কর প্রশাসন এবং সামাজিক প্রশাসনের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। মৌজা প্রধানকে 'হেডম্যান' নামে আখ্যায়িত করা হয়। হেডম্যানের সুপারিশে রাজা কার্বারী মনোনয়ন করেন এবং রাজার সুপারিশে জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিযুক্ত করেন। তবে জেলা প্রশাসক রাজার সুপারিশ মানতে বাধ্য ছিলেন না। কোনো একজন রাজা নিজেও এক বা একাধিক মৌজার হেডম্যান নিযুক্ত হতে পারেন। রাজা নিযুক্তি বংশানুক্রমিক এবং কার্বারী ও হেডম্যান সুপারিশক্রমে মনোনীত। প্রশাসনের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর থাকলেও মাঝে মাঝে রাজাদের পরামর্শ গ্রহণ ও মূল্যায়ন করা হত। হেডম্যান এবং কার্বারী গ্রামে বা মৌজায় ছোটখাট অপরাধ ও সামাজিক দ্বন্দ্বের বিচার করতেন। বিচার ও সাজা অদিবাসী প্রথা এবং নিয়ম মেনে পরিচালিত হতো। ১৮৬৭ সালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদটি ডেপুটি কমিশনার পদে উন্নীত করা হলে পার্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারের উপর অর্পিত হয়। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি মহকুমায় বিভক্ত করে ডেপুটি কমিশনারের অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা করা হতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শান্তিশৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে আরও জোরদার করার

---

[১৯২] ঐ।

[১৯৩] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-২৭।

উদ্দেশ্যে ১৮৮১ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত পুলিশ রেগুলেশন অ্যাক্ট-এর অধীনে আদিবাসী সদস্যদের নিয়ে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই বাহিনীর কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। [১৯৪]

৫.২.৪. ১৯০০ সালের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি'

পার্বত্য চট্টগ্রাম রিগুলেশন ১৯০০ নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এ আইনটি এমন এক বিশেষ ধরনের আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে আইনগুলো ব্রিটিশ রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অংশগুলোর জন্য প্রযোজ্য ছিল। [১৯৫] এ আইনের মধ্যে এতদ অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থা, ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাসহ সাধারণ নীতি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, কার্যাবলী, দায়-দায়িত্ব বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নের বিধান। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে চারটি অংশ রয়েছে। *প্রথম অংশে* ২১টি ধারা বিধৃত করা হয়েছে, যেগুলোকে রেগুলেশনের কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ধারাগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আইন-আদালত এবং এ রেগুলেশনকে কার্যকর করার বিধিমালা তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। *দ্বিতীয় অংশে* বর্ণিত হয়েছে কতিপয় আইন সংবলিত ১টি তফসিল। উল্লিখিত আইনগুলোর কতখানি এবং কি প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায়োগিক বলে গন্য হবে তার বিবরণ তফসিলে দেখানো আছে। অর্থাৎ তফসিলের আইনগুলো এ অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গভাবে নাকি আংশিকভাবে নাকি শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে তার উল্লেখ এ অংশে পাওয়া যায়। *তৃতীয় অংশে* রয়েছে রেগুলেশনের ১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রণীত ৫৪টি বিধি। এই বিধিগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল কিছু বিষয় যেমন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সুদের পরিমাণ নির্ধারণ, ভূমি প্রশাসন, প্রধানদের অভিষেকসহ মনোনয়ন ও অপসারণ পদ্ধতি, জুম পদ্ধতি, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মকানুন। এবং *চতুর্থ* এবং *শেষ অংশে* উল্লিখিত হয়েছে সংরক্ষিত বন এলাকাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা। [১৯৬]

পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এর কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা এর আইনগত মর্যাদাকে নির্দেশ করে। বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ ঃ

অ. রেগুলেশনে সরকারি কর্তৃত্ব এবং প্রথাগত আইনের স্বীকৃতি একই সাথে কার্যকর ঃ উপনিবেশ শাসনামলে একই ধরনের যে বিশেষ রেগুলেশনগুলো ছিল প্রায়োগিক অঞ্চলগুলোতে তার কার্যকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ প্রণীত হয়েছে। এ রেগুলেশনে এতদাঞ্চলের সাধারণ, বিচারিক ও ভূমি প্রশাসন পদ্ধতি, বিধিমালা প্রণয়নের বিধানের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের এবং ঐতিহ্যগত পদধারী প্রধান ও হেডম্যানদের

---

[১৯৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭, ২৮।

[১৯৫] Raja Devasish Roy & Pratikar Chakma, *The Chittagong Hill Traccts Regulation, 1900*, Association for Land Reform and Land Development (ALRD), 2010, Dhaka, পৃষ্ঠা ঃ ১৭।

[১৯৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬।

প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ প্রণালী বিধৃত রয়েছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং মায়ানমারে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। ১৯০০ সালের রেগুলেশনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কতিপয় অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আবার কোনো কোনো আইনে সরকারের উপর সর্বময় ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে আদিবাসীদের কিছু অধিকারকে সীমাবদ্ধও করা হয়েছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এ বিধান রাখা হয়েছে যে, যদি ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সাথে ১৯৮৯ সালের পাহাড়ি জেলা পরিষদ আইনের বিধানের কোনো সাংঘর্ষিকতা পরিলক্ষিত হয় তবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার রেগুলেশন সংশোধন করতে পারে। এ ধরনের সংশোধনের উদাহরণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধন) আইন, ২০০৩, যার মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনার ও বিভাগীয় কমিশনারের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

আ. রেগুলেশনের ভূমিকা সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে ঃ রেগুলেশনে একদিকে যেমন পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি, বিচার ও রাজস্ব প্রশাসনসহ সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে তেমনি ডেপুটি কমিশনার, সার্কেল চীফ এবং হেডম্যানদের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বও এতে বিধৃত আছে। রেগুলেশন এতদাঞ্চলে বলবৎকৃত অন্যান্য আইনের কার্যকর প্রণালী ও পর্যায় নির্ধারণ করে। এ প্রক্রিয়ায় কতিপয় আইন এ অঞ্চলে কেবলমাত্র ততটুকু প্রয়োগ হয় যতটুকু পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রেগুলেশনের এরূপ ভূমিকা আইনগত দলিল হিসেবে সংবিধানের অনুরূপ। রেগুলেশনের এই সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্য ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'উপজাতী এলাকা'র (Indigenous Area) মর্যাদা হারানোর সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে প্রচলিত পার্বত্য জেলা কাউন্সিল আইন এবং ১৯৯৮ সালের আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হওয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ।

ই. পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন প্রথাগত আইন এবং সহজ আদালত পদ্ধতির সমন্বয় ঃ এ রেগুলেশন পার্বত্য অঞ্চলের প্রথাগত আইনের চর্চাকে অধিকতর স্পষ্ট করেছে। এটি বলা হয়েছে যে, প্রথাগত অধিকার এবং সুবিধাদি চিহ্নিত, সংজ্ঞায়িত বা ঘোষণা করার জন্য এ রেগুলেশন প্রণীত হয়নি। বরং বিদ্যমান অধিকারগুলোকে সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করাই এ রেগুলেশনের উদ্দেশ্য। এ রেগুলেশন বিধিবদ্ধ এবং প্রথাগত আইনের সাহায্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ রেগুলেশনের মাধ্যমে জটিল দেওয়ানী কার্যবিধির পরিবর্তে সহজ প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা দেওয়ানী বিচার পরিচালনার বিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধন) আইন, ২০০৩ এ উল্লিখিত কতিপয় দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তির এখতিয়ার জেলা জজের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে, যে মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে জেলা জজ তিন পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট আইন, প্রথা এবং রীতিনীতি অনুসরণ করেন।

ঈ. ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রেগুলেশন বাতিলকরণ আইন প্রবর্তন করা হয় ঃ ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার ডিসট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল প্রবর্তনের মাধ্যমে রেগুলেশন বাতিল করে। তবে এ আইন কখনই কার্যকরী হয়নি।

বরং ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে বিধান রাখা হয়েছে যে, যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি দেখা দেয় তবে আঞ্চলিক পরিষদ এ অসঙ্গতি দূরীকরণের বিষয়ে সরকারকে উপদেশ প্রদান করবে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এ এতদাঞ্চলের বিচারিক ক্ষমতা সিভিল প্রশাসন কর্মকর্তার নিকট থেকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের (জজ) হাতে ন্যস্ত করার মধ্য দিয়ে এ রেগুলেশন বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও রেগুলেশন বিলুপ্ত হয়নি। কারণ এ আইনে সার্কেল প্রধান ও হেডম্যানদের ঐতিহ্যগত বিচার প্রশাসনের এখতিয়ার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পারিবারিক আইন এবং প্রথাগত আইন দ্বারা নিষ্পত্তিযোগ্য সংক্ষুব্ধতা থেকে উদ্ভূত বিচার করার এখতিয়ার সার্কেল চীফ এবং হেডম্যানদের উপর ন্যস্ত। এর বাইরের এখতিয়ার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপর বর্তালেও এ ক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে যে, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ তিন জেলার আইন, প্রথা এবং রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের বিচার নিষ্পত্তি করবেন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০ বাতিল সংক্রান্ত রাজনৈতিক ইস্যুর অস্তিত্ব আছে বলা যায় না।

উ. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী রেগুলেশন একটি বিদ্যমান এবং বৈধ আইন ঃ 'রাঙ্গামাটি ফুড প্রডাক্টস বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস এন্ড আদারস' মামলার আলোচনায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনকে মৃত আইন বলে উল্লেখ করে। যদিও ২০০৫ সালের অপর একটি মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের একটি রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ কে সম্পূর্ণভাবে বৈধ আইন বলে উল্লেখ করা হয়। 'রাঙ্গামাটি ফুড প্রডাক্টস বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস এন্ড আদারস' মামলায় রেগুলেশনকে মৃত বলার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপমন্ত্রী, আঞ্চলিক পরিষদ, সার্কেল প্রধান এবং হেডম্যানদের তৎপর উদ্যোগ সরকারকে রেগুলেশনের বৈধতা বোঝাতে সক্ষম হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার আপীল দায়ের করে। আপীল বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ ফুড প্রডাক্টস বনাম কমিশনার অফ কাস্টমস এন্ড আদারস সহ আরও তিনটি আপীলের রায়ে আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উল্লিখিত মৃত আইন মর্মে রেগুলেশনের মর্যাদাকে স্থগিত করেন। এ প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ আজও এ অঞ্চলের বৈধ আইন হিসেবে কার্যকর রয়েছে।

ঊ. পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কতিপয় অধিকার আন্তর্জাতিক মানের আদিবাসী অধিকার বিশেষত ঃ আদিবাসী এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত আই এল ও কনভেনশন, ১৯৫৭, আদিবাসী এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত আই এল ও কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং১৬৭), এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণায় উল্লিখিত অধিকারসমূহের সাদৃশ্যকে নির্দেশ করে। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ সালে প্রণীত এবং আন্তর্জাতিক অধিকার সম্বলিত কনভেনশন ও ঘোষণার বহু পূর্বে কার্যকরী হয়েছে। [১৯৭]

[১৯৭] Raja Devasish Roy & et.al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬-২৩।

৫.২.৫. ভারত শাসন আইন, ১৯১৯

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভিন্ন অংশ হিসেবে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং স্বশাসিত সংগঠনগুলোর ক্রমাগত অগ্রগতি নিশ্চিত করা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘোষিত নীতি। এই নীতির উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ (Government of India Act 1919) প্রণয়ন করে। এই আইনের ১৫(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, "The Governor-General in council may declareany territory in British India to be a 'backward tract', and may, by notification, with such sanction as aforesaid, direct that the principal Act and this Act shall apply to that territory subject to such exceptions and modifications as may be prescribed in the notification. Where the Governor-General in council has, by nitification, directed as aforesaid, he may, by the same or subsequent notification, direct that any Actof the Indian Lesislature shall not apply to the territory in question or any part thereof, or shall apply to the territory or any part thereof subject to such exceptions or modifications as the Governor-General thinks fit, or may authorize the governor in council to give similar directions as respected any Act of the local legislature.[১৯৮] এ আইনের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম "backward tract" হিসেবে গণ্য হয়। [১৯৯] ভারত শাসন আইন ১৯১৯ প্রণয়নের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা। এই আইনের বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাদেশিক বেশ কিছু বিষয় নির্বাচিত আইন প্রণেতাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করা। এর মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক সরকারের হাতে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। তবে এর ব্যতিক্রম হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'Backward Tract' ঘোষণা করে এর দায়িত্বভার অর্পিত হয় Governor-in-Council-এর হাতে। [২০০]

৫.২.৬. ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ সংশোধনের জন্য ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতার পুনঃহস্তান্তর। এ কমিশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিষয়ে আলোচনা হয়। সাইমন কমিশন ১৯৩০ সালে এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করে। এ সময় একটি নতুন সংবিধান বা প্রশাসন পূনর্গঠনের বিধিমালা প্রণয়নের সম্পর্কিত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যে ছিল মূলত ঃ ব্রিটিশ ভারতের ১১টি প্রাদেশিক সরকারের নির্ধারিত ক্ষমতা কাঠামোকে সমুন্নত রেখে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক

[১৯৮] A. Berriedale Keith (ed), *Speeches and Documents on Indian Policy, 1750-1921*, Vol.II, London, Humphrey Milford, Oxford University Press, পৃষ্ঠা ঃ ১৯, ২২, ২৮১-৩২৭।

[১৯৯] Raja Debasish Roy, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৪।

[২০০] J. P. Mills and the Chittagong Hill Tracts, 1926/27, Tour Diary, Reports, Photographs,Annotated and Commented Edition, Wolfgang Mey, 2009, পৃষ্ঠা ঃ ২৯।

সংসদীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রদেশ সমূহকে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা। এ প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদা æTotally Excluded” বা æPartially Excluded” হতে পারে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ চীফের নিকট থেকে এ সংক্রান্ত মতামত পাঠানোর অনুরোধ জানালে ১৯৩৩ সালে তারা ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে পরামর্শ প্রেরণ করেন যে, æ... that it would be politically convenient and expedient to group the Chittagong Hill Tracts with Tripura State and placed under ‘Wholly Excluded Area.”। পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনার এস. কে. ঘোষ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনাকালে চীফদের পরামর্শকেই গৃহীতব্য মর্মে অনুমোদন দেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীর সাথে লম্বা সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে এ বিষয়ে J.P. Mills-এর মতামত চাওয়া হলে তিনি ডেপুটি কমিশনার এবং চীফবৃন্দ উভয় পক্ষের মতামতকে অনুমোদন করে বলেন যে, “... the inhabitants desire total exclusion and I agree that total exclision is necessary. Its cuiture differs wholly not only in degree of advancement, but in kind, from the rest of the Presidency.”[২০১]

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে ভারত শাসন আইন পাশ করে এবং ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট থেকে আইনটি কার্যকর হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এ ১১টি প্রদেশের মধ্যে তৎকালীন বাংলা প্রদেশটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য কোনো আসন বরাদ্দ ছিলনা এবং এ অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। [২০২] কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯১ ও ৯২ ধারায় ভারতের যে-কোনো এলাকাকে ‘বহিঃভূত’ বা ‘আংশিক বহিঃভূত এলাকা’ ঘোষণার বিধান রয়েছে। ৯১(১)-এ বলা হয়েছে যে, æIn this Act the expressions æexcluded area” and partially æexcluded area” mean respectively such areas as His Majesty may by Order in Council declare to be excluded or partially excluded areas”...। ৯২(১) ও (৩) ধারায় বহির্ভূত এবং আংশিক বহির্ভূত এলাকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধান বিধৃত রয়েছে। এ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, ৯২(১) ঃ The executive authority of a Province extends to excluded and partially excluded areas therein, but, notwithstanding anything in this Act, no Act of the Federal Legislature or of the Provincial Legislature, shall apply to an excluded area or a partially excluded area, unless the Governor by public notification so directs,...| ৯২(৩) ঃ The Governor shall, as respects any area in a Province which is for the time being an excluded area, exercise his functions in his discretion.[২০৩]

---

[২০১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ: ২৯-৩০।

[২০২] মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা ঃ ৬২।

[২০৩] Government of India Act, 1935, Chapter V. পৃষ্ঠা ঃ ৬০-৬১।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী The Government of India (Excluded and Partially Excluded Areas) Order, 1936 জারী হয়। এই আদেশের প্রথম তফসীলের দ্বিতীয় ক্রমিকে তৎকালীন বাংলার পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২০৪] এই আইন ও আদেশের মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাদেশিক বা ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন দ্বারা শাসিত হয়নি। বরং ৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকা হিসেবে এর শাসনভার সম্পূর্ণভাবে গভর্ণরের দায়িত্বে থেকে যায়। [২০৫]

৫.৩. ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয় ১৭৬০ সালে মোঘল আমলে। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ পলিসি দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হতো; এক. ব্রিটিশের রাজনৈতিক, অর্থনেতিক এবং সামরিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা, এবং দুই. পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বাঙালিদের কাছ থেকে দূরে রাখা। এই নীতির ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বাঙালির শোষণ থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছিল এটি যেমন সত্য তেমনি, এ অঞ্চলকে ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে রেখে ব্রিটিশ তার রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষাও করেছিল। এ আন্দোলন যদিও শুরু হয়েছিল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তথাপিও অতিদ্রুত এটি সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে। তৎসময়ের বড় দুটি দলের একটি মুসলিম লীগের জন্ম মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় হওয়ার কারণে এ দলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী তাদের জায়গা করে নিতে পারেনি। আবার জাতীয় কংগ্রেসকে অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে দেখা হলেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে দলে অর্ন্তভুক্ত করার কোনো আগ্রহ কংগ্রেসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চাকমা নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের ইউনিয়নভুক্ত করার জন্য কংগ্রেস নেতাদের নিকট আবেদন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলের প্রধানদের দাবি ছিল তাদের অঞ্চলকে 'নেটিভ স্টেটস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার। পরবর্তীতে তারা ভারতের রাজ্য ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং খাসিয়ার সাথে মৈত্রীবদ্ধ হওয়ারও দাবি জানায়। রাজনৈতিক এ পালা বদলের বিষয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও মতামতের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়নি। সার্কেল প্রধানরা চেয়েছিলেন পরিপূর্ণ রাজতন্ত্র। মধ্যপন্থী নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান চেয়েছিলেন ব্রিটিশ আদলে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। আর চরমপন্থী নেতা স্নেহ কুমার চাকমা চেয়েছিলেন প্রজাতান্ত্রিক সরকার। নেতৃবৃন্দের বিবিধ ইচ্ছা দ্বারা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে আবশ্যিক করণীয় সম্পর্কে পাহাড়িদের অপ্রস্তুতিকেই সেদিন নির্দেশ করেছিল। [২০৬]

যদিও কামিনীমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ১৯২০ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' গঠিত হয়। প্রথম দিকে এই সংগঠনের কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সীমিত থাকলেও ১৯৩৯ সাল থেকে রাজনৈতিক

[২০৪] Excluded and Partially Excluded Areas/ The Government of India (Excluded and Partially Excluded Areas) Order, 1936, No.166.

[২০৫] মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬২।

[২০৬] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩৫।

কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি' পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় এই সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার প্রশ্ন উঠলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা দ্বিধায় পড়ে। এ বিষয়ে সেই সময়ের জন সমিতি নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় ঃ [২০৭]

> "ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া, স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্রোয়তা রক্ষা করার সম্ভাবনা আছে কিনা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় উপস্থিত হইল। কাল প্রভাবে বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পর্যবসিত হইলেও, একসময় আমরাও স্বাধীন ছিলাম এবং দিগ্বিজয়ক্রমে কয়েক শতাব্দীকাল যাবৎ ব্রহ্মরাজ্য দখলক্রমে শাসন করিয়াছিলাম। অতএব এই সুযোগে আমাদের পূর্ব গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে কিছুটা স্বায়ত্ব শাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।"

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত পাকিস্তান এবং ভারত দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হয় পাকিস্তানের অংশ। লক্ষনীয় বিষয় হলো ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির পক্ষে পাকিস্তানের যুক্তি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য স্বদেশ তৈরি করা। ব্রিটিশ ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলি পাকিস্তানে এবং অন্যান্য এলাকাগুলো ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা দুইভাগের কম জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তি সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কে স্তম্ভিত করেছিল। [২০৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি ও রাজাদের আধিপত্য রক্ষার জন্য ১৯৪৬ সালে মংরাজা ও চাকমা রাজা 'পাহাড়ি সমিতি' গঠন করেন। এই সংস্থা প্রতিবেশী রাজ্য কুচবিহার, ত্রিপুরা বা খাসিয়ার মতো দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা দাবি করে। দেশীয় রাজ্যের 'রাষ্ট্র সমবায়' গঠন করে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। পার্বত্য নেতাদের অনৈক্য এবং কংগ্রেসের উদাসীনতা এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলে আদিবাসীরা মনে করেন। [২০৯]

৫.৩.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম নেতৃবৃন্দের পাকিস্তানে সংযুক্তির বিরোধিতা ঃ স্নেহকুমার চাকমার বিবরণ

১৯৮৬ সালের ১০-১১ অক্টোবর আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত সাদিগাং সম্মেলনে স্নেহকুমার চাকমা একটি স্মারকলিপি পাঠ করেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে সংযুক্তির বিরোধিতা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে লর্ড ওয়াভেল সিমলায় অস্থায়ী সরকার গঠন প্রশ্নে এক

[২০৭] কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী*, দেওয়ান ব্রাদার্স, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৯-২৫০।

[২০৮] Willem Van Schendel,Wolfgang Mey & Aditya KumarDewan, The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland, The University Press Limited, Dhaka, 2001, পৃষ্ঠা ঃ ৭১।

[২০৯] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন আহবান করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী জেনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি তার সাধারণ সম্পাদক স্নেহকুমার চাকমাকে ওয়াভেল সম্মেলনে পাঠায়। তিনি সেখানে কংগ্রেস হাই কমান্ড ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন; পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৪৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দাবিনামা সম্বলিত একটি মেমোরান্ডাম পুনর্বার পাঠানো হয়। ১৯৪৭ সালের ২০ মার্চ স্নেহকুমার চাকমাকে All India Excluded Areas Sub-Committee of the Constituent Assembly of India for Chittagong Hill Tracts-এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করে নেওয়া হয়।[২১০]

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার ৯৮% তখন ছিল অমুসলমান এবং পাকিস্তান গঠিত হবার কথা ছিল মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে, স্নেহকুমার চাকমা'র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। জন সমিতির সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ান রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুষড়ে পড়লে প্রতুল চন্দ্র দেওয়ানকে সভাপতি ও ঘনশ্যাম দেওয়ানকে 'ফিল্ড কমান্ডার' ক'রে একটি 'এ্যাকশন কমিটি' গঠন করা হয়।[২১১]

স্নেহকুমার চাকমা জানিয়েছেন যে দেশভাগ হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যখন পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত গঠিত হচ্ছে তখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যে কি ঘটছে তা ছিল তাদের অজানা। তিনি লিখছেন ঃ [২১২]

> "At 00.00 hours between 14th and 15th August 1947, the Action Committee with a gathering of 10000 people led me to the Deputy Commissioner's bungalow. Col .G.L. Hyde, the D.C., came out and received us.
> æ Sir, is not India Independent now"?
> æYes, you are Independent now and on".
> æIs not, Sir, CHT a part of India under the Independence Act of India"?
> æYes according to the Independence Act of India 1947 Chittagong Hill Tracts is a territory of India dominion".
> æSo, should we not hoist our national flag"?
> æYes, but we the British people generally hoist flags at sunrise. Please came at down and hoist the Indian national flag publicly in the football ground, I will go and salute it. Thereafter I shall flourish the Indian flag in my office and residence Where I invite u all. Please come here to attend my flag hoisting ceremony".

---

২১০ Sneha Kumar Chakma, Memorandum to Chadigang Conference, Amsterdam Oct 10–11, 1986. Available at www.angelfire.com/ab/jumma/bground/SKChakma.html

২১১ ঐ।

২১২ ঐ।

> Our veteran leader, Kamini Mohan Dewan, declining all our requests to do the job, the Action Committee forced me to hoist our national flag at sunrise on 15th August 1947. We followed the D.C. in procession and attended the government flag hoisting ceremony.
> Messages were sent out everywhere.
> Little did I know that while I was hoisting Indian flags in Rangamati, CHT, Pandit Nehru was sending a crucial note of B.N. Raw to Sardar Patel, on CHT.
> In the evening of 17th August 1947 the Radcliffe Award dated 12th August 1947, was heard over the radio implying CHT within East Bengal Boundary. "

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানে সংযুক্তি জন সমিতি-সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেননি। ১৮ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে সকালবেলা এ্যাকশন কমিটি পরদিন জেলা প্রশাসকের বাংলোতে একটি জরুরি সভা ডাকে। ১৯ আগস্ট ১৯৪৭ অনুষ্ঠিত এই সভায় চাকমা রাজা, কামিনী মোহন দেওয়ান ও সমাজের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ মানবে না, দেশীয় অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ স্কোয়াড গড়ে তুলতে হবে এবং ভারত থেকে সহায়তা ও অস্ত্র জোগাড়ের জন্য স্নেহকুমার চাকমা গ্রেফতার এড়িয়ে অবিলম্বে ভারত যাবেন।[২১৩]

১৯ আগস্ট ১৯৪৭-এ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় সহায়তার প্রত্যাশায় ঐদিন বিকেল ৩.০০টায় ইন্দ্রমনি চাকমাকে সাথে নিয়ে স্নেহকুমার চাকমা হাটাপথে রামগড় হয়ে সাবরুমের পথে রওনা হন। গিরীশ দেওয়ানের নেতৃত্বাধীন ৭ জন সশস্ত্র দেহরক্ষী নিরাপত্তার প্রয়োজনে তার সাথী হয়। ২১ আগস্ট আগরতলা পৌঁছে শিলং হয়ে ২৫ আগস্ট তিনি কোলকাতা পৌঁছান এবং সরদার বল্লভভাই প্যাটেলকে তারবার্তা পাঠান। কয়েকদিনের মধ্যে তার সাথে বল্লভভাই প্যাটেলের কথা হয়। তিনি অস্ত্র সাহায্য দিতে রাজী হন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে বলেন। স্নেহকুমার চাকমা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দেখা পান ৫০ দিন পরে এবং নেহেরু অস্ত্র দিতে অস্বীকৃতি জানান। অগত্যা স্নেহকুমার চাকমা ১৯৪৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে জাতিসংঘের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। এছাড়া ঐদিন তিনি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক বরাবর টেলিগ্রাম পাঠান।[২১৪]

স্নেহকুমার চাকমা আরও লিখেছেন যে, Bengal Boundary Commission-এর দুজন অমুসলিম সদস্য বিচারপতি বিজন মুখার্জী ও বিচারপতি চারু বিশ্বাস সম্ভবত আগস্ট-এর শেষ সপ্তাহ ও সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এর প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

---

[২১৩] ঐ।

[২১৪] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করেন। স্নেহকুমার চাকমার আইনজীবী অপূর্বধন মুখোপাধ্যায়ও দিল্লিতে যেয়ে একই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজি পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজী হননি।[২১৫]

৫.৩.২. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন

১৯ আগস্ট ১৯৪৭-এ রাঙামাটির জেলা প্রশাসকের বাংলোয় অনুষ্ঠিত 'এ্যাকশন কমিটি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো প্রতিরোধ দানা বেঁধে ওঠার আগেই ২১ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে চট্টগ্রাম থেকে বালুচ রেজিমেন্টের সদস্যরা যেয়ে রাঙ্গামাটির নিয়ন্ত্রণ নেয়, ১৫ ডিসেম্বর উত্তোলিত ভারতের পতাকা নামিয়ে ফেলে এবং পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনীর দুএকজন অফিসার ছাড়া প্রত্যেকেই ছিলেন আদিবাসী, এবং মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক কোনো উৎস উল্লেখ না ক'রে লিখেছেন যে 'উপজাতি' ঐ স্থানীয় পুলিশদের নিয়ে সেখানে একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।[২১৬]

জেনারেল (অবঃ) ইবরাহিম আরও লিখেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে চেঙ্গী ভেলীর বুড়িঘাট এলাকায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। এ জনসভায় স্লোগান দেওয়া হয়, 'ভারত যদি স্বাধীন হয়, এদেশ কেন অধীন রয়।' এ জনসভায় স্নেহ কুমার চাকমা, প্রতুল দেওয়ান, অঙ্গত দেওয়ান, কামিনী মোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ জনসভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করার দায়ে উক্ত চার বক্তাকে পাকিস্তান সরকার দুই মাসের কারাদন্ডের আদেশ দেন। এছাড়া বোমাং সার্কেলের মার্মাদের ইচ্ছে ছিল বার্মার সাথে যুক্ত হওয়ার। তাই মার্মাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বান্দরবানে মার্মার পতাকা উত্তোলন করেন। পাকিস্তান সরকার এখানেও বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা প্রতিষ্ঠিত করে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করলে তারা বার্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২১৭]

স্নেহকুমার চাকমা ভারতেই রয়ে যান। সেখানে পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরা প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঘনশ্যাম দেওয়ানও ভারতে চলে যান। কামিনী মোহন দেওয়ান পাকিস্তানকে মেনে নিয়ে রাঙ্গামাটিতে থেকে যান। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধি হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[২১৮]

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সংবিধানে (১৯৫৬) ১৯০০ সালের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি' এবং ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' গৃহীত হলেও রাষ্ট্রের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসমূহের আনুগত্য সম্মন্ধে ১৯৪৭ সালে শাসকবর্গের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা পরবর্তীকালের নেতিবাচক মনোভাব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regiment উঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় পার্বত্য জনগণ

[২১৫] ঐ।

[২১৬] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫।

[২১৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৭৬।

[২১৮] কামিনী মোহন দেওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৯-২৫০। আরও দেখুন, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৭৬।

ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে হাজারে হাজারে ভারত ও বার্মায় (মায়ানমারে) আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আবার পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় সংবিধানে 'পৃথক শাসিত অঞ্চল' শব্দের পরিবর্তে 'উপজাতীয় অঞ্চল' ব্যবহার করে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত ও বার্মায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এ দুটি দেশের অনুরোধের পক্ষে আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতে পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলবৎ রাখলেও কার্যতঃ বিশেষ এলাকার মর্যাদা তুলে নেয়। ফলে উক্ত রেগুলেশন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ২৫০.০০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়। এতে ৫৫,০০০ একর আবাদী জমি ডুবে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালের দিকে ১৯০০ সালের রেগুলেশন লংঘন করে রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর, লংগুদু এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়িতে কয়েকশত মুসলমান পরিবারকে পুনর্বাসিত করে। [২১৯]

৫.৪. পাকিস্তানের সংবিধান ও আদিবাসী

দেশ বিভাগের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালে এবং এ সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের 'এক্সক্লুডেড এরিয়া' বা শাসন বহির্ভূত এলাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। তবে সেখানে হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারায় কিছু সংশোধন আনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্ট ১৯০০ সালের রেগুলেশনের ৫১ ধারায় বিধৃত ডেপুটি কমিশনারের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কাউকে বহিঃষ্কার করতে পারার এখতিয়ারকে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা বহিঃর্ভূত (Ultra-Vires) আখ্যা দিয়ে রদ করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হলে প্রথম সংবিধান বাতিল করা হয় এবং ১৯৬২ সালে প্রণীত দ্বিতীয় সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা এক্সক্লুডেড এরিয়া পরিবর্তন করে 'ট্রাইবেল এরিয়া' বা উপজাতীয় এলাকার মর্যাদা দেওয়া হয়। [২২০] এরপর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা কখনও আর পুনঃপ্রবর্তিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের রেগুলেশনের উপর সরাসরি আঘাত আসে ১৯৬৪ সালে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০-এর ৫১ নং বিধিকে পাকিস্তান সংবিধানে বর্ণিত 'অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা' বিধির পরিপন্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ঘোষণা করে। [২২১] এ বিশেষ মর্যাদা বাতিল হলেও ১৯০০ সালের রেগুলেশন বাতিল হয়নি এবং বিশেষ আইনের বাঞ্ছিত কোনো সমস্যা ব্যতীত পাহাড়ি জনগোষ্ঠী পূর্বের মতো সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে।

---

[২১৯] বিপ্লব চাকমা, '*পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে*', পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১১।

[২২০] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯-৭০।

[২২১] রাজা দেবাশীষ রায়, 'আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৭৫ (নং-১০৭) এবং বাংলাদেশের আইনসমূহ: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮।

২১ অক্টোবর ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের রেগুলেশনের ৩৪ ধারায় বিধৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি লীজ, ভূমি হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয়ে সংশোধনী আনে। এ সংশোধনীতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

১. পাহাড়ি এবং অ-পাহাড়ি উভয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমপক্ষে ১৫ বৎসর যাবৎ বসবাস করছে এমন ব্যক্তি অ-পাহাড়ি অ-পাহাড়ি বলে সংজ্ঞায়িত হবে।

২. পাহাড়ি অ-পাহাড়ি তথা অন্য যে কোনো জেলার অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে চত্বর চাষাবাদ, রাবার চাষ, শিল্প স্থাপন এবং এ সব এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণে যোগ্য বলে গণ্য হবে।

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সংবিধানের এ সংশোধনী কার্যকর করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বলবৎ করা না হলেও এ রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ একটি আইন কারণ, এ আইন কখনই বাতিল করা হয়নি। [২২২]

৫.৫. বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন বহির্ভূত অঞ্চলের মর্যাদা বিদ্যমান ছিলনা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রয়াত নেতা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানান। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতধারায় মিশে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সে সময় থেকে বিশেষত ঃ ১৯৯২ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন শুরুর সময় থেকে বাংলাদেশের সংবিধানে পাহাড়ি এবং অন্যান্য জাতিসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে, [২২৩] যে দাবি বাস্তবে আজও সংবিধানে স্থান করে নিতে পারে নি।

বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত কোনো বিষয় প্রত্যক্ষভাবে সংযোজিত হয়নি। [২২৪] বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ৪৫টিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। কিন্তু দেশের সংবিধানে এব কোনো স্বীকৃতি নেই। তবে এতে এমন কিছু বিধান আছে যা আদিবাসীদের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।' ২৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' ২৮

[২২২] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯-৭০।
[২২৩] রাজা দেবাশীষ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-৮০।
[২২৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮১।

(৪) অনুচ্ছেদে 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন থেকে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না' বলিয়া উল্লিখিত হয়েছে। নাগরিকদের যে-কোনো অনগ্রসর অংশ বলতে মূলত আদিবাসীদের বুঝানো হয়েছে। সংবিধানের ২৯ (২) অনুচ্ছেদের (ক) উপ-দফায় আরও বলা হয়েছে যে, 'নাগরিকদের যে-কোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না। ' উল্লিখিত অনুচ্ছেদ অনুসারে 'নাগরিকদের যে-কোনো অনগ্রসর অংশ' হিসেবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বিবেচনা করে সরকার তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সব পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হল ঃ

- চাকরি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন ২০০১ প্রণয়ন।
- পার্বত্য জেলাসমূহে জজ আদালত স্থাপন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি সংশোধন (২০০৩)।

১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ২য় ঘোষণাপত্রের আদেশ নং-৪ দ্বারা সংবিধানে (১ক) নামে নতুন একটি দফা সংযুক্ত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' এ আদেশবলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বলিত ১২ নং অনুচ্ছেদ'টিও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে স্বকীয় সংস্কৃতির অধিকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে বাঙালি সংস্কৃতির ভাবধারায় আত্মীকরণের প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৮৮ সালে জেনারেল এরশাদ ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপ ও জাতি-রাষ্ট্রের সমার্থবোধক বৈশিষ্ট্যকে আরও সক্রিয় করে তোলে। এই সংশোধনী হিসেবে সংবিধানের ২ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত (২ক) নামক নতুন দফায় বলা হয় যে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।'[২২৫]

১৯৭২ সালের সংবিধানে ৩ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের ভাষা হিসেবে একমাত্র বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[২২৬] এ ছাড়াও সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন ২০১১-তে (২৩ক। "উপজাতি", ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) নামক নতুন দফা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ দফায় বলা হয়েছে যে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন "উপজাতি", ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ

[২২৫] মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০, ৩১।

[২২৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ঃ ২।

করিবেন।' [২২৭] এরূপ সংশোধনীসমূহ আদিবাসীদের জাতীয় পরিচিতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিপন্নতার দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৫.৬. পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক কাঠামো, আইন ও বিচার ব্যবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগুলির রয়েছে স্ব স্ব ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি, প্রথা-ঐতিহ্য এবং সামাজিক আইন-কানুন। পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি জাতির নিজস্ব সমাজ বিনির্মাণে এগুলির যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। এ সব ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণে ১৮২৯ সালে চট্টগ্রামের তৎকালীন কমিশনার হ্যালহেড তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পত্র দ্বারা জানিয়েছিলেন যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল ট্রাইবগণ ব্রিটিশদের প্রজা ছিল না, কেবলমাত্র কর প্রদানকারী এবং আমরা আমাদের দিক থেকে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার রিকগনাইজ করি না'। [২২৮] ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ শাসকগণ চট্টগ্রামের পূর্বে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চল দখলপূর্বক তাদের উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বঙ্গ দ্বারা শাসিত হয়। এর পূর্বে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন চীফ বা রাজাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল এবং রাজাগণ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে নয় বরং তারা শাসন করতো নির্দিষ্ট দলভুক্ত কিছু মানুষকে। এক রাজার দল গঠিত হতো কয়েক ডজন থেকে কয়েক হাজার অনুসারীর সমন্বয়ে। রাজারা ছিলেন পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া ও চাল-চলনে অত্যন্ত রাজকীয়। ব্রিটিশ শাসকগণ নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ অঞ্চলকে বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থানীয় মর্যাদাশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে উপনিবেশিক শাসনের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এ সময় পার্বত্য অঞ্চলকে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম হিসেবে নামকরণ করে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ পথের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এমন মাত্র তিনজন চীফকে স্বীকৃতি দিয়ে ৩টি সার্কেলের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, ক. পার্বত্য জেলার উত্তরের মানিকছড়ির মং রাজা, খ. মধ্যে রাঙ্গামাটির চাকমা রাজা এবং গ. দক্ষিণে বান্দরবানের বোমাং রাজা। অন্যান্য স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর অধস্তন পদগুলোতে বসানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদা প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার ন্যায় Princely State অথবা চট্টগ্রামের অনুরূপ হওয়ার বাস্তবতা থাকলেও ১৯০০ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন দ্বারা এ অঞ্চলকে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়। এরূপ মর্যাদার কারণে সার্কেল রাজাকে প্রধান করে কর আদায়ের একটি স্থানীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্কেলের পরবর্তী ধাপে মৌজা নামে অপর একটি প্রশাসনিক একক গঠন করা হয়, যার দায়িত্বে নিযুক্তদের পদবি হেডম্যান। হেডম্যানদের দায়িত্ব ছিল প্রতি পরিবার থেকে কর আদায় করে গণ-আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে রাজা বা চীফের নিকট হস্তান্তর করা এবং রাজার দায়িত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেওয়া। এ কাজের জন্য রাজা এবং হেডম্যানদের জন্য পৃথক কমিশন এবং ভূমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও রাজার এখতিয়ার ছিল ছোট-খাট বিচার নিস্পত্তি করার। ১৯৪৭ সালে

[২২৭] বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, জুলাই ৩, ২০১১, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮-৯২।

[২২৮] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ঃ ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশিক শাসনের পতনের পর রাজার এরূপ ক্ষমতার প্রচলন অব্যাহত থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমাগত ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে।[২২৯]

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোর মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদসহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য দুই-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রেখে তিন জেলায় তিনটি সমক্ষমতা ও কাঠামো সম্পন্ন পারষদ গঠন করা হয়েছে। এ আইনে সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন জাতির জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে সেই জাতির আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরিষদগুলোর হাতে জেলা পর্যায়ের সরকারি কিছু বিভাগ পরিচালনার সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ আইন ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিধান অনুসারে ১৯৯৮ সালে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলঃ স্থানীয় পুলিশ, ভূমি প্রশাসন, বাজেটসহ আরও কিছু বিষয় হস্তান্তরের মাধ্যমে পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; পরিষদের যে কোনো সভায় ভোটাধিকার ব্যতীত সার্কেল প্রধান/রাজার অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ; সংশ্লিষ্ট জেলার আদিবাসী ও অন্যান্য স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদগুলোর চেয়ারম্যানসহ সদস্য নির্বাচন। তবে ১৯৮৯ সালের পরে অদ্যাবধি কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিষদসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির ফল হিসেবে পাহাড়ি অঞ্চলের অপর একটি আইন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ প্রণীত হয়। এই আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য তিন জেলা পরিষদের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। জেলা পরিষদগুলোর মতো আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ ও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমস্যদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই অঞ্চলকে "অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এই আইন বলে আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করে। আঞ্চলিক পরিষদ এ অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম, সাধারণ প্রশাসন, পার্বত্য জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং প্রথাগত আইন ও সামাজিক বিচার ইত্যাদি বিষয় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করে। মাত্রাতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতা ও বিভাগীয় কাঠামোর জটিলতাসহ পরিষদের হাতে আইনানুগ ক্ষমতা ন্যস্ত না করার কারণে পরিষদ প্রত্যাশিত ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করতে পারছে না। এখনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে।

আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ আইন ছাড়াও অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১। ১৯৮০-এর দশকের বাংলা ভাষাভাষী অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃজিত ভূমি বিরোধ কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়েছে। এটিকে কমিশন বলা হলেও এর নির্ধারিত এখতিয়ার অনেকাংশে বিচারিক আদালতের অনুরূপ। এ আইনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো কার্যক্রম

[২২৯] Willem Van Schendel & et. al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৩-২৪।

পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন, প্রথা ও পদ্ধতি বিবেচনায় আনতে কমিশন বাধ্য। এ কারণে এই আইনটিতে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নয়জন সদস্যের মধ্যে সাতজন আদিবাসী জাতিসমূহ থেকে নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী কমিশন গঠন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিধান এবং এ আইনের মধ্যে বিদ্যমান কিছু অসামঞ্জস্যতা সংশোধনের দাবি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এ সম্পর্কে ঐকমত না হওয়ার কারণে কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসমূহের ব্যক্তিগত আইন এবং প্রথাভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা রয়েছে যা, জাতিভেদে ভিন্ন। এ অঞ্চলের রাজা এবং হেডম্যানদের দ্বারা পারচালিত প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা আইন দ্বারা স্বীকৃত। পাহাড়িদের পারিবারিক সমস্যাগুলো রাজা, হেডম্যান এবং কার্বারীদের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রথাগত আদালত কর্তৃক বিচারকৃত বিষয়ের উপর রাষ্ট্রের সাধারণ সিভিল আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগের উপর বাধানিষেধ আরোপিত রয়েছে। প্রথাগত আদালতের রায়ের উপর সাধারণ আদালতে কম সংখ্যক পুনবিচার ও আপীল দাখিল নির্দেশ করে যে, আদিবাসীরা পারিবারিক বিষয়ে তাদের প্রথা অনুসরণের পক্ষে।

বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথাগত আইন ব্যবহার, রাজা ও হেডম্যানদের অব্যাহত কার্যক্রম কনভেনশন সং ১০৭-এর ৭ ও ৮ বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৭ নং অনুচ্ছেদে আদিবাসীদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের প্রথাগত আইনকে সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং তাদের নিজেদের প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ৮ নং অনুচ্ছেদে ফৌজদারী বিচার ও শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার প্রথাগত আইনকে বিবেচনায় রেখে প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসকল বিধান পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। এরূপ বিধান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আইন ছাড়াও ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিচারিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রথাগত আইনও রীতিনীতির সুস্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। [২৩০]

৫.৭. পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থা

ভূমির উপর মানুষের অধিকার চিরন্তন। সভ্যতার শুরু থেকে ভূমি নিয়ে মানুষের দ্বন্দ্ব হয়ে আসছে। গত পাঁচ দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বলা হয়, পার্বত্য সমস্যার অন্যতম কারণ ভূমি সমস্যা। বাংলাদেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ ভূমি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। মোগল আমল থেকে পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির অধিকার তাদের ঐতিহ্যগত রীতি ও প্রথা নির্ভর ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্রিটিশ সরকার পাহাড়িদের এই রীতি-নীতির উপর হস্তক্ষেপ না করেই নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ কর্তৃক

---

[২৩০] রাজা দেবাশীষ রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩-৭৩।

প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০-এ দেখা যায় যে, পাহাড়িদের নিজস্ব ধারার ভূমির অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৩৪, ৪৯, ৫১ ও ৫২ নং বিধি পাহাড়িদের ভূমির অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। বহিরাগত অ-পাহাড়িদের জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ হয়েছে ৩৪ নং বিধিতে। পার্বত্য অঞ্চলে স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহিরাগতদের বহিস্কার করার অধিকার রয়েছে ৫১ নং বিধিতে। স্থানীয় হেডম্যান ও গোত্রপতির সুপারিশক্রমে ডেপুটি কমিশনার অপাহাড়িদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন ৫২ বিধি অনুসারে। মৌজা হেডম্যানের অন্যতম দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায়। খাজনা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার জমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। জমি বন্দোবস্ত গ্রহীতারা উত্তরাধিকার সূত্রে সেই জমি ভোগ দখল করত এবং ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ব্যতিরেকে সেই জমি হস্তান্তর করতে পারত না। বন্দোবস্ত শর্ত লংঘন করলে ডেপুটি কমিশনার সেই জমি খাস ঘোষণা করেন। এছাড়া রেগুলেশনে জুম চাষ, বনজ সম্পদ আহরণ, খাস জমি দখল ও মাছ ধরার অধিকার রয়েছে। [২৩১]

পাবত্য চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বা দেওয়ানী কার্যবিধির প্রয়োগ না থাকার কারণে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কর ও কোর্ট ফি প্রদান থেকে পার্বত্যবাসীদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে প্রথম সংবিধানে এ অঞ্চলকে পৃথক শাসিত অঞ্চলের পরিবর্তে উপজাতীয় অঞ্চল উল্লেখপূর্বক রেগুলেশন সংশোধন করে। এ অঞ্চলের ভূমি সমস্যার সূত্রপাত হয় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ্ দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণির ৫৪,০০০ একর জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে। এছাড়া রেগুলেশনের ৫২ নং বিধি অনুযায়ী স্থানীয় হেডম্যান ও ও গোত্রপতির সুপারিশক্রমে ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদন ব্যতীত এ অঞ্চলে পাহাড়ি ছাড়া অন্যান্যদের বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। এতদসত্বেও পাকিস্তান আমল থেকেই অপাহাড়িদের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন শুরু হয়। একই আইনের ৩৪ ধারা সংশোধন করে বলা হয় যে, অন্য জেলায় ঘর-বাড়ি থাকবে না এরূপ অপাহাড়ি ও অস্থানীয় ব্যক্তিরা ক্রমান্বয়ে ১৫ বৎসর পর্যন্ত এ এলাকায় বসবাস করলে জমির মালিক হিসেবে গণ্য হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। সর্বাপেক্ষা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় ১৯৮০ সালে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি অভিবাসন দ্বারা। এ সময় কয়েক লক্ষ বাঙালিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় পুনর্বাসন করা হয়। সরকার প্রত্যেক পুনর্বাসিত পরিবারের নামে ৫.০০ একর পাহাড়ি জমি, ৪.০০ একর মিশ্র জমি, ও ২.৫০ একর ধানি জমি বরাদ্দপূর্বক জমির বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো সময়ই জরিপ না হওয়ায় প্রকৃত জমির পরিমাণ ও সীমানা অর্থাৎ দাগ খতিয়ানসহ বন্দোবস্তির ব্যবস্থা কার্যকর নয়। সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে চার সীমানা উল্লেখ করে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এ অবস্থায় জমির মালিকানা ও দখল সম্পর্কে শুধুমাত্র স্থানীয় হেডম্যান ও স্থানীয় রাজস্ব প্রতিনিধির অবগত থাকা সম্ভব। নিয়মানুযায়ী হেডম্যানদের প্রতিবেদন ব্যতীত জমি বন্দোবস্তি দেওয়া যায়না, তথাপিও বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে। বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলকৃত জমি বহিরাগত বাঙালিদের

[২৩১] বিপ্লব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। অনেককে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে তার জমি দখল করা হয়েছে। জোরপূর্বক উচ্ছেদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকলেও প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। [২৩২]

৫.৮. পার্বত্যাঞ্চলের সংস্কৃতি

আদিবাসী মাত্রই সংরক্ষণশীল। জীবনযাপনের যুগোপযোগী ধারা অবলম্বনের সুযোগ পেয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক আদিবাসী জাতি আজও তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সচেষ্ট। কালের ধারায় আর সভ্যতার বিবর্তনে অন্য সকল দেশ ও জাতির মতোই পাহাড়ি জাতিগুলোর সমাজেও ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। তাদের সমাজের অনেক প্রথা ও সংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ বিলুপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। [২৩৩]

ধর্মের দিক থেকে এ অঞ্চলের অধিকাংশ জাতির জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা ও চাক জাতির লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বড় অংশটি এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। খিয়াং, ম্রো ও খুমিদের অনেকে বৌদ্ধ হলেও এই তিন জাতির জনগোষ্ঠীর একটি অংশ খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করে। লুসাই, বম এবং পাংখোয়া জাতির জনগোষ্ঠীও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। তবে তাদের নিজস্ব কিছু দেবদেবী রয়েছে। ৮০-এর দশকে মেনলে ম্রো তাদের সমাজে ক্রামা নামে একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন। ম্রো এবং খুমীদের অনেকে বর্তমানে ক্রামা ধর্ম পালন করেন। পূর্বে এ জাতিগুলোর মধ্যে নানা দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার প্রচলন ছিল – যা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষা রয়েছে। চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যারা যে ভাষায় কথা বলে তা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার এবং অন্যান্য আর নয়টি আদিবাসী ভাষা ও উপভাষা সিনো-টিবেটান ভাষা পরিবারের টিবেটো-বার্মেন শাখার অন্তর্ভুক্ত। মারমা জাতির ভাষার সাথে বর্মী ভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষার নাম কক-বরক। কুকি চীন দলের ভাষায় কথা বলে লুসাই, পাংখোয়া, বম, খিয়াং ও খুমী জাতির জনগোষ্ঠী। ম্রো এবং চাক আদিবাসীদের নিজস্ব যে ভাষা রয়েছে সে ভাষায় এবং উপভাষায় লোকসাহিত্যের বিশাল এক ভান্ডার রয়েছে, যা এখনও অপ্রকাশিত। লেখার জন্য চাকমা এবং মারমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। ত্রিপুরাসহ চাকমা এবং মারমা লেখ্য ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ ঘটছে।

পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতি আকৃষ্ট করে এমন বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় জীবনধারা। তাদের ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদ জুম, জুমে নির্মিত মনোঘর, নিজেদের প্রস্তুতকৃত বর্ণিল পোশাক-পরিচ্ছদ উল্লেখযোগ্য। মারমা ও রাখাইনদের তৈরি সেগুন কাঠের বাড়ি, বৌদ্ধ মন্দিরগুলোর নিপুন নির্মাণ

---

[২৩২] বিপ্লব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৮।

[২৩৩] জাফর আহমাদ হানাফী, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

শৈলী তাদের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার নির্দেশ করে। এ সকল জাতির চিত্তাকর্ষক উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো তাদের সংগীত, নৃত্যসহ ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব। [২৩৪]

৬. পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

আদিবাসীদের অর্থনীতি মূলত ভূমি নির্ভর। ঐতিহ্যগতভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সুইডেন কৃষি ব্যবস্থায় নিয়োজিত ছিল; যে ব্যবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় 'জুম' বলা হয়। আনুমানিক ১৯০১ সালে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ১২,৪,৭৬২ জন ব্যক্তির মধ্যে ১,০৯,৩৬০ জন জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র পাংখোয়া এবং খুমী জাতির জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে জুম চাষ নির্ভর অর্থনৈতিক অবস্থায় রয়েছে। এক সময় সমতল থেকে লবণ, শুটকি, কেরোসিনের মতো কিছু পণ্য আমদানী ছাড়া সব ধরনের খাদ্যে এ জনগোষ্ঠী স্বয়ংসম্পন্ন ছিল। ১৮৬০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্তির পর এ অঞ্চলে লাঙ্গল চাষের প্রবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসক দুটি দূরদৃষ্টি থেকে চাষ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে উৎসাহী হয়েছিল। প্রথমত, রাজস্ব বৃদ্ধি, এবং দ্বিতীয়ত, এ জনগোষ্ঠীকে স্থায়ী বসবাসে অভ্যস্থ করার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সহজকরণ। তবে নতুন প্রবর্তিত লাঙ্গল পদ্ধতি শুধুমাত্র ভ্যালী চাষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ব্রিটিশ প্রশাসন তিনটি কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি এবং অর্থনীতি রক্ষার আইনগত উপায় গ্রহণ করে; এক. এই এলাকাকে আদিবাসী অঞ্চল হিসেবে সংরক্ষণ করা; দুই. আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আত্মসাৎকারী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করা, এবং তিন. এ অঞ্চলের লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাজার অর্থনীতির বাইরে রেখে দেওয়া। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন পার্বত্য অঞ্চলের এক ব্যপক এলাকাকে 'সংরক্ষিত বন' হিসেবে ঘোষণা করে; যেখানে জুম চাষ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ প্রশাসন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ গাছ রোপণের উদ্দেশ্যে এসব এলাকার কোনো কোনো স্থানের সদ্য বেড়ে উঠা বন ধ্বংস করে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ দ্বারা যে ১ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মধ্যে ১০ হাজার ছিল লাঙ্গল চাষী এবং ৮ হাজার জুম চাষী; এ নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানুষগুলো তাদের মূল অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। এখান থেকেই এ অঞ্চলের চাষযোগ্য ভূমি সংকট শুরু হয়; যা বাঁধ তৈরির পূর্বেই অনুভূত হয়েছিল। মূল পেশা থেকে ছিটকিয়ে পড়া জুম চাষীদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল উৎপাদনসহ কিছু বিকল্প ধারার অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা হলেও অনেকেই এর বাইরে থেকে যায় এবং যারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারাও বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এ ছাড়াও ৮০-এর দশকে অনেক আদিবাসী বনায়নের দিকে মনোযোগী হয়। তবে এ সব সুবিধা

[২৩৪] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। তাদের অনেকেই আজ দিনমজুরসহ সাধারণ কিছু পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। [২৩৫]

লাঙ্গল চাষী আদিবাসীদের মধ্যে অতি ধনী যেমন আছে তেমনি অতি দরিদ্রও রয়েছে। যারা প্রথম শ্রেণির জমি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তারা শুধুমাত্র ভাল পরিমাণ ফসলই নয়, এ জমি পুনভাড়া প্রদানের মাধ্যমে মোট ফসলের অর্ধেক পরিমাণ ফসল বা এর বাজার মূল্যের সমপরিমাণ তিন বছরের অগ্রীম অর্থ লাভ করে। এ ছাড়াও বাগানজাত পণ্য বাজারজাত করার মাধ্যমে তারা উচ্চ মানের মুনাফা পায়। এমনকি যখন ব্যবসায় লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কোনো বাঙালির নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থ বিজড়িত হয় সে ক্ষেত্রেও মুনাফার পরিমাণ উচ্চ থাকে। তবে এ অবস্থা ধনী চাষীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, দরিদ্র চাষীদের জন্য নয়। লাঙ্গল চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নতি সামাজিক শ্রেণি সৃষ্টি করছে। কিছু লাঙ্গল চাষী নিজে চাষ করতে পারে এমন পরিমাণ জমি অপেক্ষা অনেক বেশি জমি নিজ দখলে রাখে, যা পুনভাড়া প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ভূমির মালিক আর ভূমিহীন মনিুষের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরাদের মধ্যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

জুম চাষের জন্য একটি বিস্তৃত পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়, যেখানে আবাদ এবং অনাবাদ পর্যায়ক্রমে চলমান থাকে। জুম চাষের এ সীমাবদ্ধতাকে সুইডেন পদ্ধতির জুম চাষের বিপক্ষের যুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সুইডেন পদ্ধতিতে একটি জুমযোগ্য জমিতে একাধিক ধাপে বিবিধ কৃষিপণ্য উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও এ পদ্ধতিতে ভূমিক্ষয় অধিক। এ ছাড়াও জুম চাষিরা সুইডেন পদ্ধতির উৎপাদনে আগ্রহী নয়। এ পদ্ধতিতে যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় তা অনেক ক্ষেত্রে তাদের বৎসরের আহারের সংস্থান সংকুলান হয় না। জুম চাষিদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রভেদ তুলনামূলকভাবে কম। তাদের সমতাবাদী সমাজের ধারণা পাহাড়ি সংহতিকে অদ্যাবধি সুদৃঢ় রেখেছে। পাহাড়িদের সামাজিক বন্ধন ততক্ষণ অক্ষয় থাকে যতক্ষণ বাঙালি কর্তৃত্ব তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ না করে।[২৩৬]

৬.১. পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও সামন্ত-শোষণ

শুল্ক প্রদানে বাধ্যবাধকতা প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে ১৭৭২ সালে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লড়াই শুরু হয়। একাধিকবার সংঘটিত এ লড়াইয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত ১৭৮৭ সালে তারা পর্যুদস্ত হয়। পরবর্তী ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ ছিল না। তবে এই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল

---

[২৩৫] Rajkumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* Published by: International Work Group for Indigenous Affairs, Denmark, 2000. পৃষ্ঠা ঃ: ২৪-২৮

[২৩৬] Wolfgang Mey (ed.), *Genocide on the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : They are Now Burning Village After Village*, International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Document No.51, Copenhegen, 1984, পৃষ্ঠা ঃ ৮০-৮২।

মূলত ঃ মধ্যযুগীয় সামন্ত্রতান্ত্রিক। সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল অভিজাত শ্রেণি এবং প্রজা শ্রেণি হলো অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। অভিজাত শাসক শ্রেণি শাসনের নামে নির্যাতন, নিপীড়ন চালাতো প্রজাশ্রেণির উপর। প্রজাশ্রেণির রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো অধিকার ছিল না। তারা শুধুমাত্র উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত ছিল। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উভয় কাঠামো ছিল সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সময় অভিজাত শ্রেণি অর্থাৎ রাজা, হেডম্যান, কার্বারী, তালুকদার, দেওয়ান, খীসা; প্রত্যক্ষভাবে সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোসহ বিচার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের নির্দয় নিপীড়ণ ও শাসন-শোষণ প্রজা শ্রেণি হিসেবে সাধারণ পাহাড়িদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। [২৩৭] ১৯৫০ দশকের শেষ দিকেও শিক্ষায়, চিন্তা-চেতনায় অনগ্রসর হেডম্যান, দেওয়ানদের আভিজাত্যের অহংকার ছিল। ভূমির মালিকগণ সাধারণত তালুকদার হতেন। তালুকদারদের সামাজিক ক্ষমতা ছিল প্রবল। একই ক্ষমতা পরবর্তীতে দেওয়ানদের হাতে যায়। গ্রামের স্বচ্ছল পরিবার যারা জমিদাররের ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন তাদেরই রাজা দেওয়ান উপাধি দিতেন। খীসা বা কার্বারী উপাধিও রাজা কর্তৃক প্রদত্ত হতো।[২৩৮] রাজা, হেডম্যান ও কার্বারী এই তিন পদস্থ ব্যক্তিবর্গ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হলেও তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে। এই সমাজ কাঠামোর কারণে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সময় ব্যয় হয়েছে অনেক বেশি। [২৩৯] সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণির মাঝে বহমান সামাজিক দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ জনগণ নিস্পেষিত হয়েছে। [২৪০] সমাজের শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ও চিত্ত কিশোর চাকমা। তাদের পিতা চানমনিও ছিলেন সমাজে বিরাজমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ প্রদর্শক। [২৪১] উষাতন তালুকদার জানান ঃ

> ”পার্বত্য চট্টগ্রামে সামন্ত প্রভুরাই কর্তৃত্ব করতেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের সার্বিক দিকেই তাদের একটা খবরদারী ছিল। যেমন- প্রজারা শিকার করলে শিকারের একটা অংশ, সেটা অবশ্যই রান, দেওয়ানকে দিতে হতো। প্রজা শ্রেণির জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। রূপার অলংকার ব্যবহারের জন্যও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হতো। প্রজার বসত-বাড়ি হিসেবে টিনের ঘর, বেড়ার ঘরও সামন্ত প্রভুর অনুমোদিত নকশা ‘দাবানা বেড়া’ দিয়ে প্রস্তুত করার প্রচলন ছিল। প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই দেওয়ানদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। ব্যক্তিগত বা সামাজিক নিমন্ত্রণে সামন্ত প্রভুদের জন্য পাটির উপর কাপড় বিছিয়ে আলাদা আসনের ব্যবস্থা করতে হতো। প্রজাদের সাথে

---

[২৩৮] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[২৩৯] শ্রী উত্তরন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ০৯-১০।

[২৪০] বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ‘বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ’, *১০ই নভেম্বর ’৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

[২৪১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২

[242] শ্রী উত্তরন, ‘জাতীয় উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমিকা’, *১০ই নভেম্বর ’৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ঃ ০৯-১০।

তারা খেতেন না, খাবার গ্রহণে একই পাত্রও ব্যবহার করতেন না। দেওয়ান, তালুকদার যে পথে হেঁটে যেতেন সেই পথে প্রজাদের একই সাথে হাঁটা ছিল নিষিদ্ধ। প্রভুরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত প্রজাদের দাঁড়িয়ে থাকার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। প্রজারা গ্রামের দেওয়ান, তালুকদার, খীসা, কার্বারি, হেডম্যানদের ভয়ে ভীত থাকতেন। গ্রামের দু একজন অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের সাথে এই শ্রেণির উঠা-বসা থাকলেও প্রজাদের সাথে সামন্ত-শ্রেণির লোকেরা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতো না। এই ধারাকে ভেঙ্গেছে লারমা পরিবার। এম এন লারমার জ্যাঠা কৃষ্ণকিশোর চাকমা দেওয়ানের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ জনগণও যে রাজা দেওয়ানদের মতোই মানুষ এ বোধকে জাগ্রত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর ব্যক্তি জীবনের এ পদক্ষেপ গ্রহণ ছিলসাধারণ জনগণের উপর সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রতিবাদী করার আহ্বান। [২৪২] এম.এন. লারমা ও সন্তু লারমা তিলে তিলে সামন্ত শোষণকে অনুভব করেছিলেন। লারমাদের পরিবার পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত হওয়ার কারণে তাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রসারিত। তারা সামন্ত-শোষণটাকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে এক ধরনের ঘৃণা ও ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল। সেই কারণে গ্রামাঞ্চলকে শোষণমুক্ত ও উন্নত করার দিকে তারা দৃষ্টি দিয়েছিলেন। [২৪৩]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণ পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়িরা ভোগ করেছে সর্বাপেক্ষা বেশি। হেডম্যান, কার্বারিরা ছিলেন রাজার প্রতিনিধি। রাজা যখন গ্রামে আসতেন গরিব-ধনী নির্বিশেষে প্রজাদের উপঢৌকন দিতে হতো। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদেরও রাজার পা ছুঁয়ে সালাম করার রেওয়াজ নিষ্ঠার সাথে পালিত হতো। সামন্ত প্রভুর অত্যাচারে সাধারণ পাহাড়িদের নিত্যদিনের জীবন ছিল অতিষ্ট। চাকমাদের মধ্যে আজও তালুকদার, দেওয়ানদের ব্যাপারে একটা ক্ষোভ কাজ করে। এ কারণে তালুকদার, দেওয়ান টাইটেলগুলো আজ অনেকেই আর ব্যবহার করেন না। [২৪৪] আন্দোলনের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করার জন্য পাহাড়িরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা এটার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। তারা চেষ্টা করেছেন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব সংরক্ষণের। [২৪৫]

সামন্ত প্রভুরা শুধু সামাজিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক ভাবেই নয় শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকেও সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করতে কার্পণ্য করেনি। শিক্ষা মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। প্রজাদের স্বাধীন ব্যবসা বা স্বাধীন মতে চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রেও রাজা হেডম্যানদের ঘোর আপত্তি ছিল লক্ষণীয়। সাধারণ জনহনের প্রগতিশীলতা, চিন্তাধারায় পরিবর্তন, গণতান্ত্রিক মানস-কাঠামোর গড়নকে তারা প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করতে

---

[২৪২] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২

[২৪৩] ঊষাতন তালুকদারর সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[২৪৪] ঐ, ০৩/০১/২০০৩।

[২৪৫] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার ২৯/১/২০০৩।

সচেষ্ট থেকেছে। সাধারণের ঘরের কোনো সন্তান বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হলেই সামন্ত প্রভুর নির্দেশ আসতো তাকে বিবাহ দানের মাধ্যমে সংসার ধর্মে দীক্ষিত করার। [২৪৬]

স্বাধীন সামন্ত রাজার অধীনে শাসিত পাহাড়ি সমাজ সামন্ততন্ত্রের নাগপাশে জর্জরিত ছিল। "রাজা ভগবানের প্রতিনিধি" এই ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা। বড় বড় সামন্ত দখলদারদের যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত প্রভুরা কমবেশি প্রতিরোধের মুখোমুখী হলেও নিজেদের শাসন অব্যাহত রেখেছিল। মোঘল শাসকরা পার্বত্য সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করলেও সামন্ত রাজার সাথে মোঘল শাসকের সংঘাত দীর্ঘসূত্রিতার দিকে অগ্রসর হয়নি। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ করায়ত্ব করলে সামন্ত রাজার ক্ষমতায় আঘাত আসতে শুরু করে। এর বিরুদ্ধে সামন্ত নেতৃত্বের প্রতিরোধ দৃঢ় ছিলনা। কারণ হিসেবে বলা যায় প্রথমত, সামন্ত নেতৃত্বের আপোসকামী মনোবৃত্তি এবংতাদের সাথে প্রজাদের শ্রেণিগত দূরত্ব। [২৪৭] পার্বত্য অঞ্চল ১৭৮৭ সালে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ রাজন্যবর্গ স্থানীয়অভিজাত শ্রেণির সাথে আপোষ করে। পাহাড়িরা একদিকে গভর্ণর ও তার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যদিকে রাজন্যবর্গের দয়া ও করুণার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। অপহৃত হয় সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" লঙ্ঘন করে প্রশাসনিক কাজে বহিরাগতদের অধিক হারে নিয়োগ দান এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলসমূহ তাদের হাতে তুলে দিতে থাকে। এর পরিণতিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে প্রশাসন থেকে বিচ্যুত ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক শোষণের শিকারে পরিণত হয়। [২৪৮]

আদিকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট স্তর বিন্যাস যেমন-রাজা, মৌজার হেডম্যান, গ্রামের কার্বারী এবং সাধারণের মধ্যে যে বৈষম্যমূলক সম্পর্ক ছিল ব্রিটিশরা সুচতুরভাবে তাকে ব্যবহার করে। এ অঞ্চলে শাসন কার্য চালানোর জন্য সামন্ত সমাজের এ প্রথাই ছিল কার্যকর ও উপযোগী। অভিজাত শ্রেণি সাধারণ জনগণের উপর প্রভূত্ব কায়েম করে আর এতে সহায়তা করে শাসক গোষ্ঠী। ফলে দুই শ্রেণির মর্যাদার ব্যবধান প্রকট হতে থাকে। এখানে জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি সম্ভব না হলেও শ্রেণি বিভেদ সৃষ্টিতে তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। [২৪৯]

৬.২. সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আন্দোলন কৌশল

---

[২৪৬] উষাতন তালুকদারে'র সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[২৪৭] তনয় দেওয়ান, 'গ্রামীণ সমাজের গণতন্ত্রায়নে গ্রাম পঞ্চায়েত', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৫১-

[২৪৮] শ্রী রবি, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়', পূর্বে উল্লিখিত স্মরণিকা, পৃষ্ঠা ঃ ১- ৬১।

[২৪৯] বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

গত শতাব্দীর গোড়ার থেকে চাকমাদের মধ্যে সামান্তবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তবে মারমাদের মধ্যে কখনও এরকম আন্দোলন হয়নি। এম এন লারমা ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা বিভিন্ন জাতির জনগোষ্ঠীর সাথে গভীরভাবে মেলামেশা করেছেন। সে সময় সমাজে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মূলত সমাজে প্রচলিত দুটি ধারার কারণে-সামন্ত চিন্তাধারা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তাধারা। রাজনীতি বিষয়ে যথেষ্ঠ ধারণা থাকার কারণে এম এন লারমা এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন। [২৫০]

সামন্তবাদ ও সামন্তবাদ নীতিতে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিল পাহাড়ি ছাত্রদের সচেতন একটি অংশ। তৎকালীন পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পাহাড়ি ছাত্ররা সামন্তবাদ এবং এর দ্বারা সৃষ্ট প্রভুদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তাদের কখনও কখনও সামন্তবাদী সমাজের প্রতিনিধি গ্রামের কার্বারি, মহাজন, হেডম্যান, সার্কেল চীফ বা রাজার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই করতে হয়েছে। তবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করাও ছিল একটি অন্যতম কৌশল। এর মধ্য দিয়ে সমাজ ও গণমানুষের উপর সামন্তবাদের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর বিপরীতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বায়ত্তশাসন ও অধিকার বিষয়ে প্রেষণা যুগিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অনুৎসাহীদের সংগঠিত করা হয়েছিল। কৌশলগত মোটিভেশনের কারণে অনেক বিশেষ ব্যক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। এরূপ কৌশলগত আন্দোলনে যারা বাধার সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বা ক্ষমতাচ্যুত করার পদ্ধতি প্রয়োগ না করে সুকৌশলে তাদের নেতৃত্বকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। [২৫১]

এম এন লারমা জনগণকে অনুধাবন করানোর জোর চেষ্টা করতেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দুরবস্থার কথা। সামন্ত শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন, প্রয়োজন মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং এর জন্য আদিবাসীদের সংগঠিত ও ঐকবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাতেন তিনি। তিনি মনে করতেন আন্দোলন করে অধিকার আদায়ের বিকল্প নাই। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং ভূল দৃষ্টিভঙ্গী, আমলাদের শাসন, শোষণ, ব্যবসায়ীদের শোষণ ও নির্যাতনের কারণে পাহাড়িদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে আর এতে প্রাণ সঞ্চার করে প্রেষণায় উদ্বুদ্ধ করার কৌশল। [২৫২]

৬.৩. বাঙালি ব্যবসায়ী ও মহাজনী শোষণ

১৭৬০ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্তির পূর্ব সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী, যারা পাহাড়ের চূড়ায় বা ভ্যালীতে বাস করতো উভয়ই এক ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, যা তাদের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশেন সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। [২৫৩] পাহাড়িদের সমাজ ছিল আদিম সাম্যবাদ ভিত্তিক, যেখানে পুঁজিবাদের কোনো

[২৫০] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[২৫১] সন্তু লারমার সাক্ষাকার, ১৮/০৮/২০০২।

[২৫২] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[২৫৩] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮।

অস্তিত্ব ছিলনা। এ অর্থনৈতিক কাঠামোতে উদ্বৃত্তমূল্যের ফলাফল ব্যক্তিমুখী নয় বরং সমাজমুখী। [২৫৪] উপনিবেশের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশের পণ্য বিক্রির বাজার হিসেবেই বড়জোর ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যাতায়াত ইত্যাদির কারণে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শিল্প ও বাণিজ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশরা কর সংগ্রহের জন্য পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাথমিকভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যা তুলায় পরিশোধিত বলে গণ্য হতো এবং করের পরিমাণেও তারতম্য ছিল। এই কর কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত বাঙালি মধ্যস্বত্তভোগীদের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। তবে প্রদেয় করের পরিমাণ ব্রিটিশ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল না। এ প্রেক্ষিতে Mackenzie-এর উক্তি হলো ঃ "farmed out yearly some speculators who contracted to realize the tribute, and enjoyed a monopoly of the staple in which it was paid." এই ব্যবস্থাপনায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী শোষিত হতে শুরু করে। কারণ কর আদায়ে নিযুক্ত মধ্যস্বত্তভোগীরা কর হিসেবে অধিক তুলা পাহাড়িদের কাছ থেকে আদায় করতে থাকে, যে অতিরিক্ত আদায়কৃত তুলা তারা কোম্পানিকে কখনই জমা প্রদান করতো না। ফলে পাহাড়িদের নিকট যে পরিমাণ তুলা অবশিষ্ট থাকতো তা তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। এ পরিস্থিতিতে ১৭৭৬ সালে চাকমা রাজা শের দৌলত খানের নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, যে বিদ্রোহ ১৭৮৭ সালে শের দৌলত খানের পুত্র জান বক্স খানের নেতৃত্বে স্থিতিকৃত হয়। এ সময় আর্থিক লেনদেনের যে পরিবর্তন ঘটে তা হলোঃ রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ (প্রতি বিবাহিত ব্যক্তির জন্য ২.৫ টন), কোম্পানির নিকট রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব রাজার উপর অর্পণ, এবং ১৭৮৯ সালে পণ্যের পরিবর্তে মুদ্রায় লেনদেন ব্যবস্থার প্রবর্তিত হয়। এ ক্ষেত্রেও আর্থিক ব্যবস্থা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিপক্ষে অব্যাহত থাকে। কারণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় বাজার ছিল বাঙালিদের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণে, যাদের নিকট উৎপাদক হিসেবে পাহাড়িরা তাদের পণ্য বিক্রি করতো। পাহাড়িরা প্রায়শই বাঙালিদের নিকট থেকে এমন পরিমাণ উচ্চ সুদে অর্থ ধার করতে বাধ্য হতো যে কখনও এর পরিমাণ হতো শতকরা ৬০০ ভাগ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে বিবেচনায় না নিয়ে কোম্পানি যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তা সম্পূর্ণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিরোধী বলে প্রতিপন্ন হয়। [২৫৫]

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সুরেশ নন্দী বাঙালি মহাজনের নিকট থেকে একটি কল্কি বাঁকি কেনার ফলস্বরূপ ১০/১২ বৎসর পর ঐ কল্কির দাম হিসেবে তাকে একটি মহিষ প্রদান করতে হয়। জুম্ম কৃষক অভাবের সময় বাঙালি মহাজনের নিকট থেকে চুক্তিনামা সম্পাদন করে জমি বন্ধকি নেয়। শঠ বাঙালিরা তাদের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চুক্তিনামায় ৫০ টাকাকে ৫০০ টাকা এবং ১০০ টাকাকে ১০০০ টাকা লিখে রাখে। এই টাকার সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, জমি হস্তান্তর ব্যতীত কৃষকের আর কোনো উপায় থাকে না। বান্দরবান, রামগড়, ফেণী, তবলছড়ি এলাকার হাজার হাজার জুম্ম কৃষককে এই একই প্রক্রিয়ায় জমি হারাতে হয়েছে। [২৫৬]

---

[২৫৪] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০।

[২৫৫] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮-৮০

[২৫৬] শ্রী জগদীশ, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বেদখল', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং-৫, ১ম বর্ষ, ১০ নভেম্বর ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪-৪৫।

৬.৪. বাঙালি প্রশাসনের শোষণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম চেতনা অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নের একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি এবং পাকিস্তানিদের সম্পর্ক গঠনে অন্যতম একটি মূল ভূমিকা ছিল অর্থনীতির, যার ভিত্তিতে বাঙালির 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে পরিচিত ৬ দফা দাবির জন্ম দেয়। এতদসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদ ও '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালির আদর্শিক অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে এবং এ অস্ত্র স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়েও কার্যকর রয়েছে। রাজনীতিতে রাষ্ট্র কর্তৃক বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের স্বীকৃতি মিলেছে, এবং একই যুক্তিতে অর্থনৈতিক নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসী সম্পর্কিত কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা ১৯৭৩ সালের বাজেটেও তাদের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সংসদ বিতর্কে এম এন লারমা বলেছিলেন ঃ

> æI come from an economically backward region of Bangladesh … During the British and Pakistan period we were treated like objects of zoo … in the new state of Bangladesh we had expected a change in our fate … but too our utter dismay this budget has made no provision for our development … I don't foresee any change in our fate.. ” [২৫৭]

আদিবাসী জীবনের মূল অবলম্বন ভূমি। প্রভাবশালী ভূমিগ্রাসী চক্রের দ্বারা ক্রমাগতভাবে জমি হারাচ্ছে তারা। শুধু ভূমিলোভী চক্র নয়, কখনও কখনও সরকার স্বয়ং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে উচ্ছেদ করছে আদিবাসীদের। ন্যাশনাল পার্ক, ইকো-পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বাঁধ, সামাজিক বনায়ন, মিলিটারী বেইজ নির্মাণ, বিমান বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ ইত্যাদি সব কাজে আদিবাসীদের জমি ব্যবহৃত হয়েছে। বনবিভাগ সামাজিক বনায়নের নামে চুক্তি করে সমতল আদিবাসীদের সাথে প্রতারণা করেছে। চুক্তি অনুযায়ী সামাজিক বনায়নের গাছ সংরক্ষণ এবং যত্নের দায়িত্ব আদিবাসীদের। এর বিনিময়ে তাদের পাওনা গাছ বিক্রির শতকরা ৬৫ ভাগ টাকা। কিন্তু দশ পনের বছর পর প্রাপ্য শেয়ার আর আদিবাসীদের কাছে পৌঁছে নি। বরং এই গাছ চুরির মিথ্যা মামলায় অনেক আদিবাসীকে দিনের পর দিন এমনকি যুগ অতিক্রান্ত করে মামলার খরচ চালিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। [২৫৮]

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বাঙালি জাতির প্রভাবশালী অংশ নিজ জাতির মেহনতী শ্রেণিগুলিকে শোষণের পাশাপাশি সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে শোষণ করে। শুধু অর্থনৈতিক শোষণ নয়, পাশাপাশি চলতে থাকে সামাজিক শোষণও। আদিবাসীদের শোষণ করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। এর কারণ হিসেবে হায়দার আকবর খান রনো তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক. আদিবাসীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ; দুই. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত এবং অনুন্নত; এবং গ. বাষ্ট্র এবং প্রশাসনের

---

[২৫৭] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯-১১০।

[২৫৮] সঞ্জীব দ্রং, 'বাংলাদেশের আদিবাসী : নিরন্তর সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি নেই', প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত *সংহতি*-তে, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭।

গুরুত্বপূর্ণ পদে বাঙালি জাতির লোকেরা রয়েছে, যাদের সাথে বাঙালি শোষক শ্রেণির শ্রেণিগত একাত্বতা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পারিবারিক আত্মীয়তা। তিনি আশির দশকে বিবিসি চ্যানেল ফোরে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা বাঙালির উপর যা করেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরাও ঠিক তাই করছি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর উপর।" বাঙালি জাতিত্বের অহংবোধ আদিবাসীদের তাচ্ছিল্য করার মনোভাব সৃষ্টি করে। [২৫৯]

৬.৫. পাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আন্দোলন-সংগ্রামের পথিকৃত

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যপক প্রসার ঘটে। এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জ্যাঠা শ্রী কৃষ্ণ কিশোর লারমা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালে বিএ পাশ করে স্কুল পরিদর্শকের চাকরি নেন এবং গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বহু পাহাড়ি জনগণ শিক্ষা আলোর সন্ধান পায়। এম.এন. লারমার বাবা শ্রী চিত্ত কিশোর লারমাও একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে এসকল ব্যক্তিবর্গের অনন্য ভূমিকায় শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধেরও উন্মেষ ঘটে। [২৬০]

ঘনশ্যাম দেওয়ান, স্নেহকুমার চাকমা, চিত্তকিশোর লারমা, কৃষ্ণকিশোর চাকমা, নিরুকুমার চাকমা রাজনীতি অঙ্গনে ছিলেন পাহাড়িদের পথিকৃত। এই প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন, "স্থানীয় রাজনীতিতে, আজকের যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধিকার চেতনা তাদের মাধ্যমেই এটা প্রথম জাগরিত হয়েছিল। আদিবাসী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত তারাই স্থাপন করেছিলেন। ওই প্রাথমিক ভিত-এর উপর নির্ভর করেই এম.এন. লারমা এবং তার অনুসারীরা জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন।"[২৬১]

ঘনশ্যাম দেওয়ান ছিলেন মহাপুরম স্কুলের ছাত্র এবং চিত্তকিশোর লারমার শিষ্য। তিনি ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ঘনশ্যাম দেওয়ান ১৯২৮ সালে পাহাড়ি যুবকদের নিয়ে "চাকমা যুবক সংঘ" নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। সেটা তিন বছর কার্যকর ছিল। সামন্ত নেতৃত্বের বিরোধিতার কারণে সেই সময়ে পার্বত্যাঞ্চলে লেখাপড়া জানা লোক ছিল অনেক কম। তারপরেও তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশরা আন্দোলনটাকে কঠোরভাবে দমনের জন্য ধরপাকড় শুরু করে। তখন ঘনশ্যাম দেওয়ান, স্নেহকুমার চাকমা এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র জেলে আটক হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আন্দোলনটা সেখানেই থেমে যায়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘনশ্যাম দেওয়ান পুরোনো সহকর্মীদের একত্রিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য একটা নিজস্ব বাহিনী

---

[২৫৯] হায়দার আকবর খান রনো, 'আদিবাসী সমস্যা ও সমাধানের কিছু ইঙ্গিত', *সংহতি*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠ: ১৫।

[২৬০] বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

[২৬১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০৩

গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর অর্থের যোগান না থাকার কারণে পরিকল্পনাটি পূর্ণতা পায়নি। ৪০-এর দশকে ঘনশ্যাম দেওয়ান এবং স্নেহকুমার চাকমা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস-এর রাজনীতিতে জড়িত হন। তারা পাহাড়িদের প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরামর্শ দিতেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে নাকি পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবে এ নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং নেতৃবৃন্দ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদলে যুক্ত হন যারা সামন্ত নেতৃত্বের ধারক বাহক ছিলেন এবং পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হতে চেয়েছিলেন। অপর দলে সম্পৃক্ত নেতারা চেয়েছিলেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে। পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। Radcliff Award এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘনশ্যাম দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রাঙ্গামাটির ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে, যা ২০ আগস্ট পর্যন্ত উড়ন্ত ছিল। এ দিনই পাক সরকার বেলুচ রেজিমেন্ট পাঠিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের এ আন্দোলনকে প্রতিরোধ করে। অন্যদিকে বোমাং সার্কেলের নেতৃস্থানীয়রা এই দুই মতকে অগ্রাহ্য করে বান্দরবনে বার্মার পতাকা উত্তোলন করে। ঘনশ্যাম দেওয়ান এবং স্নেহ কুমার চাকমা ভারত বিভক্তিটা স্বীকার না করার কারণে পাক সরকারের রোষানলে পড়ে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে চিরতরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্নেহকুমার ছিলেন যোদ্ধা প্রকৃতির এবং সশস্ত্রপন্থী। তিনি বলতেন, যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই, অধিকার আদায়ের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করতে হবে। পার্বত্যাঞ্চলে স্নেহকুমার ছিলেন কিংবদন্তী নেতা ও রাজনীতিবিদ। সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাল কাজে অংশগ্রহণকারী বা অন্যায়ের প্রতিবাদকারীকে স্নেহকুমারের সাথে তুলনা করে প্রশংসিত করা হতো। ঘনশ্যাম দেওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মধ্যবৃত্তিসুলভ। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। [২৬২] পরবর্তীতে ঘনশ্যাম দেওয়ান ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্য হয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের সকল বিষয়ে পরামর্শ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ।[২৬৩]পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রামের এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে "মার্শাল ল" প্রবর্তিত হওয়ার ফলে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কার্যক্রম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। [২৬৪]

৬.৬. সরকারি উদ্যোগে ভারত থেকে আগত মোহাজিরদের পার্বত্যাঞ্চলে পুনর্বাসন

পঞ্চাশ দশকের দিকে প্রথম সরকারি উদ্যেগে পার্বত্য অঞ্চলে বহিরাগতদের পুনর্বাসন শুরু হয়। লংগদু, নানিয়াচর, আলিকদম, লামা ও নাক্ষ্যাংছড়িতে পুনর্বাসন করা হয়। এই পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের প্রবল প্রতিবাদ, পাহাড়ি-অপাহাড়ি সংঘর্ষ, স্মারকলিপি পেশ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পুনর্বাসন স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তী

[২৬২] ঐ, ২২/০৭/২০০২।
[২৬৩] ঐ, ২২/০৭/২০০২।
[২৬৪] ঐ, ২২/০৭/২০০২।

সময়ে ১৯৬৬ সালে পাক সরকার ভারত থেকে আগত কিছু সংখ্যক মোহাজিরদের পার্বত্য অঞ্চলে জোর করে পুনর্বাসন করেছিল। [২৬৫]

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার ইতিহাস। এই জাতিগুলো বহু পূর্ব থেকেই সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে নির্যাতিত হয়ে আসছে। তাই অতীত কাল থেকে এই জনগোষ্ঠীকে শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসতে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সময় সামন্ত রাজার অধীন ছিল। এই সমাজ ব্যবস্থার উপর সর্ব প্রথম আঘাত আসে মোগল শাসকদের পক্ষ থেকে। মোগল শাসকরা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত রাজার উপর আক্রমণ করে এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এ আক্রমণ বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে। ব্রিটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনের ক্ষেত্রে আর কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখলের পর এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে দৃষ্টি দেয়। ১৭৭৭ সালে ব্রিটিশরা সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সেই আক্রমণ প্রতিহত করে। পরবর্তীতে একইভাবে ১৭৭৮, ১৭৮০ ও ১৭৮২ সালে যুদ্ধ পরিচালনা করে ব্যর্থ হয়। তবে ১৭৮৭ সালে সামন্ত অভিজাত শ্রেণির একটি সুবিধালোভী গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তৎকালীন রাজা জানবক্স খাঁ পরাস্থ হন। এরই ধারাবাহিকতায় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। মূলত এখান থেকেই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্ব-জাতির স্ব-নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং ভিন্ন জাতি কর্তৃক অস্তিত্ব বিপন্নতার যাত্রা শুরু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ সম্রাজ্যভুক্ত হলে শুধুমাত্র কর প্রদারকারী রাজ্যে পরিণত হওয়া ছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় তাদের ঐতিহ্যগত স্বায়ত্তশাসনের উপর প্রত্যক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'চট্টগ্রাম' ও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' এই দুই ভাগে ভাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে চিহ্নিত করে। এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের প্রথমবারের মত পার্বত্য অঞ্চল তৎকালীন বাঙলা প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ প্রবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে। [২৬৬]

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে ধর্ম ভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বে ভারতবষর্কে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্তকরণের মধ্য দিয়ে। ভারত বিভক্তিকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার ৯৭.৫ শতাংশ ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাঙালির সংখ্যা ছিল ২.৫ শতাংশ, যার মধ্যে ১.৫ শতাংশ ছিল মুসলিম। পার্বত্য চট্টগ্রাকে ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ একই মতধারায় অবস্থান করলেও রেডক্লিফের নকশা অনুযায়ী এ অঞ্চল

---

[২৬৫] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩-৫৪।

[২৬৬] উদয়ন চাকমা, 'জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন, বিভেদপন্থী চক্রান্ত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০০১, রাঙ্গামাটি, পৃষ্ঠা ঃ ৫-৬।

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ঘনশ্যাম দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি অংশ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির বিপক্ষে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন, যাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই জুম্মদেরকে ভারতপন্থী আখ্যা দিয়ে একের পর এক শোষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়েই The Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation 1881 বাতিলের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে লঙ্ঘন করে এবং পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই বহিরাগতদের পূনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কারণ হিসেবে ব্রিটিশের চক্রান্ত ও ভারতপন্থী নেতৃবৃন্দের উদাসীনতার পাশাপাশি তৎকালীন আদিবাসী নেতৃত্বের অদূরদর্শীতারকেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সত্য হিসেবে ধারণ করে রেখেছে। [২৬৭]

মূলত পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জাতীয় চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯০৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ‘চাকমা যুবক সমিতি’ গঠন করার মধ্য দিয়ে। এই সমিতির উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নয়ন হলেও জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটে এখান থেকেই। কারণ এই সমিতির কতিপয় নেতৃবৃন্দ বিশ ও ত্রিশ দশকে জাতীয় চেতনাকে অনেকখানি এগিয়ে নিতে সমর্থ হন। ১৯২০ সালে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি’ নামে অপর একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়, এর নেতৃত্বে ছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান। এ সংগঠনঠি মূলত ঃ হেডম্যানদেরই স্বার্থ রক্ষা করেছে, জনগণের নয়। এ ছাড়াও Hillman Association নামে অপর একটি সংগঠন সমসাময়িক সময়ে গড়ে উঠে, এটিরও নেতৃত্বে ছিলেন অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা রাজন্যবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার্থেই সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৫৬ সাল থেকে এ অঞ্চলের ছাত্র সমাজ ধর্মান্ধ ও স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অনন্ত বিহারী খীসা এবং সুধাকর খীসা। ১৯৬০ সাল থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকে।

৮. আনুষঙ্গিক রচনাদি পর্যালোচনা (Literature Review)

আনুষঙ্গিক রচনাদি পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত বইগুলোকে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ কিছু গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগুলির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের ঐতিহাসিক পটভূমি, জনসংখ্যা, খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায় Lt. Col. T. H. Lewin কর্তৃক লিখিত *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein, With Comparative Vocabularies of the Hill Dialects*; সতীশ চন্দ্র ঘোষের *চাকমা জাতি জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত,* কামিনী মোহন দেওয়ানের *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী;* মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম ও

[২৬৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫-৬।

সুগত চাকমা সম্পাদিত *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*; মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা (প্রথম খণ্ড);* J.P. Mills and the Chittagong Hill Tracts 1926-27 শিরোনামের সফর-ডায়েরীভিত্তিক স্মৃতিকথা; William Van Schendel, Wolfgang Mey and Aditya Kumar Dewan রচিত গ্রন্থ *The Chittagong Hill Tracts : Living in a Borderland,* এবং পান্নালাল মজুমদারের *The Chakmas of Tripura* থেকে। এগুলোর সাথে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্যে বিশেষ আইন হিসেবে প্রবর্তিত *The Chittagong Hill Traccts Regulation, 1900* সংযুক্ত করলে ঐ অঞ্চলের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্রের বিষযটিও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয়তঃ কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেখানে পাহাড়ি জাতিসমূহের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনাকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অস্বীকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব সাহিত্যে বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক কাল থেকে এই জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে। এই লড়াইকে শান্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ বিষয়ে বিভিন্ন শাসন আমলে সরকারের ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও কোনো কোনো গ্রন্থে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলো হলো, Wolfgang Mey সম্পাদিত (১৯৮৪) *Genocide on the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : They are Now Burning Village After Village*; Amena Mohsin কর্তৃক লিখিত *The Politics of Nationalism,* মশিউর রহমানের *Struggling Against Exclusion: Adibasi in Chittagong Hill Tracts Bangladesh;* মঙ্গল কুমার চাকমা সম্পাদিত *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*; গোলাম মোর্তোজার *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন* ইত্যাদি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও বাঙালির সংকট এবং বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায় মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সংকট ও সম্ভাবনা* গ্রন্থ থেকে। আদিবাসীদের দারিদ্রের কারণ এবং তার সাথে জাতিগত বঞ্চনার যোগসূত্র সম্পর্কে জানা যায় Shapan Adnan (2004)-এর *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict, Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* গ্রন্থের মাধ্যমে। Rajkumari Chandra Roy-এর *Land Rights of the Indigenous Peoples of Bangladesh* (2000)[২৬৮] গবেষণা রিপোর্টেও আদিবাসীদের ভুমি অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পাহাড়ি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অস্বীকৃতি নিয়ে রয়েছে আদিত্য কুমার দেওয়ান ও ভূমিত্র চাকমা-সহ বেশ কিছু গবেষকের গবেষণা প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভ-সহ আরও কয়েকটি বই।

তৃতীয়তঃ পর্যালোচনার জন্য নির্বাচিত কোনো কোনো গ্রন্থে পাহাড়ি জাতিসমূহের লড়াই সংগ্রামকে নিরাপত্তার দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থগুলোতে তাদের সংগ্রামকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'সন্ত্রাসী' কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'মানুষ বা জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা' হিসেবে নয়। এসব গ্রন্থের লেখকগণ এই আন্দোলন-লড়াইয়ে

---

[২৬৮] Rajkumari Chandra Roy, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫০-৮০, ৮৪-১২১ এবং ১৭০-১৮১।

নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের ভূমিকাকে 'বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পাঁয়তারা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু গ্রন্থে তাদের উদ্যোগকে প্রতিহত করা 'বাংলাদেশের স্বাধীন ভূখণ্ডের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি' বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ হলো মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (২০০১) বীরপ্রতীক-এর *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়ন;* হাবিবুর রহমানের *বিভ্রান্তির বেড়াজালে পার্বত্য জনপদ*, আতিকুর রহমানের *পর্বত প্রকাশ (অনুসন্ধান)*, আলীমুজ্জামান হারুনের *সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী* ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ কোনো কোনো লেখক তাদের গ্রন্থে পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ শান্তিচুক্তিকে পাহাড়ি জাতিসমূহের অধিকার আদায় ও উক্ত এলাকার শান্তি-শৃংখলা রক্ষার একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে এর কিছু সংশোধন ও বাস্তবায়ন হওয়া বা না হওয়ার একাধিক কারণের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করেছেন। আবার কোন লেখক 'পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথ' হিসেবে শান্তি চুক্তিকে বিবেচনা করেননি। তাদের মতে, বাংলাদেশের অপরাপর অংশের ন্যায় দারিদ্র ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে শক্তিশালি করার মধ্য দিয়ে এ এলাকার সমস্যা সমাধান হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গবেষক মশিউর রহমান তার গবেষণা প্রবন্ধে পাহাড়ি জাতিসমূহের জন্য এ ধরনের গতানুগতিক উন্নয়নের ধারণাকে এ এলাকার অন্যতম একটি সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলো হলো, মাহফুজ পারভেজ-এর *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, আহমদ ছফার *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*, হুমায়ুন আজাদের *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* প্রভৃতি।

সাহিত্য পর্যালোচনার গ্রন্থগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অনেক লেখক "উপজাতি" এবং অনেকে "ক্ষুদ্র জাতি" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থগুলো পর্যালোচনার সময় লেখকের ব্যবহৃত শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

ক) ১ম ধারাভূক্ত গ্রন্থাবলী

১ম ধারাভূক্ত গ্রন্থাবলী অর্থাৎ যেগুলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগুলির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে জানার অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে ভারতীয় পুলিশ বিভাগের ব্রিটিশ কর্মকর্তা **R. H. Sneyd Hutchinson** কর্তৃক লিখিত *Chittagong Hill Tracts* যা *Eastarn Bengal and Asam District Gazetteers*-এর অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ সালে। গ্রন্থটিতে Hutchinson পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বিভিন্ন জাতির বিবরণ, তাদের বসতি গড়ার ইতিহাস, ব্রিটিশ শাসনের সাথে তাদের সম্পর্ক, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক বিভাজন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। এছাড়া তিনি লিখেছেন তাদের শিক্ষা,

লোককাহিনি, স্বাস্থ্য, কৃষি ও বনভূমি, পেশা ও বাণিজ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমি-রাজস্ব, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে। এই গ্রন্থটি অভিসন্দর্ভে মূল বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

কামিনী মোহন দেওয়ান (১৯৭০), *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী*[২৬৯] গ্রন্থে লেখক চাকমা জাতির ইতিহাস, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থা ও ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির সময় পাহাড়িদের অবস্থান এবং সত্তরের দশক পর্যন্ত পাহাড়িদের রাজনৈতিক জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক তার শৈশব জীবনের পাশাপাশি বাল্য জীবন ও পরিণত বয়সের ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা করেছেন। চাকমা জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, দিগ্বিজয়কালে চাকমারা এক সময় বার্মা রাজ্য দখল করে এবং সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বসতি স্থাপন করে। চাকমারা এক সময় চম্পক নগরবাসী ছিল। তখন এ কারণে চাকমাবাসীকে বার্মাবাসীগণ 'চাম্পাবাসী' বলে উল্লেখ করত। ধারণা করা হয়, উচ্চারণের তারতম্যে চাম্পা হইতে ক্রমে চাকমা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং আসামের অহম জাতির লোকেরা চাকমাদের অংশ।

কামিনী মোহন দেওয়ান-এর লেখা থেকে জানা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অতীতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে বর্তমানের পার্থক্য রয়েছে। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা একমাত্র জুম কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। জীবন ধারণের সহজ উপায় থাকাতে পরিবারের একমাত্র স্ত্রী লোকেরাই সাধারণত গৃহকর্ম ও জুমের কাজ সম্পন্ন করত। পুরুষরা গভীর অরণ্যে শিকার এবং বিভিন্ন ক্রিয়ামোদে সময় অতিবাহিত করত। সেই সময় বিলাসিতার প্রয়োজন কেউ উপলব্ধি করতনা। ফলে গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয়তা ছিল অতি নগণ্য। তারা প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য শস্য নিজেরা উৎপন্ন করত এবং নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র নিজেরা তাঁতে বুনত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এককানি পরিমাণ জুমে ২০/২৫ মণ ধান উৎপন্ন হলেও এখন ৫/৬ মণের অধিক ধান উৎপন্ন হয় না। এখনও তারা জীবিকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে পিছিয়ে রয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষা ও সভ্যতার সংমিশ্রণে, জীবন যাপনের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হওয়ায় এবং ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি না পাওয়াতে তারা ধীরে ধীরে অভাবগ্রস্ত হচ্ছে।[২৭০]

কামিনী মোহন দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অন্যতম নেতা ছিলেন। সুতরাং জীবন কাহিনী হলেও গ্রন্থটিতে বহু রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ রয়েছে সেই সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থার। গ্রন্থটিতে লেখক তার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের কিছু কাহিনী তুলে ধরেছেন। অবশ্য এর মাধ্যমে পাহাড়ি আদিবাসীদের সেই সময়ের জীবন জীবিকার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ১৯৪৭ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গারও কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭১] সুতরাং ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী হলেও ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিক এবং পাকিস্তান শাসনামলের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জানার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

---

[২৬৯] কামিনী মোহন দেওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩।

[২৭০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫-১৬।

[২৭১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬২-২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সতীশ চন্দ্র ঘোষ (২০১০), *চাকমা জাতি ঃ জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটি চাকমা জাতির উদ্ভব, পরিচয়, আবাসস্থান, রীতি-নীতি, জীবন-জীবিকা, শাসন ব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[২৭২] চাকমা জাতি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি প্রকাশ করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

গ্রন্থে বলা হয়েছে, পার্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে চাকমাদের আসন শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শিল্প সাহিত্যে তারা অনেক অগ্রসর। চাকমাদের শারীরিক গঠনের সাথে মঙ্গোলীয়দের মিল রয়েছে। তাদের বর্ণ গৌর, মুখমন্ডল গোলাকার, নাক চ্যাপ্টা, গন্ডদেশের অস্থি উন্নত, বক্ষ প্রশস্ত, বাহুযুগল মাংসল সর্বোপরি অক্ষিগোলকের কপিলাভাস ও বক্র দৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ়। অর্থাৎ পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মঙ্গোলিয়ান সংজ্ঞার সাথে চাকমাদের সাদৃশ্য রয়েছে। চাকমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণে পন্ডিত F. Muller ব্রহ্মদেশ, আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিবাসী জাতিমাত্রকেই 'লোহিতিক' বংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ অন্যান্য জাতির ন্যায় চাকমা জাতিরও মূল শাখা লোহিত্য নামান্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরভূমি থেকে আগত। অনেক পন্ডিতগণ চাকমাদেরকে 'তিব্বতীব্রহ্মা' নামে অভিহিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ডেপুটি কমিশনার Captain Thomas Herbert Lewin পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ব্রহ্মদেশীয় নামকরণে 'খ্যয়ংথা' এবং 'টংথা' শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ব্রহ্মভাষায় 'খ্যয়ং' অর্থ নদী, 'টং' অর্থ পর্বত এবং 'খা' শব্দের অর্থ সন্তান। অতএব নদীকূলে বাসকারীদেরকে 'খ্যয়ংথা' অর্থাৎ নদীর সন্তান এবং পর্বত শৃঙ্গবাসীদের 'টংথা' অর্থাৎ পাহাড়ের সন্তান বলা হয়। এই সংজ্ঞা মতে চাকমাদেরকে তিনি 'খ্যংয়থা' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৭৩] ব্রহ্মদেশীরা চাকমাদেরকে 'ছেক' নামে নির্দেশ করে। কুকিরাও ডাকে 'টুইছেক'। তাদের ভাষায় 'টুই' শব্দের অর্থ 'জল'। সুতরাং তাদের মতেও চাকমারা জলতীরবাসী জাতি। সম্ভবত চাকমাদেরকে কর্ণফুলী ও তার করদ চেঙ্গী, শুভলং, কাচালং প্রভৃতি তীরে বসবাস করতে দেখে কুকিরা 'টুইছেক' আখ্যা প্রদান করেন। অবশ্য চাকমারা নিজেদেরকে চম্পক নগরবাসী বলে দাবি করেন। তারা মনে করেন তাদের আদিম বসতি-স্থান 'চৈম্পানগো' বা চম্পক নগর হতে চাকমা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

এই গ্রন্থে ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের শাসনের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, ১৮৭৩ সালে বঙ্গীয় সরকারের আদেশে পরিবার প্রতি চার টাকা প্রদান করার রীতি করা হয়। এর মধ্যে সরকার এক টাকা, রাজা দুই টাকা এবং হেডম্যান এক টাকা করে পান। এছাড়া পাহাড়ে লাঙ্গল চাষের জন্য জমি প্রার্থনা করলে সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, রাজা অথবা হেডম্যান তার অনুমতি দেন। স্থানীয় সুপারিন্টটেন্ড সেই জমির খাজনা নির্ধারণ করে। একবার খাজনা ধার্য হলে ১০ বৎসর অপরিবর্তিত থাকে। খাজনা আদায়ের দায়িত্ব থাকে হেডম্যানের উপর। হেডম্যানদের সাহায্য করে খিসা ও কার্বারিরা, তাই খিসা এবং কার্বারিদের খাজনা দিতে হয়না। জাতীয় বিধান মতে রাজা হেডম্যান, খিসা বা কার্বারির বাড়ি ভিন্ন অন্য কারও বাড়িতে গমন করতে পারেনা। দৈবযোগেও কোনো সাধারণ বাড়িতে পদার্পণ করলে রাজা কর্তৃক সেই পরিবারকে খিসা বা কার্বারি উপাধি দিতে হয়। রাজার আদেশ ছাড়া সাধারণ

[২৭২] সতীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।
[২৭৩] ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৩।

চাকমারা স্বর্ণালংকার, জুতা, মোজা ও খড়ম ব্যবহার করতে পারে না। এমনকি পাকা বা নকশাযুক্ত ঘর তৈরি করার অধিকারও নাই সাধারণ চাকমার।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে এক সময় দাস প্রথা ছিল এই গ্রন্থের মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সরকারি কাগজ পত্রে দেখা যায়, এই পার্বত্য অঞ্চল হতে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট তিন শতাধিক অর্ধমণ দাস উদ্ধার পেয়েছিল। এতে চাকমা দাস যে ছিলনা তার কোনো প্রমাণ নাই। সমাজের চোখে ঘৃণিত হলেও অভাবের তাড়নায় এবং চট্টগ্রামবাসীদের অনুকরণে তারা হয়ত দাসত্ব গ্রহণ করেছিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মিঃ গুডউইন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিদৃষ্ট হয় চট্টগ্রামে দাসত্ব প্রথা ছিল। পিতামাতাহীন অপর সম্পর্কশূন্য নিম্নশ্রেণির লোকেরা অভাবে পড়ে আত্মবিক্রয়ে দাসত্ব গ্রহণ করত। প্রভুদের বিক্রয় ক্ষমতাও ছিল। ক্রেতা প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অধিকার পেতেন। এই দাসত্ব প্রথার বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের দায়ে দাসত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। নিরূপায় অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং নিদিষ্ট বেতন হতে সুদ বাদ যেয়ে ক্রমে মূলধন পরিশোধ হতে থাকে। অনেকে সন্তান বা পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে উত্তমর্ণের গৃহে রাখে এবং ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে তাদের দাসত্বদায় ঘুচে যায়। 'আইন শাসনে যদিও দাস বিক্রয় রহিত, কিন্তু আত্ম বিক্রয় এবং ভূমির কর মুক্তিতে দাসপনা বিরল নহে'। [২৭৪]

এই গ্রন্থে পাহাড়িদের সরলতার কথা অনেক বর্ণনা করা হয়েছে এবং বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের ঠকানোরও অনেক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কাপ্তেন লুইন তার 'ফ্লাই অন্ দি হুইল' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমি নীচ বাঙালি মোক্তারদিগের দ্বারা অতিশয় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়াছিলাম। তাহারা পাহাড়িদিগের অজ্ঞতা ও সারল্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিল। ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া তারা পাহাড়িদেরকে মোকদ্দমা দায়ের করিতে উত্তেজিত করিত। ধূর্ত বাঙালি মোক্তার ও টর্নিগণ এই পার্বত্য প্রদেশের গরল স্বরূপ। তাহাদিগকে এখান হইতে তাড়াইতে আমি কদাপি শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই। ... চতুর বাঙালিগণ পাহাড়িদিগের প্রতি অত্যাচারপূর্বক টাকা বাহির করিবার জন্য আমাদের আইনকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিত।' [২৭৫] এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নয় তার প্রমাণ লেখক পেয়েছেন।

গ্রন্থটি পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা জাতির বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থে অন্য পাহাড়ি জাতির যৎসামান্য কিছু উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য কামিনী মোহন দেওয়ান তার আত্ম জীবনীমূলক গ্রন্থে দাবি করেছেন, চাকমাদের খাদ্য ও বস্ত্র বিষয়ে এই গ্রন্থে কিছু অতিরঞ্জিত ও অযৌক্তিক বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুই-একটি বিষয় বাদ দিলে অন্যান্য জাতি ছাড়া চাকমারাও এই গ্রন্থ হতে অনেক নতুন জ্ঞান লাভ করবে। সুতরাং নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে গ্রন্থটিকে চাকমা জাতির উপর লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

---

[২৭৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮।

[২৭৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২০, ৩২১।

The Chittagong Hill Traccts Regulation, 1900[২৭৬] ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের দিকনির্দেশক বিধান হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব আদায়, প্রশাসনিক ক্ষমতা ইত্যাদি এই অভিসন্দর্ভে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **Raja Devasish Roy & Pratikar Chakma** সম্পাদিত সংস্করণে (2010) *Chittagong Hill Traccts Regulation, 1900*-এর মূল বিষয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু লোক বাস করে। অনেকে এই অঞ্চলে অভিগমন করে আবার অনেকে এই অঞ্চল থেকে অন্যত্র অভিগমন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রধান আইনগত বিধি-বিধান হলো CHT Regulation, 1900। এই বিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মং বা যে-কোনো পাহাড়ি আদিবাসী, লুসাই পাহাড়, আরাকান পার্বত্য অঞ্চল বা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কমিশন আইন, ১৯৯৮' পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি জাতিকে উল্লেখ করেছে। এগুলি হলো ব্যোম, চাকমা, চাক, খুমী, খিয়াং, মারমা, ম্রো, লুসাই, পাংখোয়া, তঞ্চঙ্গ্যা এবং ত্রিপুরা। ১৯ শতকে চট্টগ্রামের বাংলাভাষী অল্প কিছু কৃষক পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমতল থেকে দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে। ১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-পাহাড়িদের সংখ্যা ছিল শতকরা ২ভাগ। ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৮ ভাগে পৌঁছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন বাঙালিদেরকে সেখানে অ-পাহাড়ি বা অ-আদিবাসী নামে আখ্যায়িত করেছে।[২৭৭]

CHT Regulation 1900-এ চারটি অংশ রয়েছে। প্রথম ১-২০ পর্যন্ত আইনের অনেক প্রতিবিধান রয়েছে। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের অভ্যন্তরে আইনের তালিকা রয়েছে। তৃতীয় অংশে বিচার ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা, চীফ ও হেডম্যান নিয়োগ, জুম চাষ, খাজনা আদায়সহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। চতুর্থ অংশে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে ১৮টি বিভাগের ৫৪টি প্রধান আইন রয়েছে। অধ্যায় III -এর ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তিন ডেপুটি কমিশনারের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা থাকবে। এই ম্যানুয়েলে বলা হয়েছে, ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত কোনো অপাহাড়ি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে পারবেনা। ডেপুটি কমিশনার ইচ্ছে করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ভঙ্গের কারণে যে কোনো বহিরাগতকে এই অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার, কর আদায়সহ সকল প্রশাসনিক কাজের মূল দায়িত্বে থাকবে ডেপুটি কমিশনার। পার্বত্য চট্টগ্রামে যত অফিসার কর্মরত সকলে ডেপুটি কমিশনারের অধীনে থাকবে। স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় প্রয়োজনে ছোট আইন তৈরি করতে পারবে তবে তা ব্রিটিশ আইন

---

২৭৬ Raja Devasish Roy & et. al., প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯।

২৭৭ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

সমর্থনযোগ্য হতে হবে। ১৮৯৮ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ আইনে যদি ডেপুটি কমিশনার কারো মৃত্যুদন্ড দেয় তাহলে উপরের কোর্টে সে আপিল করতে পারবে।[২৭৮]

নতুন কাউকে ২৫ একরের বেশি জমি লিজ দেওয়া যাবেনা। হেডম্যানের অনুমতি ব্যতীত কেউ জমি লিজ নিতে পারবে না। ৩৪ ধারার (a) (i) উপধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক পাহাড়ি বা অপাহাড়ি পরিবার সমতল ভূমির সর্বোচ্চ ৫ একর খাস জমি লাঙ্গল চাষ করতে পারবে। এছাড়া প্রতি পরিবার ৫ একর জমিতে বনায়ন করতে পারবে। ডেপুটি কমিশনারের সন্তুষ্টিতে পরবর্তীতে বনায়নের জমি ১০ একর বৃদ্ধি পেতে পারে। (ii) উপধারায় উল্লিখিত হয়েছে, হেডম্যানের সুপারিশক্রমে উপ-বিভাগীয় কর্মকর্তা পাহাড়িদের জমি ইজারার অনুমতি প্রদান করবেন। (iii) উপধারায় বলা হয়েছে - যে সকল জমিতে পূর্বে কখনো চাষ করা হয়নি সে সকল জমি চাষের ক্ষেত্রে প্রথম তিন বছর কর প্রদান করতে হবেনা। ৩৪বি ধারায় - ডেপুটি কমিশনার নদী-তীরবর্তী যে-কোনো অঞ্চলে জুম চাষ বা লাঙ্গল চাষে বাঁধা প্রদান করতে পারে; যদি এই চাষের ফলে নদীতে পলি জমে বন্যার সৃষ্টি করে বা নিম্নাঞ্চল ডুবে যায়। ৩৪সি ধারায়- ভূমি আইন থাকা সত্ত্বেও রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা বলে ডেপুটি কমিশনার যে-কোনো ধরনের বা যে-কোনো পরিমাণের জমি যে-কোনো প্রয়োজনে কিছু শর্ত সাপেক্ষে পাহাড়ি বা অপাহাড়িকে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। ৩৫ ধারায়- পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল তিন সার্কেল চীফ অর্থাৎ চাকমা চীফ, বোমাং চীফ এবং মাইনী ভ্যালী মং চীফের অধীনে থাকবে। ৩৬ ধারায়- ১৮৯১ সালের সেনসাসের জন্যে ১৮৯০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩৩টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলিকে তালুক বলা হয়। বোমাং সার্কেলের অধীনে ১৮ তালুক, চাকমা সার্কেলের অধীনে ৯ তালুক এবং মং সার্কেলের অধীনে ৬ তালুক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩৮ ধারায়- সার্কেল চীফ ডেপুটি কমিশনারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রশাসনের সকল বিষয়ে তাকে সহায়তা করবে। সার্কেল চীফ নিয়মিত তার এলাকা পরিদর্শন করবে এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে হেডম্যান কাজ করবে। হেডম্যান মৌজার খাজনা আদায় ও শান্তি শৃংখলার দায়িত্ব পালন করবে এবং কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে ডেপুটি কমিশনারকে জানাবে। ৩৮এ ধারায়- পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক উপবিভাগের দায়িত্বে উপবিভাগীয় অফিসার ডেপুটি কমিশনারের অধীনে কাজ করবে। উপ-বিভাগ তিনটি হলো রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবান। ৩৮বি ধারায়- ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে পুলিশের জেলা পরিচালক (District Superintendent)-এর দায়িত্ব এবং সহকারী কমিশনার পুলিশের সহকারী পরিচালক (Assistant Superintendent) -এর দায়িত্ব পালন করবে। ৩৯ ধারায়- পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডেপুটি কমিশনার চীফকে পরামর্শ প্রদান করবেন। এ উপলক্ষে বছরে কমপক্ষে দু'টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করবেন ডেপুটি কমিশনার। এখানে চীফ এবং তার প্রতিনিধিত্বকারীরা আমন্ত্রিত হবেন। ৪০ ধারায়- মৌজার হেডম্যান আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা অনুসারে তাদের আইন অমান্যকারীর বিচার করবে এবং সর্বোচ্চ ২৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে। ৪১ ধারায় – পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেপুটি কমিশনারের জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ বা এ সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। সে

[২৭৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬।

যে-কোনো মৌসুমে, যে-কোনো অঞ্চলে জুম চাষ বন্ধ এবং জুম চাষ স্থানান্তরে বাঁধা দিতে পারে। ৪১ এ ধারায়– হেডম্যান তাদের নিজ নিজ মৌজার সম্পদ সংরক্ষণ করবেন। ৪২ ধারায়- মৌজার হেডম্যান প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার থেকে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে খাজনা আদায় করবে। ৫২ ধারায়- পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মং বা যে-কোনো পাহাড়ি আদিবাসীদের জন্য এই অঞ্চল সংরক্ষিত থাকবে। তবে লুসাই পাহাড়, আরাকান পাহাড়ি অঞ্চল বা ত্রিপুরার কোনো ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতে পারে ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি নিয়ে।[২৭৯]

CHT Regulation, 1900-তে পাহাড়ি জাতিগুলির নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কিছু বিধি বিধান রয়েছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্যে করা হলেও এখানে ডেপুটি কমিশনারকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যা পাহাড়িদের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব করে। CHT Regulation, 1900 এর উপর কিছু আলোচনা করা হলেও এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়নি। এই আইন পাহাড়িদের অনেকটা অনুন্নত ও অন্ধকারে রেখেছে। যুগ উপযোগী উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখা হয়নি। অথচ গ্রন্থে বিষয়গুলোর সমালোচনা করা হয়নি। তবুও CHT Regulation, 1900 সম্পূর্ণ বোঝার জন্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

J.P. Mills and the Chittagong Hill Tracts 1926-27[২৮০] রিপোর্টে পার্বত্য অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের আলোচনা দেখা যায়। এখানে দেখা যায় মোঘল আমলে অত্র এলাকায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান। পরবর্তিকালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমও একইভাবে পরিচালিত হয় যা কিনা পার্বত্য এলাকার প্রকৃত জীবনযাত্রায় তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। যদিও এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল যা এখানকার চিরাচরিত গোষ্ঠীগত ব্যাবস্থার পরিপন্থী ছিল। পরবর্তিতে পার্বত্য অঞ্চলে 'সার্কেল চিফ' ব্যাবস্থা নানা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই রিপোর্টে বিশেষত 'চিফ' ব্যাবস্থার ইতিহাস, এদের দায়িত্ব এবং এ সংক্রান্ত সৃষ্ট সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১৯৫৮ সালে Asiatic Society of Pakistan থেকে প্রকাশিত **Pierre Bessaignet**-এর গ্রন্থ *Tribesmen of The Chittagong Hill Tracts* ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত ঃ পাহাড়ী মানুষ, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজস্ব আদায়, একটি তঞ্চংগা পরিবার, মগদের দুটি গ্রাম, চাকমাদের শিশুকালের বিবরণ, একটি ম্রো পরিবার, আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ। এছাড়া গ্রন্থটিতে ৩টি পরিশিষ্ট সংযুক্ত হয়েছে ঃ বহুমাত্রিক তথ্য, চাকমা রাজা এবং অন্যান্যদের লিখিত দলিল এবং জুন নিবলেটের স্মৃতিকথা।[২৮১]

২৭৯ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৭-১৩১।

২৮০ J.P. Mills and the Chittagong Hill Tracts 1926/27 (Annotated and Commented by Wolfgang Mey), 2009.

২৮১ Prof. Pierre Bessaignet ১৯৫৭ সালে ইউনেস্কো'র একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। তার প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল জাতিতত্ত্ব বা Ethnology। এজন্য তিনি প্রথমেই এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তার গবেষণার বিষয় হিসেবে নেন। পার্বত্য

Prof. Pierre Bessaignet বলছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আদিম অধিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকে টিকে থাকা এসব আদিবাসীরা তাদের প্রাচীন শুদ্ধতা বা জীবনযাত্রা বজায় রেখেছে। অবশ্য তাদের মধ্যেকার সকলেই আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটা একটা বিশেষ দিক যে, এ সকল আদিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং যাদের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতোই একটি পারিবারিক কাঠামো রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে তারা দীর্ঘ সময় ধরে অগ্রগামী সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত।[২৮২] ১৯৫১ সালের আদমশুমারিকে উদ্ধৃত ক'রে তিনি জানাচ্ছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা হলো ২,৮৭,৬৮৮ যার মধ্যে আদিবাসী ২,৬১,৫৩৮ এবং বাঙালি হলো মাত্র ২৬,১৫০ জন।[২৮৩] তিনি আরো বলছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা জাতিতাত্ত্বিকভাবে "পূর্ব পাকিস্তানে"র স্থায়ী (settled) জনসাধারণ থেকে আলাদা। তিব্বত থেকে ইন্দোচীন বিস্তৃত অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে ব্যাপক মিল রয়েছে। দৈহিক গঠনের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীভুক্ত।[২৮৪] Prof. Pierre Bessaignet আরো জানিয়েছেন যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন, তবে ধারণা করা হয় যে, ম্রো এবং সংখ্যাল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠী যাদের কুকি বলা হয় তারাই হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা। তাদের তুলনায় চাকমা এবং মগ (মারমা)-রা পরবর্তীতে এই এলাকায় এসেছে।[২৮৫]

Prof. Pierre Bessaignet বলছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য আদিবাসীদের চেয়ে বাঙালিদের প্রভাবে চাকমারা বেশি পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও মূল চাকমা ভাষার সাথে বার্মিজ লেখমালার মিল পাওয়া যায় এবং তারা সম্ভবত কথোপথনের ক্ষেত্রে বার্মিজ কথ্যভাষা ব্যবহার করতেন, তবে বর্তমানে তাদের সাধারণ ভাষা বাঙালিদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। চাকমারা দাবি করে যে, সুপ্রাচীন ক্ষত্রিয় (Kshatriya) ধারা থেকে তাদের উদ্ভব, এবং এটাও সত্য যে যদিও তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তবে হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি তাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বাঙালিদের মতো তারাও উপত্যকা এবং সমতলে বসবাস করে।[২৮৬] আদিবাসীরা মূলত কৃষিজীবী। তাদের প্রথাগত চাষাবাদ পদ্ধতি জুম নামে পরিচিত। জুমচাষের পাশাপাশি তারা লাঙ্গল দিয়েও চাষাবাদ করেন। তবে এই পদ্ধতি পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব নয়। এখানে এর সূচনা হয়েছিল ১৮ শতকে বাঙালিদের দ্বারা । তারা তখন আদিবাসী রাজাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে পার্বত্য ভূমির নিম্নাঞ্চলে এসেছিলেন খুব সম্ভবত: চাষাবাদের জন্যই।[২৮৭]

চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সম্পর্কে জানতে তিনি সেখানে যান, অবস্থান করেন এবং এ সম্পর্কিত একটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বইটিতে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে আদিবাসী জীবনকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[২৮২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২।

[২৮৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২।

[২৮৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫।

[২৮৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭।

[২৮৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

[২৮৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

মূলত এখানকার সমতল ভূমির প্রধান শস্য হলো ধান এবং রবিশস্য। ধানের দুই প্রকার জাত আছে আউশ বা মৌসুমের শুরুকালীন শস্য এবং আমন বা শীতের শস্য। রবিশস্যের মধ্যে রয়েছে সরষে, তামাক, মরিচ, ঢেঁড়স, মিষ্টি-আলু এবং আখসহ বিভিন্ন শস্য, এসব শস্য সাধারণত অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চাষাবাদ হয়ে থাকে। রবিশস্য ছাড়াও দ্বিতীয় ফসল হিসেবে পাহাড়ি অধিবাসীরা সমতল ভূমিতে তুলা, বিভিন্ন রকমের ফল যেমন- কাঁঠাল, আম, লেবু এবং তরমুজ প্রভৃতি চাষাবাদ করে থাকেন।[২৮৮] অন্যদিকে জুম ভূমির প্রধান শস্য হলো ধান এবং এর বিভিন্ন রকম প্রকারভেদ রয়েছে। নারী এবং পুরুষ উভয়ে এই চাষাবাদের সাথে যুক্ত। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী গৃহপালিত পশু পালন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের মতো তারা গরু এবং মহিষ দুইটিই পালন করেন। এছাড়া ছাগল, শূকর, মুরগি প্রভৃতি পালন করে থাকেন। এছাড়া পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ফাঁদ পেতে মাছও ধরেন।[২৮৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতিতে বাঁশ হলো অন্যতম প্রধান পণ্য। তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করে থাকেন। জঙ্গলে এটি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। যাই হোক না কেন, একটি উন্নয়নমূলক বাণিজ্যিক অর্থনীতিও এখানে জায়গা করে নিয়েছে। কিছু কিছু শিক্ষিত পাহাড়ি সরকারী চাকুরীও করছে। এছাড়া কেউ কেউ নতুন ভাবে গৃহিত উন্নয়নমূলক শিল্পায়ন প্রকল্পে কাজ করছেন যা কর্ণফুলী নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে বাঙালিদের সংখ্যা বেশ ভালো পরিমাণে বেড়েছে – এরা মূলত বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল।[২৯০]

সাধারণত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীই আদিবাসী হিসেবে পরিচিত। সুতরাং বলা যায় আদিবাসীরাই হলো এখানকার সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত আকারে সামাজিক সংগঠন ক্রিয়াশীল রয়েছে। যদিও আধুনিক সময়ে নানা রকম প্রথা চালু হয়েছে। এছাড়া আদিবাসীদের নানারকম গোত্র, পরিবার, এবং স্থানীয় ও গ্রামীণ পর্যায়ে নানা সম্প্রদায় রয়েছে।[২৯১]

পার্বত্য চট্টগ্রামে হল একটি বিশেষ জেলা, যার সদর দপ্তর হল রাঙ্গামাটি। এই এলাকাটি ডেপুটি কমিশনারের অধীনে যিনি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তার নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে। এটিকে আবার ৩টি মহকুমায় ভাগ করা হয়েছে, এগুলোর সদর দপ্তর হল ঃ রাঙ্গামাটি, রামগড় এবং বান্দরবান। এগুলো এসডিও-এর অধীনস্ত। এছাড়া ৩টি ভাগে বিভক্ত এ অঞ্চলটির ৩টি সার্কেল আছে, যার প্রধানকে বলা হয় রাজা বা প্রধান। সার্কেলকে আবার মৌজায় ভাগ করা হয়েছে, যার প্রধান হলেন একজন হেডম্যান। মৌজা আবার কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রামগুলোর প্রধানকে বলা হয় কারবারি।[২৯২] তিনজন রাজারা হলেন, চাকমা, মং এবং বোমাং। এছাড়া এসব আদিবাসীদের নিজস্ব

[২৮৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩-১৪।
[২৮৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩-১৫।
[২৯০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭-১৮।
[২৯১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।
[২৯২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯-২০।

রীতির বিবাহ ব্যবস্থা রয়েছে।[২৯৩] সাধারণত আদিবাসীদের মধ্যে যে বিবাহ ব্যবস্থা রয়েছে তা পিতা মাতারাই ঠিক করে থাকেন।[২৯৪]

এই অঞ্চলকে যে জেলা, সার্কেল, মৌজা এবং গ্রাম প্রভৃতি অংশে ভাগ করা হয়েছে এর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় সহজ হয়েছে। সাধারণত ভূমি কর আদায় করা হয় আদিবাসীর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দ্বারা।[২৯৫] পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মূলত প্রাচীন ভারতীয় রাজস্ব আদায়ের মৌলিক নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয়। মূলত প্রধান বা রাজারাই হলো রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার অধীনস্ত দিওয়ানরা (Diwans) হল উপ-রাজস্ব সংগ্রাহক বা (Sub-Collectors)। Prof. Pierre Bessaignet বলছেন যে, এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মানুষরা হলেন আদিবাসী। তাই প্রচলিত রীতিনীতির সাথে তার রাজস্ব ব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কারণ ভূমির মালিকানায় ভোগদখলকারী-সম্পর্কিত যে ব্যবস্থা, তা আদি বা প্রাথমিক যুগের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[২৯৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিই হল রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। তবে এটিই একমাত্র উৎস নয়। উদাহরণ হিসেবে Bessaignet উল্লেখ করেছেন স্থানীয় বাজারের কথা; এর রাজস্ব সাধারণত যাকে প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় 'বাজার চৌধুরী'।[২৯৭]

মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম এবং সুগত চাকমা সম্পাদিত (২০০৭) *আদিবাসী জনগোষ্ঠী* [২৯৮] গ্রন্থে আদিবাসী সমাজের নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং প্রাচীন বাংলার আদিবাসীদের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থে আদিবাসীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এরকম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা আধুনিক রাষ্ট্রের উত্থান ও তার বর্তমান সীমানা নির্ধারণ হবার আগে থেকেই ঐ ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছেন ও যাদেরকে সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং যাদের নিজেদের মধ্যে এ স্বাতন্ত্রবোধ বা ঐতিহ্য রক্ষা করার মানসিকতা বা ইচ্ছা আছে, তাদেরকে আদিবাসী বলে আখ্যায়িত করা যায়'।

মেসবাহ কামাল তার সম্পাদকীয় ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্ট পর্যন্ত ছিল বৃহত্তর 'বঙ্গদেশ'-এর অংশ এবং যাকে ব্রিটিশ শাসকরা 'Bengala' নামে অভিহিত করত।[২৯৯] তাদের আগে

---

[২৯৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২।

[২৯৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৫।

[২৯৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭।

[২৯৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

[২৯৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।

[২৯৮] মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা সম্পাদিত 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা - ৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

[২৯৯] মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ xvi.

পর্তুগিজরা বঙ্গদেশ'কে বলত 'Bengala' এবং মুগলরা ব্যবহার করত 'বঙ্গাল' নামে। 'বঙ্গ' নাম ছিল প্রাচীনকালে। তার আগে প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ক্ল্যাসিকাল লেখকগণ এ অঞ্চলকে 'গঙ্গারিডাই' হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছিলেন। বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় বর্তমান বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজকের রাজনৈতিক মানচিত্র দিয়ে অতীতের জনমিতির ম্যাপিং নিরর্থক। বাংলাদেশের আদিবাসী বলতে বুঝায় অবিভক্ত বাংলার আদিবাসীদের, আর অবিভক্ত বাংলা হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনপূর্ব বাংলা যার অর্ন্তভুক্ত ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা। পশ্চিম বাংলা ও বিহারের কিছু অংশ নিয়ে ঝাড়খণ্ড। আর আসাম গঠিত হয়েছে 'সেভেন সিস্টারস্' (আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ) নিয়ে। এ অঞ্চলগুলির সাথে বাংলার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সম্পর্ক রয়েছে, তাই আজকের বাংলাদেশের আদিবাসী সম্পর্কিত ভাবনায় অবিভক্ত বাংলার চিত্র সামনে রাখা আবশ্যক। প্রাক-আর্য যুগ থেকে বাংলায় অস্তিত্বমান কয়েকটি জাতি হলো পুন্ড্র বা পোদ, শবর, কৈবর্ত, বাগদী, নিষাদ, ডোম, চন্ডাল, সদগোপ, মল।

গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, আদিবাসী আলোচনায় রাষ্ট্রের সীমারেখাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সমীচীন নয়। কারণ বঙ্গদেশের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে বার বার। পরিবর্তন-সংযোজন-বিয়োজনের ঘটনা শুধু ১৯৪৭ সালে ঘটেছে তা নয়, ইতিহাসের নানা কালপর্বেই ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এবং পরবর্তীতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রতিটি শাসন-শোষণ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ শুধু বাংলাদেশে নয়, এটি একটি বৈশ্বিক ঘটনা। সংখ্যার স্বল্পতা, জাতিগত স্বাতন্ত্র, ভিন্ন জীবন-রীতি ও পদ্ধতির কারণে তাদেরকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ বৈষম্য ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাই 'নিজভূম' হওয়া সত্বেও এ ভূখণ্ড ক্রমশ এ অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য "পরবাস" হয়ে উঠেছে। কারণ এখানে তারা তাদের অধিকার প্রয়োগে ব্যর্থ, তাদের অবদানেরও কোনো স্বীকৃতি নেই। মূলত তাদের এই বঞ্চনার ইতিহাস জাতি, জাতীয় রাষ্ট্র তথা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া ধারণার সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রবেশ করে সেখানকার সংখ্যালঘু জাতি ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই গ্রন্থে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূল অঞ্চলের ১২টি, উত্তর বঙ্গের ১৫টি এবং ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলের ১৮টি আদিবাসী জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত যেমন ঃ নামকরণের ঐতিহাসিকতা, বসতিস্থান, গোত্রবিভাগ, জনসংখ্যার হার, নৃতাত্ত্বিক গড়ন, বাসগৃহ, ভাষা, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষাগত অবস্থান, পোশাক, অলংকার, খাদ্য, হস্তশিল্প, বৈবাহিক সম্পর্ক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে রচিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলেও এতে বাংলাদেশের সকল আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, আদিবাসীদের বঞ্চনা বা বৈষম্যের চিত্রও সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। গ্রন্থখানা বাংলাদেশের

এশিয়াটিক সোসাইটির 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা' নামের একটি গবেষণা প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার নানামুখী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা উপধারাকে জরিপের মাধ্যমে সনাক্ত করে একটি মানদণ্ড তৈরি করা, যেন বাংলার সংস্কৃতির পরিবর্তনপূর্ব ধারাকে সনাক্ত করা যায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠী গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, বাংলাদেশের আদিবাসী কিছু জাতির সাস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণনা। এ প্রেক্ষাপটে গ্রন্থটিতে তাদের শিল্পকলা, লোকসংগীত, চারু ও কারুকলা, লোকসংস্কৃতি, সংস্কৃতির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এসব মানুষের জীবন সংগ্রাম তথা রাজনৈতিক সংগ্রামও যে ব্যাপক অর্থে এসব জাতিসমূহের সংস্কৃতির অংশ তা গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিরাজমান সংকট, অস্তিত্বের লড়াই, অধিকার আদায়ে সশস্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বা সংগ্রামের নেতৃত্বের দিকে আলোকপাত করা হলে গ্রন্থটি পূর্ণতা লাভ করত।

Pannalal Majumdar (1997) তার *The Chakmas of Tripura* গ্রন্থে চাকমাদের জীবন-জীবিকা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। এছাড়া গ্রন্থকার চাকমাদের উৎপত্তি সর্ম্পকে বিভিন্ন লেখকের অভিমত সন্নিবেশিত করেছেন। ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর এটি ভারতের সাথে যুক্ত হয়। ত্রিপুরাতে ১৯টি আদিবাসী জাতি সনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উন্নততর সংস্কৃতি চাকমাদের। চাকমার সংস্কৃতি ভারতের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। চাকমা কথাটি এসেছে সাক্য (SAKYA) থেকে।[৩০০]

প্রাচীন কালে সাক্য নামের একটি জাতি পার্বত্য অঞ্চলে নেপালের সম্মুখ অংশে বাস করত। গৌতম বুদ্ধ এই জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। বর্ণিত আছে, এই জাতির একটি অংশ অন্য শক্তিশালী মানুষ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বার্মা, আরাকান এবং ভারতের পূর্বাংশে আশ্রয় নেয়। বার্মারা নতুন আসা এই লোকদের ডাকত 'থেক' (THEK) অথবা 'থ্রিট' (THET) বলে এবং চাকমারা নিজেদের পরিচয় দিত 'সাক' (SAK) অথবা 'চাঙ' (CHANG) বলে। পরবর্তীতে 'মানুষ' (MANUCH) এর সংক্ষিপ্ত রূপ মা (MA), CHANG-এর সাথে যুক্ত হয়ে দাঁড়ায় 'চাঙমা' (CHANGMA)। ব্রিটিশরা একটু পরিবর্তন করে বলে চাকমা (CHAKMA)। সেখান থেকে চাকমা নামের উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে তারা তিব্বতীয় বার্মিজ জাতি এবং এই জাতির উদ্ভব মঙ্গোলিয়ান থেকে। বর্তমানে চাকমাদের আনক্যা, তঞ্চঙ্গ্যা, দৈন্নাক এই তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি শ্রেণির প্রতিটিতে অনেক ক্ষুদ্র শ্রেণি রয়েছে। ত্রিপুরার চাকমারা মূলত হীনযনি (Hinajani) বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরার চাকমাদের আদি নিবাস ছিল। তারা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম ও পশ্চিম বাংলায় বাস করেন। বাংলাদেশে ৪ লক্ষ, ভারতে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার এবং আরাকান রাজ্য অর্থাৎ মায়ানমারে ১ লক্ষের অধিক চাকমার বসবাস। অতীতে তারা উর্বর পাহাড়ি মৃত্তিকা অনুসন্ধান করে বসতি স্থাপন করতেন। তাই চাকমা গ্রামগুলো সাধারণত গড়ে উঠে নদীর ধারে বা পাহাড়ের ঢালুতে যেখানে ঝরণা বা পানির উৎস রয়েছে। গ্রামের মধ্যে চাকমা বাড়িগুলো ছড়ানো থাকে। তারা বাঁশ দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন এবং তাদের বাড়িগুলো বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। চাকমারা সাধারণত

[৩০০] Pannalal Majumdar, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮-৩৯।

কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের কৃষি জুম কেন্দ্রিক। প্রত্যেক বসন্তকালে জুমের জায়গা পরিস্কার করে পোড়ানো হয় ফসল উৎপাদনের জন্য। চাকমারা ধান, তুলা, আলু, কুমড়া, শসা, বেগুন, তরমুজ, মরিচ, ঢেড়স, মিষ্টি আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করেন। তারা ভাত, সবজি, মূলা, কুমড়া, মিষ্টি আলু, বেগুন, বাঁধাকপি, মাংস, মাছ ও ব্যাঙ খান। চাকমাদের ধুমপানের অভ্যাস আছে এবং এর জন্য তামাক পাতা উৎপাদন করেন। ধুমপানের জন্য তারা বাঁশ দিয়ে তৈরি হুকা ব্যবহার করেন। তবে বর্তমানে তাদের প্রথা ও খাদ্য পরিবর্তিত হচ্ছে এবং খুব দ্রত তারা আধুনিক রীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। চাকমারা সোনা, রূপা এবং পুতির তৈরি বিভিন্ন ধরনের গহনা ব্যবহার করেন। গহনায় বিভিন্ন প্রাণীর দাঁত ও হাড় ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় এবং তার মাধ্যমে চরকায় সুতা কেটে তারা কাপড় তৈরি করেন। চাকমারা গাঢ়, উজ্জ্বল রং পছন্দ করেন এবং বিভিন্ন উজ্জ্বল নকশাযুক্ত কাপড় তৈরি করে ব্যবহার করেন। চাকমা মহিলারা সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করেন। কাজ শেষে রাত্রে তারা কাপড় তৈরি করতে বসেন। চাকমা লোকসমাজে হস্তশিল্পের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে সৃষ্টিশীল সত্তা রয়েছে। তারা কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, দ্রব্য তৈরি করেন। চাকমারা নৌকা তৈরিতে দক্ষ।[৩০১]

চাকমা সমাজে দুই ধরনের বিবাহ প্রথা রয়েছে। একটি হলো ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা সম্পন্ন বিবাহ যা সমাজের অগ্রসর জনগণ করে থাকেন। আর একটি পুরাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী বিয়ে যা গ্রামের ওঝা (ojhas) দ্বারা হয়ে থাকে। চাকমাদের একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বাল্য বিবাহ চাকমা সমাজে খুব কম। বিভিন্ন ধরনের লোক নৃত্য, লোক গীত, ধাঁধা ও লোককাহিনি প্রচলিত আছে চাকমা সমাজে। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় পুত্রকে। তবে বর্তমানে আধুনিক পরিবারে কন্যাও উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানেরা সম্পদের মালিক হয়। মৃত ব্যক্তিকে চাকমারা সাদা কাপড় দিয়ে বাড়ির বাইরে ঢেকে রাখেন এবং বিভিন্ন সামাজিক রীতি পালনের মাধ্যমে সৎকার করেন। চাকমাদের শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে খ্যাতি আছে। তাদের সমাজে সাধারণত অতি অল্প অপরাধ সংঘটিত হয় এবং এর জন্য তাদের সমাজে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থায় অপরাধের ধরণ অনুযায়ী শাস্তির বিধান করা হয়ে থাকে। চাকমাদের ধর্মীয় উৎসব দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি প্রথাগত এবং অন্যটি শাস্ত্র সম্মত। শাস্ত্র সম্মত ধর্মীয় উৎসব সমাজের সকল স্থানে একই রকম কিন্তু প্রথাগত ধর্মীয় উৎসব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। চাকমাদের পূজাকে পরিবার ভিত্তিক, গ্রাম ভিত্তিক, গোষ্ঠী ভিত্তিক ও সমষ্টি ভিত্তিক এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। চাকমা সমাজে লোক নৃত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক উৎসব ও পূজাতে লোক নৃত্যের আয়োজন করা হয়। সাধারণত যুবক এবং নারীরা এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। চাকমাদের মধ্যে নারী শিক্ষার হার অধিক না হলেও বর্তমানে স্কুল, কলেজে অনেক বড় সংখ্যক চাকমা বালিকা অধ্যয়ন করছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে পুরাতন ঐতিহ্যবাহী প্রথা বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে এবং শিক্ষিত চাকমারা "আধুনিক" সমাজের দিকে অগ্রসর হচেছ। গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সাথে চাকমারা তাল মিলিয়ে চলছে এবং

[৩০১] Pannalal Majumdar, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ব্যবহার, আচরণ, বিশ্বাস, জীবন যাপনের ধারা, চিন্তাভাবনা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষিত হওয়ার কারণে। চাকমাদের জীবন জীবিকা ও তাদের সামাজিক রীতি-নীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[৩০২]

মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত (২০১০), *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা (১ম খণ্ড)*[৩০৩] গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এথনোগ্রাফিয় গবেষণামূলক এই গ্রন্থে দুটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আদিবাসীদের সামগ্রিক পরিচিতি অর্থাৎ জনমিতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নারীদের অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৩টি আদিবাসী যথা অহমিয়া, খিয়াং, খুমি, গুর্খা, চাক, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাংখো, বম, মারমা, ম্রো এবং লুসাই জাতির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের বসতি অঞ্চল, ঐতিহাসিক পটভূমি, স্থানান্তর প্রক্রিয়া, সামাজিক সংগঠন, ব্যক্তির জীবন-চক্র, পরিবারের ধরন, অর্থনৈতিক সংগঠন, উত্তরাধিকার, পেশা, বাসস্থানের ধরন, মালিকানার ধরন, ধর্মীয় সংগঠন, লোক-বিশ্বাস, সামাজিক উৎসব, আসবাপত্র, খাদ্য ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ৪৫টির অধিক সংখ্যালঘু আদিবাসী জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করে আসছে। তাদের সামাজিক রীতিনীতি, ভোগোলিক পরিবেশ, দৈহিক গঠন, খাদ্যভাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা ইত্যাদি বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক আদিবাসী জাতিসমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে।

আদিবাসী জাতির মধ্যে অধিকাংশ জাতি মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, মধ্য-উত্তর অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ এ মহাজাতিভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ নেপাল থেকে আরম্ভ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশের মধ্য-উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও উপকূল অঞ্চল এবং বর্তমান আরাকান পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে মঙ্গোলীয় মহাজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর বসতি স্থান ছিল। মধ্যযুগে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও চট্টগ্রামের কিছু অংশ অর্থাৎ ফেনী নদী পর্যন্ত স্বাধীন চাকমা রাজ্যের উপস্থিতি ছিল।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের বড় অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। এক সময় এ অঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণরূপে আদিবাসী অধ্যুষিত হলেও নানা কারণে তা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫১ ভাগ আদিবাসী বলে ধারণা করা হয়। আদিবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে অবস্থান করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যথার্থ নাগরিকের মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বাস করতে পারেনা। তারা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আগ্রাসন, আক্রমণ ও উচ্ছেদের কারণে জমি থেকে উৎখাত হয়ে নিজ জমিতে পরবাসীর ন্যায় জীবনযাপন করছে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও শাসন ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ অতি অল্প। তারা দেশের দরিদ্র, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত ও পদদলিত অংশের

[৩০২] Pannalal Majumdar, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১১০-১১৩, ১৪৯, ১৮১, ৩০৫।

[৩০৩] মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিও গবেষণা প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা ২০১০।

অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের কোনো কোনো আইনে এসব জাতিসমূহকে 'আদিবাসিন্দা' বা 'আদিবাসী পাহাড়ি' হিসেবে উল্লেখ করা হলেও সরকারিভাবে তাদের "উপজাতি" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যদিও তারা নিজেদেরকে আদিবাসী পরিচয়ে পরিচিত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ২০০৬ সালের ১৯ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক আদেশে সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ না করে "উপজাতি" হিসেবে আখ্যায়িত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। "উপজাতি" শব্দটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার উত্থান এবং আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতি-বর্ণ ভিত্তিক ভাবাদর্শ থেকে উদ্ভূত। ক্রমে অধিনস্ত জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিকীরণের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠীর নিকট এ শব্দটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত জাতিরাষ্ট্র এ শব্দটি এখনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। "উপজাতি" বলতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং বিদ্বেষ প্রসূত। এই "উপজাতি" নামকরণ জাতিসমূহকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃহত্তর সমাজ বা সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত অঙ্গীভূত করার প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করছে।

তাই "উপজাতি" শব্দটি সংখ্যালঘু জাতিসমূহের কেউ গ্রহণ করতে চায়না। জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক থেকে আদিবাসী শব্দের সংজ্ঞা অর্থে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোটিয়ার মি. জোসে মার্টিনেজ কোবো প্রদত্ত আদিবাসীর সংজ্ঞা যা জাতিসংঘ 'ওয়ার্কিং ডেফিনেশান' হিসেবে গ্রহণ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে, 'আদিবাসী সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী ও জাতি বলতে তাদেরকে বুঝায় যাদের ভূখণ্ডে প্রাগ-আগ্রাসন এবং প্রাগ-উপনিবেশিক কাল থেকে বিকশিত সামাজিক ধারাসহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে, যারা নিজেদেরকে উক্ত ভূখণ্ডে বা ভূখণ্ডের কিয়দংশে বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। বর্তমানে তারা সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আইনি ব্যবস্থার ভিত্তিতে জাতি হিসেবে তাদের ধারাবাহিক বিদ্যমানতার আলোকে তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখণ্ড ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মোট কথা আদিবাসী জাতি বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা বহিরাগত কর্তৃক দখল বা বসতিস্থাপনের পূর্ব থেকে নিদিষ্ট ভূখণ্ডের মূল অধিবাসীর বংশধর'। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জাতিসমূহ আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে।

পার্বত্য অঞ্চলে ১১টি জাতির পৃথক নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতি রয়েছে। এই সংখ্যাল্প জাতিগুলোর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করলেও তারা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বহির্ভূত হওয়ার কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলনে আদিবাসীদের অপরিসীম ভূমিকা থাকলেও তাদের এ ভূমিকাকে মূল্যায়ন করা হয়নি। আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত অনেকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ সরকার। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আদিবাসী ও "উপজাতি" জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত ১০৭ নং কনভেনশন, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত

জোহানসবার্গ ঘোষণারও স্বীকৃতি দিয়েছে, যাতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে আদিবাসীদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। তবে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করলেও সেগুলোর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসছেনা। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদিবাসীরা এখনো বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

গ্রন্থটির এ খণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামের **১৩**টি আদিবাসী জাতির এথনোগ্রাফিয় তথ্যের ভিত্তিতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থে উল্লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রামের **১৩**টি আদিবাসী জাতির বাইরে বিভিন্ন গবেষণা ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে আরও যে সব জাতির অবস্থান ছিল বা আছে বলে জানা যায় তা উল্লেখ করলে গ্রন্থটি আরও বেশি সমৃদ্ধ হতো। এছাড়াও এ গ্রন্থে পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসমূহের জীবন ধারার চিত্র পাওয়া গেলেও এই জাতিগুলোর জীবনেরই আরেক অংশ রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগ্রাম সম্পর্কে কোনো বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি যা গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঐ মন্ত্রণালয়ের সচিব **নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা** সংকলিত ও সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রাম : বন-পাহাড়ের সাত-সতের* গ্রন্থটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত ৩০টি প্রবন্ধ রয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি বাংলায় এবং ১১টি ইংরেজিতে রচিত। 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ের মানুষের মাঝে পরস্পরকে জানা-বোঝার ক্ষেত্রে যে ফাঁক আছে, যাকে হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন "মধ্যযুগীয় দূরত্ব" ও "মহাজাগতিক অস্পষ্টতা", তা এই গ্রন্থের মাধ্যমে কিছুটা হলেও দূর হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।[৩০৪]

জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী তার 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে দু'একটি কথা' প্রবন্ধে "উপজাতি" শব্দটি পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন এবং পাহাড় ও বনাঞ্চলের আদিবাসীদের সত্যবাদিতা ও মানবিক গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন।[৩০৫]

এইচ. টি. ইমাম মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রামঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' প্রবন্ধে তিনি ঐ সময়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রাঙ্গামাটির **১**ম ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অসম্পূর্ন তালিকা তিনি রাঙ্গামাটির কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, যা তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **১৮** জনের এই তালিকায় বাঙালি **১৫** জনের সাথে **৩** জন আদিবাসী – প্রভুদান চৌধুরী (মার্মা), গৌতম দেওয়ান (চাকমা) ও রণবিক্রম কিশোর ত্রিপুরার (ত্রিপুরা) – নামও রয়েছে। এই প্রথম ব্যাচটি মাত্র কয়েকদিন ট্রেনিং নিয়েই কালুরঘাট পতনের পূর্বেই চট্টগ্রামের রণক্ষেত্রে যোগদান করেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩০৬]

---

৩০৪ নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম : বন-পাহাড়ের সাত-সতের*, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ V।

৩০৫ কবীর চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে দু'একটি কথা', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১।

৩০৬ এইচ. টি. ইমাম 'পার্বত্য চট্টগ্রামঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩-১৪।

'একই দেশের অন্নে লালিত' প্রবন্ধে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বাংলাদেশ গণপরিষদে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনসমষ্টির স্বাতন্ত্র্যের কথা কেন গৃহীত হয়নি তার ৩টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, পাকিস্তান শাসন পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ভাবধারা তখন ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল, তাতে পাহাড়ি জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি শোনা যায়নি। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের যে স্বতন্ত্র হয়ে বিকশিত হওয়ার অধিকার আছে – একথা বাঙালিরা ভাবেনি। তৃতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ-বিরোধী শক্তি তখনও আত্মগোপন করে ছিল, ফলে আদিবাসীদের ন্যায্য দাবিও তখন বাংলাদেশ-বিরোধিতার আরেক রূপ বলে গণ্য হত। এছাড়াও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের "রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান" খুঁজতে গিয়ে অঞ্চলটির রক্তাক্ত হওয়া, বহু মানুষের পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির ফলে শক্তি প্রয়োগের অবসান এবং শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসার কথা উল্লেখ করেছেন। জাতিসংঘের, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি সংশোধিত কনভেনশনে (১৯৮৯), আদিবাসীর সংজ্ঞার্থ দেয়া আছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে এর প্রয়োগ – কোন স্থানে ইতিহাসগতভাবে কে আগে এসেছে সে অর্থে নয়'।[৩০৭]

'মুক্তিযুদ্ধের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম' প্রবন্ধে সৈয়দ আবদুস সামাদ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বমোট ৩৬৯টি মৌজার মধ্যে ১২৫টি মৌজা জলমগ্ন হয় (প্রায় ৩৪%) এবং ৩৫০ বর্গমাইল এলাকা ডুবে যায়, যা প্রকৌশলীদের গণনা থেকে ১.৪ গুন বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩০৮]

'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তিচুক্তি এক বলিষ্ঠ উদ্যোগ, এখন আরও বেশি যৌক্তিক' প্রবন্ধে মহিউদ্দিন আহমদ ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিটিকে একটি 'বলিষ্ঠ উদ্যোগের সূচনা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০৯]

'শেখ হাসিনার শান্তি দর্শন' প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর / ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ তারিখে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে যে-কোনো বিচারেই এক ঐতিহাসিক দলিল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, চুক্তিটি দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং শেখ হাসিনাকে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শান্তিকামী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। এছাড়া তিনি 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩ হাজার ১৮৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে ১০ লক্ষ লোকের বাস' (২০০১) উল্লেখ করে বলেছেন, দেশের কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে তাদের স্বকীয়তাকে স্বীকারের ইতিহাস বিশ্বে বিরল নয়।

---

[৩০৭] আনিসুজ্জামান, 'একই দেশের অন্নে লালিত', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫-১৭।

[৩০৮] সৈয়দ আবদুস সামাদ, 'মুক্তিযুদ্ধের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮-২২।

[৩০৯] মহিউদ্দিন আহমদ, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তিচুক্তি এক বলিষ্ঠ উদ্যোগ, এখন আরও বেশি যৌক্তিক', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৩-৩০।

চীনের হংকং, নিউজিল্যান্ডের কুক আইল্যান্ডস, ভারতের কাশ্মীর, ইন্দোনেশিয়ার আচেহ-এর উদাহরণ টেনে তিনি পার্বত্য শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষরের নেপথ্যে এসব দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন। পাহাড়ি ও সমতল ভূমির মানুষের সহাবস্থান সুদীর্ঘকালের এবং সেই সম্প্রীতি রক্ষা করে চুক্তি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া পাহাড়ি জনগণ তাদের ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নিয়ে শান্তিতে নিজ স্থানে বসবাস করবেন এবং এটা তাদের অধিকার বলে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৩১০]

'রাঙ্গামাটিতে কর্মজীবন' প্রবন্ধে শরদিন্দু শেখর চাকমা রাঙ্গামাটিতে থাকাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ভূমি জরিপ এবং ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে ৩ প্রকারের ভূমি – প্রথমত, ধান চাষের জন্য ভূমি, দ্বিতীয়ত, রবিশস্য চাষের ভূমি এবং তৃতীয়ত, উচু টিলা বা গ্রোভল্যান্ডে'র কথা উল্লেখ করেছেন ।[৩১১]

'বন পাহাড়ের দেশে' প্রবন্ধে অনামিকা ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের লোক ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন। 'ঢেঁকির শব্দ স্বর্গ থেকে দেবতারাও শুনতে পান' ত্রিপুরাদের এমন বিশ্বাসের কথাসহ নানা বিষয় তার লেখায় উঠে এসেছে। এছাড়া আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বহুমাত্রিক চিত্র তিনি গল্পাকারে বর্ণনা করেছেন।[৩১২]

'পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা' প্রবন্ধে অভয় প্রকাশ চাকমা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিবন্ধকতার, বিশেষতঃ 'বিএনপি-সহ কিছু উগ্র দক্ষিণপন্থী দল এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরোধিতা'র কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে '২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর আওয়ামী লীগ সরকারকে আবার নতুন করে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়েছে'। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৮০ সালের কাউখালি গণহত্যাকে তিনি ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকান্ডের সাথে তুলনা করেছেন।[৩১৩]

'Chittagong Hill Tracts in 1798' প্রবন্ধে Francis Buchanan তার অবস্থানকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ, বিশেষ করে এপ্রিল ও মে মাসে নদী, উপত্যকা ও পাহাড় কেমন থাকে সে চিত্র অংকন করেছেন।[৩১৪]

[৩১০] আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, 'শেখ হাসিনার শান্তি দর্শন', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১-৩৪।

[৩১১] শরদিন্দু শেখর চাকমা, 'রাঙ্গামাটিতে কর্মজীবন', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫-৬৪।

[৩১২] অনামিকা ত্রিপুরা, 'বন পাহাড়ের দেশে', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪-১১৫।

[৩১৩] অভয় প্রকাশ চাকমা, 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২০-১২৪।

[৩১৪] Francis Buchanan, 'Chittagong Hill Tracts in 1798', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৫-১৪০।

'The Hill Tracts of Chittagong' প্রবন্ধে T.H. Lewin বোমাংদের বিবরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থা, আরাকানীদের সাথে সম্পর্ক এবং বিভিন্ন গ্রামে তার সরেজমিনে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।[৩১৫]

'The Economy of the Indigenous Peoples of the CHT' প্রবন্ধে Dr. P.B. Chakma পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতির সামগ্রিক দিক, ভূমি-কেন্দ্রিক অর্থনীতি, জনসংখ্যার বাড়তি চাপ ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩১৬]

'Reingkhyong Lake: The Forgotten Frontier of Bangladesh' প্রবন্ধে Raja Devasish Roy পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশগত নানা দিক, জাতিতাত্ত্বিক পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩১৭]

'The Bohomong Raj Dynasty in Brief' প্রবন্ধে Bohmongree Kyaw San Prue বোমাং রাজবংশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৩১৮]

'CHT Accord : Hill People's Concern' প্রবন্ধে Sadeka Halim সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি এবং এর সাথে সংবিধানকে সম্পর্কিত করে তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন।[৩১৯]

'Chittagong Hill Tracts : Land Issue, Problems & Prospect' প্রবন্ধে Brigadier General Md. Sarwar Hossain পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা, জুম চাষাবাদ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমি, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটসহ নানা বিষয় পর্যালোচনা করেছেন এবং এর সম্ভাবনার নানা দিক তুলে করেছেন।[৩২০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রনালয়ের প্রকাশনা অর্থাৎ সরকারি একটি প্রকাশনা হওয়া সত্বেও এই গ্রন্থে বেশ কিছু বিবরণী আছে যেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে এই অভিসন্দর্ভ-ভুক্ত সময়কালে মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লংঘিত হবার অভিযোগকে সঠিক হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বেশ কিছু পুরনো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লেখা, যেগুলো সহজলভ্য নয়,

[৩১৫] T. H. Lewin, 'The Hill Tracts of Chittagong', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪১-১৬০।

[৩১৬] P. B. Chakma, 'The Economy of the Indigenous Peoples of the CHT', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৮-১৮৭।

[৩১৭] Raja Devasish Roy, 'Reingkhyong Lake: The Forgotten Frontier of Bangladesh', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৮৮-২০১।

[৩১৮] Bohmongree Kyaw San Prue, 'The Bohomong Raj Dynasty in Brief', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০২-২০৫।

[৩১৯] Sadeka Halim, 'CHT Accord : Hill People's Concern', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬-২১০।

[৩২০] Md. Sarwar Hossain, 'Chittagong Hill Tracts : Land Issue – Problems & Prospect', নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২১১-২২৪।

সেগুলোর অংশ বিশেষ পুনঃমুদ্রণ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন ব্যক্তিদের লেখা গ্রন্থটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

UNDP-এর Chittagong Hill Tracts Development Facility'র পক্ষে আবুল বারকাত, সাদেকা হালিম, অভিজিৎ পোদ্দার ও অন্যান্যরা মিলে *Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts* শিরোনামে ২০০৯ সালে যে গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন তা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের লক্ষ্যণীয় বেশকিছু তথ্য পাওয়া যায়। গবেষকবৃন্দ জানিয়েছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাড়াগুলোতে, যা কিনা সমতল ভূমির গ্রামগুলির মত, গড়ে ৪৬টি পরিবার বাস করে যার জনসংখ্যা হচ্ছে গড়পড়তা ২৪০ জন। সেখানে পরিবারের গড় জনসংখ্যা ৫.২। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৭.৮ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছেন। সেখানকার শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ মানুষ লাঙল-চাষ ভিত্তিক কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী শতকরা ৬২ জন বাঙালি অনধিক ৩০ বছর আগে সেখানে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছেন সেটলার বাঙালি যাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের শতকরা ১৩ ভাগ পরিবারের মধ্যে অন্তত একজন সদস্যকে তার পাড়া থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধানত ভূমির তিন ধরনের মালিকানা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, নিবন্ধনকৃত স্বতন্ত্র বা নিজস্ব ভূমির মালিকানা। দ্বিতীয়ত, প্রথাগত মালিকানা বা ভোগদখলকৃত মালিকানা (হেডম্যান কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বা নিবন্ধনকৃত নয়)। তৃতীয়ত, সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে ভোগদখলকৃত মালিকানা (যা সমতল ভূমি থেকে আলাদা)।

আনুমানিক চাষযোগ্য ৩,৬৪,০০০ একর জমির মধ্যে ৭৩,০০০ একর জমি লাঙ্গল চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং ৯৯,০০০ একর জমি জুম চাষের জন্য ও ৬৬,০০০ একর জমি বসতির জন্য ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য গ্রামাঞ্চলের শতকরা ২২ ভাগ আদিবাসী তাদের নিজস্ব ভূমি হারিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি ভোগদখল সূত্রের। আদিবাসীদের অধিকাংশ (৬৩%) ঘরবাড়ি কাঁচা বাড়ি যা তাদের নিজস্ব মাচাং ভিত্তিতে তৈরি। বাঙালিদের প্রায় অধিকাংশ বাড়ি (৯৬%) কাঁচা। পরিবারগুলোর শতকরা ৫২ ভাগ সদস্য (প্রত্যেক বাড়ি থেকে ২.৭৫ জন, যেখানে পরিবারের গড় জনসংখ্যা ৫.২) হয় চাকরি করছেন নয়তো চাকরির যোগ্য।

শস্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগতভাবে সাধারণত লাঙ্গল ব্যবহার করা হয় এবং ভূমির উপযোগিতার উপর জুম চাষ নির্ভরশীল। গ্রামাঞ্চলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার চাষাবাদের সাথে যুক্ত থাকেন। পরিবারগুলি চাষাবাদের জন্য মোট জমির ১৩৮ ডেসিম্যাল জমি পেয়েছে এবং জুম চাষের জন্য পেয়েছে ১৬১ ডেসিম্যাল। গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোর বার্ষিক গড় আয় ৬৬,০০০ টাকা (যেখানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোর গড় আয় ৮৪,০০০ টাকা)। তবে পরিবারগুলোর বার্ষিক আয়ে নারীর দৃশ্যমান অবদান খুবই কম। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবারগুলোর বার্ষিক ব্যয়

বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রাম থেকে কম (৬২,০০০ টাকা বনাম ৭৩,০০০ টাকা)। বাড়ির বার্ষিক খরচ নির্বাহে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ সামঞ্জস্যহীনভাবে কম (প্রায় ৩০%)। তথ্য মতে শতকরা ৮৭ ভাগ পরিবারে কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে। পরিবারগুলোর মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ পরিবারে পরিবার ঋণ লাভের সুযোগ পায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের খাদ্যাভাস প্রায় সমতলের লোকদের মতোই, তবে এর পাশাপাশি আদিবাসীরা নাপ্পি, কচি বাঁশের মূল এবং শুকনো শাকসবজি খায়। আদিবাসীরা মাথাপিছু ১,৭৯৮ কিলো ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করে, যা কিনা অন্য নিম্নতর গরীব জনগণের থেকেও নিচে (১,৮০৫ কিলো/ক্যালোরি)। পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্যাভাব ব্যাপক ভাবে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল আদিবাসী বছরের অধিকাংশ সময়ে খাবার জোগাড় করতে অক্ষম থাকেন। এই অঞ্চলে নির্বিশেষে শতকরা ৬২ ভাগ জাতিসমূহের পরিবারগুলো সরাসরি ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি (ডিসিআই) অনুযায়ী সত্যিকারার্থে দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শতকরা ৩৬ ভাগ মানুষ একেবারেই গরিব। পরিবারগুলোর তিন-চতুর্থাংশ জনগণ (৭৪%) দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন (মাসে মাথাপিছু আয় ৮৬৬ টাকার বেশি না) এবং শতকরা ৮৬ ভাগ জনগণ দারিদ্র সীমার উপরে বাস করেন (মাসে মাথপিছু আয় ১,০২৫ টাকার বেশি না)।

শিক্ষার দিক থেকে এরা বেশ পিছিয়ে। ৫-১৬ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখায়। এছাড়া স্বাস্থ্য সমস্যা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং সেবা প্রদানকারী সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান খুবই সংকটময়। গর্ভনিরোধের প্রবণতার হার ৫৪% (জাতীয় ৫৬%) এবং পরিবার পরিকল্পনার চাহিদার হার ১২% (জাতীয় ১৭.৬%) । পার্বত্য চট্টগ্রামে পানি পান করা এবং রান্না করার প্রধান উৎসসমূহ নিরাপদ নয়।

চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে ৪৩% বাড়িতে (আদিবাসী ৫০% এবং বাঙালি ৩৪%) রেডিও শোনা হয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দৈনন্দিন জীবন ঐতিহ্যগত ক্ষমতার কাঠামো এবং স্থানীয় সরকারের নিম্নস্তর এবং কখনোবা নিরাপত্তা ফোর্সদের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। এদের সামগ্রিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোয় অংশগ্রহন খুবই কম। যৌগিক গণনার দিক দিয়ে মহিলা এবং উন্নয়নের ইস্যুতে আদিবাসীরা ভালমন্দ মিশিয়ে বাঙালিদের থেকে গড়ে উপরে আছেন। মহিলা ও উন্নয়নের ইস্যুতে বিভিন্ন মেয়াদী যে সকল তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, আদিবাসীরা বাঙালিদের চেয়ে ১২ শতাংশ পিছিয়ে আছেন।

১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশির ভাগ মানুষের জ্ঞান অপর্যাপ্ত। পার্বত্য শান্তিচুক্তির আগে পরিবারগুলোর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ কিছু মাত্রায় হলেও সৈন্যবাহিনীর সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন।[৩২১]

---

[৩২১] Abul Barkat, Sadeka Halim, Avijit Poddar et.al, *Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts,* UNDP-CHTDF, Dhaka, 2009, পৃষ্ঠা ii-ix.

Nathan Loncheu লিখিত THE BAWMZO : With an introduction to the unknown Kuki-Chin (Zo) Cultures of the Chittagong Hill Tracts গ্রন্থটি বম জো জনগোষ্ঠীকে জানার জন্য একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। ভূমিকায় লেখক গ্রন্থটির রচনার উদ্দেশ্য হিসেবে অজানা "কুকি চিন (জো)" জাতির সংস্কৃতির একটি চিত্র তুলে ধরার কথা বলেছেন। গ্রন্থটির পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যুদয়, অবস্থান, ভূসংস্থান, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ সম্পর্কে বলেছেন। "জাতিগত পরিচয়' শীর্ষক দ্বিতীয় পর্বে লেখক কুকি, ত্রিপুরা ও আরাকানী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় পর্বে তঞ্চংগ্যা ও খ্যঙ্গথা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। চতুর্থ পর্বে রয়েছে জো, মিজো, চিন এবং কুকি সম্পর্কে আলোচনা। "চিন" সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রফেসর এফ. কে লেহম্যান-এর মতে চিন হল একটি বার্মিজ শব্দ (খ্যায়াং) যার অর্থ হল ঝুড়ি। অবশ্য প্রফেসর জি এইচ লুয়াস এর মতে বার্মিজ খ্যায়াং শব্দটির অর্থ হল কমরেড। কুকিদের লেখক পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষ বলে অভিহিত করেছেন, যারা বর্তমানে মিজোরাম প্রদেশে মিজো নামে এবং মায়ানমারে চিন নামে পরিচিত। বম এবং কুকি চিন জনগোষ্ঠীর মুখের গড়নের সাথে চীনাদের মিল রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা তাদেরকে "প্রোটো-মঙ্গোলয়েড" নামে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদে "বম" জনগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচয়ের অংশে তাদের জন্ম ও উত্থান, দলগত এবং সাময়িক আবাস এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বমদের আগমন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উত্তর চিন, মধ্য চিন এবং দক্ষিণের চিন জনগোষ্ঠী মিলে তেরি হয়েছে বমজো অথবা বম জনগোষ্ঠী। "বম" শব্দটির অর্থ নিরূপণে খাঁচা, মুরগির খাঁচা, আবরণ এবং ঝুড়ি শব্দগুলো এসেছে। এস লউ "বম"-এর অর্থসমূহকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত "বম" এর অর্থ হল একাত্মতা, সংঘবদ্ধতা, অন্যদিকে আরেকটি অর্থ ঝুড়ি, থলে ইত্যাদি। বমরা সাধারণত সহজ-সরল, সুখী, সৎ, উদারচেতা, কর্মঠ ও সাহসী হয়ে থাকেন। তারা সংগীত ভালোবাসেন। জীবন-বিধি হিসেবে তারা নিঃস্বার্থপরতা, আতিথেয়তা ও পরোপকারকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বম জনগোষ্ঠীর ভাষা, ভাষার ব্যাকরণ, জনসংখ্যা, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-বিশ্বাস, রাজনৈতিক ধারা, সংস্কৃতি, নারী-পুরুষের ভূমিকা, প্রথাগত বিধি, পারিবারিক সম্পর্ক, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ পদ্ধতি, বুনন শিল্প, রন্ধন শিল্প, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পশুপালন, লোক-শিল্প ও সাহিত্য, সংগীত-নৃত্য, ইন্দ্রজাল, কেশবিন্যাস প্রণালী, বিভূষণ, উৎসব, ক্রীড়া, শিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে। লেখক, যিনি নিজে একজন চিত্রশিল্পী, সুনিপুন রেখাচিত্রের সাহায্যে বর্ণিত বিষয়গুলোকে চিত্তাকর্ষক করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[৩২২]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামের জো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন। তিনি জো-দের পাঁচটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন – লাখের (সেন্দু), লুসাই, ম্রু (মাসো), খুমি (আসো) এবং খ্যায়াং (সো)। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে জো-দের অভিপ্রয়াণ, তাদের উপনিবেশীয় ইতিহাস, ঔপনিবেশকালে ব্রিটিশ ও

[৩২২] Nathan Loncheu, THE BAWMZO: With an introduction to the unknown Kuki-Chin (Zo) Cultures of the Chittagong Hill Tracts, Published by Santu Saha, Hope Multimedia, Dhaka, 2012, পৃষ্ঠা ঃ ২৪-৩৫।

অধীনদের বিরুদ্ধে কুকিদের কয়েকটি সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৮৩৪-১৮৫৪ পর্যন্ত ১৯টি আক্রমণের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। পরে ১৮৬০-১৮৮৭ পর্যন্তও কিছু আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে ১০০ জনের মতো ইউরোপিয়ান এবং ব্রিটিশ অধীনস্তরা নিহত এবং আটক হয়। সবশেষে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বম এলাকার হ্রদ এবং শৃঙ্গসমূহ, চিম্বুক, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রবিধান ১৯৯০ এবং জো দের কালপঞ্জি বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, লেখক সাবলীল বর্ণনা ও শৈল্পিক রেখাচিত্রের মিশেলে একটি অনবদ্য গবেষণাধর্মী বিষয়কে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বম জাতিগোষ্ঠী এবং অজানা কুকি-চিন (জো) সম্পর্কে এত বিস্তারিত বর্ণনামূলক এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ খুব কমই রয়েছে।[৩২৩]

খ) ২য় ধারাভূক্ত গ্রন্থাবলী

২য় ধারাভূক্ত গ্রন্থাবলী অর্থাৎ যেসব গ্রন্থে পাহাড়ি জাতিসমূহের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনাকে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকারের অস্বীকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো প্রধানত নিম্নরূপ ঃ

William Van Schendel, Wolfgang Mey and Aditya Kumar Dewan রচিত *The Chittagong Hill Tracts : Living in a Borderland*[৩২৪] গ্রন্থে তারা বেশ কিছু স্থির আলোকচিত্রের সাহায্যে পাহাড়ি জনজীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গ্রন্থে ১৮৬০-১৯৭০ এর সময়কালে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনধারণের ছবি তুলে ধরেছেন। এখানে বলা হয়েছে পশ্চিমা বার্মা, উত্তর-পুর্ব ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সীমান্তবর্তী দুর্গম এই পার্বত্য অঞ্চলটি নানা কারণে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়নি। কেননা এ অঞ্চলের প্রবেশাধিকার সর্বদা সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও অন্তর্দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক যুদ্ধ, প্রাকৃতিক পরিবর্তন, অভিপ্রায়ণ, মাদক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এ অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ আকর্ষণ লাভের সুযোগ সেখানে খুব একটা দেখা যায়নি। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে সেই অনবহিত অবস্থার পর্দা উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখকত্রয়ী বলছেন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র পাহাড়ি জনগণকে ‘আদিম’, ‘যাযাবর’, এবং ‘উন্নয়ন-বিরোধী’ বলে অভিহিত করেছিল। তবে, তারা দেখিয়েছেন যে, পাহাড়ি এলাকায় কর্নফুলী কাগজকল নির্মাণ, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ এবং বন উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি পাহাড় থেকে পাহাড়িদের বহিষ্কারের কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

---

[৩২৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২১৩-২৩৮।

[৩২৪] Willem van Schendel, &. et.al.. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে এ যাবৎ কাল কোনো গ্রন্থ প্রণীত হয়নি, তবে **মঙ্গল কুমার চাকমা** সম্পাদিত (২০০৯) *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম* [৩২৫] গ্রন্থে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ বাংলাদেশ গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ অধিবেসনে তাঁর দেয়া ভাষণ ও প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থে ষোল জন লেখক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উপর স্মৃতিচারণমূলক লেখনীর মাধ্যমে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সজীব চাকমার 'এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা এম এন লারমা'। এ প্রবন্ধে এম এন লারমার জন্ম, পরিবার, শিক্ষা জীবন, তাঁর সময়কাল ও সৃজনশীলতা সম্পর্কে আলোচনাসহ তাঁর সহজ, সরল, নিরহংকারী সাধারণ জীবন যাপন তুলে ধরা হয়েছে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বড় বোন জ্যোতিপ্রভা লারমার লেখা 'মঞ্জুর কিছু স্মৃতি কিছু কথা' নিবন্ধে তাদের পরিবার, এম এন লারমার শিশুকাল, স্কুলের পাঠ, প্রকৃতির পাঠ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, পাঠাভ্যাস, ছাত্র জীবন, সংগ্রামের সোপান, জন্মভূমি আর জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। হিমাদ্রী উদয়ন চাকমার 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম' স্মৃতিচারণে এম এন লারমার পরিবার, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। রেণীর 'আমার চোখে মানবেন্দ্র লারমা' স্মৃতিচারণমূলক লেখনীতে এম এন লারমার দরদ ও সহানুভূতি, গরিব চাষী ও অসহায়ের প্রতি তার দরদী মনোভাব এবং প্রকৃতি প্রেমের দিক তুলে ধরা হয়েছে। পল্লবীর লেখা 'নারী মুক্তি প্রসঙ্গে এম এন লারমা' নিবন্ধে এম এন লারমার সংগ্রামী ভূমিকায় জুম্ম নারী জাগরণসহ বাংলাদেশের নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত নারী সমাজের মুক্তির আন্দোলন কীভাবে সংযুক্ত হয়েছে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার 'পরিবেশবাদী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও কিছু স্মৃতিকথা' নিবন্ধে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি এম এন লারমার গভীর মমত্ববোধ প্রতিফলিত হয়েছে। বিজয় কেতন চাকমার 'স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ' লেখনীতে এম এন লারমার পিতা শ্রী চিত্ত কিশোর লারমার গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, সহজ-সরল জীবন এবং এম এন লারমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও স্বজাতির জীবনের দুর্দশা নিয়ে দুশ্চিতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। সঞ্জীব দ্রং এর 'জুমের দেশে তাঁকে ফিরে পেতে হবে আবার' লেখনীতে পাহাড়িদের নিয়ে এম এন লারমার স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে এবং পাহাড়িদের জাতিগত আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সংসদের ভিতরে ও বাইরে তার সংগ্রামের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যার 'বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ' স্মৃতিচারণমূলক লেখনীতে কাপ্তাই বাঁধের কারণে পাহাড়িদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এছাড়া এই সংকলিত গ্রন্থটিতে সংসদ সদস্য হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দেয়া ভাষণ ও প্রস্তাবের পুরোটাই পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে। এতে তার সংসদীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি জাতীয় সংসদে আদিবাসী, পাহাড়ি মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা ও সংস্কৃতির কথা যেমন বলেছেন তেমনি সারাদেশের নিপীড়িত, নিগৃহীত মানুষের কথা, আবেগের

[৩২৫] মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পাদিত) স্মারক গ্রন্থ, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২০০৯।

সাথে বলে সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার কথা শোনেননি তখনকার নেতৃবৃন্দ এবং তার আনিত প্রস্তাবগুলো সংসদে কণ্ঠভোটে একের পর এক নাচক হয়ে যায়। তারপরেও তিনি লড়াই করে গেছেন অধিকারহারা মানুষের অধিকার রক্ষার্থে।

এই গ্রন্থটিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে জানার এবং তার স্বজাতি প্রেম, মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়ার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলেও গ্রন্থটির অনেক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়নি। এম এন লারমার সংগ্রামী জীবন ও ব্যক্তি জীবনের দৃষ্টান্তমূলক বা অনুশীলনীয় দিকগুলো যথেষ্ট প্রস্ফুটিত হয়নি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংগ্রামময় সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার ও বোঝার জন্য এটি একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের উপর যে এ পর্যন্ত স্বল্প যে কয়েকটি গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা ও কর্ম খানিকটা বিবৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান গবেষণাটি করেছেন **ড. আমেনা মোহসীন**। তিনি তার *The Politics of Nationalism, The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh*[৩২৬] গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কীভাবে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যাখান করে Homogenization-এর প্রচেষ্টা নিয়েছে এবং এই কাজে রাষ্ট্রযন্ত্র তার শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছে। গ্রন্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'জাতি' (Nation), 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism), 'জাতি-রাষ্ট্র' (Nation-State)-এর ধারণা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; জাতীয়তা কীভাবে রাজনীতির হাতিয়ার হয় এবং এর মাধ্যমে কীভাবে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর জাতীয়তাকে অস্বীকার করা হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটকে তিনি দেখেছেন জাতীয়তাবাদের সমস্যা হিসেবে; বাঙালি জাতীয়তাবাদের একচ্ছত্র প্রভুত্বের ফলে সংখ্যালঘুদের সমস্যা হিসেবে পার্বত্য সংকট কীভাবে তৈরি হয়েছে তা ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, খুমি, ম্রো, লুসাই, কুকি, খিয়াং, বোম এবং চাকদের সামান্য কিছু পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ড. আমেনা মোহসীনের মতে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ববান জাতি দ্বারা পূর্ব বাংলা এবং বাঙালি জাতি যেভাবে নিগৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর অনুরূপভাবে বাঙালিরাও তেমন আচরণ করেছে পাহাড়িদের উপর। রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছিলেন এই অজুহাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী পাহাড়ে রাজাকার এবং তাদের সহযোগীদের নিধনের নামে পাহাড়িদের উপর অত্যাচার শুরু করে। শেখ মুজিবর রহমানের নিকট প্রতিকার চেয়েও কোনো লাভ হয়নি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও প্রতিনিধি দল পার্বত্য অঞ্চলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

[৩২৬] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫০-৬৬।

রক্ষার জন্য ১৯৭২ সালে স্বায়ত্তশাসনসহ চার দফা দাবি পেশ করে ব্যর্থ হন। শেখ মুজিবর রহমান দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতি তা হলো বাঙালি। তিনি পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। নতুবা বাঙালি প্রবেশ করিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদেরকে সংখ্যালঘু করার ভয় দেখান। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ব্যর্থ হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গড়ে উঠে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয় শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে। বাঙালি এলিটদের জাতীয়তাবাদের রাজনীতিই পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নতার পথে এগিয়ে দিয়েছিল। জিন্না যেমন বাংলার বদলে উর্দুকে চাপিয়ে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন, মুজিবও তেমনি পাহাড়িদেরকে বাঙালির চেয়ে আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকার না করে জুম্ম জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন।

উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে পাহাড়িদের বৈষম্যের চিত্র নিরূপণে এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পাহাড়িদের ওপর বাংলাদেশ সরকারের বৈষম্যের চিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া তাদের রাজনৈতিক সংঘাত ও সংগ্রামের যথার্থতাকে তুলে ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থা অনুধাবনে গ্রন্থটি সহায়ক।

বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ নিপীড়ন ও সংগ্রাম* গ্রন্থটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন ও তার থেকে মুক্তির সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লিখেছেন বদরুদ্দিন উমর, আনু মুহাম্মদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও কবিতা চাকমা। বদরুদ্দীন উমর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, জাতিগত নিপীড়ন শ্রেণী শোষণেরই একটি বিশেষ দিক; পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর যে ধরণের নিপীড়ন চলছে এবং এর বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ যে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তা অবধারিত ছিল। বাঙালি উগ্রজাতীয়তাবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে পাহাড়ি জনগণকে নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে।[৩২৭] বদরুদ্দিন উমর আরো বলছেন যে, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম নানাভাবে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামও এদিক দিয়ে কোনো ব্যতিক্রম নয়। উগ্রজাতীয়তাবাদী বাঙ্গালিদের শোষণ নির্যাতনের সংগ্রাম করতে দাঁড়িয়ে তারা নিজেরাও যেন উগ্রজাতীয়তাবাদী পরিণত না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।[৩২৮]

বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জাতিগত সমস্যা, জাতির অধিকার ও জাতীয় চেতনা, জাতির আত্ম-উপলব্ধি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি, সৃষ্টির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ প্রভৃতি নিয়ে আনু মুহাম্মদের প্রবন্ধগুলোতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র ও বহুত্ববাচকতা নিয়ে আনু মুহাম্মদ লিখেছেন ঃ [৩২৯]

[৩২৭] বদরুদ্দিন উমর, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন ও তার থেকে মুক্তির সংগ্রাম', প্রকাশিত হয়েছে বদরুদ্দিন উমর (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ নিপীড়ন ও সংগ্রাম*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১১-১২।

[৩২৮] বদরুদ্দিন উমর, 'ভূমিকা', দেখুন বদরুদ্দিন উমর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

[৩২৯] আনু মুহাম্মদ, 'বাংলাদেশ শুধু বাঙালিদের বাসভূমি নয়', দেখুন বদরুদ্দিন উমর (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮।

"বাংলাদেশে কেবলমাত্র বাঙালিদের বাসভূমি নয়। এদেশে জাতিগতভাবে বাঙালি নন, বাংলা ভাষা মাতৃভাষা নয় এবং শতসহস্র বছর ধরে এ অঞ্চলেই বসবাস করেছেন, কোন কোন অঞ্চলে তারা বাঙালিদের আগেও বসতি গড়েছেন, ভিন্ন সমাজ সংগঠন সংস্কৃতি নিয়ে ভিন্ন জগৎ তৈরি করেছেন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে তারা নিজেদের বাসভূমি হিসেবে বিশ্বাস করেন, এখানে তাদের শেকড় বাঙালিদের চাইতে কম গভীরে প্রোথিত নয়, এ রকম জনগোষ্ঠী আছেন আরও একাধিক। তারাও বাঙালিদের মতই বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা জরুরী যে, তারা বাঙালি নন। এদের জাতিগত পরিচয় খুব অজানা নয়, এঁরা হচ্ছেন চাকমা, সাঁওতাল, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, মুরং ও অন্যান্য। এদের ইতিহাস আলাদা, সমাজ আলাদা, ভাষা আলাদা কিন্তু আমাদের সকলের রাষ্ট্রীয় পরিচয় অভিন্ন।"

Wolfgang Mey সম্পাদিত (১৯৮৪) *Genocide on the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : They are Now Burning Village After Village* গ্রন্থে দেখানো হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে প্রকৃত আদিবাসী জাতিসমূহের বিলুপ্তিদশার পিছনে পাহাড়ি জাতি-বহির্ভূত বাঙালিদের অবস্থান হুমকি হিসেবে কাজ করছে। উক্ত গ্রন্থে মোট ৮টি প্রবন্ধে আদিবাসীদের বিভিন্ন দুর্দশা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'The Road to Repression : Aspects of Bengali Encroachment in Chittagong Hill Tracts'[৩৩০]-এই প্রবন্ধে পাহাড়ি অঞ্চলে বাঙালিদের অভিপ্রায়ণের কারণ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও দেখানো হয়েছে বাঙালিদের এই অভিপ্রায়ন আদিবাসীরা কখনই সমর্থন করতে পারেনি কেননা ঐতিহাসিকভাবেই পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য বিরাজমান ছিল, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিরা আদিবাসী নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই প্রবন্ধে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা তিনটি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। প্রথম পর্যায় উপনিবেশিক শাসনামল, দ্বিতীয় পর্যায় পাকিস্তানি শাসনামল এবং তৃতীয় পর্যায় হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। এখানে দেখা যায়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে আদিবাসীদের অবস্থান আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। সর্বোপরি, এখানে বলা হয়েছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাঙালি সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে ঠিক সেভাবেই সন্ত্রাস চালিয়েছে ঠিক যেভাবে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের প্রতি চালিয়েছিল।

এ. বি. চাকমা রচিত 'Look Back from Exile : A Chakma Experience'[৩৩১] প্রবন্ধে লেখকের স্মৃতিকথা ফুটে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামে লেখকের শৈশব, কৈশোর, আদিবাসীদের উপর দেওয়ানদের জুলুম-নির্যাতন, মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সংগ্রাম বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। এই গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন যে, আদিবাসীর পাকিস্তান সমর্থন বিষয়ক নানা অপপ্রচার থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে, বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম বাদে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থক ছিল, যারা শুধু আদিবাসীই নয়

---

[৩৩০] Bangladesh Group Netherland, 'The Road to Repression : Aspects of Bengali Encroachment on the Chittagong Hill Tracts 1860-1983', published in Wolfgang Mey (ed), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১-৩২।

[৩৩১] A. B. Chakma, 'Look Back from Exile : A Chakma Experience', published in Wolfgang Mey (ed), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪১-৫৬।

বরং বাঙালিদের জান-মাল রক্ষায় কাজ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে নিজ দেশে তারা চরম নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, হত্যা ও ধর্ষণের শিকার হয়। স্বাধীন দেশে সরকারগুলো নানা সময়ে তাদেরকে বাঙালি হিসেবে মূলস্রোতে একীভূত করার চেষ্টা চালায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে লেখক নিজ দেশ ছেড়ে ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন।

Wolfgang Mey রচিত 'Soil Use and Land Rights in the Chittagong Hill Tracts'[৩৩২] প্রবন্ধে লেখক আদিবাসীদের ভূমির অধিকার পরবর্তী সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্দোলনে রূপান্তরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এই গ্রন্থে আরও কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলো পাহাড়ি জাতিসমূহের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নির্যাতন, নিপীড়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা আলোচনা করে।

Md. Mashiur Rahman (2011) *Struggling Against Exclusion: Adibashi in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*[৩৩৩] গবেষণামূলক গ্রন্থে আদিবাসীদের বিভিন্ন দুর্দশা ও তাদের সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশের মূল ধারার জনগোষ্ঠী থেকে আদিবাসী জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিন্নতাকে তুলে ধরা হয় এ গ্রন্থে। এতে মোঘল আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস ও বিভিন্ন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বা কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। ব্রিটিশ শাসকই যে প্রথম এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদ আহরণ ও বাণিজ্য বিস্তারের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতি বহির্ভুত মানুষকে এ অঞ্চলে পুনর্বাসিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার উল্লেখ এ গবেষণামূলক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে বাঙালিদের পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিত ভাবে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। তখন থেকেই পরিবর্তন ও উন্নয়নের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোত ধারার সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় একীভূত করার প্রয়াস অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের নামে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অবস্থা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরেই থাকে যা জাতি হিসেবেই প্রান্তিক পর্যায়ে উপনীত করে। এই পদক্ষেপ একদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর 'আত্ম-উন্নয়ন'কে ব্যাহত করে, অন্যদিকে রাষ্ট্র একটি কর্তৃত্ববান শ্রেণি গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় পার্বত্য অঞ্চলের অধস্তন আদিবাসী এবং ক্ষমতাশীল বাঙালির মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্য ও অবিশ্বাস তীব্রতর হতে থাকে। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বহু আদিবাসী নিজ বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র পুনর্বাসিত হতে বাধ্য হয়।

এ অঞ্চলে একাধিক দ্বন্দ্বমূলক স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে। অন্যতম দ্বন্দ্বগুলো হলো ঃ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মূলত পুনর্বাসিত বাঙালিরা প্রয়োগ করে, এ অঞ্চলের প্রতি সেনাবাহিনীর বিশেষ আগ্রহ লক্ষণীয়, দাতা সংস্থা ও

---

[৩৩২] Wolfgang Mey, 'Soil Use and Land Rights in the Chittagong Hill Tracts', published in Wolfgang Mey (ed), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪-৮৫।

[৩৩৩] Md. Mashiur Rahman, *Struggling Against Exclusion: Adibasi in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*, MS Thesis, Department of Sociology, Lund University, Sweeden, 2011।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের বিবেচনাধীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর। সাম্প্রতিককালে কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন (ক) জনসংহতি সমিতি (খ) সংস্কারবাদী জনসংহতি সমিতি ও (গ) ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সক্রিয় হওয়ায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে বিভক্ত হয়েছে। স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে যে, সরকার এবং সামরিক বাহিনী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বিভক্তকরণের মাধ্যমে শাসন করার উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের কোনো কোনো সংগঠনকে সহায়তা প্রদান করছে। ভূমি গ্রাস, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক হয়রানি, মিথ্যা পুলিশি মামলা, নারী ও শিশুদের চরম নিরাপত্তাহীনতার মতো অপরাধের শিকার হয়ে কয়েক দশক ধরে তারা তাদের শান্তি, আত্মমর্যাদা, পৃথক জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের দাবি জানিয়ে আসছে। আদিবাসী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি, বহু সংখ্যক বাঙালি পুনর্বাসন এবং সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণে এ অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং প্রতিবিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এক লক্ষ পাহাড়ি মানুষ উদ্বাস্তু এবং তার চেয়েও বহু বেশি সংখ্যক অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের করুণ অবস্থার অন্যতম উদাহরণ সাজেকে সংঘটিত ঘটনা, যেখানে সেনাবাহিনী পুনর্বাসিত বাঙালিদের সহায়তায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর হামলা চালায়। এই গবেষণায় সমর্থিত হয়েছে যে, আদিবাসীদের অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল ভূমিকেন্দ্রিক বিষয়। ভূমিকে কেন্দ্র করে যেমন পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তেমনি বাঙালিদের সাথেও তাদের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বকালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সরকার পাহাড়ি ভূমির প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ফলে এখনও পাহাড়ি ও বাঙালি এবং রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী ও পাহাড়িদের মধ্যে উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভূমির মালিকানার দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ শাসক বন বিভাগের নামে পাহাড়ের ভূমি করায়ত্ব করে। পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ তৈরির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে অস্বীকার করে। বাংলাদেশ শাসন আমলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙালি পুনর্বাসন ও অনানুষ্ঠানিক অনুপ্রবেশের ধারা অব্যাহত থাকায় তারা নিজস্ব ভূমি থেকে প্রতিনিয়ত বিতাড়িত হচ্ছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, সরকারের পুনঃবন্দোবস্ত প্রকল্প (Government Resettlement Project)-এর কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরেও পুনর্বাসিত বাঙালিরা তাদের স্বজনদের এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। গবেষকের মতে আইনগতভাবে এরূপ অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে এ অঞ্চলে বাঙালি অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকবে, সেইসাথে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ভূমিহারা হয়ে থাকবে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী মনে করে ভূমি প্রকৃতির দান যেখানে তারা উত্তরাধিকারদের জন্য ভূমির গুনাগুন বজায় রেখে চাষ ও বাস করার অধিকারী। এই ধারণা থেকে কখনোই তাদের ভূমি দখল বা মালিকানার কোনো দলিল ছিলনা, এখনও নাই। কিন্তু অপরদিকে পুনর্বাসিত বাঙালিদের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূমির দলিল রয়েছে। এ অঞ্চলে এটি একটি অন্যতম সংঘাতময় পরিস্থিতি যা অদ্যাবধি নিস্পত্তি হয়নি।

গবেষক এ অঞ্চলের বাঙালি পুনর্বাসনকে রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, অনেক পুনর্বাসিত বাঙালি এখন অনুধাবন করতে পারে যে, এ অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসন ছিল তৎকালীন সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, তারা এর শিকার হয়ে দারিদ্র ও পীড়িত অবস্থায় জীবন-যাপন করছেন। পাহাড়ি এলাকায়

তাদের চলাফেরা, বসবাস কষ্টসাধ্য বিষয়। এছাড়া পাহাড়ি পথে দূরে অবস্থিত স্কুলে যেতে তাদের সন্তানেরা আগ্রহবোধ করেনা। আবার স্কুলের পরিবেশও বাঙালি সন্তানদের জন্য অনুকূলে নয়। বাঙালিরা মনে করে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ খুব অল্প। উপরন্তু অব্যবস্থার ফলে বরাদ্দকৃত স্বল্পভূমিও সঠিকভাবে তাদের হস্তগত হয়নি। সুতরাং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভূমি বরাদ্দ দিয়ে যাদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে সে বাঙালি বা স্থায়ী পাহাড়ি জনগোষ্ঠী কোনো পক্ষই এ অঞ্চলে সরকারি কার্যক্রমে সন্তুষ্ট নয়; বরং তারা দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসে লিপ্ত।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত সকল সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা হয় এবং ক্রমান্বয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদ সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এ প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। সামরিক বাহিনীর আগ্রহ ও স্বার্থ এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও অসহায়ত্বকে বিস্তৃত করেছে। সাধারণভাবে এ সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা যে-কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে এমন ব্যয়বহুল সামরিক বাহিনী মোতায়েন ও অভিযানের কোনো যৌক্তিকতা খুজে পাওয়া যায়না। উপরন্তু বিগত কয়েক দশকে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি আদিবাসীদের ভোগান্তি এবং আদিবাসী বাঙালি দূরত্ব বাড়িয়েছে। সামরিক সরকারের আমলে সামরিক বাহিনীর যে দৌরাত্ব ছিল পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক সরকারগুলো তা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সামরিক বাহিনীকে এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্রোহ দমনের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানপূর্বক মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে এক দশক পরে বাংলাদেশের সরকার উপলব্ধি করতে পারে যে এ অঞ্চলের সমস্যা মূলত রাজনৈতিক, সুতরাং রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গবেষণায় এ অঞ্চলের আদিবাসীদের বঞ্চনার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা চাষ ও বাসযোগ্য ভূমি এমনকি পাহাড় ও বন থেকেও উচ্ছেদ হয়েছে। তারা যে-কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক নীতিমালা থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী। এ অঞ্চলে সরকার কর্তৃক গৃহীত আবাসিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাসহ যে-কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি অত্যন্ত নিম্নমানে পরিচালিত হয়। গবেষক এ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক নীতিমালা গ্রহণ ও সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব বণ্টন পারস্পরিক অধিক্রমিত হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। স্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ মূলত এ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল করেছে। অনেক আদিবাসী নেতৃবৃন্দ তাদের সমাজে বিরাজমান সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীকে এমনভাবে ধারণ করা হয় যেখানে তারা তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সুষ্টভাবে পরিচালনা করার অধিকার অর্জন করে। গবেষক মনে করেন, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সমস্যা সংখ্যালঘুর কারণে নয় বরং তারা তাদের জাতি-পরিচয় সংকটে বিপন্ন। ফলে

ক্ষণিকের জন্য তারা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারালেও তাদের সংগঠনগুলো আবারও সুসংগঠিত হয়ে রাষ্টীয় শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, যদি না সরকার এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐক্যতান রচনা করতে সক্ষম হয়। আদিবাসীদের মধ্যেও এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, যেখানে তারা মনে করে যে, একটি সামাজিক বিপ্লবই পারে সামন্ততান্ত্রিকতাকে উপেক্ষা করে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

গবেষণায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন-বঞ্চনার চিত্র অর্থাৎ তাদের সংক্ষুব্ধতা কীভাবে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে তা যতটা আলোচিত হয়েছে তাদের রাজনৈতিক জীবন-সংগ্রাম, নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের অবদান তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তিনি গবেষণায় যে সামাজিক নীতিমালা, গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও সুশাসনের সুপারিশ করেছেন তা কার্যকরী করার পদক্ষেপ কি হতে পারে তা আলোকপাত করেননি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক জীবন ধারাকে জানার জন্য গবেষণাটি উল্লেখযোগ্য।

Shapan Adnan (2004), *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict, Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দারিদ্র্যের কারণগুলোকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের দারিদ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তা তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।[৩৩৪] পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সমতলভূমির বাংলা ভাষাভাষীদের থেকে আলাদা। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি "জুম্ম" নামে অভিহিত করে। জুম্ম শব্দটি পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ থেকে এসেছে। সরকারি নথি-পত্রে তাদেরকে "এ্যাবরজিনাল", ''হিলম্যান", "উপজাতি" অথবা 'জুমিয়া' নামে অভিহিত করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের নিজস্ব সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলো নিজেদেরকে ব্রিটিশ শাসনমল থেকে 'হিলম্যান' অথবা 'পাহাড়ি' এবং সাম্প্রতিককালে 'Indigenous People' বা 'আদিবাসী' বলে চিহ্নিত করে থাকে।[৩৩৫]

পাহাড়িরা জুম চাষে অভ্যস্ত। প্রতি বছর জুম চাষের জমি পরিবর্তন করার জন্য এই চাষে প্রচুর জমির আবশ্যক হয়। জুমের জমি কমে যাওয়ায় পাহাড়িরা প্রতি বছর জুমের জমি পরিবর্তন করতে পারছেন না, ফলে জুম চাষ অলাভজনক হয়ে পড়েছে। এই জুম চাষও পাহাড়িদের অনগ্রসরতার একটি কারণ।

পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য আগ্রহী ছিল। এ উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনা নামক স্থানে কর্নফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠা করে। এ কাগজ কলে কাঁচামাল হিসেবে এই অঞ্চলের বাঁশ ও নরম কাঠ ব্যবহার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করে। এতে

[৩৩৪] Shapan Adnan , *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict, Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Research & Advisory Services, Dhaka, 2004, পৃষ্ঠা ঃ ১৪০-১৬১।

[৩৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়িদের জুম চাষের জমি কমে যায়।[৩৩৬] পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে পাহাড়িদের জীবনে মারাত্মক দুর্ভোগ বয়ে আনে। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ নির্মাণ পাহাড়িদের মধ্যে একই সঙ্গে দারিদ্র্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে।[৩৩৭] এছাড়া স্বাধীনতার পর পাহাড়িদের প্রতি সহিংস আচরণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থানের অজুহাতে।[৩৩৮] সেই সাথে সংবিধানে তাদের দাবিকে অস্বীকার করা হয়। পাহাড়িরা দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলেন। বাংলাদেশ সরকার তাদের দমন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনাবাহিনী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলে এবং সমতল ভূমির লাখ লাখ বাঙালির অনুপ্রবেশ ঘটায়। সেনাবাহিনী পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন, হত্যা, নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংস আচরণ করে। এতে তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয় এবং বাঙালি অনুপ্রবেশের ফলে পাহাড়িরা ভূমির অধিকার হারাতে থাকে। ফলে তারা দারিদ্রের দিকে ধাবিত হয়।[৩৩৯] অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকার একমত হয়ে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পাহাড়ে বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ পাহাড়ি, বাঙালি উভয়ের সাধারণ জনগণের নিকট থেকে বিভিন্ন খাতে চাঁদা ও টোল আদায় করে যা অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে দুর্বল করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, বিদেশী অভিজ্ঞ পরামর্শক পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে হস্তক্ষেপ করে, যা অধিকাংশ সময় উন্নয়নের পরিবর্তে দারিদ্র তৈরি করে- যেমন কাপ্তায় বাঁধ প্রকল্প, বনায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান পাহাড়িদের জীবন প্রণালী, সংস্কৃতি ও প্রথাকে মূল্য দেয়না, ফলে তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সবসময় পাহাড়িদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়না।[৩৪০]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বাঙালিরা। বাঙালিরা পাহাড়িদের উৎপাদিত পণ্য অধিক মূল্যে নিজেদের পরিবহনে নিকটস্থ বাজারে নিয়ে যেতে এবং স্বল্প মূল্যে তাদের নিকট বিক্রি করতে বাধ্য করে। এতে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে দিনে দিনে অপরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশকারী মানুষের বসতি, ভৌতকাঠামো নির্মাণ ও নগরায়নের ফলে পাহাড়িরা জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস পাহাড়-বন ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- বৃক্ষ, বাঁশ ও ফলের বাগান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস ও ক্ষয় হচ্ছে এবং পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে যা পাহাড়িদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।[৩৪১] বাস বা চাষের ভূমিকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে না করা এ অঞ্চলের আদিবাসী জাতিসমূহের একটি ঐতিহ্যবাহী মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। তাই জমির দলিলকে তারা অনাবশ্যক মনে করে। যুগের পর যুগ বংশ পরম্পরায় তারা জমির দলিল ব্যতীত জমি ভোগ দখল করে আসছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সফলতা আনার জন্য ব্যাংক ঋণ প্রয়োজন। ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির জন্য জমির দলিলপত্র না দেখাতে পারায় তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়,

[৩৩৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৩।
[৩৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪০।
[৩৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬।
[৩৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪-৬৭ ও ১৪৬।
[৩৪০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬।
[৩৪১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৩।

যা তাদের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়িদের শিক্ষার হার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পেলেও এই সংখ্যা দেশের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় এখনও অতি নগণ্য। বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে একবিংশ শতাব্দীতেও পাহাড়িরা দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করছে। [৩৪২]

এ গবেষণায় গবেষক দারিদ্র্য এবং উন্নয়নের ধারণাকে পাহাড়ি জনগণের সুনিদিষ্ট সাংস্কৃতিক চর্চা জীবনের চাহিদা এবং তা পূরণের জন্য তাদের পছন্দের অগ্রাধিকারকে একই সূত্রে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে বাজার, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান কর্ম-প্রক্রিয়ার জটিলতার পরিণতি হিসেবে দেখা হয়েছে। পাহাড়ি জনগণের দারিদ্র্য বিশ্লেষণে ক্ষমতা ও শোষণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যা জাতিগতভাবে তাদের উপর আরোপিত কর্তৃত্ব ও বৈষম্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেগুলোকে নিবিড়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জোরপূর্বক বাণিজ্যিকরণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকরণ এবং বিশ্বায়ন কীভাবে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যকরণে ভূমিকা রাখছে তা সুন্দরভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দারিদ্র্যের মূল কারণগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। পদ্ধতিগতভাবে দারিদ্র্য বিস্তারের সাথে জড়িত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যেমন ভূমি থেকে উচ্ছেদ, জোরপূর্বক পুনর্বাসন, রাষ্ট্র কর্তৃক শোষণ-নিপীড়ন, বন উজাড়, পরিবেশগত ভারসাম্যতা হ্রাস, বাজার ব্যবস্থা ও বাণিজ্যে বেআইনি প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে ভিন্নতর সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে দারিদ্রের কারণ উদঘাটন ও নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতানুগতিক ধারায় যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তা-ঘাট এবং ভৌত কাঠামোর অভাব, মূলধন ও ক্ষুদ্র ঋণের অভাব, অনুন্নত বাজার ব্যবস্থাকে এ অঞ্চলের দারিদ্রের কারণ হিসেবে দেখা হয় যা অনাকাঙ্খিত।[৩৪৩] পার্বত্য জনগোষ্ঠীর দারিদ্রের কারণ ও তার নিরসনের উপায় অনুধাবনের জন্য এটিকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Rajkumari Chandra Roy তার *Land Rights of the Indigenous Peoples of Bangladesh*[৩৪৪] (2000) গবেষণা রিপোর্টে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও এ সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা ছাড়াও আদিবাসীদের ভূমি ব্যাবস্থাপনায় প্রথাগত নীতি এবং এ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি পর্যালোচনা করেছেন। এছাড়াও আদিবাসীদের আইনগত অধিকার তথা সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টিও আলোচনায় আসে। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত আইন বিশেষ করে ভূমি অধিকার, রাজস্ব, ভূমি প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি ও প্রোগ্রাম (ফরেস্ট পলিসি,

---

[৩৪২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫২।

[৩৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪০-১৬২।

[৩৪৪] Rajkumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Denmark, 2000, পৃষ্ঠা ঃ ২৪-৩৫, ৩৯-৪৭, ৫০-৮২ ও ৮৫-৯৫।

হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট, পপুলেশন ট্রান্সফার প্রোগ্রাম, সামরিকীকরণ ইত্যাদি) এবং এদের প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন এক্সপার্ট মিটিংসমূহ যেখানে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এগুলোও এই রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে।

Tone Bleie তার *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenge: The Adivasis of Bangladesh* গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন ব্যবস্থা, মানবাধিকার, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির Foreword অংশে সঞ্জীব দ্রং বলেছেন বাংলাদেশ শুধু বাঙালিদেরই আবাস ভূমি নয়। এখানে বহু সংস্কৃতির এবং বিভিন্ন জাতির মানুষের বসবাস। এরাই হল বাংলাদেশের আদিবাসী।[৩৪৫] Tone Bleie বলছেন যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন দেশের মোট আয়তনের ১০ ভাগের ১ ভাগ। ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং বার্মার সাথে এখানকার আদিবাসীদের আত্মিক এবং জাতিগত সম্পর্ক আছে। [৩৪৬] কাপ্তাই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করে Tone Bleie তার গ্রন্থে বলেছেন, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে আদিবাসীরা ভূমিহীন এবং উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে।[৩৪৭] শেখ মুজিবর রহমান যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি আদিবাসীদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভারতের সমর্থনে আদিবাসীরা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। এখানে ভারতীয় সেনাদের দ্বারা তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। তবে পার্বত্য চট্টগ্রমে আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টি করার কোনো ইচ্ছা ভারতের ছিলনা বলে Tone Bleie উল্লেখ করেছেন।[৩৪৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে আদিবাসী বৌদ্ধ, হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংস কর্মকান্ডের ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির ফলে তা কিছুটা প্রশমিত হয় বলে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।[৩৪৯] Tone Bleie বলছেন যে বাংলাদেশের সকল আদিবাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের অধিকারের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাদের দাবি-দাওয়াগুলো

---

[৩৪৫] Sanjeeb Drong, Foreword, বিস্তারিতের জন্য দেখুন Tone Bleie, *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenge: The Adivasis of Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, 2006, পৃষ্ঠা ঃ xvi.

[৩৪৬] Tone Bleie, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৫।

[৩৪৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬।

[৩৪৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬।

[৩৪৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬২।

আদায়ের ব্যাপারে অনেকটা সফলতা অর্জন করেছে।[৩৫০] আন্তর্জাতিকভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সেখানে মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছিল। তবে ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির ফলে সেখানে স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে গ্রন্থটিতে উল্লিখিত হয়েছে।[৩৫১]

আদিত্য কুমার দেওয়ান-এর *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh* শীর্ষক গবেষণায় চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় বাঙালিদের ক্রমাগত আগমনের কারণে আদিবাসীদের ঐ অঞ্চলে সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। উক্ত গবেষণায় যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, জাতিগত দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও বিস্তার হয়েছে ব্রিটিশ, পাকিস্তানি এবং বাঙালি উপনিবেশবাদ, আধুনিকায়ন এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, সামরিকীকরণ এবং আদিবাসীদের প্রথাগত জীবনের ক্রমাগত ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে। [৩৫২]

ভূমিত্র চাকমা'র '*The Post-Colonial State and Minorities: Ethnocide in the Chittagong Hill Tracts*' গবেষণা প্রবন্ধে যে তিনটি বিষয়কে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখিয়েছেন তা হলো ঃ

ক. আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতিগত ও উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

খ. সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম

গ. আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে সামরিকীকরণ।

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আমলাতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকএবং সামরিক অনুপ্রবেশ তাদের প্রান্তিকীকরণের জন্য এবং সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংসের জন্য দায়ী। এই অবস্থা তাদেরকে স্বায়ত্তশাসনের দাবির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। [৩৫৩]

বুদ্ধদেব চৌধুরী তার 'Ethnic Conflict in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে ওই অঞ্চলে যে দুই দশকব্যাপী যে জাতিগত সংঘাত, হিংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ড চলেছে এবং তার ফলে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে তা তুলে ধরেছেন। তিনি তার প্রবন্ধে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এগুলো হলো ঃ এলাকা, জনসংখ্যা এবং অভিবাসন প্রবনতা, অর্থনীতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর গৃহীত নীতিমালা, দেশীয়-আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এবং নিপীড়ন, প্রতিরোধ ও অভিবাসন। বুদ্ধদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছিল ২,৭০,০০০ যার মধ্যে বাঙালি

[৩৫০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৬।

[৩৫১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৮২।

[৩৫২] Aditya Kumar Dewan, *Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh*, Ph.D. Dissertation in Department of Anthropology, McGill University, 1990.

[৩৫৩] Bhumitra Chakma, '*The Post-Colonial State and Minorities: Ethnocide in the Chittagong Hill Tracts*', published in *Commonwealth & Comparative Politics*, 2010, Vol. 48, Issue 3. পৃষ্ঠা ঃ ২৮১-৩০০।

ছিল মাত্র ২ শতাংশ। ১৯৫১ সালে বাঙালি জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯.১% এ, ১৯৬১ সালে বাঙালির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭.৭%, ১৯৮১ সালে বাঙালি সেটলারদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে যাবার ফলে বাঙালি জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ শতাংশে। তিনি ১৯৮৪ সালের ৬ মার্চের ব্রিটিশ সংবাদপত্র গার্ডিয়ান-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩-৪ লক্ষ বাঙালি সেটলারদের বসতি করানো হয়। ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে যার মধ্যে রয়েছে ইউনিসেফ কর্তৃক খাবার পানি সরবরাহ কর্মসূচি, সুইডেনের অর্থায়ণের বনায়ন প্রকল্প, ডব্লিও.এইচ.ও কর্তৃক নেয়া ম্যালেরিয়া দমন প্রকল্প, এশিয়ান ডেপেলপমেন্ট ব্যাংক-এর পশুপালন ও মৎস্যায়ন প্রকল্প, রাস্তা নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য, এশিয়ান ডেপেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক সহায়তায় পরিচালিত যৌথ খামার কর্মসূচি ইথ্যাদি। প্রফেসর বুদ্ধদেব চৌধুরী বলছেন, বিভিন্ন সরকারের সময়েই এখানে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়েছে। নানা রকম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক দল এবং এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে শান্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। ১৯৭২ সালে তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গড়ে উঠা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ১৯৯০ দশকের গোড়ায় তিনটি প্রস্তাব দেয় ঃ ক) আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা। খ) পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা এবং গ) সেনা প্রত্যাহার করে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বুদ্ধদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রমের আদিবাসীদের ৫ টি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় ঃ তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত। আর সেটলারদের অভিবাসনের ফলে আদিবাসীদের জীবনধারার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। [৩৫৪]

নাসির উদ্দিন তার গবেষণা প্রবন্ধ 'Decolonising Ethnography in the Field: An Anthropological Account'-এ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভিন্ন জাতির আবাসস্থল এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের স্থান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ পার্বত্যাঞ্চল। এখানে ১১টি সংখ্যালঘু জাতির বাস যারা বাঙালি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন – তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক, কাঠামোগত, ভাষাগত, ও ধর্মীয় বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যের কারণে। বলা হয়েছে যে, পাহাড়িদের স্বতন্ত্র ভাষায়সিনো-তিব্বতী, তিব্বতী-বর্মন এবং কুকি-চীন-এর প্রভাব রয়েছে। গবেষক বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক নীতি এবং উপনিবেশ-পরবর্তী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসই পাহাড়িদের প্রান্তিকতা বা তাদের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির

---

[৩৫৪] Buddhadeb Chaudhuri, 'Ethnic Conflict in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh', in S.W.R. De A. Samarasingha and Reed Coughlan (ed.), Economic Dimensions of Ethnic Conflicts : International Prespectives, UPL, Dhaka, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫-১৫৫।

প্রধান কারণ। এছাড়া তিনি CHT Regulation Act 1900-এর রদ এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাধ নির্মাণ-কে পাকিস্তান আমলে পাহাড়ি বনাম রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। [৩৫৫]

গোলাম রসুল ও মাধব কার্কি তাদের 'Political Ecology of Degradation of Forest Common in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh' শিরোনামের গবেষণা প্রবন্ধে বলেছেন যে, ভূমিক্ষয়ের জন্য আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জমিচাষ প্রথা দায়ী নয়; বরং এর জন্য দায়ী অতীত ও বর্তমানের বভিন্ন ধরনের নীতি যার মধ্যে আছে ভূমি ও বনের জাতীয়করণ, সংরক্ষিত বন প্রথা, বন-ব্যবস্থাপনার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কৃষি, রাবার উৎপাদন ও উদ্যানের জন্য ভূমির বেসরকারিকরণ এবং নিম্নাঞ্চলের মানুষদের বসবাসের জন্য ভূমির পত্তনি ব্যবস্থা।[৩৫৬]

নাঈম মোহাইমেন সম্পাদিত Between Ashes and Hope : Chittagong Hill Tracts in the Blind Spot of Bangladesh Nationalism গ্রন্থে অর্ধশতাধিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেখানে আদিবাসীদের অধিকার, বঞ্চনা, নির্যাতন, ভূমি বিরোধ, ভাষা সমস্যা, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, নিরাপত্তা, বাঙালির অনুপ্রবেশ, অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি এবং সর্বোপরি প্রহসনমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Deepak Singh-এর লেখা The Chakma between Bangladesh and India লেখাটি যাতে আলোচিত হয়েছে ভারতের অরুণাচল রাজ্যে অবস্থান নেয়া কাপ্তাই উদ্বাস্তুদের কথা যারা অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে নাগরিকত্ব পাননি এবং দেশহীন অবস্থায় রয়েছেন। [৩৫৭]

মোহম্মদ আশরাফুজ্জামান তার মাস্টার্স গবেষণা অভিসন্দর্ভ *The Tragedy of Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: Land Rights of Indigenous Peoples*-এ দেখিয়েছেন যে, আদিবাসী জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা তথা রীতিনীতি ইত্যাদির ভিন্নতা বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী তথা বাঙালিদের থেকে আদিবাসীদের বিভক্ত করেছে। এই ভিন্নতা অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের রূপ গ্রহণ না করে বহু দিন ধরে তাদের মূল জনস্রোতের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। সাংবিধানিকভাবেও তাদেরকে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘু পরিচয়ে পরিচিত করা হয়েছে। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, পাকিস্তানি আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে তারা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের অস্বীকৃতি। নানা নির্যাতনমূলক

[৩৫৫] Nasir Uddin, 'Decolonising Ethnography in the Field: An Anthropological Account', published in *International Journal of Social Research Methodology*, vol. 14, no. 6, November 2011, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৫-৪৬৭।

[৩৫৬] Golam Rasul and Madhav Karki, 'Political Ecology of Degradation of Forest Common in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh', International Centre for Integrated Mountain Development, Kathmandu, Nepal, Monograph published in http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/517.

[৩৫৭] Deepak Singh, 'The Chakma between Bangladesh and India' published in Naeem Mohaiemen (ed), *Between Ashes and Hope : Chittagong Hill Tracts in the Blind Spot of Bangladesh Nationalism*, Drishtipat Writers' Collective, Dhaka, 2010, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩-১৪৬।

আইনের মাধ্যমে আদিবাসীদের নিজ জমি থেকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী ও অভিবাসী বাঙালিদের বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। মূলত সকল বৈষ্যমের কেন্দ্রমূলে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ আগ্রাসন।[৩৫৮]

কাউসার আহমেদ তার 'Defining 'Indigenous' in Bangladesh: International Law in Domestic Context' প্রবন্ধে বলেন যে, বাংলাদেশ একটি বহুজাতিক দেশ। এই সভ্যতা হাজার বছরের। জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী ১১টি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের এখনও স্বীকৃতি মেলে নি। তাদের জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার এখনও স্বীকৃত নয়। বাংলাদেশে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীই জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসীদের সংজ্ঞাকে প্রতিনিধিত্ব করে ফলে তারা আদিবাসী হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সনাক্ত করতে আগ্রহী।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী সংজ্ঞা নিয়ে আদিবাসী জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। এটি নিয়ে কেউই সন্তুষ্ট নয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব-পরিচয় দিতেই বেশি আগ্রহী কিন্তু কোনো সংজ্ঞার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করতে রাজী নয়। আদিবাসী জনগণ আধিপত্য বিহীন সামাজিক ব্যবস্থাকেন্দ্রিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে আধিপত্যবাদ রয়েছে। ফলে সামঞ্জস্যহীন একটা সম্পর্কের টানাপোড়েন রয়েছে রাষ্ট্র ও আদিবাসী জনগণের মধ্যে। তবে আন্তর্জাতিক আইনে আদিবাসীদের সম্পর্কে যে ধারনা দেওয়া হয়েছে তা তাদের সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অবস্থাকে অনুধাবন করতে সাহায্য করছে।[৩৫৯]

আদিবাসীদের ইতিহাস অধস্তনদের ইতিহাস। ইংরেজ উপনিবেশবাদের ফলে তাদের জমি দখল হয়ে যায় এবং তারা তাদের অধীনস্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজরা যখন চলে যায় তখন অভ্যন্তরীণভাবে তাদের জমি দখল করে নেয় প্রভাবশালী মহল। ফলে তারা অধস্তনই থেকে যায়। এই প্রবন্ধে খাসি, চাকমা, সাঁওতাল তিনটি আদিবাসী কমিউনিটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় ৭৫টি জাতি রয়েছে তার কোনো কথা উল্লেখ নেই। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত তিনটি জাতির ঐতিহাসিক অবস্থান ও বিবর্তনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্র যদি তাদের স্বীকৃতি দেয় তবে তা উভয়ের জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে।

গ) ৩য় ধারার গ্রন্থাবলী

---

[৩৫৮] Md. Ashrafuzzaman, *The Tragedy of Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: Land Rights of Indigenous People*, Masters Thesis in Development Studies, Lund University, 2014, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫-৬০।

[৩৫৯] Kawser Ahmed, 'Defining 'Indigenous' in Bangladesh: International Law in Domestic Context', *International Journal on Minority and Group Rights,* Leiden, Issue 17, 2010, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭-৭৩।

৩য় ধারার গ্রন্থাবলী অর্থাৎ যেসব গ্রন্থে পাহাড়ি জাতিসমূহের সংগ্রামকে নিরাপত্তার দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাদের সংগ্রামকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও 'সন্ত্রাসী' কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ ঃ

ঢাকার Centre for Development Research থেকে **ড. মিজানুর রহমান শেলী**'র সম্পাদনায় **১৯৯২** *সালে প্রকাশিত The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The Untold Story* গ্রন্থে ড. শেলী ও ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-সহ অন্যান্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর কার্যক্রম এবং এই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতার নানা বিষয় পর্যালোচনা করেছেন এবং রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সমর্থন করেছেন [৩৬০] গ্রন্থটির সমালোচনায় প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা ও পরবর্তীকালে বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সৈয়দ মাহমুদ আলী লিখেছেন যে, ১৯৯০ সালের শেষ দিকে তখনকার রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ-এর আমন্ত্রণে একটি ইউরোপভিত্তিক একটি সংস্থা (CHT Commission) পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সফর করেছিল। এই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। *জীবন আমাদের নয়* (*Life Is Not Ours*) নামে তারা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে বিগত দুই দশকের সরকারি নীতির কঠোর সমলোচনা করা হয়েছিল। যখন মিসেস খালেদা জিয়ার সরকার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করলো, তিনি কমিশনের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে সেনাবাহিনীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন ১৯৭০-এর দশকের শেষ থেকে কারা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করতো। ২৪ পদাতিক ডিভিশন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের সব ধরণের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিল, তারা শেষ বছরে ৩ খন্ডের রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। ড. মিজানুর রহমান শেলী'র বইটিতে মূলতঃ ২৪ পদাতিক ডিভিশনের সেই রিপোর্টের একটি সাধারণ পর্যালোচনা করা হয়েছে।[৩৬১]

এই গ্রন্থে মূলতঃ বঙ্গীয় ব-দ্বীপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে চাপ এবং তার ফলে কম জনবসতিপূর্ণ এলাকার দিকে তাদের সরে আসার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ১০ ভাগের এক ভাগ এবং এটা দেশের একমাত্র বড় অঞ্চল যেখানে কম জনবসতি রয়েছে। ফলে দেশের বাড়তি জনসংখ্যার চাপে এই উর্বর উপত্যকায় ও ভূমিতে অভিবাসন প্রক্রিয়ার একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। ১৯৭০ এর শেষ দিকে রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণের কারণে সেখানে হাজার হাজার বাঙালি ভূমিহীন পরিবারকে বসতিকরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে এই উদ্যোগ যে ঐ এলাকায় গুরুতর সমস্যা তৈরি করেছে, বিশেষ করে ভূমি-বিরোধ তৈরি ক'রে শান্তিবাহিনীর জঙ্গল-যুদ্ধ আরও বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি করেছে সে কথা এই গ্রন্থে বলা হয়নি। বরং এতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে রাস্তা নির্মাণের সময় শান্তিবাহিনী (SB) একজন আর্মিকে অপহরণ করেছিল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ প্রকৌশলীদের হত্যা করেছিল। তখন থেকেই মূলত শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছিল এবং এই অভিযান পরবর্তীতে অব্যাহত ছিল।

---

[৩৬০] Dr. Mizanur Rahman Shelley (Edited), The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story, Centre for Development Research, Dhaka, 1992.

[৩৬১] Syed Mahmud Ali,

এই গ্রন্থের প্রথম এবং শেষ অধ্যায়ে অন্য অধ্যায়গুলোর সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। না বলা কথা (*The Untold Story*) শিরোনামে এই গ্রন্থে কিছু নাটকীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে আদিবাসী বিদ্রোহের মূল কারণ তারা খুঁজে বের করেছেন বলে দাবি করেছেন এই ব'লে যে এটা মূলতঃ বাংলাদেশের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। তবে তারা এর বিস্তৃত বিশ্লেষণে যাননি। তবে এই গ্রন্থে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে জনগণের অধিকার, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিষয়ে কিভাবে আরও নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক (২০০১) -এর *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়ন*[৩৬২] গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবন, ইতিহাস ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। লেখক **১৯৮৮-১৯৮৯** সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক শান্তি প্রক্রিয়ায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত। তিনি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ডিএমও, বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীর কমান্ডান্ট ও যশোর অঞ্চলের জিওসি ছিলেন। সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার সুবাদে বিভিন্ন সময়ে আত্মসমর্পণকৃত বা শান্তিপূর্ণ জীবনে প্রত্যাবর্তনকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য, বিভিন্নি অপারেশনে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধৃত শান্তিবাহিনীর সদস্য ও ভারতে অবস্থিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের জবানবন্দী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে পড়া শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন দলিলপত্র ও নিজস্ব গোয়েন্দাদের মূল্যায়ন থেকে পাহাড়ি জাতিসমূহের সংগ্রাম, গোপন ও প্রকাশ্য লড়াই, নেতৃত্ব ও নেতাসহ সাধারণ মানুষের অবস্থা-অবস্থান সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়ার সুযোগ তার হয়েছে। তিনি তার এ লেখা মূলত এসব তথ্যের সমাহারে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় ও ঐতিহাসিক কিছু দলিলের উপাত্ত এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর গ্রন্থ বলা সমীচীন। তবে একথাও সত্য যে, তিনি এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন যেটি তার নিজস্ব মূল্যায়ন নির্ভর ও সমর্থিত বলেই ধরে নেয়া যায়। তবে পার্বত্য অঞ্চলের সংগ্রাম, জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গ সংগঠন শান্তি বাহিনীর গড়ে ওঠা ও সশস্ত্র লড়াই এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের ভূমিকা জানা ও বোঝার সন্ধান পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশেষভাবে মূল্যায়িত হওয়ার দাবি রাখে।

এম এন লারমা, শান্তিবাহিনী ও সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি এই গ্রন্থে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা “উপজাতি” সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ রয়েছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় সুলতানী আমল ও মুঘল আমলের (১৩৩৮ থেকে ১৭৬০ সাল) রাজনৈতিক শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, ১৭৬০ সালে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাগ্যও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ সরকার ‘রেগুলেশন-ওয়ান’ প্রণয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসনিক ও

---

[৩৬২] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি "উপজাতীয় সার্কেলে" বিভক্ত করা হয় যেগুলোর প্রধান করা হয় "উপজাতীয়" ব্যক্তিদের। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় কার্যত দুই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়। সার্কেল প্রধানগণ সরকারের রাজস্ব আদায় এবং "উপজাতীয়" সংস্কৃতি ও প্রশাসন বজায় রাখার দায়িত্ব পান। মহকুমা প্রশাসকদের (এসডিও) দায়িত্ব ছিল নিয়মতান্ত্রিক সরকারি প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভূক্তি পাহাড়িরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে বেশি সুবিধাজনক মনে করেছিল। ফলে পাকিস্তানি শাসকগণ প্রথম থেকেই তাদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার গৃহীত শিল্প উন্নয়নের উদ্যোগ তাদেরকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সময় "উপজাতি"দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষোভের জন্ম দেয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে পাহাড়িদের অস্তিত্বের ওপর প্রবল আঘাত হানা হয়। সর্বমোট প্রায় ১,০০,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পুনর্বাসন ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত ছিল না এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অব্যবস্থাপনার দরুন প্রায় ৪০,০০০ চাকমা জাতি "পূর্ব পাকিস্তান" ত্যাগ করে ভারতের অরুণাচল ও মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে সেখানে ইন্সার্জেন্সি তৎপরতা শুরু হয়। এর প্রেক্ষাপটে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্র সমন্বয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটিতে বিশাল সমাবেশে পাহাড়িদের প্রতি তাঁর সরকারের বিশেষ আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন এবং একই সাথে তিনি পাহাড়ি জাতিকে সেদিন থেকে বাঙালি হয়ে যেতে বলেন। এই ঘোষণা দ্বারা মূলতঃ কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি তা স্পষ্ট না করলেও, জেনারেল ইবরাহিম মনে করেন যে, এ আহ্বান দ্বারা আসলে তিনি পাহাড়িদেরকে বাঙালিদের সমান মর্যাদা ভোগ করার কথাই বুঝাতে চেয়েছিলেন। [৩৬৩] তবে বাস্তবে এই ঘোষণাকে পাহাড়িরা বাঙালিদের কাছে তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সমর্পণ হিসেবে মূল্যায়ন করে। ফলে পাহাড়ি জনগণের অসন্তোষ জঙ্গীরূপ ধারণ করে যা স্বল্প সময়ের মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। এরূপ তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য বিদ্যমান আইনের আওতায় সেনাবাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক সেনাক্যাম্প স্থাপন করে। জেনারেল ইবরাহিম আরও বলছেন যে, এ সময় পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার ভারতের

[৩৬৩] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতায় একটি যৌথ অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।[৩৬৪]

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতা গ্রহণের পর জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপের সাথে সাথে এই সরকার সমস্যা মোকাবেলায় কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সামরিক, আধা-সামরিক, পুলিশ ও আনসার বাহিনী মোতায়েনের পরেও শান্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ না হওয়ায় সরকার "পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ও বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাতে ভারসাম্য আনার জন্য" এবং পাহাড়ি জাতির আন্দোলনকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় বাঙালি পুনর্বাসন করে। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ ও জনগণ স্বাভাবিকভাবে এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিরোধীতা করে এবং তাদের পূর্বের দাবিদাওয়ার সাথে পুনর্বাসিত বাঙালিদের ফিরিয়ে নেওয়ার নতুন দাবি যুক্ত হয়। কিন্তু সরকার পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাঙালি এবং পাহাড়ি জনসংখ্যার মধ্যে যে একটা ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে তা পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোনো সুফল বয়ে আনেনি।

পাহাড়িদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি "উপজাতি"দের একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বাঙালি ব্যতীত অন্য কোনো জাতিকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত। এম এন লারমা সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদে পাহাড়ি জাতির অস্তিত্বকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেন যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করে তারা অধিকার অর্জন করতে সমর্থ হবেন না। দাবি আদায়ের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে বেছে নেন। এ লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' গঠিত হয়।[৩৬৫] জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব ছিল মূলত এম এন লারমা এবং সন্তু লারমার হাতে। শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে এম এন লারমা বন্ধু-দেশ হিসেবে বার্মা ও ভারতের সহায়তা চান। বার্মা কোনো আগ্রহ দেখায় নাই। তবে ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত সরাসরি ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারত সরকার শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭৫ সালের শেষার্ধে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণের পর অস্ত্র ও রসদ দিয়েও সহায়তা করা হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে কয়েক দফা অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান আসার পর যুদ্ধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালের শেষ দিকে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রিয় কামিটির সদস্য প্রীতি কুমার চাকমার সাথে উচ্চ পর্যায়ের

[৩৬৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮।

[৩৬৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪।

নেতাদের পার্টির 'আদর্শগত' প্রশ্নে বিতর্কের সৃষ্টি হলে শান্তিবাহিনীর মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়। এছাড়া শান্তিবাহিনীকে সহায়তা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার চাপ ছিল শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব পরিবর্তনের। এর ফলে ভবতোষ দেওয়ান ও প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে সশস্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিবাহিনী ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে। দল বিভক্তির মাধ্যমে নবগঠিত নেতৃত্ব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। অবশেষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর ৮জন সদস্যসহ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে "ভারতের ইজারা গ্রামের বাঘমারা শান্তিবাহিনী ক্যাম্পে" প্রতিপক্ষ প্রীতি গ্রুপ হত্যা করে। এ ঘটনার পর শান্তিবাহিনী প্রকাশ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল ২৩৩জন প্রীতি গ্রুপের সহযোগী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। লারমা গ্রুপ তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। বিভিন্ন সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী সকল সরকার তাদের সাথে সমঝোতায় বসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইতোমধ্যে সরকার পাহাড়িদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভারত প্রত্যাগতদের পুনর্বাসন ও আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীদের পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে। জনগণের পক্ষ থেকে সরকার এবং শান্তিবাহিনীর ওপর স্থায়ী শান্তি অর্জনের নিমিত্তে চাপ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। তাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগে আলোচনা অব্যাহত রাখে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ৭ দফা বৈঠকের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করে এবং ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংঘাতের ওপর রচিত সর্বাধিক তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ বলে গণ্য করা যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবহুল ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য, খণ্ডচিত্র ও মূল্যায়ন এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে শান্তি স্থাপনের দায়িত্বে সংযুক্ত ছিলেন বিধায় তাঁর পক্ষে অনেক অপ্রকাশিত গোপন তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থে বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনীর ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকলেও কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেওয়ায় পাহাড়িদের প্রতি বৈষম্য এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

আতিকুর রহমান তার *They are not Indigenous (The Tribes Residing in Chittagong Hill Tracts)* গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও শান্তিচুক্তি, তাদের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে উগ্র-বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও উগ্র-ইসলামী অবস্থান থেকে আলোচনা করেছেন। চাকমা রাজাদের মুসলিম উপাধি ব্যবহার এবং তাদের ব্যবহৃত সীলমোহরে "আরবী" লেখা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে চাকমাদের পূর্বপুরুষ মুসলমান ছিলেন।[৩৬৬]

[৩৬৬] Atiqur Rahman, *They Are Not Indigenous (The Tribes Residing in Chittagong Hill Tracts)*, Porbat Prokasoni, Dhaka, 2013, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬-১২০ ও ২৩-৩১।

লেখক তার গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'A Danger Point' হিসেবে উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, ১৮৬০ সালে ইংরেজ সরকার চট্টগ্রামের পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পৃথক একটি জেলা গঠন করে এবং এর মাধ্যমেই সমস্যার সূত্রপাত কেননা এই জেলায় 'উপজাতি'রা সংখ্যায় বেশি হয়ে যায়।[৩৬৭] তিনি প্রস্তাব করেছেন বর্তমান চট্টগ্রাম জেলা থেকে কয়েকটি উপজেলা কেটে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোর সাথে যোগ করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কেননা বাঙালিরা তাহলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে।[৩৬৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিপজ্জনক অঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করে লেখক বলেন যে, ১৭৮৪ সালের বার্মা-আরাকান যুদ্ধ ও ১৮২৪ সালের ব্রিটিশ-বার্মা যুদ্ধ চলাকালীন সময় আসাম ও আরাকান থেকে অনেক শরণার্থী এখানে আসে, কিন্তু তারা আর ফিরে যায়নি। তারা এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক হবার পর বহিরাগত 'রিফিউজি'রা সংখ্যায় বেশি হয়ে যায়। যেহেতু পার্বত্য অঞ্চল বন এবং জঙ্গলে আচ্ছাদিত এবং মানুষের প্রায় কোনো বসবাস ছিলনা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়ায় তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা তৈরি হয়, যদিও তারা ছিল সংখ্যায় স্বল্প ও রাজনৈতিকভাবে বহিরাগত।[৩৬৯] ১৯০০ সালের শাসনবিধি প্রণীত হবার তার ৫২ ধারা অনুযায়ী অভিবাসী আইন করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা 'উপজাতি'দের প্রতি পক্ষপাত করে এবং তাদের 'উচ্চতর নাগরিকে'র (Superior Citizen)-এর মর্যাদা দেয়।[৩৭০] সংখ্যায় অধিক হওয়ায় এবং স্থানীয় জনগণের তুলনায় আধিপত্য থাকায় 'উপজাতি'রা রাজনৈতিকভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠে। বিশেষ করে চাকমারা নিজেদের সামন্ত প্রভু ভাবতে শুরু করে। তারা সংখ্যালঘু গরিব মুসলিমদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনেককে বন্দী করে। এই বন্দীরা চাকমা সমাজে দজা, চিক-কাবা, লস্কর, সর্দার, টিবির, মগ, নরণ, খিয়াংজয়, নাপিত, বড়ুয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। ১৮৪৪-১৮৭৩ সালের দিকে রাণী কালিন্দী বিবির শাসনামলে এই বন্দীদের বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।[৩৭১] এখন তারা গরিব বাঙালি সেটলারদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।[৩৭২] এছাড়া লেখক মন্তব্য করেন যে, চাকমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সংহতি সাধন ক'রে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে 'জুম্ম ল্যান্ড' নামে পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন।[৩৭৩]

আতিকুর রহমান আরও উল্লেখ করেন যে, 'উপজাতি'রা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নয়,[৩৭৪] মারমাদের আদি নিবাস আরাকানে, চাকমারা তাদের ঐতিহ্যবাহী গানে নিজেদের Royangya বলে। ত্রিপুরা জাতি আসামের কাছে ত্রিপুরা

---

[৩৬৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০০।
[৩৬৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ??? ।
[৩৬৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০০।
[৩৭০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০১।
[৩৭১] ঐ।
[৩৭২] ঐ।
[৩৭৩] ঐ।
[৩৭৪] ঐ।

প্রদেশ থেকে এসেছে। আদিবাসীরা "জনসংহতি সমিতি" নামে রাজনৈতিক দল দ্বারা সংগঠিত। "শান্তিবাহিনী" নামে একটি সশস্ত্র গ্রুপ রয়েছে।[৩৭৫]

লেখকের মতে, বাঙালিরাই হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই (Naturally) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শক্তি। বাঙালিদের কাছেই বাংলাদেশ নিরাপদ। সুতরাং আমাদের অপরিহার্য্য দায়িত্ব হচ্ছে বাঙালি সেটলার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সহায়তা করা।[৩৭৬] তিনি আরো লিখেছেন যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আদিবাসীরা সংগঠিত হয়ে বাঙালিদের আক্রমণ করা শুরু করে, তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।[৩৭৭]

গ্রন্থটিতে আতিকুর রহমান দাবি করেছেন যে, ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যখন রাঙ্গামাটিতে আসেন তখন তিনি তাকে বিদ্রোহী আদিবাসীরা স্বায়ত্বশাসন দাবি করছে ব'লে অবগত করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অবগত করেন যে, চাকমারা রাষ্ট্রদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে বাঙালি জনগণের উপর হামলা করা শুরু করেছে। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে তিনি পরার্মশ দেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্টের পক্ষেকার (Pro-State) জনসংখ্যা ও সেনাবাহিনীর সদস্য-সংখ্যা বাড়াতে হবে। এর ফলে চার লাখ ভূমিহীন বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে ভূমি ও বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হয়।[৩৭৮]

আতিকুর রহমানের মতে ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আদিবাসীরা চাকরি ও অর্থনৈতিক খাতসহ সবক্ষেত্রেই সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। গরিব মুসলিম সেটেলাররা অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়। তাদের জন্য কোনো কৃষি জমি বরাদ্দ করা হয়নি। তারা মানবেতর জীবন-যাপন করে। তাদের উপর দিনরাত বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক নির্যাতন চলছে।[৩৭৯]
লেখক গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন যে, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠন করে এবং তিনি নিজে তার চেয়ারম্যান হয়ে শান্তিচুক্তির ধারা লঙ্ঘন করেছেন, কেননা শান্তিচুক্তিতে তাদের আদিবাসী বলা হয় নি, উপজাতি বলা হয়েছিল।[৩৮০]

এছাড়াও লেখক চুক্তির কিছু অংশ উল্লেখ করে বলেছেন যে, আদিবাসীরাই চুক্তিটি লঙ্ঘন করছে। চুক্তির এ/১ ধারার বলা আছে যে, উভয় পক্ষই পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতি অধুষ্যিত" এলাকা হিসেবে গণ্য হবে। এবং পার্ট বি/১ কাউন্সিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে "উপজাতি" শব্দের ব্যবহার। এই চুক্তিতে উপজাতি শব্দটি ৩৭ বারের বেশি ব্যবহৃত

[৩৭৫] ঐ।
[৩৭৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০১-১০২।
[৩৭৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০২।
[৩৭৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০২-১০৩ ।
[৩৭৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০২।
[৩৮০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৭-১০৮।

হয়েছে। এবং ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামেল থেকে কোনো প্রকার বিতর্ক ছাড়াই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং তারা আদিবাসী নয় তারা উপজাতি।[৩৮১]

আতিকুর রহমান আরও বলেছেন, বাংলাদেশ যেহেতু সেখানে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করেছে এবং পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে একজন 'উপজাতি' নিয়োগ দিয়েছে, সেহেতু সেটা বাংলাদেশ সংবিধানের পরিপন্থী।[৩৮২]

আতিকুর রহমান (২০১৩), *পর্বত প্রকাশ (অনুসন্ধান)*[৩৮৩] গ্রন্থটিতে বাঙালি না "উপজাতি" কারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদি বাসিন্দা, কারা বহিরাগত এই প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। লেখক বলছেন যে, শিলক কর্নফুলী নদীর উপনদী। এটি রাঙ্গুনিয়াকে ভেদ করে কর্নফুলীতে পড়েছে। এর খাল বা উপনদী হলো ঝংকা। শিলকের অন্যতম ছড়া বাঙ্গাল হাল্যা। আসলে নামটি অর্থপূর্ণ ও বিকৃত। ধারণা করা হয় এক সময় এটি বাঙাল খাল বা খালি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে বিকৃতির মাধ্যমে বাঙ্গাল হাল্যায় পরিণত হয়েছে। চাকমা লোকগীতিতে প্রকাশ শের মস্ত খাঁ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলীয় চাকমা সমাজে আদি রাজা। রাজানগর বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে লিখার মাধ্যমেও চাকমা রানী কালিন্দী স্বীকার করেছেন শের মস্ত খাঁই এই অঞ্চলের চাকমাদের আদি রাজা। অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, মোগল শাসক জুলকদর খাঁন ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা সর্দার শের মস্ত খাঁকে মাওদায় পুনর্বাসিত করেন। এ সকল সূত্রের তথ্য অনুসারে লেখক ধারণা করেন, শের মস্ত খাঁ ও কিছু চাকমা ১৭৩৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম আগমন করেন। পূর্বে তাদের বাসস্থান ছিল আরাকানের রোসাং অঞ্চল। তখনো চাকমাদের মূল অংশ বাংলাদেশে প্রবেশ করেনি। স্থানীয় ইতিহাস সূত্রেও জানা যায়, শের মস্ত খাঁর মৃত্যুর পর ১৭৫৮ সালে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন শের জব্বার খাঁ। এ থেকে অনুমান করা যায়, মোগল আমলের শেষ এবং ব্রিটিশ আমলের শুরু থেকেই এ অঞ্চলে চাকমা আগমন ঘটে। পরবর্তীতে ১৭৮৪/৮৫ সালে বার্মার আভা রাজ্য আরাকান দখল করে জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন শুরু করে এতে মগ, মুরং ইত্যাদি "উপজাতি" পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। ১৮১৮ সালেও কিছু তঞ্চঙ্গ্যার এ অঞ্চলে আগমন ঘটে। সুতরাং চাকমা, মগ, মুরং ইত্যাদি অবাঙালি এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়। [৩৮৪]

বলা হয়, বাঙালিদের অত্যাচার ও শোষণের কারণে অবাঙালি পার্বত্যবাসীদের সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। বাঙালি মহাজনেরা চড়া সুদে অভাবী পার্বত্যবাসীদের ঋণ দিত এবং সর্বস্ব দিয়েও তারা এ ঋণ থেকে মুক্তি পেতনা। কিন্তু বাস্তবে এটি ফাঁকা অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এছাড়া মুসলমান বাঙালিরা ধর্মীয় নিষেধে সুদের কারবার থেকে বিরত ছিল। মোগল ও ব্রিটিশ আমলে ক্ষুদ্র সংখ্যক হিন্দু মহাজন সুদের ব্যবসা করত। হেডম্যান, চীফ বা সরকার তাদের প্রতিরোধ করেনি। এছাড়া গুটিকয়েক হিন্দু

[৩৮১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৮।

[৩৮২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯।

[৩৮৩] আতিকুর রহমান, *পর্বত প্রকাশ (অনুসন্ধান)*, পর্বত প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ২০১৩।

[৩৮৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮-১৯।

মহাজন পাহাড়ি সমাজপতি ও সরকারি প্রশাসনের তুলনায় অতি তুচ্ছ শক্তি। এই ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা কীভাবে শোষণ, নির্যাতন সম্ভব হয়েছিল। যদি হয়ে থাকে স্থানীয় প্রশাসন ও নেতৃবৃন্দের সহায়তায় হয়েছে। সুতরাং এর দায়ভার সাধারণ বাঙালিদের উপর বর্তায় না। [৩৮৫]

বহু তথ্য সন্নিবেশের মাধ্যমে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, চাকমারা এক সময় মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। লেখক বলেছেন, চাকমা ভাষাটি চট্টগ্রামী মুসলিম সামাজিক ভাষার যমজ। চাকমা ভাষায় বহু আরবী, ফার্সি ও ইসলামী পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। ভাষাটি পৌত্তলিকতা মুক্ত। তাদের অভিধানে ঈশ্বর শব্দ নেই। চট্টগ্রামের উত্তর রাঙ্গুনিয়ায় রাজানগর রাজবাড়ির পারিবারিক কবরস্থান ও মসজিদ রয়েছে। এই কবরস্থান ও মসজিদ তাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। একাধিক সূত্রের তথ্য মতে অতীতে চাকমা মহিলাদের কাফন পরিয়ে কবর দেওয়ার রীতি ছিল। এছাড়া তাদের বিবাহে মোহরানা ছিল। যা তাদের ভাষায় এখন দাবা নামে খ্যাত। মুসলিম মহিলাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত চাকমা মহিলারাও পর্দা প্রথা মেনে চলতেন। রাজা শের জব্বার খাঁর সীলমোহরে খোদাই করা ছিল 'আল্লাহু রাব্বি'। এতে নির্ণীত হয় তাদের পারিবারিক ধর্ম ছিল ইসলাম। [৩৮৬] খিসা জনগোষ্ঠী পূর্বে আসলে মুসলিম বাঙালি ছিলেন এবং পরে চাকমায় পরিণত হয়েছেন। তা না হলে দাড়ি রাখা ও খাৎনা করার মতো মুসলিম চরিত্র বা সর্দার পদবি তাদের সমাজে প্রচলিত হতোনা। [৩৮৭] এই অঞ্চলে আলিকদম, আলীর পাহাড় মুসলমান অবস্থানের কথা স্মরণ করায়।

লেখক তুলে ধরেছেন, ভৌগোলিকভাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম মূল পার্বত্য চট্টগ্রামের অংশ এবং জেলা ভাগ করার সুবাদে এখানকার স্থানীয় "উপজাতি"রা জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা চট্টগ্রামের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। অভিবাসনের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসী। মাত্র শত বছর পূর্বের পার্বত্য শাসন আইন ধারা নং ৫২ আইন বলে "উপজাতি"রা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় অধিবাসী। সুতরাং তাদের বিশেষাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি অযৌক্তিক এবং এই প্রশ্নে তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ অমার্জনীয়। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে ঠেকানোর জন্য এই অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার অর্থাৎ সেনাবাহিনী মোতায়েন ও বাঙালি বসতি স্থাপন করা হয়। তাই এই দুই বিষয়কে অবাঙালিদের বিদ্রোহের ফল বলা সঙ্গত। এতে কারো বিরোধিতা বা আপত্তি উত্থাপন যৌক্তিক বলা যাবেনা। [৩৮৮] বাংলাদেশের এক দশমাংশ অংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এখানকার বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বল্প জনসংখ্যা নিয়ে "উপজাতি"রা গর্ব করলেও এ অঞ্চল ও সম্পদ তাদের একার নয়। এগুলি জাতীয় সম্পদ। সংখ্যাগত দিক থেকে "উপজাতি"রা বাংলাদেশী জাতির এক ক্ষুদ্র অংশ। শতকরা একশত ভাগের এক ভাগের অর্ধেক অংশ। পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রামের আদি ভৌগোলিক এলাকা এবং চিরকাল বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়। এই অখণ্ডতার ভিত্তিতে পাহাড়ি, বাঙালি এক জাতি। [৩৮৯] গ্রন্থে লেখক জাতীয়তা ও জাতি একই অর্থে ব্যবহার

[৩৮৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৫-২৬।
[৩৮৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬-১৭।
[৩৮৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

করেছেন। কিন্তু শব্দ দুটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। বাঙালি, গারো, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জাতি। বাংলাদেশে অনেক জাতির লোক বাস করে কিন্তু সকলের জাতীয়তা এক; সকলেই বাংলাদেশী।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সুপ্রকাশ রায় ও জগদীশ চাকমার লেখা যথাক্রমে 'চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭)' ও 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' সন্নিবেশিত হয়েছে। এ দুটি লেখার মাধ্যমে পাহাড়িদের বাস্তব চিত্রের সামান্য অংশ প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থের এ দুটি অংশ ছাড়া পুরো গ্রন্থটিতে অসংখ্য অযৌক্তিক যুক্তি উপস্থাপন করে পাঠককে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বহু ভুল তথ্যের সন্নিবেশ করা হয়েছে। "উপজাতি"দের আত্মমর্যাদার লড়াইকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রশাসন ও বাঙালিদের দ্বারা সংঘঠিত অপরাধ কর্মের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান এবং পাহাড়িদের অপরাধকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থে বাঙালিদের মর্যাদাবান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের "উপজাতি"দের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি নিরপেক্ষতার দাবি রাখেনা। এছাড়া গ্রন্থটির নামকরণকে যথার্থ বলা যাবেনা কারণ সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এটি রচিত হয়নি।

হাবিবুর রহমান (২০০৪) *বিভ্রান্তির বেড়াজালে পার্বত্য জনপদ*[৩৯০] *গ্রন্থে* পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে ভৌগোলিক ইতিহাস, জনগোষ্ঠীর বিবরণ, অর্থনৈতিক বিষয়, বনজ সম্পদ, পানি বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদের বিবরণ তুলে ধরা হয়। লেখক সুলতানী আমল, মোঘল ও ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি তার মত ক'রে তুলে ধরেছেন। তিনি পার্বত্য জাতিসমূহের স্বাধিকারের আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংস রাজনৈতিক তৎপরতা' হিসেবে উল্লেখ করেন। গ্রন্থে বাঙালিদের এ অঞ্চলের "আদি বাসিন্দা" এবং চাকমা-সহ অন্যান্য পাহাড়ি জাতিসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'বহিরাগত' ও 'আশ্রিত' বলা হয়েছে। বাঙালি পুনর্বাসন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে বাংলাদেশে ধন-সম্পদের যেমন প্রাচুর্য ছিল, তেমনি জনসংখ্যাও ছিল অনেক কম। ফলে বাঙালিদের বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে এসে বসতি গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তীতে পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা সমতলে ভূমি অনুপাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় সরকারি পদক্ষেপে এই অঞ্চলে বাঙালি পুনর্বাসন করা হয়। এছাড়াও কর্নফুলী কাগজ কল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলসহ বিভিন্ন কলকারখানা এবং সরকারি কার্যোপলক্ষ্যে ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি সেখানে জায়গা জমি কিনে বসতি স্থাপন করে। এছাড়া তিনি শান্তিবাহিনীর "বিচ্ছিন্নতাবাদী অসহনীয় কার্যক্রম দমনের অন্যতম উপায়" হিসেবেও বাঙালি পুনর্বাসনের যৌক্তিকতাকে দাঁড় করিয়েছেন।

হাবিবুর রহমান আরও লিখেছেন যে, ব্রিটিশ শাসকবর্গ কর্তৃক প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এর মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদের দমন ও বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। অদ্যাবধি কার্যকর এ রেগুলেশন অনুযায়ী দেশের সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্ব আইনানুগ। কিন্তু এই পার্বত্য চট্টগ্রামের "উপজাতি"রা সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে

[৩৮৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮-১৩৯।

[৩৮৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯।

[৩৯০] হাবিবুর রহমান, *বিভ্রান্তির বেড়াজালে পার্বত্য চট্টগ্রাম*, টর্চ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৪।

যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায় তাতে জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্ব ও ১৯০০ সালের রেগুলেশন একই সাথে খর্ব হয়। এই রেগুলেশন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে এক্সক্লুসিভ এরিয়া ঘোষণা করে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে দেশের সমতল ভূমির জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল মূলত ঃ তাদেরকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে রাখা। লেখক বলছেন যে "উপজাতি"রা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেনি। তাই দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিনের মধ্যেই তথাকথিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের 'অবাস্তব' দাবি তুলে তারা এদেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তাদের তৈরি শান্তিবাহিনী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। তারা সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার ইত্যাদির অবস্থান বা ভ্রাম্যমান দলের ওপর হামলা চালিয়েছে। শান্তিবাহিনী অতর্কিতে বাঙালিদের গ্রামে হামলা করে ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং অগ্নিদগ্ধ করে বা গুলিবিদ্ধ করে শত শত বাঙালিকে হতাহত করে। ধারণা করা হয় ৩০ বছরে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের হাতে ২৫ হাজার বাঙালি নিহত হয়েছে। বাঙালি ছাড়াও তারা অনেক "উপজাতি"কে হত্যা করে।

বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট ক্ষোভ একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের বিদ্রোহী করে তোলে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য নেতাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ অঞ্চলকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এই ইচ্ছার কারণে পাকিস্তান শাসকগণ এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখত। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলের জাতিসমূহকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রঘোনা বেসরকারি কাগজকলে শ্রমিক কর্মচারি নিয়োগে সমতলের অভিজ্ঞ বাঙালির অগ্রাধিকার এ জাতিসমূহকে বিক্ষুব্ধ করে। এছাড়া ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ১ লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসিত করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত ছিলনা বিধায় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হয়নি। পার্বত্য জনগণের বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি অনুপ্রবেশ। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে এবং ১৯৬৬ সালে দুদফায় পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে। এতে ক্রমবর্ধিষ্ণু বাঙালি জনগণ একদিকে এ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও জীবন ধারায় যেমন প্রভাব ফেলতে থাকে তেমনি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালিরা সরকারি বরাদ্দের চেয়ে অধিক জমি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি খাস জমি দখল করে নেয় এবং নামমাত্র মূল্যে পাহাড়িদের জমি-জমা কিনে নেয়। এ বিষয়গুলো পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে শত্রুতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে থাকে। এমন বিবিধ কারণে সৃষ্ট ক্ষোভের এক পর্যায়ে পাহাড়িরা এক সময় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতন হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে স্বায়ত্তশাসন ও পৃথক আইন পরিষদের দাবি তোলেন। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চাকমা জাতির ত্রিদিব রায়সহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ পাকিস্তানিদের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কিছু উগ্রপন্থী সদস্য স্বাধীনতার বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর দুঃখজনকভাবে অত্যাচার করে যাতে তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আরও ঘনিভূত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে লেখক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে 'বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া চক্রান্ত' বলে উল্লেখ করেন। এই জাতিগোষ্ঠী কখনো বিদেশী শাসন তথা ব্রিটিশ বা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে সামান্যতম ভূমিকা রাখেনি। এর মূল কারণ হলো মনস্তাত্ত্বিক, তারা এ দেশে আশ্রিত/বহিরাগত এবং সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে আপামর মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো আন্দোলনে ভূমিকা রাখার আত্মিক অনুপ্রেরণা ও তাড়না অনুভব করেনি। অথচ বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক বাঙালিদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের উচ্ছেদের মাধ্যমে জুম্মল্যান্ড নামক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭২ সালে, যখন কতিপয় চাকমা নেতাসহ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অত্যন্ত গোপনে প্রথম পর্যায়ে রাঙ্গামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং পরবর্তীতে তারই প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে জনসংহতি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি গঠনের আট মাসের মধ্যে সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' গঠিত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের কার্যক্রমকে আদর্শের লড়াই বলে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠনকে সমাজতন্ত্রের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট থাকে। যদিও বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার এমনকি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলো রাঙ্গামাটি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে স্বীকৃতি দেয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র চৌত্রিশ দিনের মাথায় ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে এবং তার সতেরো দিন পরে ১৫ ফেব্রুয়ারি মংপ্রু সাইনের নেতৃত্বে দু'টি প্রতিনিধি দল প্রথমবার শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিতীয় সাক্ষাতে চার দফা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি অর্পণ করেন, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র এলাকা ঘোষণা করে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়। প্রথম সাক্ষাৎকারের পর শেখ মুজিব পাহাড়িদের স্বার্থ, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরি সংরক্ষণ করার আশ্বাস দিলেও দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের স্মারকলিপিতে উল্লিখিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি শেখ মুজিব উপেক্ষা করেন। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, শেখ মুজিব কর্তৃক বাঙালি হবার উপদেশসহ তার অনেক বক্তব্য ও আচরণকে জনসংহতি সমিতি নিছক অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিগত দিনগুলোতে অনেক নমনীয় পদক্ষেপ নিয়েও "সন্ত্রাসীদের" মন জয় করা যায়নি। উপরন্ত পরবর্তীতে শেখ মুজিবের সাথে মানবেন্দ্র লারমার সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তার অনুসারীসহ বাকশালে যোগদান করলেও তারা চক্রান্তের পথ থেকে সরে আসেনি।

গ্রন্থে লেখক অস্ত্রবিরতি, শান্তির সংলাপ ও চুক্তিকে সন্ত্রাসী তথা আন্দোলনকারীদের অপকৌশল বলে আখ্যায়িত করেছেন। লেখকের মতে শক্তিশালী অবস্থানে থাকলে সন্ত্রাসীরা কখনই শান্তির পথে আসতনা। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রক্রিয়া চালু করার উদ্দেশ্যে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় ৩০ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের ২০ সদস্য পাহাড়ি জাতিভুক্ত এবং পরিষদের চেয়ারম্যানের পদটি স্থায়ীভাবে পাহাড়ি জাতির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকার মর্যাদা দানের দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও এ পরিষদের হাতে ২২টি বিশেষ বিষয়ের ক্ষমতা ন্যস্ত করায় প্রকৃত অর্থে পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা স্বশাসনের অধিকার লাভ করে। এ অবস্থায় জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা আর থাকেনা। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী স্থানীয় সরকার পরিষদ অর্থাৎ পার্বত্য জেলা পরিষদকে তাদের আশা-আকাংখা পূরণের প্রতীক বলে মনে করে। ফলে এই জনগোষ্ঠীর কাছে জনসংহতি সমিতির প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যপকভাবে হ্রাস পায়। এছাড়াও চাকমা ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহের কাছে চাকমা প্রভাবিত

জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ক্রমেই প্রকাশ হতে থাকে। অন্যান্য জাতির সাথে চাকমারা ঐতিহাসিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন নয়। তাদের নেতৃবৃন্দের বিলাশবহুল ও নিরুদ্বেগ জীবনযাপন অথচ সাধারণ কর্মীদের দুর্ভোগ অন্যদের মধ্যে হতাশার জন্ম দেয়। বিভিন্ন কারণে বিশেষত কর্মী স্বল্পতার কারণে দলীয় কার্যক্রম গ্রহণের অক্ষমতা, কাঠ ও বাঁশ কাটাসহ নেতাকর্মীদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে চাঁদা আদায় বন্ধ এবং স্থানীয় জনগণের সমর্থনহীনতার দরুণ খাদ্য ও আর্থিক সংকটে কর্মীরা প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে সন্ত্রাসীদের মধ্যে দল ত্যাগের প্রবণতা বেড়ে যায়। আশির দশকের শেষভাগে এবং নব্বইয়ের প্রথম ভাগে শান্তিবাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় 'র' এর পরামর্শে জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতি ও চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি হয়।

লেখক মনে করেন, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা পর্যায়ে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উন্নয়ন বরাদ্দ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বে সম্ভবত বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে "উপজাতি" জনগোষ্ঠী দেশের মূল অধিবাসীদের অনেকখানি পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পার্বত্য "উপজাতি"রা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় যা পার্বত্য বাঙালিরা পায়না। এতদ সত্ত্বেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও রাজনৈতিক মুক্তির দাবিতে তারা জনগণের চিন্তা-চেতনাকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। লেখক মনে করেন যে সন্ত্রাসী তৎপরতার উদ্ভব, বিস্তার এবং এর গতিধারা নিয়ন্ত্রণে ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রধান পৃষ্টপোষক হিসেবে কাজ করে আসছে। তিনি এক্ষেত্রে মনে করেন যে, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ বাংলাদেশের উচিত ভারতের সাথে উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক বৈঠকের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে একটি অন্যতম "জাতীয় সমস্যা" হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর সমাধানের জন্য দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে সংশ্লিষ্ট করার সুপারিশ করেন। তিনি মনে করেন দলমত নির্বিশেষে সকলের সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এ অঞ্চলকে দেশ ও জাতির জন্য একটি সম্ভাবনাময় স্থানে পরিণত করা যায়।

গ্রন্থের অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যের বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ বলে প্রতীয়মান হয়না। এতে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠির প্রতি বিভিন্ন সময়ের শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করা হলেও শান্তিবাহিনী সৃষ্টির কারণের সাথে এই বৈষম্যের সম্পর্ক দেখাতে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন। একদিকে পাহাড়ি জাতিসমূহর প্রতি বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের কথা তিনি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে এই জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে ঢালাওভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। নিপীড়নের প্রতিবাদের আন্দোলনই যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এই বাস্তবতাকে তিনি গ্রন্থে প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন।

গ্রন্থটিতে জনসংহতি সমিতির দাবিকে অযৌক্তিক উল্লেখ করে শুধু শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডকে অপকর্ম হিসেবে উল্লেখ করে তিনি পক্ষপাতিত্বের দায় নিয়েছেন। গ্রন্থকার কৌশলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে "উপজাতি" হিতকর কর্মকাণ্ড, উদার দেশপ্রেম হিসেবে বর্ণনা করেন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। একই সাথে গোপন করেন বাঙালি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক "উপজাতি"দের উপর দমন,

নির্যাতনের চিত্র। গ্রন্থটিতে উল্লিখিত কিছু তথ্য-উপাত্ত অন্য গ্রন্থের তথ্য উপাত্তের সাথে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া গেলেও অধিকাংশ তথ্য উপাত্ত নিরপেক্ষতার দাবি রাখেনা। বাংলাদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবীসহ একটি শ্রেণি চিন্তা চেতনায় ধারণ করেন যে, ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করছে যার মূল উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করা। এই গ্রন্থের লেখক একই রকম মানসিকতার ধারক, যিনি অযৌক্তিক ও সমর্থনযোগ্য নয় এমন বিশ্লেষণ করে এরূপ ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং পাহাড়ি জাতিসমূহর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামী ভূমিকার সঠিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি পাঠকদের বিভ্রান্ত করবে।

ঘ) ৪র্থ ধারার গ্রন্থাবলী

৪র্থ ধারার গ্রন্থাবলী অর্থাৎ যেসব গ্রন্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে ঘিরে প্রণিত হয়েছে – কেউ শান্তিচুক্তিকে পাহাড়ি জাতিসমূহের অধিকার আদায় ও ঐ এলাকায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন অথবা এর সমালোচনা করে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ভিন্নমত জ্ঞাপন করেছেন – সেগুলি প্রধানত নিম্নরূপঃ

মাহফুজ পারভেজ (১৯৯৯) তাঁর *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি* [৩৯১] গ্রন্থে পাহাড়িদের বিদ্রোহী হওয়ার কারণ, শান্তিচুক্তির যৌক্তিকতা এবং শান্তি স্থাপনে বিকল্প প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। পার্বত্য বিদ্রোহ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। পাহাড়িদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী যে বঞ্চনা, শোষণ ও নিপীড়ন করা হয়েছে; তার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশই হলো এই অঞ্চলের বিদ্রোহ। বাঙালি-পাহাড়ির জনগণের দীর্ঘ কালের পাশাপাশি অবস্থান পাহাড়ির মনে বাঙালি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের শাসন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার উদ্দেশ্যে ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ নীতির মাধ্যমে এই উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে সামাজিক-রাজনৈতিক-ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত করে। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানিরাও তেমনি পাহাড়িদের ভারতপন্থীহিসেবে আখ্যায়িত করে এবং কর্নফুলী নদীতে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে পাকিস্তানকে আলোকিত করার সাথে সাথে পাহাড়ে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের সহযোগিতা করায় পাহাড়িরা মুক্তিবাহিনীর রোষানলে পড়ে। তারা পাহাড়িদের হতাহত করে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। এতে পাহাড়ি নেতারা শেখ মুজিবুর রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন কিন্তু তিনি তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেননি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সংবিধানে কোনো বিধান এবং বাজেটে কোনোরূপ বরাদ্দ রাখা হয়নি। এ ছাড়াও স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের কোনো দাবি না মেনে পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার

[৩৯১] মাহফুজ পারভেজ, *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

আহ্বান জানিয়েছিলেন। এতে এ অঞ্চলের “উপজাতি”দের বাঙালি বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। এম এন লারমাসহ পাহাড়ি নেতারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় আইনগত পদ্ধতিতে তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। এম এন লারমা ১৯৭৪ সালে গঠিত দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)-এ যোগদান করেছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ক্ষমতার সাথে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। বস্তুতপক্ষে, শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের চার দফা দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের ‘এক সংস্কৃতি’ ও ‘এক ভাষা’ নীতি গ্রহণের ফলে ‘উপজাতি’রা বিদ্রোহী হয়ে উঠে, যার ফলে জন্ম নেয় জুম্ম জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। পাহাড়িদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে লারমা ১৯৭২ সালের ১৬ মে গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। এই সংগঠনকে বলা হয় মাওবাদী রাজনৈতিক দল ‘রাঙ্গামাটি কম্যুনিস্ট পার্টি’র বাহ্যিক রূপ। ১৯৭২ সালেই দেখা দেয় আরেক তরুণ জাতীয়তাবাদী নেতা প্রীতিকুমার চাকমা যিনি সক্রিয় করে তোলেন পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক থাকায় শান্তিবাহিনীকে ভারত সরকার কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করেনি। ফলে শান্তিবাহিনী সে সময় প্রকাশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের পর শান্তিবাহিনী পাহাড়ি অঞ্চলের বাঙালি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। বিভিন্ন সরকার এ অসন্তোষের শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সরকারই সফল হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে পার্বত্য চট্টগ্রামের কালপঞ্জির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে ১৪১৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। এতে শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ব্যাপক কর্মসূচি অর্থাৎ উত্তপ্ত রাজনৈতিক আলোচনাসহ শান্তিচুক্তির এক বছর পূর্তির প্রাক্কালে এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। লেখক উল্লেখ করেছেন যে শান্তিচুক্তি স্থাপনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সন্তু লারমা তার সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, ‘সরকারের একটি বিশেষ মহল শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়ায় বাঁধার সৃষ্টি করছে’। গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির দেওয়া বিকল্প শান্তির প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষক ও গবেষক আমেনা মহসিন বলেছেন ‘জাতি’ এবং ‘রাষ্ট্র’কে এক করা ঠিক হয়নি। এটা পৃথক থাকা উচিৎ। আঞ্চলিক ও কেন্দ্রিয় পর্যায়ে কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং যা সম্ভব কেবলমাত্র অ-উপনিবেশিক মানসিকতা জাগ্রত করার মাধ্যমে। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়নের তাগিদ জানিয়েছেন, যার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতেও সকলের অধিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। লেখক ও শিক্ষক হুমায়ুন আজাদের মতে, চুক্তি করে নয়, পাহাড়িদের অবস্থার উন্নতি করেই শুধু সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। গবেষক ও লেখক আহমদ ছফার মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেই অর্থ মূলধন হিসেবে সেখানকার জনগনকে প্রদান করা হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি প্রসারিত হবে। গ্রন্থটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের

সংগ্রামের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানকার জনগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ও উপাত্তের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া শান্তি স্থাপনে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের উপর কোনো গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।

মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা সম্পাদিত (২০০১) *পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ও সম্ভাবনা* [৩৯২] গ্রন্থটি দু'দিনব্যাপী এক জাতীয় সেমিনারের ভিত্তিতে সংকলিত। গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃতি, সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে এবং কীভাবে এই সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে, এর সমাধানের জন্য পরস্পর পক্ষগুলো কীভাবে এ্যাক্ট ও রিএ্যাক্ট করেছেন, কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ইত্যাদি বিষয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাস্তবায়ন নিয়ে শুরু হয় নানা সমস্যা। জনসংহতি সমিতির দেওয়া তালিকা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন না করে আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের পছন্দের কয়েকজন ব্যক্তিকে আঞ্চলিক পরিষদের বাঙালি-সদস্য নির্ধারণ করে। এতে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হন এবং তারা আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে ১৪ মাস বিরত থাকেন। এমন অচলবস্থায় ১৯৯৯ সালের ২২-২৩ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ও সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে সিরডাপ মিলনায়তনে একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)। এই সেমিনারের আলোচনার ভিত্তিতে পুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থের শেষভাগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিবেদন সংযুক্ত হয়েছে। এতে দেখা যায় চুক্তির অনেক বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আইনে অর্ন্তভুক্ত এ বিষয়গুলোর অধিকাংশ এখনো কার্যকর হয়নি, কিছু বিষয় আছে আইনে অর্ন্তভুক্ত হলেও সরকার সে আইন কার্যকরীকরণের প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করেনি। আবার চুক্তিভুক্ত কিছু বিষয় বাস্তবায়নে সরকার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, পাহাড়িদের অত্যাচার-বঞ্চনার ইতিহাস বহু পুরনো। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মোগল ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংগে লড়াই করেছে। ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করে। তথাপিও ব্রিটিশ সরকার হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন ১৯০০-এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে তাদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন করে পার্বত্য জেলার বিশেষ অধিকারের মর্যাদা খর্ব করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগুলোর অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলের অধিকাংশ জাতিসমূহ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রণয়নকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংবিধান প্রণয়ন

[৩৯২] মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা সম্পাদিত, *পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ও সম্ভাবনা*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা, ২০০১।

কমিটির নিকট নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি জাতীয় সংসদে জুম্ম জাতি এবং সকল নিগৃহীত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি তুলেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে পাহাড়িদের জাতিগত অধিকার সংরক্ষিত হলে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজন হতোনা। পাহাড়িরা এদেশেরই মানুষ, এদেশের স্বার্থ তাদের স্বার্থ। তারা এদেশের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চায়। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর বাস্তবায়ন কাঙ্খিত গতি লাভ না করায় চুক্তি-সাক্ষরকারী পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের মনে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছার ব্যাপারে সন্দেহ জাগে। সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ১৩৩৯টি প্রত্যাগত শরনার্থী পরিবার বাস্তুভিটা ফেরত পায়নি, ৭৭৪টি পরিবার তাদের পাহাড় বা বাগান ফেরত পায়নি। সব বন্দীরা এখনো মুক্তি পায়নি। গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের পাশাপাশি বাঙালিদের করুন অবস্থার চিত্রও ফুটে উঠেছে। গুচ্ছ-গ্রামে বাঙালিরা বন্দি জীবন যাপন করছেন। তারা চিকিৎসা এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এছাড়া সরকার তাদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

গ্রন্থটির সারাংশতে কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক-দশমাংশ বলে সেখানে জমির পরিমাণ যতটা বলে প্রচার করা হয় আসলে ততোটা না। সেখানে বরং আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিশাল বিশাল এলাকা লিজ দেয়া অনুচিত। বনায়নের জন্য নতুন নতুন এলাকায় এলাকাবাসীর ঘরবাড়ি, জায়গা জমির উপর হস্তক্ষেপ না করে যে সব এলাকায় আগে বন ছিল এখন নেই, সেসব জায়গায় পুনঃবনায়ন করা উচিত। যে সমস্ত বাঙালির জমি আছে তারা থাকতে পারে, কিন্তু ভূমিহীনদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভূমি কমিশনকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো উচিত। শুধুমাত্র বাঙালি সেটেলারদের দেয়া রেশন ব্যবস্থা বন্ধ করা প্রয়োজন। চুক্তির কিছু ভুল ভ্রান্তির কথা কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে। তবে অবস্থাগত ও পদ্ধতিগত কারণে যেহেতু উভয় পক্ষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সেহেতু চুক্তি বাস্তবায়নে উভয় পক্ষেরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। গ্রন্থের অধিকাংশ আলোচনা যদিও আদিবাসীদের পক্ষে তবে স্বল্প পরিসরে হলেও বাঙালিদের করুন চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অবস্থা এবং শান্তি চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আলীমুজ্জামান হারুন (১৯৯২) তার *সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী*[৩৯৩] গ্রন্থে শান্তিবাহিনী সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা সহ শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা নতুন কোনো ইতিহাস নয়। উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্ব থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে চলে আসছে নানা ষড়যন্ত্র। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারতের এক শ্রেণির নেতার প্ররোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে প্রায় ৪৫ হাজার একর উর্বর জমি জলমগ্ন হয় এবং ১ লক্ষ "উপজাতি" ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালিন পাকিস্তান সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনসহ ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করলেও খুব কম সাহায্য ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে পৌঁছে।

[৩৯৩] আলীমুজ্জামান হারুন,*সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী*, প্রকাশক জাকিয়া জামান, ঢাকা, ১৯৯২।

এতে উপজাতীয় নেতারা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং "উপজাতি" অধিবাসিদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে সরকার তাদের ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কিছু "উপজাতি" পাহাড়ি বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, আর কিছু ভারতে আশ্রয় নেয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সাধারণ "উপজাতি"রা নিরপেক্ষ থাকলেও রাজা ত্রিদিব রায়সহ অনেকে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে স্বাধীনতার পর অনেকে বাংলাদেশ সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং "উপজাতি"দের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, যে কমিটিতে "উপজাতি"দের প্রতিনিধি রাখা হয়।

১৯৭৩ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এম এন লারমা। স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিবাহিনী নামে সশস্ত্র আর্মড ক্যাডার সৃষ্টি করেন। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং এ অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে। সমতল এলাকার তুলনায় এ তিনটি জেলায় জনবসতি অনেক কম। লেখকের মতে, দেশের মূল ভূখণ্ডের ১০ ভাগ ভূমি পার্বত্য অঞ্চলে অব্যবহৃত থাকায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভাসমান বাঙালিদের এই অঞ্চলে পুনর্বাসন করেন। পুনর্বাসনের পর থেকেই শান্তিবাহিনী একের পর এক হামলা চালিয়ে বাঙালিদের হত্যা ও তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে নারী-পুরুষসহ দেড় হাজার বাঙালি নিহত এবং আহত হয় প্রায় এক হাজার লোক। শান্তিবাহিনীর অব্যাহত হামলার কারণে বাঙালিদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাদের আবাসস্থল থেকে সরিয়ে এনে গুচ্ছগ্রামে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতর আশ্রয় দেয়। গুচ্ছগ্রামে আসার পর থেকে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। সপ্তাহে ২১ কেজি চালের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে কঙ্কালসার হয়ে "অ-উপজাতি" পরিবারগুলো বেঁচে রয়েছে। শান্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য হলো বাঙালি নিধন। তাদের অভিসন্ধি বাঙালিরা স্বজন হারানোর শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে "উপজাতি"দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন "উপজাতি"রা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেবে এবং তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা শান্তিবাহিনীর জন্য সহজ হবে। ভারত সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের সহায়তা করছে। সন্ত্রাসীদের চূড়ান্ত বিজয় নয়, শুধুমাত্র সমস্যাটিকে অমীমাংসিত রেখে বাংলাদেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করাই হচ্ছে ভারতের উদ্দেশ্য। বলা হয়, শান্তিবাহিনীর হাত থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা ও সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে শান্তিবাহিনী ধীরে ধীরে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শান্তিবাহিনীর

প্রীতি গ্রুপ ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এম এন লারমাকে হত্যা করে এবং গ্রুপের একটা বিরাট অংশ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এতে শান্তিবাহিনীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায় কিন্তু সন্ত্রাসী কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থটিতে শান্তিবাহিনীকে একটি রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে উল্লেখ না করে শুধুমাত্র একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে উল্লেখ করে সংগঠনটির কর্মকাণ্ডকে অপকর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাহাড়িদের শোষণ, বঞ্চনার যে ইতিহাস তা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে কতকগুলো ছবির মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর নৃশংসতার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সরকারি বাহিনীর ছত্রছায়ায় বাঙালিদের নৃশংস ঘটনার কোনো উল্লেখ গ্রন্থটিতে নেই। এছাড়াও এম এন লারমাসহ অন্যান্য আদিবাসী নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ সম্পর্কিত কোনো তথ্য এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়নি। সুতরাং সহজেই অনুমেয়, গ্রন্থটি নিরপেক্ষভাবে রচিত হয়নি এবং এখানে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে একপাক্ষিক বিবরণী হলেও জাতিগত সমস্যা রাজনৈতিকভাবে নিস্পত্তি না করলে তা যে কি ভয়ংকর ফলাফল তৈরি করতে পারে তা বোঝার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আহমদ ছফা (১৯৯৮), *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*[৩৯৪] গ্রন্থের লেখক তার স্কুল জীবন সমাপ্তির পর পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এক বছর তিন মাস অবস্থান করেন। সেই সময় তার দৃষ্টিতে আবদ্ধ পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং বাঙালিদের সাথে পাহাড়িদের সম্পর্কের বিষয়টি যেভাবে ধরা পড়েছিল তার সাথে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির সমন্বয় করার চেষ্টা তিনি এই গ্রন্থে করেছেন। গ্রন্থকার পার্বত্য সমস্যাটিকে মানবিক মূল্যবোধের মানদন্ডে দেখেছেন। গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। ছাড়াও ভারতের রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি, আমলাদের ক্ষমতা, উত্তরবঙ্গের চোরাচালান ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত তিনটি অধ্যায়ে পাহাড়িদের বঞ্চনা, জীবন সংগ্রাম এবং বাঙালিদের প্রতি তাদের মনোভাবের একটি প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। পাহাড়িদের ধারণা বাঙালিরা প্রতারক। কারণ তাদের মেয়েরা বাঙালিদের নিকট নিরাপদ নয়। বাঙালিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে পাহাড়িদের ঠকায় এবং বিভিন্ন কৌশলে তাদের জমি আত্মসাৎ করে নেয়। যুগ যুগ ধরে বাঙালিরা শোষণ ও প্রতারণা করে আসছে পাহাড়িদের সাথে।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকারের প্রসন্ন মনোভাব ছিলনা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি। সরকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বৈরী শক্তি হিসেবে জ্ঞান করতো। হয়ত এ কারণে শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে এ থেকেই পার্বত্য অঞ্চলে নতুন রাজনৈতিক সংকটের সুত্রপাত ঘটে। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়। এ অঞ্চলের অন্যতম নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করাকে মেনে নিতে পারেননি। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আলাদা একটা নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহ্যগত পরিচয় রয়েছে, সেটার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলে পাহাড়িদের প্রতি সুবিচার করা হত। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা,

[৩৯৪] আহমদ ছফা, *শান্তিচুক্তি ও নির্বচিত নিবন্ধ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চার দফা দাবি প্রত্যাখ্যান পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে। শেষ পর্যন্ত তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের বিষয়ে মনোযোগী হয়। তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি ভারতপন্থী ও চীনপন্থী এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। এতে প্রতিপক্ষ ভারতপন্থী গ্রুপের হাতে এম এন লারমার প্রাণ দিতে হয়।

আহমেদ ছফা মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সকল দাবি মেটানো হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবেনা। দারিদ্র তাদেরকে বিচ্ছিন্নতার পথে নিয়ে যাবে। প্রচলিত যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, সেগুলো পার্বত্য এলাকার শান্তি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবেনা। তাদের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাদের উপর শোষণ, কাপ্তাই বাঁধের ফলে তাদের বাস্তুচ্যুতি, সেনাবাহিনীর দমন-পীড়ন, লোগাংসহ অন্যান্য হত্যাকাণ্ড, পার্বত্য এলাকায় বাঙালি পুনর্বাসন ইত্যাদি। উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্বত্য সংকট সৃষ্টিতে ভারতের ভূমিকা রয়েছে। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায়, পার্বত্য সংকট ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ যেমন- ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বিরাজমান সংকটের একটি সম্প্রসারিত রূপ। শান্তিচুক্তিতে আলোচিত না হলেও ভারত এ চুক্তির একটি শক্তিশালী পক্ষ। ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ পেয়ে এই অঞ্চলের বিদ্রোহী অংশ শর্ত আরোপের মাধ্যমে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারকে আলোচনায় আনতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রন্থে শান্তিচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অত্যাবশ্যক দুটি দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকের মতে প্রথমত ঃ চুক্তিতে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। তারা যেন তাদের জমির অধিকার ফিরে পায়, ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ পায়; মানবিক, নাগরিক এবং জাতিগত অধিকার যেন তারা ভোগ করতে পারে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেন নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, বাংলাদেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি যেন সুনিশ্চিত হয়। এ চুক্তিতে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে ভারত পূর্ব ভারতীয় রাজ্যসমূহের সংকটের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য গোষ্ঠীকে জড়িত করে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার ভেতরের সংকট বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দেবার সুযোগ না পায়। লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের উপর জোর না দিয়ে পাহাড়িদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেন। গ্রন্থটিতে পাহাড়িদের শোষণ, বঞ্চনার ইতিহাস উল্লেখ করলেও তিনি পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসমূহের অধিকার রক্ষা বিদ্রোহকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বিছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রতি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আন্দোলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে বৈদেশিক শক্তির উস্কানি এবং গোপন সহায়তাকে দায়ী করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহকে ঘিরে বৈদেশিক তথা ভারতের হস্তক্ষেপের ব্যপারে সরকারকে সাবধানতা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্যে কিছু সত্যতা থাকলেও অতিরিক্ত ভারত বিদ্বেষী মনোভাব গ্রন্থটিকে সীমাবদ্ধ করেছে।

হুমায়ুন আজাদ (২০১০), *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা*[৩৯৫] গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিদ্রোহের পটভূমি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থকার পাহাড়ে শান্তি স্থাপনের জন্য তার নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। আদিবাসীদের তিনি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, একটি অভিজাত শ্রেণি আর একটি সাধারণ শ্রেণি। আদিবাসীদের শোষণের ইতিহাস একদিনের নয়। ব্রিটিশ শাসনামলেও আদিবাসীরা ভালো ছিল না। তবে ভালো ছিল অভিজাতমন্ডলি যারা রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, দেওয়ান, চেয়ারম্যান, সাংসদ, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ। ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল' নামে এক বিধিমালা প্রণয়ন করে। এ বিধিটি যদিও অন্তঃসারশূন্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে তেমন মূল্যবান কিছুই নেই। বরং এর অনেকটাই সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। তথাপি পাহাড়ি মানুষদের নিকট এটি অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এতে পার্বত্য জনগণের ঐতিহ্যগত অধিকার, সংস্কৃতি, আচার, রীতি-নীতি, সংস্কার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এতে তাদের আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার সাথে সম্পর্কিত কোনো অধিকার প্রদত্ত হয়নি। তারা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক সীমার মধ্যে তাদের আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। তাদের এই আদিম রীতিনীতির ওপর হাত না দিয়ে ব্রিটিশরা পাহাড়িদের খুশি করতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তানের শুরুর সময় র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে পাহাড়িদের আহত করে। কারণ পাহাড়িরা কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল, পাকিস্তানের নয়। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে প্রায় ১,০০,০০০ আদিবাসীকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে। তাদের এই বৃহৎ ক্ষতি পুষিয়ে দিতেও পাকিস্তান সরকার ব্যর্থ হয়েছিল। ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার একটি বড় অংশ রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে থেকে যায়।

স্বাধীনতার পর পাহাড়িরা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। হুমায়ন আজাদ মনে করেন, তাদের কাছে এই স্বায়ত্তশাসন স্বাভাবিক মনে হলেও বাংলাদেশের অন্যান্য অধিবাসীদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হয়। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণেতাদের নিকট মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক উত্থাপিত দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলনা। কারণ দাবিগুলো মানলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে জুম্মল্যান্ড যা বাঙালির জন্য হবে নিষিদ্ধ দেশ; বাংলাদেশের ভিতরে থেকেও বিদেশ। কোনো বাঙালি হয়তো এ দাবি মানতে রাজি হবেনা। '

১৯৭৪ সালে লারমা যোগ দেন বাকশালে, হয়তো তিনি ভেবেছিলেন "ক্ষমতার সাথে থেকে অবস্থার বদল ঘটানো সম্ভব হবে।" শেখ মুজিবুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে লারমার এ আশা নিরাশায় পরিণত হয়। সাংবিধানিক বা উন্মুক্ত রাজনীতির মাধ্যমে দাবি আদায় সম্ভব না হলে এম এন লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা হিসেবে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদ অশান্ত হয়ে ওঠে। ১৯৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক লক্ষ বাঙালির অনুপ্রবেশ ঘটান। বাঙালিদের অনুপ্রবেশ করানো ছিল জিয়াউর রহমানের একটি কৌশল। তিনি ভেবেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন পাহাড়িদের সংখ্যা কমিয়ে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানো। তার স্বপ্ন

[৩৯৫] হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত।

ছিল অনুপ্রবেশকারী বাঙালিরা এ অঞ্চলে টিকে থাকতে পারলে ২০৩০ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মুসলমান হবে প্রধান জনগোষ্ঠী। বাঙালি মুসলমানের এমন অনুপ্রবেশের কারণে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা বেড়েছে বহুগুণ।

লেখক মনে করেন যেহেতু বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমানের প্রাধান্য, তাই সংখ্যালঘুরা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত, এমন কি তারা পরিকল্পিত বৈষম্যেরও শিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য যা করা দরকার, তা স্বায়ত্তশাসন বা উপজাতীয় সংশয় বা জুম্মল্যান্ড নয়, রাজা রাখা নয়, এ অঞ্চলকে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত করা নয়; বরং দরকার সেখানকার সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি। তিনি মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা; তাই রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান প্রয়োজন। গ্রন্থটিতে আদিবাসীদের শোষণ, বঞ্চনার উল্লেখের পাশাপাশি তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অযৌক্তিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে তিনি ‘চুক্তি কথাটির মধ্যেই রয়েছে চুক্তি ভঙ্গের বীজ’ উক্তিটির মাধ্যমে তিনি শান্তিচুক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। গ্রন্থটিতে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি, বাঙালি উভয়ের স্বার্থ রক্ষায় শান্তিচুক্তির বিকল্প হিসেবে শান্তি স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে।

গোলাম মোর্তোজা (২০০০), *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন* [৩৯৬] গ্রন্থে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত গেরিলাদের জীবন-সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্য এবং সশস্ত্র সংগ্রামের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদের অধিবেশন হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়ে। গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের ত্রয়োদশ বৈঠক থেকেই বাঙালি-বাংলাদেশি বিতর্কের সূচনা। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে এই বিতর্কের কারণে। সংসদে বাংলাদেশের নাগরিককে বাঙালি বলে চিহ্নিত করা হলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এর বিরোধিতা করে ব্যর্থ হন। পাহাড়িরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান বাংলাদেশ সরকারের নিকট; এতেও তারা ব্যর্থ হন। ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। ১৯৭৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আজ থেকে আমরা সবাই বাঙালি। এখানে কোন আদিবাসী নেই।’ পাহাড়িরা ভাবতে থাকে অধিকার এমনিতে পাওয়া যাবেনা, আদায় করে নিতে হবে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাই সন্তু লারমা শান্তিবাহিনীর প্রধান হন। নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতই কঠোর নিয়ম মেনে চলে শান্তিবাহিনী। সেনাবাহিনীর মতই সৈনিক নেওয়া হয়। শান্তিবাহিনীর প্রধানকে বলা হয় ফিল্ড কমান্ডার। পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে ঘেরা বিশাল পাহাড়ে শান্তিবাহিনীর গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিদ্রোহী জীবনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সন্তু লারমা দুই ভাই মিলিতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য তারা ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকা অবস্থায় তারা ভারতের সহযোগিতা পাননি। এমনকি ভারত সরকার উল্টো তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকারকে। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর ভারত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। শুরু হয় তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম।

[৩৯৬] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।

শান্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সময় ছিল ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে বাংলাদেশ সরকার হাজার হাজার সেনাবাহিনী ও বিডিআর মোতায়েন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। প্রতিদিন সরকারের প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হতে থাকে। চলতে থাকে শান্তিবাহিনীর গেরিলা হামলা এবং সেনাবাহিনীর অমানুষিক নির্যাতন। হাজার হাজার পাহাড়ি শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয় এবং তাদের ঘর-বাড়ি ও জমি বাঙালিরা দখল করে নেয়। জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪ লক্ষ বাঙালিকে পুনর্বাসন করে।

১৯৮২ সালে নেতৃত্বের কোন্দল দেখা দেয় শান্তিবাহিনীর ভিতর। প্রীতি কুমার চাকমা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দল থেকে বেরিয়ে যায়। তার সাথে যোগ দেয় প্রায় অর্ধেক গেরিলা। ১৯৮২ এবং ৮৩ সাল দুই বছর গৃহযুদ্ধ চলে শান্তিবাহিনীর মধ্যে। অবশেষে উভয় গ্রুপের নেতৃবৃন্দ একত্রে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে। আসলে একত্রিত হওয়ার বিষয়টি ছিল প্রীতি গ্রুপের কৌশল এবং এই সুযোগে তারা ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এম এন লারমাকে হত্যা করে। এম এন লারমার মৃত্যুর পর সন্তু লারমা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। বিভিন্ন সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির শান্তি আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তিচুক্তি সাক্ষরের পর তার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে করে। এতে পাহাড়িদের মনে নতুন ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

গ্রন্থটিতে শান্তিবাহিনীর অনেক গেরিলা তাদের স্বপ্ন, পরিবার, জীবন ও সশস্ত্র সংগ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের গেরিলা জীবনের অনেক লোমহর্ষক কাহিনি উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি অস্ত্র সমর্পণের পর তাদের দৈনতা, দুঃখ, দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক সাধারণ মানুষ থেকে গেরিলাদের পৃথক সত্তাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী গেরিলাদের পুনর্বাসিত না করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করেছেন। গ্রন্থটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, সমস্যা সৃষ্টির কারণ এবং গেরিলাদের জীবন সংগ্রামের সত্যিকার চিত্র অবলম্বনে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতিসমূহের সংস্কৃতি, জীবনধারা, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় বর্তমান অবস্থা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যবহুল আরও বেশকিছু গ্রন্থ, পত্রিকা, বুলেটিন, স্মরণিকা ইত্যাদি অধ্যয়ন করা হয়েছে যা সাহিত্য পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়নি। তবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সহযোগী ও সহকর্মীবৃন্দসহ তার মৃত্যুত্তোরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অনেকেরই সাক্ষাৎকার এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য পাওয়া গেছে যা এযাবৎকাল অনালোকিত বহু অধ্যায়কে ইতিহাসের পাতায় তুলে ধরে এ বিষয়ক জ্ঞানভাণ্ডারকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

এই সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে যে সব প্রশ্ন বেরিয়ে এসেছে সেগুলো হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কি বহিরাগত? পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ আসলেই কি পাহাড়িদের দমন ও বিচ্ছিন্ন করার জন্য করা হয়েছিল?

১৯৪৭ সালে পাহাড়িদের 'ভারতপন্থী' এবং ১৯৭১ সালে 'পাকিস্তানপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কেন? পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা রাখেনি? কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়িদের জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল? পাহাড়িদের সশস্ত্র সংগ্রাম কি আসলেই 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস'? বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পাহাড়িদের অসন্তোষের কারণগুলো কি কি? পাহাড়িদের সশস্ত্র সংগ্রাম না করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবি আদায় সম্ভব ছিল কি? জুম্ম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির কারণ কি ছিল? এম এন লারমার বাকশালে যোগদানের সম্ভাব্য কারণ কি ছিল? 'দেশের মূল ভূখণ্ডের ১০ ভাগ ভূমি পার্বত্য অঞ্চলে থাকায় সরকার বিভিন্ন স্থান থেকে ভূমিহীনদের নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসন করেছে' – এই উক্তি কি গ্রহণযোগ্য? নাকি অন্য কোন কারণ কাজ করেছে? পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের পাঁচ শতাধিক সেনাক্যাম্প স্থাপন যুক্তিসংগত ছিল কিনা? জাতীয়তা কীভাবে রাজনীতির হাতিয়ার হয় এবং এর মাধ্যমে কীভাবে সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে অস্বীকার করা হয়? এবং নেতা ও ব্যক্তি হিসেবে এম এন লারমা কেমন ছিলেন এবং রাজনীতিতে তার ভূমিকা কি ছিল? এসব প্রশ্ন-সহ সংশ্লিষ্ট আরও নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

৯. উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে এই গবেষণা। গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে সংঘাতময় রাজনীতি ও পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকা পর্যালোচনা এবং পাহাড়ি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তার উত্থানের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে অনুধাবনের জন্য এই গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গবেষণার পরিধি হিসেবে বলা হয়েছে যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সূত্রপাত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্তত এক যুগ আগে – কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে – এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বের সোপান সেখান থেকেই শুরু, তাই গবেষণার সময়কাল শুরু হয়েছে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণকাল থেকে, আর গবেষণার সমাপ্তিকাল হিসেবে নেয়া হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সাক্ষরের মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র সংঘাতের অবসানকালকে; অর্থাৎ গবেষণাকর্মের পরিধি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। মূলত পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প সবচেয়ে বড় ক্ষোভের জন্ম দেয়। ১৯৬০ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়, তাই এই সময় থেকে ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রে বেশকিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভৌগোলিক অবস্থান যথা এর আয়তন, সীমানা, ভূমিরূপ, ভূমির শ্রেণিবিভাগ, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার আলোচনায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয়, জনসংখ্যা এবং নানা শ্রেণীর আদিবাসীর বিশদ আলোচনা রয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্রেও আলোচনায় এর প্রশাসনিক কাঠামোর আলোচনা সহ সুলতানী

Dhaka University Institutional Repository

আমল থেকে শুরু করে মোঘল শাসনামল, বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত বিবরণী রয়েছে। পরবর্তিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ তথা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের আইনগত স্বীকৃতি ও অধিকারের বিষয়গুলোও এখানে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপণে দেখানো হয়েছে কিভাবে ঐতিহাসিক কাল থেকে পাহাড়িরা সামন্ত-শোষণ, মহাজনী শোষণ, বাঙালি ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের শোষণের শিকার হয়েছেন। সর্বোপরি, পাহাড়ি আদিবাসী জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের পথিকৃত হিসেবে এম এন লারমার ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় গবেষণাকালের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা এবং এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূলত ঃ দুই ধরনের উপাত্তের উপর নির্ভর করে এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথমত ঃ প্রাথমিক বা মূল উপাত্ত হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ও বর্তমান আন্দোলন-সংঘাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দ, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, শান্তি বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, এবং এম এন লারমার রাজনৈতিক উত্তরসূরী সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ সহকারী উপাত্ত হিসেবে গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য রচনা, গবেষণা কর্ম, স্মৃতিকথা, স্মরণিকা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। সংসদীয় কার্যবিবরণীকেও উপাত্তের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের একটি বড় অংশ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা। পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত বইগুলোকে চারটি দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়েছে। **প্রথমত** কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেখানে পাহাড়ি জাতিসমূহের উপর সরকার কর্তৃক নির্যাতন, নিপীড়ন, বঞ্চনাকে সমালোচনা করে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষীয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত** কোন কোন গ্রন্থে পাহাড়ি জাতিসমূহের লড়াই সংগ্রামকে নিরাপত্তার দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থগুলোতে তাদের কর্মকাণ্ডকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। **তৃতীয়ত** কোন কোন লেখক তাদের গ্রন্থে পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কোন লেখক বিরাজমান সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে শান্তি চুক্তিকে বিবেচনা করেননি। তাদের মতে দারিদ্র ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান হবে। **চতুর্থত** আরও কিছু গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগুলির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন বেরিয়ে এসেছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা কি আসলেই বহিরাগত? ১৯৪৭ সালে পাহাড়িদের 'ভারতপন্থী' এবং ১৯৭১ সালে 'পাকিস্তানপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কেন? কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়িদের জীবনে কি প্রভাব ফেলেছিল? পাহাড়িদের সশস্ত্র সংগ্রাম না করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবি আদায় সম্ভব ছিল কিনা? জুম্ম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির কারণ কি ছিল? আরও যে প্রশ্নটি বেরিয়ে এসেছে সেটি হলো নেতা ও ব্যক্তি হিসেবে এম এন লারমা কেমন ছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে তার ভূমিকা ছিল কি ধরনের এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শিক প্রস্তুতি

১. সূচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও আদর্শিক প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনা শুরু হয়েছে মহাপুরম গ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম ও বেড়ে ওঠার বর্ণনার মধ্য দিয়ে, ক্রমান্বয়ে এসেছে তার পারিবারিক পরিমন্ডল, তার পিতামহ চানমনি চাকমা, পিতা চিত্তকিশোর লারমা, মাতা সুভাষিণী দেওয়ান, ভাইবোন ও পরিজনদের সাহচর্য এমএন লারমার ব্যক্তিত্ব গঠনে কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার আলোচনা। এ অধ্যায়ে তার শিক্ষাজীবন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে মহাপুরম স্কুলের ভূমিকা, পাহাড়ী ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠা ও মনোভূমি নির্মাণে প্রভাব, পাহাড়ি জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সম্পৃক্ততা, পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে আসা, কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২. মহাপুরম গ্রাম ও এম এন লারমার জীবনধারা

রাঙ্গামাটি শহরের উত্তর দিকে, খাগড়াছড়ি যাবার পথে, ১২ মাইল দূরে, নানিয়ারচর থানায় মহাপুরম গ্রাম অবস্থিত। এ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দুটো নদী, বড় মহাপুরম ও ছোট মহাপুরম। অনেকের ধারণা, ওই দুটো নদীর নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয়েছে। বড় মহাপুরম নদীটা কুতুবছড়ি হয়ে হাজাছড়ি, ছিড়িয়াছড়ি এবং পেরেশছড়ি অতিক্রম করে চেঙ্গী নদীতে মিশে কর্নফুলী নদীতে পড়েছে। গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে নদী দুটি সম্পর্কে সন্তু লারমা জানান ঃ [১]

> "আমরা একসাথে খেলেছি, একসাথে অনেক দূরন্তপনা করেছি। বড় মহাপুরমের সাথে ছোট মহাপুরম নদীটা মিশে গেছে এবং দুটোই গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ছোটবেলায় বর্ষাকালে যখন নদী দুকূল ছাপিয়ে কানায় কানায় ভরে যেতো সেই সময়ে আমরা একসাথে সাঁতার কেটেছি। মানবেন্দ্র লারমা শান্ত প্রকৃতির হলেও সমস্ত ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।"

এম এন লারমার বাবা চিত্তকিশোর চাকমা তার 'চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি' নামক গ্রন্থে মহাপুরমের বর্ণনা দিয়েছেন এ ভাবে যে,

পুরম নদীর তীরে শোভে স্বভাব সুন্দরে বাজে
শোভিত রম্য মহাপুরম গ্রাম,
সেই মোর জন্মভূমি, গরিয়সী মা জননী,
জীবনের পরম-তীরথ ধাম।

---

[১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

মহাপুরম শহর-বন্দর না হলেও বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নামে খ্যাত ছিল এক সময়। বিভিন্ন দিক হতে আগত ছয়টি পথের মিলনস্থল ছিল এই গ্রাম। চাকমা রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভূপ্রকৃতিগত কারণে বিভিন্ন দিকগামী পথের মিলনকেন্দ্র ছিল এটি। কর্নফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে এই গ্রামের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে নতুবা নদীর সঙ্গম স্থলে মহাপুরম গ্রাম এখনো থাকত। [২]

মহাপুরম ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং এ গ্রামের অধিকাংশ পরিবার ছিল শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন। এ গ্রামে প্রায় ২০ থেকে ২২টি পরিবার ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত। কেবল দুএকটি পরিবার মাঝে মধ্যে অভাবের সম্মুখীন হতো। এ অবস্থায় গ্রামের লোকজন নিজ উদ্যোগে চাঁদা সংগ্রহ করে অভাবগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করতেন। এটাকে এক ধরনের কমিউনিটি জীবন ব্যবস্থা বলা যায়। অন্যান্য গ্রামেও এ ধরনের জীবন ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও অপেক্ষাকৃতভাবে মহাপুরম গ্রামেই অনুশীলন হতো বেশি। উল্লেখ্য, গ্রামের মুরুব্বি মহলই এসব পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তারা যে কোন পরিবারের অভাব অনটন দূর করার জন্য অগ্রিম প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। বিপদে-আপদে পরস্পরকে সহযোগিতা করে এভাবেই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখতেন। মহাপুরম গ্রাম ছিল 'রিজার্ভ' ভিত্তিক। এ রিজার্ভ ব্যবস্থা সরকার ঘোষিত নয়। গ্রামের মুরুব্বীদের দ্বারা বিশেষ অঞ্চলের (গ্রামসহ) সীমানা চিহ্নিতপূর্বক রিজার্ভ করা হতো এবং গ্রামের সকলের প্রয়োজনে তা উন্মুক্ত ছিল। এসব রিজার্ভকৃত এলাকায় বন্য প্রাণীকুল খুব সহজে লুকিয়ে থাকতে পারতো। এ এলাকায় বন্য পশুপাখি শিকার সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তবে প্রয়োজনবোধে মানুষ নিজেদের রিজার্ভের পশুপাখি শিকার করতে পারতো। এক রিজার্ভের লোকজন অন্যের নির্ধারিত রিজার্ভে শিকার করতে পারতো না। এই রিজার্ভকরণ প্রক্রিয়াটি ছিল যুগোপযোগী এবং নিজেদের জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। ফলে গ্রামের সকলে রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি ধ্বংসের হাত থেকে যেমন রক্ষা পায়, তেমনি সংশ্লিষ্ট গ্রামের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে। আবার পরিবেশ রক্ষায় এর গুরুত্বও অপরিসীম। [৩]

সমতল চাষোপযোগী জমি এবং ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল মহাপুরম গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি কাঁচা রাস্তা, যে রাস্তাটি ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীতে মেরামত করে। শুষ্ক মৌসুমে এ রাস্তা দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচল করলেও সাইকেলই ছিল অন্যতম বাহন। প্রথম দিকে এই রাস্তাটির বিস্তৃতি ছিল মহালছড়ি পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কাপ্তাই বাঁধের পানিতে খাগড়াছড়ির রাস্তাটি তলিয়ে গেছে। মহালছড়ির রাস্তাটি এখনও রয়েছে, তবে নতুন রাস্তা তৈরি করার কারণে পুরানো রাস্তা ব্যবহার করা হয় না। বর্তমানে মহালছড়ি থানার মাইজছড়ি ইউনিয়ন থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গেছে সেটি পুরোনো রাস্তার অংশ, যা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।[৪] মহাপুরমে চাষাবাদ হতো মূলত ঃ প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী হলেও এম এন লারমার পূর্বসূরিগণ

---

২ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, 'তঞ্চঙ্গ্যা', প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য সম্পাদিত বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিও গবেষণা, প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

৩ সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

৪ ঐ, ২১/০৫/২০০২।

চাষাবাদে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করায় সচেষ্ট ছিলেন। তখন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল একটি জেলা এবং এর প্রধান কার্যালয় ছিল রাঙ্গামাটি। মহাপুরম রাঙ্গামাটির অনতিদূরে ছিল বলে রাঙ্গামাটির সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়ে গ্রামটি ওতপ্রোতোভাবে জড়িত ছিল। [৫]

৩. জন্ম ও শৈশব জীবন

১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম। ছোটকাল থেকে স্বাস্থ্যের গড়ন ছিল হালকা পাতলা এবং নরম প্রকৃতির। ছোটবেলা থেকেই তিনি তার বাবার সান্নিধ্যে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। [৬]

এম. এন লারমা তার শৈশব জীবনে পারিবারিক পরিবেশ ও পাহাড়ি সংস্কৃতি থেকে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। তার ছিল শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ, শৃঙ্খলাবোধ, মানুষের প্রতি মমতা ও কল্যাণ সাধনের আকাঙ্ক্ষা, আর্ত-মানবতার প্রতি দয়া ও ভালোবাসা এবং স্বদেশের প্রতি গভীর প্রেম। এম. এন লারমা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বড় বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা বলেন,[৭]

> "আমাদের বাড়িটির নাম ছিল 'অনোমা কুঠির', বাবারই দেয়া নাম। বাড়িটি মাটির তৈরি ছনের ছাউনি দোতলা "গুদোম"। বাড়িটিতে ছিল বড় বড় সাতটি ঘর। ঘরের ভিতরে বাবা দোলনা টাঙিয়ে দিতেন, এই বাড়িটিতেই আমাদের জন্ম। বাবার কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর তিন ছেলে হবে অনেকটা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মত, আর মেয়ে হবে প্রকৃতি। আমাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিলো। জমিতে ধান আর শাক-সবজির চাষ হতো, বাগান-বাগিচা ছিল। গোলাভর্তি ধান থাকতো, খাওয়ার পর কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্তও থাকতো। আমাদের বাড়িতে থেকে যে ছাত্ররা লেখাপড়া করতো তাদেরও এখান থেকেই খাওয়া-দাওয়ার খরচ চলতো। যখন থেকে স্মরণ করতে পারি, তখন থেকে দেখে আসছি বাড়িতে সবসময় নানা মানুষের সমাগম। সব সময় অতিথি থাকতো। ছোটকাল থেকে মঞ্জুর গড়ন ছিল নরম। হাঁটতে চলতে তার গতি ছিল মন্থর। সে মায়ের পিছনে হেলে-দুলে চলতো। ছোটবেলা সে ছিল সচেতন, শৃঙ্খলাপরায়ণ, সরল ও সহিষ্ণু। আমি ওকে আদর করে 'চিক্ক' বলে ডাকতাম।"

এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা তার স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছোট বেলা থেকেই ধীর স্থির ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তার আচার-ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। কারো দুর্ব্যবহারে সহজে উত্তেজিত হতেন না এবং নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি সব পরিবেশ এবং সকল মানুষকে সহজে আপন করে নিতে পারতেন। গ্রামের অন্যান্য সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের মত তিনিও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছিলেন তথাপিও সকলের সাথে তার ছিল আন্তরিক বন্ধুত্ব। এম এন লারমা পড়ালেখায় মনোযোগী ছিলেন।

---

[৫] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[৬] জ্যোতিপ্রভা লারমা, 'মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা', *এম. এন. লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ২০১৪ স্মরণিকা*, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবাষিকী পালন জাতীয় কমিটি, ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫-৩৬।

[৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮।

জ্যোতিপ্রভা লারমা বলেন,[৮]

> ‘এম এন লারমা অল্পেই তুষ্ট হতো। কর্মজীবনে এসেও তার সেই চরিত্র অটুট ছিল। এই স্বভাবের কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে অভুক্ত থাকতে হয়েছিল বেশ কয়েকবার। ছোট কাল থেকেই মঞ্জু না বুঝে অনুকরণ করার পক্ষপাতি ছিলনা। একবার স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একই সাথে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বসেছিলাম। কাকতালীয়ভাবে শিশু শ্রেণিতে পড়া মঞ্জুর আর আমার স্থান হলো একই বেঞ্চে। আমি তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একভাবে লিখতে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু সে সেভাবে না লিখে লিখল নিজের মতো করে। ’

উল্লেখ করার মতো সরলতা ও সহিষ্ণুতা ছিল এম এন লারমার। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া মঞ্জু ভাইবোনদের নিয়ে উঠানে বল খেলার সময় বল পাট ক্ষেতে গিয়ে পড়ে। বল নিতে গিয়ে সকলে ভীমরুলের কামড়ের শিকার হয়। অন্য ভাইবোনরা চিৎকার করে কান্নাকাটি করলেও মঞ্জু চিৎকার না করে কামড়ে থাকা ভীমরুলগুলোকে সরিয়ে দেয়। একবার তাদের গ্রামে এক বানর ঢুকে পড়ে। গ্রামের বালক এবং যুবকরা সেই বানরকে তাড়া করে ধরে ফেলে। বুলু, মঞ্জু, সন্তু তিন ভাইও ছিলেন সেখানে। বেদম প্রহারে বানরটি মারা যায়। এই কথা তাদের বাবার কানে গেলে তিনি ছেলেদের শাস্তি প্রদানের জন্য অপেক্ষা করেন। ছেলেরা আসলে, সেখানে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে মারতে উদ্যত হলে, বুলু এবং সন্তু তাদের বাবার এই রুদ্র মূর্তি দেখে দৌঁড়ে পালিয়ে গেলেন কিন্তু মঞ্জু পালিয়ে যান নি। ফলে তিনি একাই শাস্তি ভোগ করেন। [৯]

বিভিন্ন বিষয়ে জানার প্রতি তার আগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য। ছাত্র অবস্থায় সুযোগ পেলে গ্রামের নেতৃস্থানীয় নারী-পুরুষের সাথে আলাপ করতেন। তাদের ব্যক্তিগত বিষয়, সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি, চাষাবাদ, লতাপাতার নাম, গাছের নাম, বাঁশের নাম, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় জানতে চাইতেন। কাপ্তাই বাঁধের পানিতে ক্ষতি সাধিত হওয়া আগেই তিনি পাহাড়ি জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। এ সময় থেকেই তিনি জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন, জানতে চাইতেন পাহাড়ি জাতির এ ক্ষতিতে কার কি ভূমিকা হতে পারে।[১০]

এম এন লারমা যখন কিশোর ছিলেন তখন প্রায় ২০-২৫ জন ছেলেমেয়ের সমন্বয়ে একটা বড় দল ছিল, যারা একসাথে খেলাধুলা, গান-বাজনা, নাটক, কুস্তি কানামাছি খেলা প্রভৃতি বিনোদনমূলক কাজে যুক্ত থাকতেন।[১১] তাদের পারিবারিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সুখকর। এম এন লারমা ছুটির দিনে নদীতে মাছ ধরতে যেতেন। আবার কোন কোন সময় বনে বনে ঘুরে বনের ফলমূল সংগ্রহ করতেন। তিনি ফুটবল, ভলিবল, কুস্তি, হা-ডু-ডু, দৌঁড় প্রভৃতি

[৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮-৯।
[৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯।
[১০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০-১১।
[১১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তার সম্পৃক্ততা ছিল। তিনি খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন।[১২]

পড়াশুনার পাশাপাশি গৃহের কাজকর্ম করতেও কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতেন না। পারিবারিক যে কোন কাজে তার উপস্থিতি ও অবস্থানটা ছিল অত্যন্ত নিবিড়। ধান মাড়াই, ধান ভানা জমির আল মিরামত প্রভৃতি কাজেও তিনি হাত লাগাতেন। মাঝে মাঝে বনে-জঙ্গলে তিনি গরু-মহিষ চরাতেন, প্রয়োজনে হাল বা লাঙ্গল চালিয়ে কৃষিজমি চাষও করতেন আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে। তিনি যে কাজ হাতে নিতেন সেটা শেষ করতে চাইতেন। [১৩] এই প্রসঙ্গে সন্তু লারমা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, একদিন তারা তিন ভাই এবং বাড়ির কাজের সহযোগি একটি ছেলেসহ ধান ক্ষেতে যান। এম এন লারমা বেশ কিছু ধানের আঁটি কাঁধে তুলে সবার আগে বাড়ির দিকে রওনা দেন। কিন্তু ভারি বোঝা বহন করে পথে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং হাঁটতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়লেন। ফিরার পথে সন্তু লারমা এসে দেখলেন তার গায়ে জ্বর। তীব্র রোদ আর জ্বর মিলিয়ে তার গৌর বর্ণ রক্তিম হয়ে পড়েছে। সন্তু লারমা তাকে সাহায্য করতে চাইলে তিনি ক্ষেপে যান এবং বোঝা মাথায় করে উঠতে গিয়ে আবারও পড়ে যান। ছিটকে যাওয়া ধানের আঁটি অন্যেরা ভাগাভাগি করে বাড়ি নিয়ে গেলেন, আর লারমা খালি হাতে বাড়ি ফিরলেন। সন্তু লারমা নিজের অপরাধ স্বীকার করে বড়ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কথায় তিনি মনে কষ্ট পেয়েছেন কিনা? এম এন লারমা উত্তরে বললেন, 'নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করতে পারি নি সেটাই তো দুঃখজনক ব্যাপার'। [১৪] এম এন লারমার শৈশব ছিল সুশৃঙ্খল। তার সঙ্গী-সাথীরা নিয়মিত লেখাপড়া ও খেলাধুলা করতেন। তাদের গ্রামে নেতৃত্ব বিকাশের একটা অনুকূল পরিবেশ ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠরা যেমন তাদের স্নেহ করতেন তেমনি তারাও বড়দের সম্মান করতেন। এম এন লারমা শৈশব থেকেই প্রখর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। যে কোন বিষয়ের খুব গভীরে গিয়ে ভাবতে পারতেন। শৈশব জীবনে তার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন অমিয়সেন চাকমা, শান্তিময় চাকমা এবং শান্তিরঞ্জন চাকমা। আর মেয়ে-সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন শান্তনা চাকমা, জোস্না চাকমা এবং পূর্ণশশী চাকমা। তাদের শৈশব-কৈশোরের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি বিজড়িত মহাপুরম গ্রাম কাপ্তাই হ্রদের অথৈ জলে তলিয়ে গেছে।[১৫]

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন মৃদুভাষী। তিনি তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি এবং সৃজনশীল মেধার অধিকারী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অধিকারহারা পাহাড়ি জনগণের মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং প্রজা শ্রেণির উপর অভিজাত শ্রেণির শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছোটকাল থেকেই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন।[১৬]

---

[১২] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[১৩] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[১৪] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[১৫] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[১৬] মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পাদিত) স্মারক গ্রন্থ, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৭।

৪. পরিবার-পরিজন ও লারমার ব্যক্তিত্ব গঠন

চানমনি চাকমা

এম এন লারমার ঠাকুরদাদা চানমনি চাকমা আর্থিকভাবে বেশ ছিলেন। তার চল্লিশ একর সমতলের জমি এবং সাধারণভাবে একটি পরিবার চলার জন্য যা প্রয়োজন তার সবই ছিল। এম এন লারমার ঠাকুরদাদা চানমনি চাকমা সুউচ্চ পর্বত 'কেরেটথাবা' থেকে সমতলে এসে ৫০/৬০ একর জমি আবাদ করেছিলেন। তিনি এতটা শান্তিপ্রিয় ও স্বার্থ ত্যাগী ছিলেন যে, এলাকার মং রাজার বড় ভাইয়ের সাথে কলহ শুরু হলে তিনি ৫০/৬০ একর আবাদি জমি ফেলে রেখে রাঙ্গামাটির মহাপুরমে চলে আসেন। আজকের ফেনী জেলার পরশুরাম থানার পূর্ববর্তী নাম ছিল খন্দল। এম এন লারমার পূর্বপুরুষরা খন্দলের অধিবাসী ছিলেন, এ কারণে তাদের খন্দইল্যা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন ঃ

> "আমার দাদা জন্ম নিয়েছিলেন কেরেটথাবায়। রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি যাবার পথে বাম দিকে সবচেয়ে উঁচু পর্বতটা কেরেটথাবা। এখানেই তিনি জুম চাষ করতেন। সেখান থেকে ঠাকুরদাদা চলে এলেন খাগড়াছড়ি। ঠাকুরদাদার তিন পুরুষ পূর্বে, অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক ১০০ বৎসর আগে, খন্দল থেকে শুরু করে মিরেশ্বরাই, সিতাকুন্ড, ফটিকছড়ি এবং রাউজানের কিছু অংশ চাকমা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন জনসংখ্যা কম ছিল, অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র, জুম চাষের কোন সমস্যা ছিল না। সেখান থেকে কী কারণে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা চলে এসেছিলেন হয় রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে। নোয়াখালী জেলার একটা অংশ পূর্বে চাকমা রাজ্যের অংশ ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার কিছু অংশ ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল। চট্টগ্রাম নামটাও ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষ ৫ জেনারেশন আগে কেরেটথাবা থেকে খাগড়াছড়িতে আসেন এবং সেখান থেকে রাঙ্গামাটির মহাপুরমে। ঠাকুরদা জমি আবাদ করে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। চানমনি চাকমার তিন ছেলে-বড়ছেলে কৃষ্ণকিশোর চাকমা, মেজ ছেলে হরিকিশোর চাকমা এবং ছোট ছেলে চিত্তকিশোর চাকমা। মানবেন্দ্রদাসহ আমাদের সকলের জন্মও সেখানে।" [১৭]

সুভাষিণী চাকমা

এম এন লারমার মা সুভাষিণী দেওয়ান ছিলেন শিক্ষিত সামন্ত পরিবারের মেয়ে। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। ওই সময় গোটা দেশে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া নারীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। একটা প্রগতিশীল পরিবারের বধু হিসেবে খুব সহজে শ্বশুর-শাশুড়ি ও সবার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। তার বাড়িতে বিভিন্ন জাতির লোক আসতো, তাদের মধ্যে ধনী-গরীব সকলেই থাকতেন। তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। প্রতিবেশীদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বুদ্ধের নির্দেশ উপদেশ অনুযায়ী নিজের জীবনকে

---

[১৭] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

পরিচালিত করতেন, খুব পরিশ্রমী এবং উদার মনের অধিকারী ছিলেন। মানুষ কোন বিপদে পড়লে সেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উপকার করার জন্য উদগ্রীব হতেন। সুভাষিণী দেওয়ান সুযোগ পেলেই গল্পের বই পড়তেন, আর নানা ধরনের বইয়ের জোগান দিতেন তার স্বামী চিত্তকিশোর চাকমা। এম এন লারমা পরিবার থেকে পেয়েছিলেন মানুষের কল্যাণ সাধন করার মহৎ গুণটি। কারণ তার মা বাবার এবং পূর্ব পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করা। সুভাষিণী দেওয়ান শরৎচন্দ্রের বই পড়তে তিনি খুব পছন্দ করতেন।[১৮] তিনি সন্তানদের পড়াশুনার ব্যাপারে খোঁজ রাখতেন এবং নিজে পড়াতেন। সুভাষিণী দেওয়ান ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। তার রুচিবোধ ছিল আধুনিক। গৃহস্থালী কাজে ও হস্তশিল্পে তিনি ছিলেন দক্ষ। অনেক ছাত্র তার বাড়িতে থেকে মাতৃস্নেহ পেয়েছেন, লেখাপড়া শিখেছেন। ওই সময় গুরু শিষ্যের সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত নিবিড়। সে কারণে অনেক ছাত্র শিক্ষকের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন। এম এন লারমাদের বাড়িতে থেকে যেসব ছাত্র লেখাপড়া করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বিরাজ চাকমা, সঞ্জীবন দেওয়ান, স্মৃতিরূপা দেওয়ান, ললিত চাকমা, বিনোদ বিহারী খীসা, দীপান্বিতা চাকমাসহ আরও অনেকে। সুভাষিণী দেওয়ান তার সন্তানসহ এই সকল ছাত্রছাত্রীদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন স্নেহময়ী মা ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এই মহিয়সী মা, যার বাড়িতে ছিল এক সময় অসংখ্য ছাত্রের আনাগোনা, তাকেই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে পার্বত্যাঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবনতি এবং সেনা নির্যাতনের ভয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল পানছড়ি উপজেলাধীন শুকনাছড়িতে সত্যধন চাকমা নামে একজন গরিব কৃষকের ঘরে। সে সময় বাড়িতে কেউ রাত কাটাতো না, রাতে গ্রামগুলো থাকতো পুরুষশূন্য। ওই রকম পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন রোগেভুগে বিনা চিকিৎসায় সুভাষিণী দেওয়ান ১৯৮০ সালের ১১ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তার সমাধির জন্য সোনাধন চাকমা জায়গা দান করেছিলেন। মায়ের সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সন্তু লারমা সেনাবাহিনীর কাছে বন্দী হয়েছিলেন। [১৯]

চিত্তকিশোর লারমা

এম এন লারমার বাবা চিত্তকিশোর লারমাই সর্বপ্রথম 'নামের আগে বা পরে জাতির নাম' এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। তিনি বলতেন বিশ্বের কোন দেশেই কোন ব্যক্তির নামের আগে বা পরে তার জাতির নাম লিখা হয় না। সুতরাং চাকমাদের নামের আগে বা পরে জাতির নাম থাকবে কেন? থাকতে পারে নিজস্ব গোষ্ঠী বা পরিবারের টাইটেল। নামের শেষে জাতির নামের সংযোজন ব্রিটিশদের ইচ্ছেমূলক কর্ম। ব্রিটিশরা সংখ্যাল্প জাতিকে 'চিহ্নিত করার জন্য' এবং তাদের "ডিভাইড এন্ড রুল" পলিসিকে যথাযথ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে এই কাজটা করেছিল। তিনি তার ও সন্তানদের নামের শেষে লারমা টইটেল যোগ করেন। লারমা হল একটি 'গোজার' নাম। চাকমা জাতিতে যে কয়েকটা গোজা আছে তার মধ্যে বড় গোজার নাম লারমা। গোজা অপেক্ষা গোষ্ঠী ছোট। এই টাইটেল ব্যবহারের কারণে

---

[১৮] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[১৯] জরিতা চাকমা, 'সুভাষিণী দেওয়ান একজন আদর্শ মাতার নাম', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র, বুলেটিং নং-৩৪, ১৪ বর্ষ, রাঙ্গামাটি, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ২০-২১।

পরবর্তীতে লারমাদের বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশেষ করে, ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় জনগণের কাছে এম এন লারমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে যে, তাদের নামের পরে চাকমা সংযুক্ত না হয়ে লারমা কেন?[২০]

১৯৩০ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না এবং জনগণ আন্দোলন বা রাজনীতি করবে এরকম পরিবেশও ছিল না। চিত্ত কিশোর লারমা, যিনি ছাত্রজীবন থেকেই জড়িত ছিলেন রাজনীতির সাথে। তিনি আজীবনই সামন্ত শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। চট্টগ্রাম কলেজে পড়াকালীন তিনি 'অনুশীলন' পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 'যুগান্তরে'র সাথেও তার যোগাযোগ ছিল। চিত্ত কিশোর লারমা ১৯২০-এর দশকে মহাপুরম স্কুলে পড়াশুনা করেন। তারপরে পাহাড়তলী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি বহরমপুর টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ভার্নাকুলার ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং শেষে গ্রামে ফিরে এসে ১৯৩৫ সালে মহাপুরম স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সে সময় গোটা বাংলাদেশে লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন খুব কম। সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে শিক্ষার অবস্থাটা আরও পিছিয়ে থাকার কথা, কারণ ঐ সময়ের বহু পরেও কেউ ম্যাট্রিক পাশ করলে আশেপাশের দশ গ্রামের মানুষ তাকে দেখতে আসত। [২১]

তিনি মহাপুরমে গ্রামবাসীদের নিয়ে নিজ গ্রামে ছোট 'মহাপুরম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়' গড়েছিলেন। যেখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হতো। এরপর ১৯৫১ সালে এটি 'জুনিয়র হাইস্কুলে' উন্নীত হয়। বর্তমানে এটি রামহরি পাড়ায় অবস্থিত 'মহাপুরম হাই স্কুল'। স্কুলের ছাত্রদের নিজের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করাতেন। এমনকি নিজের টাকা দিয়ে স্কুলে ভর্তি করাতেন এবং হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করতেন।[২২] চিত্ত কিশোর লারমা ছিলেন কবি এবং গায়ক। তিনি খুব ভাল বাঁশিও বাজাতে পারতেন। খেলাধুলাতেও পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রদের খেলাধুলার অনুশীলন করাতেন। ভাল ছবি আঁকতেন। *চাকমা জাতির জীবনস্মৃতি* তার রচনা। তার কবিতার উপজীব্য ছিল সমাজ জীবন ও প্রকৃতি। ১৯৮৫/৮৬ সালে আর্মির নেতৃত্বে সেটেলাররা পাহাড়িদের উপর আক্রমণ এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটনকালে তিনি তার সমস্ত লেখা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেলে চলে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে লেখাগুলোর পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি। [২৩]

রাজবিহারে অবস্থানরত স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং অন্তবাসী ভিক্ষু শ্রমণগণের নিকট চিত্ত কিশোর লারমা ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের পর দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। রাজ বিহারের বিরাট উঠোন পরিষ্কার, ফুলের বাগান পরিচর্যা এবং বিহারের যাবতীয় বিষয় সুনজরে রাখতেন। বিহারে আগত অতিথি ভিক্ষু-শ্রমণগণের প্রতি তাঁর আতিথেয়তা ছিল মধুর। তাঁর নিকট আসা ধর্ম পিপাসুদের তিনি শুধু ধর্ম সর্ম্পকে শিক্ষা

---

২০ সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

২১ ঐ, ২১/০৫/২০০২।

২২ জ্যোতিপ্রভা লারমা, *'মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা'*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

২৩ সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

দিতেন না, বরং জীবনকে কীভাবে সার্থক-সুন্দর করা যায় তা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা দিতেন। এমন পিতার সন্তান ছিলেন বলেই এম এন লারমা নিজের জীবনকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার শিক্ষা পেয়েছিলেন। [২৪]

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। জনসংহতি সমিতির দেশাত্ববোধক সংগীত তার রচনা। এম এন লারমা এবং সন্তু লারমা তার কাছ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। তিনি স্বাধিকার আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ব্যাপারেও তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ছিল।[২৫] চিত্তকিশোর লারমা শেষ জীবন শীলবান ভিক্ষু হিসেবে দীঘিনালা বনবিহারেই কাটিয়েছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে ১৯৯২ সালের ১২ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ৮৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [২৬]

এম এন লারমার বাবা ওই রকম পরিবেশ থেকে কীভাবে শিক্ষায় এতটা এগিয়ে এলেন সে প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন,

> "আমার ঠাকুরদা চানমনি চাকমা খুব স্বাধীনচেতা ছিলেন, সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি তার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করানোর ব্যাপারে খুব উদ্যোগী ছিলেন। বাবার (চিত্ত কিশোর লারমা) আরও দুভাই ছিলেন। বড় ভাই কৃষ্ণকিশোর চাকমা ১৯১৯ সালে গ্রাজুয়েশন করেছিলেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি প্রথম শিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।" [২৭]

কৃষ্ণকিশোর চাকমা

এম এন লারমার বড় জ্যাঠার নাম কৃষ্ণকিশোর চাকমা। শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় পার্বত্য অঞ্চলে খুব কম লোকই লেখাপড়া করতে আগ্রহী হতেন। এর কারণ ছিল সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব। ওই নেতৃত্ব কখনোই চাইতো না সাধারণ প্রজারা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক। সে কারণে পার্বত্য জনগণ লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না, বা তাদেরকে সচেতন করার কাজে কেউ উদ্যোগী ছিলেন না। কৃষ্ণকিশোর চাকমা স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন বলেই কাজের সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গ্রামের লোকদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। জনগণকে লেখাপড়ার ব্যাপারে আগ্রহী করার জন্য তিনি পরামর্শ দিতেন, উৎসাহিত করতেন। সেই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরেও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। বিভিন্ন গ্রামে প্রাথমিক স্কুল স্থাপনে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশেষ করে

---

[২৪] বিজয় কেতন চাকমা, 'স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

[২৫] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০২।

[২৬] ঐ, এবং জরিতা চাকমা, 'সুভাষিণী দেওয়ান একজন আদর্শ মাতার নাম', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০।

[২৭] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২।

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের কাজ করে গেছেন। বান্দরবান জেলায় চাকমা কম থাকায় এবং তুলনামূলকভাবে মারমা অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় কৃষ্ণকিশোর চাকমা সেখানে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কাজ করার ততটা অনুকূল পরিবেশ পাননি। তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল জাতীয় পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের ধারণাকে বদলে দিয়ে শিক্ষিত একটা জনপ্রতিনিধিত্বশীল নেতৃত্বের কামনায় বিভিন্ন জায়গায় সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছেন তিনি। [২৮]

অভিজাত ও সাধারণ জনগণকে নিয়ে ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে "চাকমা যুবক সমিতি" গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো। কৃষ্ণকিশোর চাকমা এই সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। [২৯] তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেয়ার পরামর্শ দিতেন। [৩০]

মূলত রাঙ্গামাটির মহাপুরম গ্রামটি ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্বদের এলাকা। মহাপুরম থেকে নানিয়ারচর পর্যন্ত এলাকাটি ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র। [৩১]

হরিকিশোর চাকমা

হরিকিশোর চাকমা ছিলেন এম এন লারমার মেজো জ্যাঠা। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন ধনী ও আদর্শ কৃষক। তিনি চাষাবাদকে আধুনিকীকরণের চেষ্টায় বিভিন্ন বই পড়তেন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদ করতেন এবং নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ করতেন। হরিকিশোর চাকমা শিক্ষক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি কবিয়ালদের মতো মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। [৩২]

রমেশচন্দ্র দেওয়ান

এম এন লারমার নানা রমেশচন্দ্র দেওয়ান-এর বাড়ি ছিল খাগড়াছড়ির খবংপড়িয়ায়। তার পরিবারও ছিল শিক্ষিত। তারা ছিলেন তিন ভাই। দুজন শিক্ষকতা করতেন এবং আরেক জন ছিলেন । এম এন লারমার দাদা এবং নানার পরিবারে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ও রাজনীতির চর্চা ছিল অভিন্ন। তবে নানার পরিবার ছিল সামন্ত পরিবার। নানার সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই ছিলেন শিক্ষিত। তিন কন্যার মধ্যে এম এন লারমার মা সুভাষিণী দেওয়ান ছিলেন

[২৮] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[২৯] শ্রী উত্তরন, 'জাতীয় উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমিকা', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ১৯৮৪ পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৩০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৩১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০৩।

[৩২] ঐ, ২২/০৭/২০০৩ ও ২১/০৫/২০০২

বড়। তার সেজ ছেলে রাজনীতি করতেন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সাথেও জড়িত ছিলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র রামেন্দু শেখর দেওয়ান লন্ডনে বসবাস করেন এবং জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।[৩৩]

জ্যোতিপ্রভা লারমা

এম এন লারমার চার ভাই বোনের মধ্যে জ্যোতিপ্রভা লারমা হলেন সবার বড়। তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। সেই সাথে তিনি লেখালেখিও করেন। তার কবিতা সংগ্রামী মানুষকে প্রেরণা যোগায়।[৩৪]

শুভেন্দু বিকাশ লারমা

এম.এন. লারমার বড় ভাই শুভেন্দু বিকাশ লারমা ৬০-এর দশকে পানছড়ি থানার যুব সমিতির আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করতেন। জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতেন এবং নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি কৃষি বিপ্লবের সাথে জড়িত ছিলেন। পাহাড়ি জনগণকে জুম চাষের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে কৃষি কাজের দিকে উৎসাহী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শুভেন্দু বিকাশ লারমা অত্যন্ত জনদরদী ছিলেন। এলাকার অনেককে নিজের সম্পত্তি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। কেউ বিপদে পড়ে তার কাছে এলে তিনি সাধ্যমত কিছু করার চেষ্টা করতেন। এমন কি বিভেদপন্থী গ্রুপের পলাশের ভাইদের পড়াশুনার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করেছিলেন। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর 'গৃহযুদ্ধে'র ফলে তার মৃত্যু হয়।[৩৫]

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির মাধ্যমে তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের শুরু। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত। ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আশুতোষ কলেজ থেকে আইএ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বাংলায় এম.এ করেন। মাস্টার্স ফাইনালের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তিনি নিজ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

---

[৩৩] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[৩৪] জরিতা চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০-২১।

[৩৫] শ্রী পেলে, *'রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর'*, ১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৬।

সন্তু লারমা ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস থেকে একাধারে শিক্ষকতা ও রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। এই সালের ডিসেম্বর মাসে এম এন লারমা ও তাঁর নেতৃত্বে 'ইন্টার হিল ট্রাক্টস্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। সন্তু লারমা ছিলেন এই এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং অনন্ত বিহারী খিসা জেনারেল সেক্রেটারি।

তিনি প্রথমে বিনা বেতনে মাইজছড়ি প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপরে গুইমারী প্রাইমারি স্কুলে যোগ দেন। প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন দুটো স্কুলকেই তিনি জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত করেন। পরবর্তীতে পানছড়ি স্কুলে যোগ দেন। তবে এরমধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে কমলছড়ি হাইস্কুল, তারাবুনিয়া জুনিয়র হাইস্কুল, রূপকারের হাইস্কুল ও আরও কয়েকটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬] সন্তু লারমা তাঁর এলাকার ক্ষেতমজুরদের নিয়েও কাজ করেছেন। তাদের অধিকার সচেতন করে ন্যায্য-মজুরী আদায়ের জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি রেলওয়ে শ্রমিকদের এবং চট্টগ্রামে হরিজন সম্প্রদায়কে নিয়েও কাজ করেছেন।

গ্রামে শিক্ষকতা করার সময় ছাত্রদের নৈতিক গুণসম্পন্ন সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি সমমনা শিক্ষকদের নিয়ে গ্রামের সাধারণ জনগণকে সচেতন করার কাজ করেছেন। তাদের শাসন-শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এম এন লারমার মৃত্যুর পর শান্তিবাহিনীর কমান্ডার ও জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান হন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান।

৫. পারিবারিক বৈশিষ্ট্য

এম এন লারমাদের পরিবার ছিল শিক্ষিত ও কৃষি নির্ভর পরিবার। নিজেরা নিজেদের জমি চাষ করতেন। তবে কখনও কখনও কৃষি কাজে সাহায্যের জন্য মাসিক চুক্তিতে কাউকে নিযুক্ত করা হত। পরিবারের যে কোন কাজে অংশগ্রহণে পরিবারের সদস্যদের কোন দ্বিধা ছিলনা। কোন অন্যায় বা ভুল কাজের জন্য পরিবারে কোন শারীরিক শাস্তির প্রচলন ছিল না। পরিবারে সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বিশেষত লারমা পরিবারে বাবা এবং মায়ের সাথে সন্তানদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তাদের পরিবারে বিভিন্ন জাতির লোক আসা-যাওয়া করত। অতিথি মাত্রই আপ্যায়ন ও সেবা করা ছিল একটি অন্যতম পারিবারিক রেওয়াজ। বাঙালি পরিবারে সাধারণত যে কাজগুলো মেয়েরা করেন আদিবাসী সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লারমা পরিবারের সেসব কাজ ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই করেন। একটু বড় হওয়ার পর বাবার সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছে সকলের। মায়ের প্রতিটি কাজে সন্তানরা সহযোগিতা করতেন, মায়ের কথা শুনতেন সবাই এবং মাও বন্ধুর মতো সন্তানদের সাথে আচরণ করতেন এমনকি তিনি সন্তানদের খেলার

[৩৬] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

সাথীও ছিলেন। মাঝে মাঝে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়নি তেমন নয় তবে বড় ধরনের কোনো মতান্তর জন্ম নেয়নি কখনই।[৩৭]

৬. শিক্ষা-জীবন

এম এন লারমার শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল মা সুভাষিণী দেওয়ানের কাছে। এম এন লারমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় তার বাবার প্রতিষ্ঠিত ছোট মহাপুরম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর রাঙ্গামাটিসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন।[৩৮] উল্লেখ্য, তৎকালীন এটিই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র সরকারি বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও চৌকস ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েও তিনি ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে গ্রামসমাজের সাথে তার একটা সম্পৃক্ততা ছিল।[৩৯] সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন কলেজ না থাকায় তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে আইএ পাশ করেন এবং একই কলেজে বিএতে ভর্তি হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির সঙ্গে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মুক্তি যে একই সাথে বাঁধা এ প্রজ্ঞা এম এন লারমার ছিল। তাই এ মুক্তিকে ত্বরান্বিত করার কাজে হাত লাগাতে তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে আই.এ অধ্যয়নকালে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্য এবং নীতি যে আগ্রাসী ও ভ্রান্ত তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ সময় তিনি কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সকলকে সংগঠিত করেন। এম এন লারমার উদ্যোগে ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করে একটি লিফলেট প্রচার করা হয়, যা ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নিবর্তনমূলক আইনে তাকে গ্রেফতার করা হয়।[৪০] তিনি প্রায় দুই বছরের অধিককাল কারাভোগের পর তিনি ১৯৬৫ সালে ৮ মার্চ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৪১] তিনি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরাধীন প্যারোলে থেকে ১৯৬৫ সালে বিএ পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে বিএড পাশ করেন। অতপর ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম আদিবাসী আইনজীবী হিসেবে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগ দেন। ওই সময় থেকেই তিনি রাজনীতিতে পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন।[৪২]

---

[৩৭] ঐ, ২১/০৫/২০০২।

[৩৮] জ্যোতিপ্রভা লারমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

[৩৯] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২

[৪০] সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, মল্লিকপুর, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭।

[৪১] ঘোষণাপত্র, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩১তম মৃত্যুবাষিকী পালন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত স্মরণিকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ ৫।

[৪২] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২

৬.১ পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ও পাঠাভ্যাসে একনিষ্ঠতা

ছোটবেলা থেকেই মঞ্জু ছিলেন বই অনুরাগী। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রভা লারমা লেখেন,

> "স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও মঞ্জু গল্পের বই পড়তো সবসময়, এই অভ্যাসটা প্রথম শ্রেণি থেকেই ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময়ে বাবা কলকাতা থেকে ডাকযোগে বিভিন্ন বই ও পত্রপত্রিকা এনে দিতেন। পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাসিক বসুমতি, শুকতারার নাম মনে পড়ে। এসবই মঞ্জু গভীর আগ্রহ সহকারে পড়তো। বৃত্তির টাকা দিয়ে বই কিনত। প্রয়োজনে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে সে নিজেই বই সংগ্রহ করত। এভাবে তার নিজের সংগ্রহেই অনেক বই পত্র ছিল।"[৪৩]

লারমা পরিবারে পড়াশুনার পরিবেশ ছিল। বাড়ির ছোটরা নিজে থেকেই নিয়মিত পড়াশোনা করত। তাছাড়া আরও অনেক শিক্ষার্থীরা লারমা পরিবারে থেকে পড়াশুনা করেছে। অবশ্য মহাপুরম গ্রামের অভিভাবকগণও শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। লেখা-পড়ায় অনিয়মের জন্য পরিবারে শারীরিক শাস্তির প্রচলন ছিলনা। পড়ালেখার সময়টা অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলেও প্রতিদিন পড়ালেখা করা বাধ্যতামূলক ছিল। এম এন লারমাদের বাড়িতে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়াও বিভিন্ন রকমের বই ছিল। অবসর সময়ে এ সমস্ত বই পড়ে নিজেদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন তারা। লারমা পরিবারে সে সময় যেসব পত্রিকা পড়া হতো তার মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত "শুকতারা" ছিল অন্যতম। এই পত্রিকার তারা নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তখনকার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন গ্রামে এরকম পত্রিকা পড়ার সুযোগ অন্যদের তেমন ছিল না। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের জীবনকাহিনী, প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী, স্বাধীনতাসংগ্রাম ও বিভিন্ন অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাহিনী সম্পন্ন বিভিন্ন বই, সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা ও বই, সাহিত্যিকদের জীবন কাহিনী ও নানা ধরনের গোয়েন্দা সিরিজের বই তারা পড়তেন। বস্তুত পরিবার পরিজনদের মধ্য থেকেই এম এন লারমাসহ অন্যান্য ভাইবোনদের নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে।[৪৪]

৬.২ আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূতিকাগার মহাপুরম স্কুল

১৯২০ এর দশকের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেমন কোন স্কুল ছিল না। অত্যন্ত পুরাতন যে দুএকটা স্কুল ছিল তার মধ্যে মহাপুরম স্কুল ছিল অন্যতম। এটা প্রথমে ১ম হতে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত ছিল। তারপরে লোয়ার প্রাইমারি যা পরে প্রাইমারি, তারপর মিডল স্কুল, এবং ধীরে ধীরে জুনিয়র হাইস্কুল ও পরে হাইস্কুল হয়েছে। মহাপুরম স্কুলেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন লারমা পরিবারের সকলে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এম এন লারমার পিতা। স্কুলের সকল শিক্ষকরা ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবান। মহাপুরম স্কুল ছিল 'আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূতিকাগার'। এই স্কুল ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। পূর্বে এবং বর্তমানেও যারা জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং প্রথম সারির

[৪৩] জ্যোতিপ্রভা লারমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০।
[৪৪] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২

Dhaka University Institutional Repository

নেতা তাদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছেন মহাপুরম স্কুলের ছাত্র। তারা হয় এম এন লারমার বাবার ছাত্র না হয় জ্যাঠাদের ছাত্র। এম এন লারমার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা মহাপুরম স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং তাদের মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তিনি হলেন চিত্তকিশোর লারমার পিতৃব্য পুত্র (দাদা) কালী প্রসন্ন চাকমা। চিত্ত কিশোর লারমার ছেলেবেলার বন্ধু বিমল চন্দ্র খীসাও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। এদের দুজনকেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ঢাকায় আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের হাতে সনদপত্র প্রদান করেছিলেন।[৪৫] শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন চাকমা জাতির প্রথম তিনজন গ্রাজুয়েটের একজন কৃষ্ণকিশোর চাকমা, যিনি নিজেই এই স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্র। চিত্ত কিশোর লারমা তার রচিত বইয়ে উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ শাসন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসন আমলেও মহাপুরম স্কুল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই স্কুলের ছাত্ররাই চাকমা জাতি ও অন্যান্য জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন। এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন ঘনশ্যাম দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমা। এরা দুজনে লারমা পরিবারে অবস্থান করে পড়াশুনা করেছিলেন। তারা কৃষ্ণ কিশোরের শিষ্য ছিলেন, সেই সাথে এম এন লারমার বাবার সাথেও তাদের সখ্যতা ছিল।[৪৬] দুই শতাব্দী পূর্বে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের একমাত্র বিদ্যাপীঠ ছিল মহাপুরম স্কুল। অতীতের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। যেমন, কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, চিত্ত কিশোর চাকমা, ঘনশ্যাম দেওয়ান, রাজচন্দ্র দেওয়ান, স্নেহকুমার চাকমা, সুশীল জীবন চাকমা, রাজমনি দেওয়ান পরবর্তীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, স্নেহ কুমার চাকমা প্রমুখ।[৪৭]

৭. পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'র প্রতিষ্ঠা ও মনোভূমি নির্মাণে প্রভাব

১৯৫০-এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাল্প জাতিসত্তার মানুষদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন সুযোগ ছিল না। সেই সময় পাহাড়ি আদিবাসীরা উপলব্ধি করেছিলেন রাজনীতি এবং আন্দোলন করতে না পারলে তারা এ দেশে টিকে থাকতে পারবেন না। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নিষ্পেষণ, অন্যদিকে পাকিস্তান প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণ। এই দুয়ের মধ্যে পড়ে পাহাড়িদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত নাজুক। 'স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য জেগে উঠা দরকার' এই বোধ থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সচেতন পাহাড়ি ছাত্ররা 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' গঠন করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। [৪৮]

---

[৪৫] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০৩।

[৪৬] ঐ।

[৪৭] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯।

[৪৮] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২ এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

১৯৫৬ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ী ছাত্র সমিতিতে জড়িত হন। ১৯৫৭ সালে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অন্যদের সাথে তিনিও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ওই বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রীপুরে প্রথম পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অমিয় সেন চাকমা, সীমা দেওয়ান, সন্তোষ কুমার চাকমা, সুদেশ কুমার চাকমা, জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা প্রমুখ। এই সময় থেকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কার্যকলাপ জোরদার হয়। এম এন লারমা উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমাদের কিছু করা দরকার, নাহলে আমরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের দায় থাকবে'। এই পরিস্থিতিতে স্যার আশুতোষ কলেজের ছাত্র অনন্ত বিহারী খীসা এবং পরবর্তীতে সুধাকর খীসা এই সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে সুধাকর খীসা এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬০ সালে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এম এন লারমা। [৪৯]

৮. উপসংহার

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও তার আদর্শিক প্রস্তুতির প্রসঙ্গ। জন্মস্থান রাঙ্গামাটির মহাপুরম গ্রাম ও তার জীবনধারা, শৈশব জীবন ও পরিবার-পরিজন, পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ পরিবারে সামন্ত-শোষণ বিরোধী মনোভাব, পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূতিকাগার মহাপুরম স্কুলে মানবেন্দ্র লারমার শিক্ষা-জীবন এবং ১৯৫০-এর দশকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'র প্রতিষ্ঠা, তাতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার যোগদান ও তার মনোভূমি নির্মাণে ছাত্র সমিতি'র প্রভাব ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই আলোচনা থেকে জানা যায় ছাত্রজীবনেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ি জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬০ সাল থেকে তিনি পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে সমাসীন হন এবং আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখবো যে এই প্রস্তুতি তাকে আন্দোলনের নেতৃত্বে সমাসীন করতে ভূমিকা রাখছে।

---

[৪৯] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কাপ্তাই বাঁধ থেকে মুক্তিযুদ্ধ ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের সূত্রপাত

১. সূচনা

তৃতীয় অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের পরিধিকালের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও তার প্রতিক্রিয়ায় সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের সূত্রপাত প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আশু প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের প্রভাবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর নানামুখী ক্ষতি ও দুর্গতি এবং তার বিপরীতে সরকারের দায়সারা পুনর্বাসন, কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে *পাহাড়ী ছাত্র সমিতি*'র ভূমিকা ও আন্দোলনে তাদের সম্পৃক্ততা, দীর্ঘ মেয়াদি সংগ্রামের কৌশল হিসেবে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা এবং রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে *চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন*-এর জন্ম ও বিকাশের কথা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির বিকাশ প্রসঙ্গ, যেমন ঐতিহাসিক ৬ দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যূত্থান ও ১১ দফা আন্দোলনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। এখানে বলা হয়েছে পাহাড়ি জনগণকে নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত করার যে প্রক্রিয়া কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পাকিস্তান আমল থেকে শুরু হয় তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই মূলত পাহাড়িরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে নিজেদের লড়াই শুরু করেন। এ লড়াই পরবর্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী সংগ্রামে পাহাড়িদের যুক্ত করে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে জোরালো করে।

২. কাপ্তাই বাঁধ ও বাঁধের প্রভাব ঃ ১ লক্ষ আদিবাসী উদ্বাস্তু, ৬০ হাজার দেশান্তরী

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানবজাতি বন্যা হতে আত্মরক্ষা কিংবা চাষাবাদের জন্য নদীতে বাঁধ নির্মাণ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিন্ধু নদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতা, নীল নদীর তীরে মিশরীয় সভ্যতা এবং হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতায় বাঁধের উদাহরণ আমরা পাই। ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র "উৎপাদনশীল কাজে" ব্যবহারের জন্য নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করে যাকে নদীশাসন বলা হয়। নদীশাসনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব পড়ে নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো কাপ্তাই বাঁধ।

পূর্ববঙ্গে বাঁধ নির্মাণের আলোচনা শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) পর থেকে। সর্বপ্রথম ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্নফুলি পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করে। কিন্তু এরপর প্রায় দেড় দশক এনিয়ে সরকারের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুনরায় সরকারের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু পূর্বের মতো এইবারও কর্নফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর প্রায় দুই দশক পর ১৯৪৬ সালে ই. এ মুর (E. A. Moore) বর্তমান কাপ্তাই বাঁধের ৬৫ কিলোমিটার উজানে বরকল নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাব করেন। ১৯৫০ সালে মার্জ রেনডাল ভাত্তেন কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার্স (Marz Rendal Vatten Consulting Engineers) নামক একটি কনসালটিং ফার্ম কাপ্তাই-এর ৪৫ কিলোমিটার উজানে চিলারডাক (Chilardak) নামক একটি স্থানে বাঁধটি নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করে। ১৯৫১ সালে সরকারি প্রকৌশলীরা বর্তমান বাঁধের প্রায় ১১ কিলোমিটার ভাটির অভিমুখে চিতমোরাম (Chimoram) নামক স্থানে বাঁধটি নির্মাণের প্রস্তাব করে।[১] অবশেষে ১৯৫২ সালের শুরুর দিকে প্রধান প্রকৌশলী (কৃষি) খাজা আজিমুদ্দিন বাঁধ নির্মাণের জন্য কাপ্তাইকে নির্বাচিত করেন। প্রকৃতপক্ষে কাপ্তাই হলো ধনুকাকৃতির বাঁকযুক্ত একটি খাল যার উজানে রেংখিয়াং নদী ও ভাটিতে পাহাড়ি ছড়া ফ্রিংখিয়াং। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন। প্রকল্পের নক্সা অনুযায়ী বাঁধ দিয়ে বাঁকের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের শেষ প্রান্তে পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে সঞ্চিত পানির বিরাট জলাধার সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয় এবং এই সঞ্চিত পানিই সুড়ঙ্গ সদৃশ নির্দিষ্ট পথে বেগে ধাবিত করলে জলের তোড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্রসমূহ সক্রিয় হয়ে উঠবে। পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রস্তাব রাখে। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং ১৯৫৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (International Engineering Company) বাঁধ তৈরির জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। ইউতাহ ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেট (Utah International Inc.) নামের আরেকটি কোম্পানি ১৯৫৭ সালে বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৬১ সালের শেষ নাগাদ এবং নির্গমন দ্বারগুলো ১৯৬২ সালের প্রথম দিকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্ষাকালে পরিকল্পিত সর্বোচ্চ মাত্রার পানি অর্জন সম্ভব হয় এবং জলবিদ্যুৎ স্থাপনাটি চালুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম এলাকা ও জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। কর্নফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত দেশের একমাত্র জলীয় শক্তি দ্বারা পরিচালিত বিদ্যুৎ স্থাপনা।[২]

'কর্নফুলী বহুমুখী প্রকল্প' এর একটি দিক হলো কর্নফুলী পানি বিদুৎ কেন্দ্র। কর্নফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা। নিম্নে বাঁধটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো ঃ[৩]

১. বাঁধটি মাটি ভরাট করে নির্মিত ৬৭০.৬ মিটার দীর্ঘ

২. বাঁধটি ৪৫০৭ মিটার উঁচু যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৬ মিটার (এম. এস. এল) উচ্চতার সমান

৩. এর চূড়ার সর্বোচ্চ প্রস্থ ৭.৬ মিটার ও পাদদেশের প্রস্থ ৪৫.৭ মিটার

---

[১] http://en.wikipedia.org/wiki/Kaptai_Dam

[২] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড-২, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০-৭১

[৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০।

৪. ১২.২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১১.৩ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট মোট ১৬টি জলকপাট সংযুক্ত একটি জল নির্গমন কাঠামো এটি যার মাধ্যমে একত্রে ৬, ২৫, ০০০ কিউসেক পানি নির্গমন সম্ভব।

৫. জলাধারটিতে গড় বার্ষিক প্রবাহের পরিমাণ প্রায় ১৫৬৪.৬ কোটি ঘন মিটার, বন্যা বিশোষণ ক্ষমতা ৮২.৫ লক্ষ একর-ফুট।

চিত্র ১ ঃ কর্নফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল ফটক

বর্তমান অবস্থানে অর্থাৎ কাপ্তাই-এ বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় ১৯৫১ সালে, নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালে এবং সম্পন্ন হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৬২ সালে Dam, Spillway, Penstock and two units of power house নির্মিত হয়। প্রতিটি power house-এর সক্ষমতা ছিল ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ইউনিট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে ৪র্থ এবং ৫ম ইউনিটের কাজ শেষ হয় এবং মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ২৩০ মেগাওয়াট। কাপ্তাই বাঁধ দৈর্ঘ্যে ৬৭০.৫৬ মিটার লম্বা এবং ৪৫.৭ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন। কাপ্তাই রিজার্ভারের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার পরিমাণ ১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এর মধ্যে পড়েছে ২২০ বর্গ কিলোমিটার আবাদি জমি যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আবাদি জমির ৪০ শতাংশ এবং কাপ্তাই বাঁধের কারণে এবং ৩৩ মিটার এম.এস.এল উচ্চতা পর্যন্ত প্লাবিত অঞ্চল ৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার।

চিত্র ২ ঃ কর্নফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ

কাপ্তাইয়ে কর্নফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে কর্নফুলী বিদ্যুৎ স্থাপনা প্রকল্পের জন্য যে বিশাল জলাধারটি গড়ে তোলা হয়েছে সেটি কাপ্তাই লেক নামে পরিচিত। জলাধারটির কারণে বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বাঁধের ফলে ১,৬৪,৮৪০ একর জমি তলিয়ে যায় হ্রদের গর্ভে। এই বাঁধ একদিকে আলোকিত করে, অন্যদিকে পাহাড়িদের জীবনে অন্ধকার নিয়ে আসে। তলিয়ে যাওয়া ১,৬৪,৮৪০ একর জমির মধ্যে ৬৪,০০০ একর ফসলি জমি। পাহাড়িরা প্রধানত কাচালং এলাকার শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্য পরিষ্কারের পর এসব জমি আবাদ করতেন। এ এলাকার অর্ধেক জমি চলে কাপ্তাই বাঁধের জলের সীমানার নীচে। ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের এক তৃতীয়াংশ লোক শুষ্ক মৌসুমে চাষ করার আশায় জলমগ্ন অঞ্চলে রয়ে যান। তারা ভূমিহীন হয়ে পড়েন। জলে ভাসা জমির পরিমাণ ১৫,০০০ একর। এই জমিতে শুষ্ক

মৌসুমে চাষ সম্ভব হলেও পানি বাড়ার সাথে সাথে সব তলিয়ে যায়। ফলে এ সমস্ত জমির ফসলের উপর নির্ভর করা যায় না।[৪] হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো জমি বা টাকা পাননি।[৫] বাঁধের পানি কতটুকু হতে পারে তা সরকার পরিমাপ করেছিল। এটা জানা ছিল বাঁধের উচ্চতা ১৩০ ফুট হলে খাগড়াছড়ি জেলা ডুবে যাবে। চেঙ্গি নদী, কাচালঙ্গ নদী, মাইনি নদী পুরোটাই তলিয়ে যাবে। অন্যদিকে ভারতের মিজোরাম অঙ্গরাজ্যও ডুবে যাবে। পরবর্তীতে এর উচ্চতা ১১০ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। তারপরেও প্রায় ২৪৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়।[৬] মোট চাষযোগ্য জমির ৪০% জলমগ্ন হয়। এক লক্ষ লোক আশ্রয়হীন হয়। খাগড়াছড়ি জেলার কিছু অংশ এবং রাঙ্গামাটি জেলার পুরো সমতল চাষোপযোগী জমি পানিতে তলিয়ে যায়। [৭] এই বাঁধের ফলে এমনকি চাকমা রাজার আদি বাড়িও পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল।[৮]

১৯৬৪ সালে শুধু লংগদু, বরকল ও বাঘাইছড়ি থানা পুনর্বাসন এলাকা থেকে প্রায় ৫০,০০০ চাকমাসহ ৬০,০০০ আদিবাসী দেশান্তরী হন। তার মধ্যে ৪০,০০০ চাকমা উদ্বাস্তু অরুণাচলের দিকে যান, অন্যরা ত্রিপুরা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে আশ্রয় নেন।[৯] পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জুলফিকার আলী লিখেছেন যে ১৯৬০-এর দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১২৫টি মৌজার ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য সর্বোত্তম কৃষি জমি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ২৮ হাজার পরিবারের ১ লক্ষ আদিবাসী, যাদের অধিকাংশই চাকমা, তারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। যথাযথ পুনর্বাসনের অভাবে এবং নিরাপত্তাহীনতা ও পরিবেশগত কারণে ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার চাকমা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার এসব চাকমা উদ্বাস্তুদের অরুণাচল প্রদেশে আশ্রয় দিয়েছিল। এ সময়ে বেশ কিছু আদিবাসী উদ্বাস্তু মায়ানমারে চলে যান।[১০]

---

[৪] বিপ্লব চাকমা, *‘পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে’*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১১-১২।

[৫] শ্রী জগদীশ, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বেদখল’, *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র, বুলেটিন নং-৫, ১ম বর্ষ, ১০ নভেম্বর, ১৯৯১ পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

[৬] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[৭] ঐ।

[৮] কুমার প্রীতীশ বল, ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তি ঃ আগে-পরের কথা’, প্রকাশিত হয়েছে শফি আহমেদ এবং রাশেদা কে. চৌধুরী (সম্পাদিত), *নিজভূমে পরবাসী ঃ বাংলাদেশের আদিবাসী*, গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ ১১৮।

[৯] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[১০] মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় শরণার্থী*, কাজী ফেরদৌস-এ-নাজলা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। যে-সকল আদিবাসী দেশের মধ্যে ছিলেন অথচ বাস্তুচ্যুত হননি বা উদ্বাস্তুতে পরিণত হননি তাদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে ১০ শতাংশের কম বলে সুধাসিন্ধু খিসা উল্লেখ করেছেন।[১১]

বাঁধের ফলে সার্বিক সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পাহাড়ি জনগণের জীবনে দেখা দেয় মারাত্মক বিপর্যয়। তাদের সামাজিক জীবনসহ সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে যুথবদ্ধ সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন হয়ে যায়। যে যেদিকে পারলেন সেদিকে আশ্রয় নিলেন। সরকার সঠিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করায় অনেকেই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। পাহাড়িরা কখনো ভাবতে পারেননি এত বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে তাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সরকার এভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে।[১২] উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সরকার মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিল। যেমন- জায়গার বদলে জায়গা, জমির বদলে জমি। কিন্তু সেসব প্রতিশ্রুতি সরকার পূর্ণ করেনি।

কাপ্তাই বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন, বাঁধের পূর্বে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল মোট ২২৭ হাজার একর। বাঁধের ফলে ৪০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন হয়। [১৩] পাহাড়িরা বেঁচে থাকার জন্য, নিজেদেরকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখার জন্য নিম্নশ্রেণির পেশায় নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকেরা পুলিশের কনস্টেবল, পিয়ন, দারোয়ানের চাকরি পেশা হিসেবে পছন্দ করতেন না। তাদের মনোভাব ছিল উচ্চ। তারা ডিসি, এসডিও হতে চাইতো। বাস্তবতার কারণে বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়ে পরবর্তীকালে তারা এ সব পেশায় যোগ দিয়েছেন। জেলে, বাগান চাষী হয়েছে। পূর্বে নাপিত, ধোপা, মেথর এই কাজগুলো তারা করতো না। কিন্তু বিপর্যস্ত অর্থনীতির ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের নিম্ন পেশায় নিয়োজিত হন। [১৪]

চাকমা রাজারা যথেষ্ট বিত্তবান ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভূত সম্পদ তো ছিলই, চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লা এলাকাতেও তাদের প্রচুর জমি ছিল। সে সবের অনেকটাই তারা বিক্রি করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাঙ্গামাটির অনেক ভূসম্পত্তিও তারা ইতোমধ্যে বিক্রি করেছেন। এ সবই কাপ্তাই বাঁধের প্রতিক্রিয়া যা রাজ-পরিবারকেও স্পর্শ করেছে।[১৫]

---

[১১] সুধাসিন্ধু খিসা, 'অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যা', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল এবং শারমিন মৃধা (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সংকট ও সম্ভাবনা*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ১০০।

[১২] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

[১৩] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০০; শ্রী পেলে, 'রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

[১৪] ঐ, ২/০৭/২০০২ এবং ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[১৫] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

৩. সরকার কর্তৃক দায়সারা পুনর্বাসন ঃ ভূমি-মালিকানার ঐতিহ্যগত ও সামষ্টিক রীতি'র প্রতি অননুমোদন ও ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকৃতি

পূর্বেই বলা হয়েছে উদ্বাস্তু পাহাড়ি জনগণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন যৎসামান্য। পুনর্বাসন করা হয়েছিল 'এ' ফরম ও 'বি' ফরমের মাধ্যমে। যেসকল ক্ষতিগ্রস্ত লোক 'এ' ফরম পূরণ করেছিল তারা নিজেদের জায়গায় থাকতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, উচ্চ পাহাড়ের উপরে পুনর্বাসন করা হয়েছিল নিজ নিজ দায়িত্বে। সরকারের তরফ থেকে কিছুই করা হয়নি। যারা 'বি' ফরম পূরণ করেছিল তারা অন্যত্র চলে গিয়েছিল। পুনর্বাসনের জন্য জমি পেয়েছিল এক কানি বা এক একর। অর্থাৎ সরকারের রেকর্ডে যা ছিল, যেমন এক একর, অর্থাৎ শুধু বসতের জায়গাটা ও ধানের জমি। অথচ সেই ব্যক্তির আরও অনেক জমি ছিল যেহেতু রেকর্ড ছিল না তাই এমন হয়েছে। [১৬] যাদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল, যেমন বাঘাইছড়িতে তাদেরকে একশো ফুট উপরে জায়গা দেয়া হয়েছিল কিন্তু বর্ষা মৌসুমে সেই জায়গাও ডুবে যায় ফলে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়নি। ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ এতই কম ছিল যে, সে টাকা দিয়ে কেউ রেডিও কিনেছে, কেউ হ্যাজাক বাতি কিনেছে। পুনর্বাসন বা কর্মসংস্থান কিছু না হওয়াতে পরিবারগুলো পথে বসেছে। এই পরিবারগুলোরই এক সময় সুখের নীড় ছিল, ধানের জমি ছিল, গরু, মহিষ, ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। বাঁধের ফলে তারা সর্বশান্ত হয়েছে। চাকমা অধ্যুষিত এলাকাকে টার্গেট করে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, শুভলং এর সাঙ্গু নদীতে দেওয়া হলে জনগণ এতটা আক্রান্ত হতো না। প্রয়োজনমতো বিজলিও উৎপাদন করা যেতো। [১৭] দুই লক্ষ মানুষের মধ্যে এক লক্ষই উদ্বাস্তু হয়েছিল। [১৮] রেকর্ডকৃত সমতল জমি যাদের ছিল শুধু তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। নিমজ্জিত জমির ক্ষতিপূরণের হার প্রথম শ্রেণি ৬০০/- টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণি ৪০০/-টাকা, তৃতীয় শ্রেণি ২০০/- টাকা।

ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ–এর প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল পাকিস্তান সরকার ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছিল ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু দেয়া হয়েছিল ১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুম্ম চাষী ও কাগজ বিহীন জমির মালিকরা কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। এর কারণ হিসেবে পাকিস্তান সরকার মত প্রকাশ করে যে,

> "The tribe peoples are jungle people. They can live on foots and grasses hence they need no more compensation'.[১৯]

মালিকানার ভিত্তিতে পাকিস্তানে চার ধরনের ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। যেমন, রাষ্ট্রীয় ভূমি, ব্যক্তিগত ভূমি, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা ও মহালওয়ারি ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভূমিকে 'রাজকীয় ভূমি' বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কৃষকরা সরকারের নিকট থেকে চাষের উদ্দেশ্যে কিছু শর্তে ভূমি গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থায় ভূমি

---

[১৬] ঐ এবং সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

[১৭] ঊষাতন তালুকদার এর সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[১৮] ঐ এবং সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২

[১৯] শ্রী জগদীশ, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বেদখল', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

ব্যবহারের জন্য কৃষক সরকারকে শর্তানুযায়ী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। কৃষকরা ভূমির স্বত্বাধিকার লাভ করবে না। তারা ভূমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে। এক্ষেত্রে যৌথগত মালিকানাও হতে পারে এবং তিনি বা তারা সরকারকে ভূমি রাজস্ব পরিশোধ করবে। রায়তারি ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার সিন্ধু প্রদেশে প্রচলিত করেছিল। পাকিস্তান সরকার ভূমির মালিকানার ধরণ দেখিয়ে আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করেনি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৩ (গ)- তে মালিকানার নীতিতে তিন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে ঃ

১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা
২. সমবায় মালিকানা
৩. ব্যক্তি মালিকানা

সম্পত্তির স্বত্বাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানার বিষয়টি আদিবাসীদের জন্য খুবই মৌলিক বিষয়, কিন্তু সে কথা সংবিধানে বলা হয়নি।

৪. পাহাড়িদের দৃষ্টিতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ "চোখের জলের কাপ্তাই লেক" ও 'কালেকটিভ ট্রমা'

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধিবাসীদের অনেকে মনে করেন যে, তাদের সংস্কৃতি, চাষাবাদ, আচার-আচরণ অর্থাৎ তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের সরকার। এরও বহু পূর্বে ইস্কান্দার মির্জার সময় থেকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ওপর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই অংশ হিসেবে কাপ্তাই বাঁধ। তারা মনে করেন এটা পাকিস্তানি সরকারের পরিকল্পিত চক্রান্ত। [২০]

ক. চোখের সামনে তলিয়ে গেল মহাপুরম গ্রাম

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের কারণে অসংখ্য সমৃদ্ধ জনপদের সাথে মহাপুরম গ্রামও তলিয়ে যায়। যেদিন মহাপুরম গ্রাম ডুবে গেল সেদিন সন্তু লারমা সেখানে ছিলেন। সন্তু লারমা যখন সেই দিনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন যেন তিনি ফিরে গেলেন তার জন্মস্থান মহাপুরমে ঃ

> "গ্রামের অনতিদূরে একটা টিলা, টিলার উপরে ছিল বৌদ্ধবিহার, তার পাশেই খামারের মতো দোতলা বাড়ি, সামনে সোনালি ধানের ক্ষেত বাতাসে ঢেউ খেলে যেতো। পাশেই খেলার মাঠ, তার পাশ দিয়ে সরকারি রাস্তা, রাস্তার পূর্ব দিকে মহাপুরম স্কুল, যেপথে সবসময় চলাচল করেছি আমরা।

[২০] ঐ। আরও সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০২।

ধীরে ধীরে সব ডুবে যাচ্ছে, সমস্ত গ্রাম ডুবে গেল, লোকজন নিজের বাস্তুভিটা, ঘরবাড়ি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে যাচ্ছে, পরিবারগুলো পিঠে বা কাঁধে বোঝা নিয়ে নৌকায় যাচ্ছে অজানার উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র ফেলে যেতে হয়েছিল তাদের। দিনে দিনে পানি বাড়তে লাগলো। পুরো এলাকার আবাদী জমি থেকে শুরু করে বসত ভিটা সব কিছু ডুবে গেল। বাঁধ চালুর বিষয়টি জনগণ অবহিত না থাকায় তারা দ্রুত নিরাপদ স্থানে যেতে পারেনি। সেই কারণে ভেসে গেলো গরু, ছাগল, থালা-বাটিসহ সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস। দ্রুত বৃদ্ধ ও শিশুদের অনত্র সরিয়ে নিতে পারেনি অনেকে। ফলে পরবর্তীতে লেকের পানিতে ভেসে উঠেছিল অসংখ্য শিশু ও বৃদ্ধের লাশ।[২১] এ অবস্থায় আমাদের পরিবারও ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় খাগড়াছড়ি থেকে পানছড়িতে সত্যধন কারবারী পাড়ায় স্থানান্তরিত হই, পরবর্তীতে এ গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে মঞ্জু আদাম। [২২]

খ. সলিল সমাধিস্থ হলো লংগদু থানার পানিছড়া গ্রাম

বাঁধের কারণে লংগদু থানার রাঙা পানিছড়া গ্রাম ডুবে গেলে জনসংহতির অন্যতম নেতা গৌতম চাকমার ৭ ভাই-বোনসহ বাবা নগেন্দ্র লাল চাকমা, মা কৃষ্ণলতা চাকমা নিজ গ্রাম ছেড়ে আরও আধা মাইল পশ্চিমে পাহাড়ের উপরে গিয়ে আশ্রয় নেন। তখন গৌতম ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। সেখানে তার পিতা চাষাবাদের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই পাহাড়ও ডুবে গেলে তারা সেই জায়গা ছাড়তে বাধ্য হন। পূর্বে এই পরিবারের সমতলে ধানের জমি ছিল বিশ কানি অর্থাৎ ষাট একরের উপরে। লংগদুর পাড়েও তাদের ৫ একর জায়গা ছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালের দিকে তাদের সচ্ছলতাটা কমে আসে, কারণ তার বাবাকে দুটো পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। একটা নিজের অন্যটা তার ভাইয়ের। এই অবস্থার মধ্যে পানি এসে তাদের গ্রাম ডুবিয়ে দিয়ে গেল। এই জলমগ্ন এলাকায় তারা তিন বছর কোন রকমে থাকেন। পরে দিঘীনালা থানার কলাখালি নামক জায়গার মাইনিতে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তাদের ২.৫ একর ভূমি ছিল। কিন্তু তা চাষযোগ্য ছিল না। সেই জমিগুলোকে খুব পরিশ্রম করে তার বাবা আবাদযোগ্য করেছিলেন। তারপরেও অনেক সময় তারা না খেয়ে থাকতেন। সেখানে তাদের আত্মীয়-স্বজন ছিল, তারা সহযোগিতা করতেন। [২৩]

১৯৭২ সালে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান সভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রস্তাবিত সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বঞ্চণা প্রসঙ্গে কাপ্তাই বাঁধের উল্লেখ ক'রে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন ঃ [২৪]

---

[২১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

[২২] ঐ

[২৩] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[২৪] সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২, বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক ঃ সরকারী বিবরণী, খন্ড ২ সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৭২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৫।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আজকে তাই কথা প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বদৌলতে আজকে বাতি জ্বলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জল বিদ্যুতের বদৌলতে কল-কারখানা চলছে। অথচ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে যারা দেশকে গড়েছে, পাকিস্তানের শাসকরা তাদেরকে মানুষের মত বাঁচার অধিকার দেয়নি। আমার বক্তব্য হল, আজকে আমরা এই সংবিধানে কিছুই পাইনি।'

চিত্র ৩ ঃ কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে জলমগ্ন এলাকা

গ. কাপ্তাই বাঁধ ও রাজা ত্রিদিব রায়ের অবস্থান

কাপ্তাই বাঁধের কারণে প্রায় এক লক্ষ পার্বত্য অধিবাসী চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি জনগণকে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর বিপুল অংকের টাকা ফেরত চলে যায়। এ রকম সময়ে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় "পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার প্রশংসনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে" এই মর্মে এক প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন। এ প্রতিবেদনে সরকার সম্পর্কে ইতিবাচক বিবরণ থাকায় বিদেশী অনুদানকারীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। পাহাড়িদের ধারণা এ কারণে তিনি প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর সদস্য না হয়েও পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে মেজর উপাধি পেয়েছিলেন।[২৫] চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় সাধারণ আদিবাসীদের কোনো রকম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই কাপ্তাই বাঁধের ব্যাপারে সরকারের সমর্থন পেয়েছেন। জনগণ উদ্বাস্তু হয়েছেন, সর্বশান্ত হয়েছেন। অথচ রাজা ত্রিদিব রায় সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ নিয়েছিলেন। ত্রিদিব রায়ের এই অবস্থানের ব্যাপারে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি জনগণকে সজাগ করেছে।[২৬]

৫. কাপ্তাই বাঁধ-বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম

৫.১. পাহাড়ী ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠা

১৯১৫ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমাজ একটি সংগঠন দাঁড় করায়। এই সংগঠন বেশি দিন কাজ করতে পারেনি। ১৯২৮-৩০ সাল পর্যন্ত তিন বছর মাত্র সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ সরকার এটি দমন করে। ১৯৪৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজকে নিয়ে আবার আন্দোলন শুরু হয়। এটিও ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সক্রিয় থাকার পর ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তীকালে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নিষ্পেষণ ও পাকিস্তানি প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণ এই দুয়ের মধ্যে পড়ে পাহাড়িদের অবস্থা হয়ে পড়ে অত্যন্ত নাজুক। 'স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য জেগে উঠা দরকার' এই বোধ থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সচেতন পাহাড়ি ছাত্ররা 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' পুনর্গঠন করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা।[২৭] ১৯৫৬ সালে অনন্ত বিহারী খীসা ও সুধাকর খীসার নেতৃত্বে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি চট্টগ্রাম জেলার বেয়ালখালী থানার শ্রীপুর নামক স্থানে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশের মাধ্যমে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী হয় এবং ধীরে ধীরে এর পরিধি বাড়তে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতির সমন্বয়ে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি গঠিত হলেও এতে চাকমাদের প্রধান্য ছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন

[২৫] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

[২৬] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[২৭] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২ এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

জারি হলে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। উনিশশো ষাটের দশক থেকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। [২৮]

৫.২. পাহাড়ী ছাত্র সমিতি'র আন্দোলন

১৯৫৬ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ী ছাত্র সমিতিতে জড়িত হন। কাপ্তাই বাঁধ তৈরির পর পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন, কেননা ঐ নেতৃত্ব জীবনবিনাশী বাঁধের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। ১৯৬০ সালের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, মৌলিক গণতন্ত্র চালুকরণ, ১৯৬৩ সালের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন, মুসলমান অনুপ্রবেশ, ষাট হাজার পাহাড়ি জনগণের দেশান্তরের ঘটনা এবং ১৯৬০-এর দশকে চরম খাদ্যাভাব ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। [২৯]

১৯৬৬ সালে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যক্রম ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর পাহাড়ী ছাত্র সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন চাবাই মং মারমা, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিক্রম ত্রিপুরা। রাঙ্গামাটি কলেজের সমসাময়িক ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন গৌতম কুমার চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, উষাতন তালুকদার, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বীরেন কিশোর রোয়াজা প্রমুখ। ছাত্রদের কাজ ছিল পাহাড়ি জনগণ ও ছাত্রদের সংগঠিত করা। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা জনগণকে সংগঠিত করার জন্য গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে যেতেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম দুর্গম এলাকা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসা-যাওয়া তখন খুব কঠিন ছিল। তারপরেও কর্মীরা কখনো হেঁটে, কখনো গাড়িতে যেতেন। সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রদের গিয়ে বোঝাতেন 'আমাদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করতে হবে'। চাকমা জাতি আন্দোলনটা শুরু করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জাতিও এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। এম এন লারমা সকল জাতির ছাত্র-যুবদের পাহাড়ী ছাত্র সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। [৩০]

৫.৩. সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ ঃ পাহাড়ি যুবকদের শিক্ষা গ্রহণে আহ্বান

১৯৬২ সালে পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনে এম এন লারমার নেতৃত্বে কর্মীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা গ্রামে ফিরে যাবেন। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কর্মীরা বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে কমিটি গঠন করতেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করতেন এবং তাদের বুঝিয়ে রাজনীতি সচেতন করতেন। এই কাজগুলো করতে গিয়ে সামন্ত প্রধানদের রোষের মুখে পড়তেন ছাত্ররা। সামন্ত প্রধানরা বাধা দিতেন এবং বলতেন 'নাক টিপলে দুধ বের হবে, এরা কি করবে?' পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা কনভিন্স করার জন্য মুরুব্বীদের ও হেডম্যানদের পায়ে ধরে সালাম করতেন, গল্প করতেন, তারপর আস্তে-ধীরে নিজেদের উদ্দেশ্যের কথা জানাতেন।

[২৮] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

[২৯] শ্রী জিমি, 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৩-২৪।

[৩০] ঐ।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাদের বুঝানো যেত। অর্থাৎ সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তারা সংগঠনকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।[৩১]

ছাত্রদের সাথে এম এন লারমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি তাদের সাথে গঠনমূলক আলোচনা করতেন। ছাত্রদের খোঁজ খবর নিতেন। সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং যে বিষয় নিয়ে কথা বলতেন এক সপ্তাহ পর সেগুলো জানতে চাইতেন। বই পড়ার কথা, ডকুমেন্ট দেখার কথা বলতেন। রাজনীতির চর্চা ও আন্দোলন করার জন্য ভিন্ন দেশের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছাত্রদের কাজে লাগাতে বলতেন– সেটা চীন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের।[৩২]

পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীদের এম এন লারমা বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে উৎসাহিত করতেন। যেমন দর্শন, প্রাণী জগতের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, অর্থনীতির বিকাশ, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সমাজ-তত্ত্ব, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি। পাকিস্তান আমলে সাম্যবাদী বইগুলো নিষিদ্ধ থাকলেও সেগুলো পাওয়া যেত। যেমন মার্কসবাদ-লেলিনবাদের উপর নানান বই, *আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম*, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পত্রিকা *হক কথা*, *চীনের আকাশে লাল তারা*, *দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন*, *ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *রুশ বিপ্লব*, *চীন বিপ্লব*, *ভিয়েতনামের যুদ্ধ*, *আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম* ইত্যাদি বইগুলো পাওয়া যেতো।

১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল এবং কলেজগুলোতে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা শাখা বিস্তারের কাজ জোরদার করেছিলেন। শাখাগুলো গড়ার উদ্যোক্তা ছিলেন মূলত সন্তু লারমা, গৌতম কুমার চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান প্রমুখ। সংগঠনের কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের কাজ শেখানো হয়েছিল যেমন চিঠি লেখা, রেজিস্টার সংরক্ষণ ইত্যাদি। শাখা খোলার কাজটা সহজ ছিল না। পাকিস্তান শাসন আমলে এ বিষয়গুলো নিয়ে গোপনে আলোচনা করতে হতো। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে নেতৃবৃন্দকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হতো। পানছড়ি, দিঘীনালায় গাড়ির রাস্তা ছিল না। রাঙ্গামাটি থেকে পানছড়ি পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার ছিল। টাকা পয়সার অভাবে সব সময় গাড়িতে চড়াও সম্ভব ছিল না। দূরত্ব যতই হোক, বাড়ি থেকে কিছু পয়সা নিয়ে কর্মীরা হেঁটে চলে যেতেন গন্তব্যে। শুধু মেম্বারদের চাঁদা দিয়ে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি চলতো। কর্মীরা খুব কষ্ট করে কাজগুলো করতেন। কর্মীদের জীবন যাপন ছিল খুব সাধারণ। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ পাহাড়ী ছাত্র সমিতির শাখা গঠন করার ব্যাপারে যথেষ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। পানছড়ি, মাইজছড়ি, কাচালঙ্গ, দিঘীনালা হাইস্কুলের শিক্ষকরা সন্তু লারমার পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করে শাখা খুলেছিলেন।[৩৩] সে সময় খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান তিনটি মহকুমার সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব যেহেতু কাপ্তাই বাঁধ প্রতিরোধ করতে পারেননি, তাই তাদের বিপরীতে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল পাহাড়ী ছাত্র সমিতি।

---

[৩১] ঊষাতন তালুকদার এর সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[৩২] হানাচরন ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[৩৩] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

শিক্ষার মাধ্যমেই *পাহাড়ী ছাত্র সমিতি*র কর্মীরা আন্দোলনটা শুরু করেছিলেন। যারা প্রগতিশীল চিন্তাধারার ছিলেন তারা মুষ্টিমেয় হলেও তাদের ভাবনাটা ছিল এরকম যে লড়াইটা শুধু পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে নয়, লড়াই করতে হবে সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও। কারণ সেই সময়টায় সামন্ত নেতৃত্ব পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সাথে আঁতাত করে সাধারণ মানুষকে শোষণ-নিপীড়ন করছিলেন। *পাহাড়ী ছাত্র সমিতি*র কর্মীদের অনুভূতিটা ছিল শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তথা স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলাকাবাসী ও গ্রামের লোকজনের সাথে মিশে যেতে হবে। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসবে এবং এদেরকে গড়ে তোলার মাধ্যমেই সাধারণ জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। কারণ শিক্ষা ছাড়া সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যায়না। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন,

> 'শিক্ষিত না হলে সে নিজেকেও জানবেনা, নিজের সমাজকে ও পৃথিবীকেও জানবেনা। রাজনৈতিক অধিকারের লড়াইয়ের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের পূর্বসূরিরা দেখিয়েছেন শিক্ষা ছাড়া মুক্তি নাই। অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো শিক্ষা। সেভাবেই কর্মীরা এগিয়েছিলেন।'[৩৪]

৬. আন্দোলন দমনে সরকারি তৎপরতা

ব্রিটিশ আমল থেকে পাহাড়ি আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান আমলেও মিথ্যা মামলা দায়ের করে নিরপরাধ লোকদের জেল খাটানো হতো, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উষাতন তালুকদারের মামা নীলময়ী দেওয়ান-এর ঘটনাটি। নীলময়ী দেওয়ান অবস্থাপন্ন নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। তবে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন না। তাকে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে বছরের পর বছর জেলে ভরে রাখা হতো।

রাষ্ট্রীয় উক্ত নীতির জন্য ৪০ দশকের দিকে পাহাড়িদের মনে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। বিশেষ করে টাউট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পাহাড়িরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এর জন্য দায়ী ছিল বাঙালি এবং আদিবাসী ব্যবসায়ী উভয় মহলই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ক্ষোভ চরম রূপ ধারণ করলো। এই সময় "ভারতপন্থী" বলে আদিবাসীদের উপর গোয়েন্দাদের নজরদারী বেড়ে গিয়েছিল। কাপ্তাই বাঁধের পর পাহাড়িদের কাছে সরকারের জাতিসত্তা বিনাশী স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩৫]

শেখ মুজিবকে যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়েছিল তেমনি পাকিস্তান সময়ে অনেক আদিবাসীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল খাটতে হয়েছে বছরের পর বছর ধরে।[৩৬]

---

[৩৪] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

[৩৫] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[৩৬] ঐ, ১১/১১/২০০২।

৬.১. সরকারি সার্কেল অফিসার কর্তৃত্ববাদী আচরণ

পাহাড়ি অঞ্চলে ৬০-এর দশকের সরকারি লোকজন যখন তখন পাহাড়িদের সাথে কর্তৃত্ববাদী আচরণ করতো। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে-কোনো থানায় কর্মরত সার্কেল অফিসার যে-কোনো সময় সেখানকার যে-কোনো স্কুলে গিয়ে পাহাড়ি ছাত্রদের ডেকে নিয়ে যেতো, মেয়েদের দেখতে চাইতো। স্বাধীনচেতা শিক্ষকরা এটা মেনে নিতে পারতেন না। এর বিরোধিতা করার জন্য দীঘিনালা হাইস্কুলের একজন প্রধান শিক্ষককে বিদায় নিতে হয়েছিল। সেদিন স্কুলে প্রধান শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছিলেন, ক্লাস চলাকালীন একজন সার্কেল অফিসার ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইলে প্রধান শিক্ষক তাকে বাধা দেন ও বলেন 'আপনি কে'? এবং তাকে ক্লাসরুম থেকে বের করে দেন। এই ঘটনায় পরে অনেক বাক-বিতন্ডা হয় এবং প্রধান শিক্ষককে চাকরি হারাতে হয়। [৩৭]

৬.২. গোয়েন্দা তৎপরতা

রাঙ্গামাটি রিজার্ভ বাজারে একটি লাইব্রেরি ছিল। মালিক ছিলেন মোখসেদুর রহমান নামে প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সরকারি ইনফরমারের কাজ করতেন, তিনি আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের চিহ্নিত করার জন্য ভাসানীর 'হক কথা' এবং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের নানান বই, 'লাল বই' নিয়ে আসতেন। কারা এ বইগুলো পড়ছে এবং কোন ছাত্র কি করছে এটা সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে তিনি রিপোর্ট করতেন। তিনি পত্রিকার এজেন্ট ছিলেন। এই করতে করতে সাংবাদিক নাম নিলেন। রাঙ্গামাটির যে-কোনো ঘটনা/ অঘটনের পেছনে তার হাত থাকতো। এছাড়াও ডিজিএফআই, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা লাইব্রেরিতে যেসব ছাত্র বই নিতেন তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন। [৩৮]

প্রশাসনের লোকদের নজরদারী সম্পর্কে লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা বলেন,

> "প্রশাসনের লোকেরা সব সময় পাহাড়ি ছেলেদের পিছনে লেগে থাকত। তারা কোথায় যাচ্ছে, কি করছে কড়াকড়ি দৃষ্টিতে ফলো করতো। DIB-রা কয়েকজন পাহাড়ি ছাত্র দেখলেই তাদের পিছু নিত।"[৩৯]

৭. রাজনৈতিক সংগঠন ঃ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন-এর জন্ম

১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নিবর্তনমূলক আইনে এম এন লারমা গ্রেপ্তার হন। তখন বাইরের রাজনীতির সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব নেন সন্তু লারমা। বিশেষ করে নিজ উদ্যোগে তিনি আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং

৩৭ গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।
৩৮ লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।
৩৯ ঐ।

অন্যদেরকেও সচেতন ও সংগঠিত করছিলেন। ১৯৬৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ৪৫জন ছাত্র-কর্মীকে একত্রিত করে তিনি "চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন" গঠন করেছিলেন। [৪০]

এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্তু লারমা জানান যে ছাত্র এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে তাদেরকে সদস্য পদ প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন,

> "পার্টি যেভাবে সদস্যভুক্ত করে সেভাবেই করা হয়েছিল। তবে ৬০ এর দশকে এই প্রক্রিয়াটা এত জোরদার হতে পারে নাই। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য অঞ্চলে রাজনীতি করা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। তাই কিছু কিছু পত্রিকার মাধ্যমে গোপন পদ্ধতিতে সদস্য পদ দেয়া হতো। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনে শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল। জেলা, মহকুমা বা থানাস্তরে কমিটিগুলো তখনও করা যায়নি। কারণ সময়টা খুব দ্রুতগতিতে অতিবাহিত হচ্ছিল। তখন জেলা ছিল একটা, মহকুমা ছিল তিনটা। কোন কোন এলাকায় গোপনে তিন জন বা পাঁচ জনকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল কাজটা চালিয়ে নিয়ে যাবার। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুজন শিক্ষককে ভিতরে ভিতরে দায়িত্ব দেয়া হতো। তারা মূল কাজটা করতেন। তবে ৬০ এর দশকের শেষ পর্যায়ে "রিজিয়ন" কমিটি বা কয়েকটি সেল মিলে একটা আঞ্চলিক কমিটি করা হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ গুছিয়ে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল।"[৪১]

সন্তু লারমা ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস থেকে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এম.এন. লারমা এবং তার নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি শহরে "চিটাগাং ইন্টার হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন" প্রথম একটা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠে। সন্তু লারমা ছিলেন প্রেসিডেন্ট, অনন্ত বিহারী খিসা জেনারেল সেক্রেটারি। এর মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক এবং সমাজ উন্নয়ন। এই সংগঠনটি খাগড়াছড়িতে করার কারণ এখানে কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা ছিল। সন্তু লারমা এখানে মাইজছড়ি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং স্কুলে শিক্ষক সমিতি গঠন করেছিলেন এবং তিনি এই সমিতির সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি এই স্কুলটাকে প্রাইমারি থেকে জুনিয়র, তারপর হাইস্কুলে উন্নীত করেছিলেন। [৪২]

পাহাড়ি জনগণ নানাভাবে শোষিত, বঞ্চিত হতেন। সুদখোর বাঙালি মহাজনদের নিকট পাহাড়ি জনগণ চরমভাবে শোষিত হতেন। অর্থনীতির অন্যান্য উৎপাদন খাতেও পাহাড়ি জনগণ চরমভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। যেমন কাপ্তাই বাঁধের ফলে লক্ষাধিক পাহাড়ি নিজ বাস্তুভিটা ও জমি থেকে উচ্ছেদ হলেও কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাহাড়িদের চাকরি দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে কর্নফুলী পেপার মিলে মাত্র ১০/১১জন পাহাড়িকে নিয়োগ দেয়া হয়। কাপ্তাই হ্রদে জেলেদের পরিসংখ্যান পাকিস্তান আমলের পাওয়া যায় না তবে ১৯৭২-৭৩ সালে লাইসেন্সধারী জেলেদের মধ্যে ৩১% পাহাড়ি,

---

[৪০] ঐ, ১৮/০৮/২০০২।

[৪১] ঐ।

[৪২] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

২৮, ৪৯% বাঙালি হিন্দু ও ৩৯, ৫৫% বাঙালি মুসলমান। কিন্তু ১৯৯০ সালে জেলেদের অনুপাত দাঁড়ায় পাহাড়ি ১% বাঙালি হিন্দু ২৬% ও বাঙালি মুসলমান ৭৩%।[৪৩]

১৯৬২-তে সন্তু লারমা এবং অন্যান্যরা গ্রামে ফিরে গিয়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনগণকে সংঘবদ্ধ করেন। অর্থাৎ যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার কাজটা শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন, 'ছাত্র জীবন শেষ করার পর রাঙ্গামাটিতে গিয়ে সিনিয়র যারা ছিলেন তাদের কয়েকজনকে বলেছিলাম আপনারা আমাদেরকে নেতৃত্ব দেন। আমরা আপনাদের সাথে থাকবো। তারা অনুমতি না দিয়ে পরবর্তীতে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন ফলে নতুন নেতৃত্ব তৈরির কাজ হাতে নিতে হয়েছিল'।[৪৪]

৮. ঐতিহাসিক ৬ দফা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৬৬ সালে স্বাধিকার আন্দোলনের ৬ দফা'য় বাঙালি জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। তারপরেও পাহাড়িরা এটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে পাহাড়িদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা পাবে এ আশা থেকে আদিবাসীরা ৬ দফা আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন,[৪৫]

> "গোটা পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রগতিশীল ব্যক্তিরা। এই আন্দোলনের অবদান হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ এবং বাঙালিকে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এটাতো এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলন; ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে এ আন্দোলন। এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই এই আন্দোলনের পরিবেশটা সৃষ্টি করেছিল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হয়েছে এটা বলা উচিত না। কারণ আওয়ামী লীগ এককালে ছিল একটা সাম্প্রদায়িক দল। আওয়ামী মুসলিম লীগ একটা পর্যায়ে এসে আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে। শেখ মুজিব ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। তিনি প্রথম থেকে মুসলিম লীগে জড়িত ছিলেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে যে জাতীয়তাবাদ, আর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন বা নেতৃত্বের যে জাতীয়তাবাদ তারমধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। এদেশের প্রগতিশীল যে আন্দোলন অর্থাৎ বাঙালিদের মুক্তিসংগ্রাম বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেটা বামপন্থীরা শুরু করেছিলেন। তবে আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে একপর্যায়ে তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হন। যে কারণে হয়তো পাহাড়িদের মত সংখ্যাল্প জাতিসমূহের অধিকারটা সেখানে স্থান পায়নি। অথচ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পাহাড়িদের অধিকারের ঘোষণা থাকার কথা ছিল। কারণ নেতৃত্ব যদি বাম প্রগতিশীল হয় তাহলে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এদেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার লিপিবদ্ধ থাকবে না

[৪৩] জগদীশ চাকমা, 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' আতিকুর রহমান (সম্পাদিত), *পর্বত প্রকাশ (অনুসন্ধান)*, পর্বত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৯-২৮০।

[৪৪] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

[৪৫] ঐ।

কেন? এ কারণে যতদূর জানা যায় ১৯৬৬ সালে পাহাড়ে আদিবাসীদের মধ্যে ৬ দফা আন্দোলন তেমন ব্যাপক কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। ঐ সময়ে পাহাড়িরা নিজেদের সংগঠিত হওয়ার আন্দোলনটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন।”

৯. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ঃ পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক চেতনা

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সারা দেশকেই আলোড়িত ও উদ্বোধিত করে। যদিও পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ সমতলের পরিবেশ থেকে আলাদা তবুও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এখানকার ছাত্র জনতার মধ্যে ব্যাপক রাজনেতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল। এবং পরবর্তীতে ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ আন্দোলনের সময় রাঙ্গামাটি কলেজের বাঙালি ও পাহাড়ি ছাত্ররা মিলিত হয়ে ‘সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করেছিল। এ কমিটির আহবায়ক ছিলেন অশোক মিত্র কারবারী। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাঙ্গামাটিতে মিছিল হয়েছিল। সেটা ছিল পাহাড়ি যুবকদের দ্বিতীয় মিছিল। তখনকার দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের মিছিল-মিটিং ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। কারণ গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিতো তারা রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করছে এবং দারোগা গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যেতো।[৪৬]এই সময় পাকিস্তান সরকার বিরোধী আন্দোলনে সন্তু লারমা পাহাড়ী ছাত্র সমিতির মুখপাত্র ছিলেন। তিনি আন্দোলনের বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন, জনগণ ও ছাত্রদেরকে বোঝাতেন। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন, [৪৭]

> “বর্তমানে যেমন সমতলের রাজনীতির সাথে পাহাড়িরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত পূর্বে তেমন ছিল না। যেমন আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। তবে এর শাখা পার্বত্য অঞ্চলে নেইনি। পাহাড়ে এসে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি করতাম। এর কারণ ছিল বাস্তবতার আলোকে নিজেদেরকে সংগঠিত করে দেশের বৃহত্তর পরিধিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থাকা। তবে এম এন লারমা ১৯৬৮ সালে শিক্ষকতার কাজে চট্টগ্রাম আসেন। রেলওয়ে স্টেশনের কাছের এলাকাটা ছিল বিহারী বাঙালি রেল কর্মচারীদের। তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে যুক্ত থেকে। এ সময় তিনি চট্টগ্রামের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন, নিয়মিত সভা সমিতিতে যোগ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন। ৬৯–এর গণ অভ্যুত্থানে এম এন লারমার নেতৃত্বে শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল। পাহাড়ি ছাত্র যুবকরা এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। এর বিরুদ্ধে পার্বত্য আদিবাসীদের সমর্থন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির টানাপোড়নে পাহাড়িরাও আন্দোলিত ছিল নানা ভাবে। একদিকে ন্যাপ, প্রগতিশীল দল, অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সাথে বিচ্ছিন্নভাবে কথাবার্তা চলছিল এম এন লারমার।”

[৪৬] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।
[৪৭] ঐ।

সেই সময় সন্তু লারমা পড়াশুনা শেষ করে পাহাড়ের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমতলের রাজনীতির সাথেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং শিক্ষকতার জন্য ঢাকা চট্টগ্রাম যাওয়া আসা করতেন।

১৯৬৯ এর ১১ দফা আন্দোলনকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। রাঙ্গামাটি কলেজের শিক্ষক মংচানু চৌধুরী ও মটুলাল চাকমার নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরও বেগবান হয়েছিলো। এই আন্দোলনের পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতি কেন্দ্রিক আলোচনা ঢাকা বা চিটাগাং এ করা হতো এবং ওখানেই সীমাবদ্ধ থাকত। ১১ দফা আন্দোলনের সময় থেকেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল পর্যায়ে রাজনীতির আলোচনার জন্য যেতে পেরেছে। পূর্বে রাজনীতির আলোচনা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন বিয়ে পিকনিকে করা হতো। মানুষ সাহস করে যে সরকারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে পারে এ আন্দোলনের ফলে পাহাড়িরাও তা বুঝতে পেরেছিল এবং এটা তাদের মধ্যে যথেষ্ঠ সচেতনতা ও উৎসাহ যুগিয়েছিলো। [৪৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংকৃতি, কৃষ্টির প্রতি পাকিস্তান সরকার ছিল উদাসীন। পাহাড়িদের প্রতি প্রশাসনের ছিল বিমাতৃসুলভ আচরণ। এছাড়া কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে পাকিস্তান সরকার পাহাড়িদের ডুবিয়ে দিয়েছে। পাহাড়িদের এই বঞ্চনার চিত্রগুলো পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা উপলব্ধি করেছে। এ প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুর বলেন, [৪৯]

> "বাংলাদেশে বাঙালিরা জেগেছে তাদের স্বাধিকার আদায়ের জন্য। আমরা যদি আমাদের অধিকার নিয়ে না আন্দোলন করি তাহলে আমরা টিকে থাকতে পারবনা। এই রকম উপলব্ধি থেকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি জোরদার করা হয়"।

পাহাড়িদের নাগরিক অধিকার সব সময় উপেক্ষা করা হতো। সে সময় বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি হতো। বিশেষ করে দীঘিনালায়। ডাকাতি হলে তা থানার দারোগাকে জানানো হতো। কিন্তু দারোগা আসামি না ধরে প্রথমে টাকা দাবি করতো, তাকে ঘুষ না দিলে যার বাড়িতে ডাকাতি হতো তার যদি অর্থবিত্ত থাকতো, তাকেই আসামী করতো, ভয় দেখাতো। পাড়ার কিছু স্থানীয় মুরুব্বী দালালী করে দারোগাকে টাকা আদায় করে দিতো। এই পীড়াদায়ক ঘটনাগুলোর জন্য পাহাড়ি ছাত্ররা পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী ১১ দফা'র আন্দোলনে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনে সর্বপ্রথম যোগদান করেন। '৬৯-এর গণ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে পাহাড়ি ছাত্রদের একটা প্রভাব পড়েছিল"। [৫০]

১৯৬৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে সুধাসিন্ধু খীসার বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছিল। সেই সুবাদে সুধাসিন্ধু খীসা মংসু নু প্রু চৌধুরীর সাথে গিয়ে জননেতা মওলানা ভাসানীকে পার্বত্য অঞ্চলে আসার আমন্ত্রণ

[৪৮] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ৩০/০১/২০০৩।

[৪৯] বিক্রম ত্রিপুরা সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[৫০] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

জানান এবং ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে পাহাড়িদের সংযুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে ভাবার অনুরোধ জানান। মওলানা ভাসানী রাঙ্গামাটিতে মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিং-এ খুব বেশি পাহাড়ি লোকজনের সমাগম না হওয়ায় তিনি রেগে বলেছিলেন ঃ[৫১]

> "তোমরা সবাই দালাল, মুসলিম লীগের সাথে থাকো। এই জন্যে আইয়ুব খান পার্বত্যাঞ্চলে আসলে অনেক পাহাড়ি লোকের সমাগম ঘটে। বাইরে তোমরা বাম রাজনীতি কর, পার্বত্যাঞ্চলে আসলেই মুসলিম লীগ কর।"

সুধাসিন্ধু খীসা জানান যে, সেই সময় মওলানা ভাসানীকে বুঝানো যাচ্ছিল না যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাম রাজনীতির প্রভাব আছে গোপনে, প্রকাশ্যে এই অঞ্চলে রাজনীতি করার অবস্থা নেই। আর আইয়ুব খান পার্বত্যাঞ্চলে আসলে সরকারি লঞ্চ, গাড়ি, যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া সব ফ্রি ছিল, এতে করে অনেক লোকের সমাগম হতো। আরেকটা ব্যাপার ছিল 'রাজদর্শন একটা পুণ্য কাজ' এই বিশ্বাসেও অনেক লোক আসতো। পাহাড়িরা মুসলিম লীগ কখনও করে না। এখানে রাজনীতির নাম উচ্চারণই করা যেতো না।"[৫২]

৯.১. পাহাড়ি জনগণের ভূমি বেদখল

'পূর্ব পাকিস্তান' কালপর্বে পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালিদের অনুপ্রবেশটাও বেড়ে গিয়েছিল, যা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পূর্বে পাকিস্তান সরকার রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবান মহকুমায় হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব বাঙালি মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এতে পাহাড়িদের ভূমিস্বত্ব হরণ করা হয়। আদিবাসীদের ভূমি দখলের প্রক্রিয়া স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চট্টগ্রাম হতে হাজার হাজার মুসলমান বাঙালি বান্দরবানের লামা, নাক্ষ্যংছড়ি, আলিকদমে এবং ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে রামগড়ের মাটিরাঙা ও তবলছড়িতে প্রবেশ করে নিরাপত্তার কারণে। এদের অনেকে পাহাড়িদের জমি দখল করে নেয়। হাজার হাজার পাহাড়ি পরিবার ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া অন্যান্য কারণে যে-সব পাকিস্তানি শাসনামলে পাহাড়ি ভূমি বেদখল হতো তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) রাষ্ট্র কতৃক জমি অধিগ্রহণ ঃ ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সরকার *পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০* এর সংশোধনীর মাধ্যমে জুম্মদের ভূমি অধিগ্রহণ করার আইন প্রণয়ন করে। এতে সরকারের প্রয়োজনে জুম্ম জনগণ জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

(খ) ভুয়া দলিল তৈরি করে জমি দখল ঃ ১৯৪৭ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বাঙালিদের জমি দখলের প্রধান কৌশল ছিল ভুয়া দলিল তৈরি, যা স্বাধীনতা অর্জনের পরও চলমান ছিল। এক্ষেত্রে বাঙালিরা স্থানীয় হেডম্যানের

[৫১] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[৫২] ঐ।

দস্তখত ও সিলমোহর জাল করে। অনেক পাহাড়ি কৃষক জমি পুনরুদ্ধারের আশায় মামলা করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আবার অনেকে মামলা করতে যেয়ে জীবনের হুমকিতে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগে জমির ফসল অল্প হলে বৎসরের খোরাকির জন্য পাহাড়িরা বাঙালি মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নেয়। এই ঋণই পাহাড়িদের জমি হারানোর আরও একটি কারণ। এই ঋণ অল্প সময়ের জন্য দেওয়া হয় এবং চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেড়ে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয় যেখান থেকে জমি বিক্রয় ছাড়া পাহাড়িরা ফিরে আসতে পারেনা। এভাবেও তারা জমি হারায়। আবার অনেক সময় বাঙালি মহাজনের নিকট থেকে ৫০ টাকা ঋণ নিলে মহাজন ৫০০ টাকা অথবা ১০০ টাকার ঋণ নিলে ১,০০০ টাকা লিখে রাখে। এভাবেও ঋণের বোঝা অধিক হলে পাহাড়িরা জমি বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে যায়।

(গ) জবরদখল ঃ পাহাড়িদের জমি দখলের আরও একটি কৌশল ছিল জবরদখল। এই জবরদখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পাকিস্তান আমল থেকে যা স্বাধীনতার পর এই প্রক্রিয়া বাধাহীন ভাবে চলছে। সবচেয়ে সহজ, স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময় সাপেক্ষ কৌশল জবরদখল।

ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পূর্বে রাজনীতি বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পেত না। সব সময় লাল কালির ভয়ে থাকত। অর্থাৎ সরকারের তালিকাভুক্ত বা কুনজরে পড়ার ভয়ে থাকত। যারা সরকারি চাকরি করে তাদের বলা হত, 'তোমরা ওসবে জড়াবেনা, অসুবিধা আছে।'[৫৩]

১০. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চিন্তা-চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়িরা আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৬০-এর দশকে পাহাড়ি ছাত্রদের সাংগঠনিক তৎপরতা প্রসঙ্গে সুধাসিন্ধু খীসা বলেন ঃ

> "১৯৬৭ তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে নীরুকুমার চাকমা জগন্নাথ হলে ছিলেন। তার কাছে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মাক্সবাদী-লেলিনবাদী'র) মোহাম্মদ তোয়াহা নিয়মিত আসতেন, আলোচনা করতেন। সেই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন, তাদের অধিকাংশই বাম রাজনীতি, বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। এখানে সুদত্ত বিকাশ তংচঙ্গাও জড়িত ছিলেন। আলোচনায় আমি থাকতাম। মোহাম্মদ তোয়াহা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র কায়েম হলে পার্বত্যবাসী মুক্তি পাবে, নচেৎ নয়। ঐ সময় আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে কবে এই সমাজতন্ত্র আসবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জাতিগত নিপীড়ন চলছে এটার বিরুদ্ধে পাহাড়ি ছাত্ররা কি করতে পারে? আপনাদের অবস্থান কি? এর উত্তরে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাল্প জাতিসত্তা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। আর তারা কি করবে? পূর্ব পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র আসলে

[৫৩] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩

পার্বত্য-চট্টগ্রামের সংখ্যাল্প জাতিসত্তা তাদের অধিকার পাবে। বাম নেতাদের রাজনৈতিক আলোচনায় আমরা আকৃষ্ট হতাম, মনে হতো পাহাড়িদের মুক্তি এখানেই নিহিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত যুবক শক্তি এবং তাদের নেতা এম এন লারমাও এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন না। তবে আমাদের মুক্তিটা কীভাবে আসবে সে ব্যাপারে তাদের কাছে স্পষ্ট ধারণা পেতাম না।"[৫৪]

সুধাসিন্ধু খীসা আরও বলেন,

"দেশ বিভাগের সময় বিশ্ব প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হল, যেমন North Atlantic Treaty Organization– NATO ও South East Asian Treaty Organization – SEATO হয়। এ সময় সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। মাও সেতুং এর নেতৃত্বে চীনেও সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। তখন পাকিস্তান সরকার SEATO'র সদস্য পদ নেয়, এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ব্যান্ড করে। পূর্ব পাকিস্তানে যে শাখাটি ছিল, সেটি আর প্রকাশ্যে কাজ করতে পারেনি। আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করে। তখন এরা আওয়ামী লীগের ভিতরে ঢুকে ফ্র্যাকশনাল ওয়ার্ক করে। এর মধ্যে বর্তমান যে যুবলীগ, সেই যুবলীগের বামপন্থীরা বাম রাজনীতির চর্চা করতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম বাম রাজনীতি নিয়ে যান যুবলীগের চারু বিকাশ চাকমা, পরবর্তীতে অনন্ত বিহারী খীসা। এর পরে সুধাসিন্ধু খীসা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তখন কমিউনিস্ট পার্টি যুবলীগের মাধ্যমে কাজ করতো। জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা ও আমি বাম রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম।"[৫৫]

পাহাড়িদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বামপন্থীদের অবস্থান প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন ঃ

"দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি এদেশে যারা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতি করেন তারা পাহাড়িদের জাতীয়তার বিষয়টাকে বরাবরই উপেক্ষা করেছেন। তারা বলতেন গোটা দেশটা যখন পরিবর্তিত হবে তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিবর্তিত হবে। কিন্তু জুম্ম জাতিগুলোর জাতীয় অস্তিত্বের বিষয়টির উত্তরে বামপন্থী রাজনীতিবিদরা অস্পষ্ট ধারনা দিতেন। বলতেন 'দেশ পরিবর্তিত হলে পাহাড়ও পরিবর্তিত হবে, সেখানে শ্রেণি শোষণ ও বঞ্চনা থাকবে না'। কিন্তু এ ব্যাপারে মার্ক্সিষ্ট লিটারেচারে, বিশেষ করে স্ট্যালিনের লেখায়, প্রচুর তথ্য আছে এবং 'জাতি সমস্যা'র ব্যাপারে যথেষ্ঠ দিক-নির্দেশনা আছে। নেতারা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও এদের তত্ত্বকে সামনে তুলে ধরতেন। কিন্তু তাদের শিক্ষাকে 'জাতি প্রশ্নে' বিবেচনা করতেন না। আমরা বুঝতে পারতাম নেতারা আমাদের জন্য ভাবেন, কিছু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের জন্য বাম নেতারা উদ্বিগ্ন নন। সুতরাং নিজেদের মুক্তি নিজেদেরই অর্জন করতে হবে– এই চিন্তাটা এম.এন. লারমাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৬ দফা আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলনও। এই আন্দোলন যে দাবিগুলোর ভিত্তিতে তার কোথাও পাহাড়িদের কথা নেই। ফলে যতদিন যাচ্ছিল আমরা নিজেদেরকে নিয়ে বেশি জড়িত হয়ে পড়ছিলাম।"

---

[৫৪] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[৫৫] ঐ।

এজন্য পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীরা প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতরে গিয়েও কাজ করেছেন। সন্তু লারমা নিজে ১৯৬৬ সালে গ্রামে ঢুকেছেন, মাঝখানের জেল জীবন ছাড়া ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আর বাইরে আসেননি। তিনি জানান ঃ

> " দীঘিনালা স্কুলে ১৯৬৮ ও ৬৯ এ দুটো বছর কাজ করেছি। তারপর পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যেই আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বা রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে আদিবাসীদের অস্তিত্বের সংকট ও লড়াইকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিবেচনায় নিলেন না। তখন আমরা বাধ্য হয়েছি নিজের অস্তিত্বের লড়াই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রায় বন্ধুহীনভাবে একা করতে। প্রগতিশীল আদর্শের মধ্যে আমরা এই লড়াই এর শক্তি পেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি কোন জনগোষ্ঠী যদি অস্তিত্বের ও অধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হতে পারে এবং ভীত না হয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে বিশ্বের কোন শক্তি নাই সেটাকে প্রতিরোধ করে। তার উদাহরণ ভিয়েতনাম, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমাদের দেশের স্বাধীনতা লড়াইয়েও জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীলরা ছিল"। [৫৬]

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাকিস্তান আমলে সমতলের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। কারণ শাসকচক্র ষড়যন্ত্র করে নতুন করে তাকে জেলে পুরে দিতে পারে। তাই যোগাযোগ রক্ষার বেলায়ও তিনি সংযত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাথে তিনি কথা বলেছিলেন তবে তাতে তিনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। পিকিংপন্থী এবং মস্কোপন্থী যারা ছিলেন তাদের কাছে তিনি নিজে না গেলেও জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফলপ্রসূ কিছু আসেনি। এম এন লারমা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বুঝতে পেরেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা তাদের নিজেদেরই করতে হবে। এবং এভাবেই তিনি কর্মীদের সংগঠিত করেছিলেন। বড় কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে একটা কিছু করা যাবে সেই ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ তিনি উপলব্দি করেছিলেন যে মস্কোপন্থী বা পিকিংপন্থী যেটাই বলুক বহুধা বিভক্ত হয়ে আন্দোলনটা নানান দিকে ধাবিত হয়েছিল। পার্বত্য ইস্যুটা বামপন্থীরা যথাযথ ভাবে বিবেচনা করতে পারেন নি।[৫৭]

১১. ১৯৭০-এর নির্বাচনে রাজপরিবার ও আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাজিত ক'রে প্রাদেশিক পরিষদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বিজয়

১৯৭০ এর নির্বাচনে পাহাড়িদের মূল দাবি ছিল ১৯০০ সালের শাসনবিধির পুরোপুরি প্রবর্তন করতে হবে এবং সেটাকে কার্যকর করতে হবে। পৃথক শাসিত অঞ্চলের দাবিটা খুব মাইল্ড ছিল। [৫৮]

---

[৫৬] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১৩/০৮/২০০২।

[৫৭] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১২/১১/২০০২।

[৫৮] ঐ, ১১/১১/২০০২।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাঙ্গামাটিতে চারু বিকাশ চাকমার বাড়িতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিটিং হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন লংগদু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল বিহারী চাকমা, এম এন লারমা, সন্তু লারমা, জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা, তিলক চন্দ্র চাকমা-সহ অন্যান্যরা। মূলত প্রবীণদেরকে নিয়েই এই মিটিং হয়েছিল এবং মিটিংয়ে *নির্বাচন পরিচালনা কমিটি* গঠন করা হয়েছিল। এই *নির্বাচন পরিচালনা কমিটি* একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এই মিটিংয়ে ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন গৌতম কুমার চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, স্নেহময় চাকমা, দেবজ্যোতি চাকমা প্রমুখ। এই মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল নির্বাচনে কারা প্রার্থী হবেন। [৫৯]

সেই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল জাতীয় পরিষদের একটা আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের দুইটা আসন। নির্বাচনের সময় যারা নবীন ছিলেন, তারা তিনটি আসনেই নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি জাতীয় পরিষদে চারু বিকাশ চাকমাকে মনোনয়ন দেয়। প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসনে এম এন লারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনে জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা মনোনয়ন পান। নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ ১৬টি দাবি জানিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

ভারত-বিভক্তির সময় থেকেই চারু বিকাশ চাকমা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭-এর পরে তিনি সাম্যবাদী হতে না পারলেও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এই জন্য তার সাথে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ ছিল। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন,

> "তারা আমাদের পূর্বসূরি ছিলেন। আমরা যারা দেশের কথা ভাবতাম, দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতাম – চারু বিকাশ চাকমা ছিলেন সে পরিমণ্ডলেরই একজন। যদিও পরিণত বয়সে বাস্তবতার কারণে তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত থাকতে পারেন নাই, তবুও সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তাকে আমরা আমাদের সাথে নিয়েছিলাম।" [৬০]

কিন্তু নির্দলীয় *নির্বাচন পরিচালনা কমিটি*-র মনোনয়ন পেলেও চারু বিকাশ চাকমা ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগে যোগ দেন ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হন। তখন দল থেকে এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটি থেকে চারু বিকাশ চাকমাকে বহিষ্কার করা হয়। কারণ, তাদের মতে, আওয়ামী লীগ উগ্র-বাঙালি জাতীয়তাবাদী দল, আর পাহাড়ে আওয়ামী লীগের যারা ছিলেন তারা ছিলেন পাহাড়ি বিদ্বেষী; যেমন ঃ সায়েদুর রহমান ছিলেন একজন পুরোপুরি পাহাড়ি-বিদ্বেষী ব্যক্তি। আর তাদেরকে জেতানো মানে পাহাড়িদের আত্মঘাতী কাজ করা।[৬১]

পাহাড়িরা স্বতন্ত্র প্রার্থী ত্রিদিব রায়ের পক্ষ নিলেন কারণ তুলনামূলকভাবে ত্রিদিব রায় অন্যদের থেকে উদার ছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এন লারমার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ত্রিদিব রায়ের কাকা কুমার কোকনদ্রাক্ষা রায়। আওয়ামী লীগের পক্ষে নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমার বিপরীতে বান্দরবান

---

[৫৯] ঐ।

[৬০] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১৩/০৮/২০০২।

[৬১] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

সার্কেলের চীফ মং শৈ প্রু চৌধুরী স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে ত্রিদিব রায় জিতে যান।[৬২] ২৯৯তম আসনে এম এন লারমা, ৩০০তম আসনে মং শৈ প্রু চৌধুরী জিতে যান।[৬৩] উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এম এন লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিরঙ্কুশ ভোটে বিজয় অর্জন করেছিলেন।[৬৪] দক্ষিণে জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা পরাজিত হলেন।

১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে তাদের মনোনীত প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমা নির্বাচনের আগেই দলবদল করেন, প্রাদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনের প্রার্থী জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা পরাজিত হন, কেবল এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর আসনে জয়যুক্ত হন। তাহলে ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে তাদের প্রাপ্তি কতটুকু কি ছিল সে সম্পর্কে জানতে চাইলে সন্তু লারমা বলেন ঃ[৬৫]

> "আমরা জয়যুক্ত হওয়ার আশা নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি নাই। আমরা দুটো কারণে নেমেছিলাম। একটা হলো ১৯৬০-এর দশকের গোড়া থেকে ১৯৭০-এর দশকের শুরু – এই এক দশক আমরা যে কাজটা করলাম, এতে আমরা কতদূর পর্যন্ত জনগণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছি সেটা জানা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত নির্বাচন যদি করি তবে এটা হবে একটা অভিজ্ঞতা। এর মাধ্যমে পরিচিতি বাড়বে। যদি জয়যুক্ত হতে পারি, তাহলে আমরা নেতৃত্বে গেলাম। নেতৃত্বের জন্যই তো লড়াই করছি। গ্রামে ঢুকতে পারলে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বকে কব্জা করা যাবে। তবে সমস্যা ছিল আইয়ুবী ডেমোক্রেসী নির্বাচন পদ্ধতি। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, চেয়ারম্যান ছিল সামন্ত প্রভুরাই। সুতরাং দুটো দিকে লড়াই করতে হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। একটা হচ্ছে বেসিক ডেমোক্র্যাট যারা ছিল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, চেয়ারম্যান, আরেকটা হলো হেডম্যান, কার্বারী। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা দেখলাম আমরা অনেক ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছি, জনগণ আমাদের গ্রহণ করেছে।"

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব বাংলায় ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে দুটি আসন আওয়ামী লীগ পায়নি। এ থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, প্রথমত, পাহাড়ি আদিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য যে আন্দোলন করছে বহু কাল ধরে তার ওপর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রের একটি সন্দেহের বীজ রোপিত হলো।

---

[৬২] ঐ।

[৬৩] ঐ।

[৬৪] ঐ।

[৬৫] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১৩/০৮/২০০২।

১২. উপসংহার

ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র "উৎপাদনশীল কাজে" ব্যবহারের জন্য নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করে যাকে "নদীশাসন" বলা হয়। আর এই নদী শাসনের বিরূপ প্রভাব পরে নিম্নবর্গের মানুষদের উপর, যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল কাপ্তাই বাঁধ। আর এই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার সংগ্রামের সূত্রপাত হয় যা অভিসন্দর্ভের এই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই কাপ্তাই বাঁধের ফলে ২৪৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়। মোট চাষযোগ্য জমির ৪০% জলমগ্ন হয়। এক লক্ষ লোক আশ্রয়হীন হয়। কিন্তু উদ্বাস্তু পাহাড়ি জনগণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন সামান্য। পুনর্বাসন বা কর্মসংস্থান কিছুই করা হয় নি। তাই বলা যায় কাপ্তাই বাঁধের ফলে তারা সর্বশান্ত হয়েছে। পাহাড়িরা মনে করেন, এটা পাকিস্তানি সরকারের পরিকল্পিত চক্রান্ত। কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আন্দোলনে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির আন্দোলন প্রণিধানযোগ্য। এম এন লারমা পাহাড়ি সকল জাতির ছাত্র-যুবদের পাহাড়ি ছাত্র সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে তার নেতৃত্বে কর্মীরা বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে কমিটি গঠন করতেন, গ্রামে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করতেন এবং তাদের বুঝিয়ে রাজনীতি সচেতন করতেন। প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়ি আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্র নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। অনেক আদিবাসীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল খাটতে হয়েছে বছরের পর বছর। তাছাড়া রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন-এর জন্ম ও বিকাশ এবং জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতির বিকাশ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি এ অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্বত্য অঞ্চল থেকে একটিও আসন পায়নি। এর নেতিবাচক ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নির্বাচিত হবার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য আদিবাসী ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং চাকমা রাজা ও লালডেঙ্গার 'মিজো বাহিনী'র কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তি

১. সূচনা

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য আদিবাসী ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পার্বত্য আদিবাসীদের ভূমিকার কথা। ১৯৭১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন, পাহাড়ি ও বাঙালি সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এম এন লারমার নেতৃত্বে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের বিবরণী এতে রয়েছে। কিন্তু 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে'র যুদ্ধে অবাঙালি পাহাড়িরা কেন আসছেন তা স্থানীয় বাঙালি সংগঠকদের ঠিক বোধগম্য হয়নি, ফলে পাহাড়িদের সম্পর্কে তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েই যায়। এই অবিশ্বাস কেন ও কীভাবে জোরদার হয় তা আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে, পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে এসব সন্দেহ-অবিশ্বাস উপেক্ষা করে কীভাবে পাহাড়িরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণী – বিবৃত হয়েছে মং সার্কেলের রাজা মং প্রু সেইন-সহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের অবদানের ইতিবৃত্ত।

২. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও পাহাড়ি-বাঙালি সম্মিলিত প্রতিরোধ

১১টি সেক্টরের মধ্যে ১ নং সেক্টরের আওতাধীন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রায় ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই পার্বত্যাঞ্চলের ১১টি আদিবাসী জাতিসত্তার প্রায় সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রাঙ্গামাটি ও রামগড় সদরে খোলা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী ট্রেনিং কেন্দ্র। একাত্তরের মার্চে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল ছাত্রনেতা গৌতম দেওয়ান ও সুনীল কান্তি দে-র নেতৃত্বে। ১৬ মার্চ বিকেল ৪টায় রামগড় মহকুমার তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান আহমদ রামগড় শহরের বনবীথি বোর্ডিং-এ আলোচনা সভার আয়োজন করেন, সভায় সভাপতিত্ব করেন মারমা আদিবাসী নেতা মং কংচাই চৌধুরী। উক্ত সভায় আদিবাসী নেতা নকুলচন্দ্র ত্রিপুরার প্রস্তাবমতে কাজী রুহুল আমিনকে আহ্বায়ক এবং সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরাকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের বাঙালি সদস্যদের পাশাপাশি আদিবাসী সদস্যরা হলেন– ডা. ফণীভূষণ ত্রিপুরা, নদেরবাঁশী দেববর্মন, নবকুমার ত্রিপুরা এবং মং মাইহ্লা প্রু চৌধুরী। এই পরিষদের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং এবং অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। ২০ মার্চ মাটিরাঙা থানার অন্তর্গত গুইমারা হাই স্কুল মাঠে

সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মং মাইন্থা প্রু চৌধুরী এবং আলোচনায় অংশ নেন সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা, ডাঃ ফণীভূষণ ত্রিপুরা, সুলতান আহমেদ ও আবুল কাশেম মোলØা। এতে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী ও বাঙালি যোগ দেন।

২৫ মার্চের পর চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, রামগড়সহ বেশকিছু এলাকায় ডিফেন্স লাইনে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে পাঠানোর কাজে আদিবাসী ছাত্র-যুবকেরা নিয়োজিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে এই যুবকেরা ভারতের হরিনা, অম্পিনগর, শলীছড়ী, দেমাগ্রী, উদয়পুর বা আগরতলা ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পার্বত্য এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচ. টি. ইমাম মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তানি বাহিনী রাঙ্গামাটি জেলা সদর দখল করে একাত্তরের ১৫ এপ্রিল। সেদিনই পাকিস্তান বাহিনী প্রতিরোধকারী যোদ্ধা আব্দুস শুক্কুর, এমএম কামাল, শফিকুর রহমান, ইফতেখার, ইলিয়াস, মোঃ মামুন প্রমুখকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২০ এপ্রিল বুড়িঘাট-নানিয়াচর এলাকায় বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুররউফ শহীদ হন। জনাব এইচ. টি. ইমাম তার লেখা *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* গ্রন্থে উলেØখ করেছেন যে, পার্বত্য আদিবাসীদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন বরেন ত্রিপুরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী যতি বিকাশ চাকমা রামগড়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন এবং সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু আচার্য জ্যোতিপাল মহাথেরোকে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ ভ্রাম্যমান দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা যান এবং হরিণার কাছে এক বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান নেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব জনাব এইচ. টি. ইমাম সেখানে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। জ্যোতিপাল মহাথেরো সাগ্রহে সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ-প্রধান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত সফল প্রচার চালিয়েছেন। এতে তিনি ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বেশকিছু চাকমা ও ত্রিপুরা যুবক ছিলেন, এদের মধ্যে কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। চাকমাদের একটা বিরাট অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। মেজর রফিক তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে চাকমাদের কথা উল্লেখ করেছেন। [১]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল জাতি, শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই যুদ্ধ একটি যথার্থ জনযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত এই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি আপামর জনতার পাশাপাশি দেশের আদিবাসী জনগণও পূর্ণমাত্রায় সামিল হন। বাঙালি কৃষকের মতোই আদিবাসী কৃষক ও জুমচাষীরা হাতে অস্ত্র তুলে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবন দিয়েছেন। পঙ্গু হয়েছেন। ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ হারিয়েছেন। অসংখ্য আদিবাসী নারী ধর্ষিত হয়েছেন। শরণার্থী হিসেবে ভারতে

[১] এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬।*

আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত কয়েক লক্ষ ছিলেন আদিবাসী, যাদের অনেকেই অনাহারে-অর্ধাহারে এবং রোগে-শোকে পরিবারের অনেককে সেখানে হারিয়েছেন।

৩. এম এন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়িদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ

যুদ্ধ-পূর্ব সময় থেকে পাহাড়িরা বিভিন্ন বামপন্থী দলের সাথে যেমন, সর্বহারা পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ, মতিয়া গ্রুপে যুক্ত ছিল। যুদ্ধের সূচনালগ্নে পাহাড়ে রাজনৈতিক নেতা এম এন লারমা, সন্তু লারমা এবং রূপায়ন দেওয়ান এর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড়িদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য একটা সভা হয়েছিল। সেই সভায় সিদ্ধান্ত ছিল পাহাড়িরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের করণীয় বিষয়গুলো। ২৬ মার্চ সকালে এম এন লারমার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শতাধিক জুম্ম ছাত্র সারিবদ্ধভাবে লাইন করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও তালিকাভূক্তির জন্য। রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজারের কাছে আব্দুল আলিম একাডেমি মাঠে পাহাড়ি-বাঙালি সবাই তিন দিনের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ, শারীরিক কসরত প্রভৃতির প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। [২]

৪. পাহাড়িদের সম্পর্কে বাঙালিদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস

১৯৭১-এর মার্চ, চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল 'জয়বাংলা'। পার্বত্য এলাকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীও ইতোমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আর ২৫ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে রাঙ্গামাটিস্থ আব্দুল আলীম একাডেমীর মাঠে পাহাড়ি-বাঙালি এক সাথে অস্ত্রসহ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক, নির্বাহী কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের ব্যবস্থাপনায় বি.ডি.আর, পুলিশ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালিরা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বাঙালি পাহাড়িরা একত্রিত হয়ে লঞ্চ থেকে মালামাল বের করে গাড়িতে তুলে দেন। কিন্তু পাহাড়িদেরকে সঙ্গে না নিয়েই রওনা হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধারা। এসময় পাহাড়ি নেতা রূপায়ন দেওয়ান ব্যক্তিগতভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সাথে দেখা করেছিলেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা পাহাড়িদের প্রতি অবিশ্বাস নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দিয়েছিলেন। পার্বত্যাঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনী অগ্রসর হলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ট্রেনিংপ্রাপ্ত আদিবাসীদের বাদ দিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়। তার কারণ জানতে চাইলে বলা হয়েছিল পরে জানানো হবে। এম এন লারমা গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কোন সভাতেও ডাকা হয়নি। এতে পাহাড়িরা কিছুটা দমে গেলেও মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যের যোগান, অস্ত্র বহন করা, তথ্য দেয়া এমনকি অনেককে গহীন অরন্যে লুকিয়ে থাকতেও সহযোগিতা করেছিলেন। তারপরেও বাঙালিরা আদিবাসীদের বিশ্বাস করে নি। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা বলেন,

---

[২] লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

"পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আর্মি, বিডিআর ও পুলিশ যখন চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আমরা তখন তাদের খাদ্যের যোগান, গোলাবারুদ বহন ও পথ দেখিয়েছি। তারপরেও সশস্ত্রভাবে আমরা যুদ্ধে যোগ দিতে পারিনি।"[৩]

তাতিন্দ্রলাল চাকমা মুক্তিযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"আমাদের এই অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল মিটিং ও আমরা যারা এক সঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছিলাম তার মধ্যে স্থায়ী বাঙালিরাও ছিল। তবে কেন আমরা ট্রেনিং নেয়ার পরেও মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারলাম না সেটা পরে বুঝতে পেরেছি।"[৪]

যুদ্ধকালীন আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন,

"মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণীর জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। চাকরিজীবী, আমলা, বামপন্থী, গণতান্ত্রিক শক্তি, ন্যাপ, পূর্ব পাকিস্তানের ইপিআর বা আর্মিতে যারা ছিলেন তারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে ভারতেরও ভূমিকা ছিল। আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে তারা সংগঠিত করতে চেয়েছিল। তবে সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশি। তারা কোন দল বা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন না। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তির কামনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পাহাড়ি সমাজে যারা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তারা মুক্তিযুদ্ধকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলেন। আমি মনে করি, যদি পাহাড়িরা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারত তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানি ইসলামিকরণের যে ষড়যন্ত্র ছিল তা থেকে হয়তো পার্বত্যবাসী মুক্তি পেতো। এই ব্যাপারটা এম এন লারমাও প্রত্যক্ষ করতেন।"[৫]

১৯৭১ পূর্বে বাঙালিরা শাসন পরিচালনায় নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল না এবং পাহাড়িদের প্রতিযোগীও ছিল না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছিল পাহাড়িদের প্রত্যক্ষ শত্রু।[৬]

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে সে সময় পাহাড়ি ছাত্র-যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। তারা আওয়ামী লীগের তৎকালীন জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, সব ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তবলছড়ির শাহা স্কুলের মাঠে পুলিশ প্রশিক্ষণের জন্য বেশ কিছু পাহাড়ি যুবককে নিয়ে যান এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচ. টি. ইমাম এবং আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর রহমান এতদসংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তারা হঠাৎ করে প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেন এবং

[৩] ঐ, ১০/১১/২০০২।
[৪] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ৬১।
[৫] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১৮/০৮/২০০২।
[৬] ঐ, ১৮/০৮/২০০২।

পরে অবহিত করবেন মর্মে জানান। কিন্তু পারর্তীতে পাহাড়িদের আর প্রশিক্ষণে ডাকা হয়নি। শুধু বাঙালিদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল। [৭] এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ৭১-এর রাঙ্গামাটি কলেজের অধ্যাপক দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান চাকমা, তার ভাই ডক্টর কনিস্ক, কুমার কোকনদ্রাক্ষা রায়ের (ত্রিদিব রায়ের চাচা) নেতৃত্বে কয়েকশ যুবক মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য আগরতলায় গিয়েছিলেন। সেখানে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে তো দেয়নি বরং কুমার কোকনদ্রাক্ষা রায়কে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে তারা কোন রকমে পালিয়ে আসেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধা মনোনীত করার দায়িত্বে নিয়োজিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ কর্মীর বাইরে কাউকে যুদ্ধে যেতে দেয়নি। আওয়ামী লীগের এ নীতির কারণে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এমনও অভিযোগ আছে যে, বৈষম্যমূলক আচরণের কারণেও যুদ্ধে না গিয়ে অনেকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে ফিরে আসে। এই সব ঘটনার ফলে আওয়ামীদের ষড়যন্ত্র পাহাড়িদের কাছে পরিষ্কার হয়, তারা বুঝতে পারে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ইচ্ছা করেই পাহাড়িদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দিচ্ছে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পাহাড়ি জাতিগুলো যেমন ঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা বিশেষ করে চাকমাদের প্রতি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দৃষ্টি ছিল সন্দেহের।[৮]

ত্রিদিব রায় সব সময় পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনামলে ১৯৩৩ সালে রাজা ত্রিদিব রায়ের জন্ম পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটির রাজবাড়িতে। তিনি নলীনাক্ষ রায়ের পুত্র ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২ মে তিনি রাজপরিবারের চাকমা সার্কেলের ৫০তম রাজা হিসেবে মনোনীত হন। ত্রিদিব রায় ছিলেন মুসলিম লীগের সমর্থক। তার এ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১-এ ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি পাকিস্তানেই থাকবেন। এই জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে মন্ত্রী পরিষদে লাইফ টাইম ফেডারেল মিনিস্টার করেছিল। প্রায় ৪ দশক ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে রাষ্ট্রের অনুগত থেকে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে মাইনোরিটি এ্যাফেয়ার্স এবং ট্যুরিজম ক্যাবিনেটের মন্ত্রী করেছিলেন। বাংলাদেশের জন্মের পর ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ আবেদন করলে সেই বিষয়ে বিরোধিতা করার জন্য পাকিস্তান সরকার ত্রিদিব রায়-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল জাতিসংঘে– যাতে বাংলাদেশ জাতিসংঘে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে। অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমান নিউইয়র্কে রাজমাতা বিনতা রায় (ত্রিদিব রায়ের মা)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘের সদস্য পদ পাওয়ার জন্য সেই সাথে ত্রিদিব রায়কে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। তিনি তার মায়ের প্রস্তাব বা অনুনয় প্রত্যাখান করেছিলেন। দেখা যায় ত্রিদিব রায় তার মা-এর থেকে পাকিস্তানের প্রতি বেশি অনুগত ছিলেন। ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে ফিরে গেলে রাওয়ালপিন্ডিতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাকে একজন হিরো হিসেবে সংবর্ধনা দিয়েছিল। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ছাড়া কিন্তু সাধারণ জনগোষ্ঠী ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে। ব্যক্তির ভূমিকাকে কেন্দ্র করে চাকমা এবং সমগ্র পাহাড়ি আদিবাসীকে সন্দেহের চোখে দেখে

---

[৭] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[৮] লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা ও রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২ ও ০৫/০২/২০০৩। আরও দেখুন Nasir Uddin, 'Living on the margin: the positioning of the 'Khumi' within the sociopolitical and ethnic history of the Chittagong Hill Tracts', *Asian Ethnicity*, Vol. 9, No.1, February 2008, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪-৪৫।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে সক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের সাথে যারা সরাসরি যুক্ত ছিলেন তারা প্রথম দিকেই মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন[৯]।

৫. পাকিস্তানি বাহিনী ও মিজোবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ

১৯৭১ সালের মার্চে যুদ্ধকালীন অবস্থায় জেনারেল জিয়ার উপর মিজোবাহিনীর অতর্কিত হামলা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালির সন্দেহ বাড়াতে সহায়তা করেছিল। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীসহ মহালছড়িতে গিয়ে ডাকবাংলোয় অবস্থান নিয়েছিলেন। তার সাথে আরও ছিলেন ডক্টর নীলি চৌধুরীর বড় ভাই এবং প্রভুদান মারমা। এ সময় স্থানীয় পাহাড়ি জনগণ গ্রাম থেকে ৫০/৬০ বস্তা চাল সংগ্রহ করে তাদের খাবারের জোগানও দিয়েছিলেন। তারা সেখানে ১৫ দিন অবস্থানের পর পূর্বদিক থেকে মিজোরা এবং এর পরপরই দক্ষিণ দিক থেকে অর্থাৎ রাঙ্গামাটি থেকে পাকিস্তানি বাহিনী জেনারেল জিয়ার দলের উপর আক্রমণ করলে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরপর জিয়াউর রহমান সঙ্গীদের নিয়ে লংগদু মহালছড়ি থেকে ফেনী ও তবলছড়ি হয়ে পশ্চিমে রামগড়ের দিক দিয়ে ভারতে চলে যান। এ সময় জিয়াউর রহমানের সাথে প্রভুধন, পঙ্কজ দেওয়ান ও কয়েকজন চাকমা যুবকসহ প্রায় ৬০/৬২জন ছিলেন। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মী মৃগংগা শেখর চাকমা জিয়াউর রহমানকে কাঁধে করে চেঙ্গি নদী পার করেছিলেন। (১৯৭৮ সালে মৃগংগা শেখর চাকমা শান্তিবাহিনীতে যুক্ত থাকাকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। সেসময় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয় ও পরবর্তীতে তার পায়ের গোড়ালি কেটে দেওয়া হয় এবং পঙ্গু অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন)। [১০] জিয়াউর রহমান তার সাথে যাওয়া পাহাড়িদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেন নি। কারণ তিনি ধরে নিয়েছিলেন পাহাড়িদের আমন্ত্রণেই মিজোবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। এ সময় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা একটি সংকটপূর্ণ অবস্থায় পড়েছিলেন। একদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ অন্যদিকে বাঙালিদের অবিশ্বাস। মিজোবাহিনী আক্রমণ প্রসঙ্গে সুধাসিন্ধু খীসা বলেন ঃ

> “৭০ এর দশকের শুরুতে পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় লংগদু উপজেলা সদরে পাহাড়ের পশ্চিম পাশে কয়েকশ মিজো সশস্ত্র ট্রেনিং নিয়েছিল। বাঘাইছড়ি উপজেলার সীমান্ত এলাকায় যেখানে পাংখোরা থাকতো সেখানেই সশস্ত্র মিজোরা অবস্থান নেয়। এরাই মিজোরামের চাকমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এরা মর্টার, রকেট চালনায় দক্ষ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিজোরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষে কাজ করে। তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় লংগদুর দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং পাহাড়িদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে মোরগ, মুরগির ডিম, তেল যা পেতো সব লুট করে নিয়ে যেত”। [১১]

---

[৯] লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার ১০/১১/২০০২

[১০] সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩ ও ১১/১১/২০০২।

[১১] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩, ৩০/০১/২০০৩।

এই মিজোবাহিনীদের নিয়ে জিয়াউর রহমান ও আদিবাসীদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ায় মুক্তিকামী আদিবাসী যুবকদের জিয়াউর রহমান বাদ দিয়েছিলেন। সুধাসিন্ধু খীসা ৭১-এর পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ঢাকা ইউনিটের সভাপতি ছিলেন। তিনি ৯ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে যান এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সহযোগিতা করেছিলেন। [১২] প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই আদিবাসীরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। [১৩] রাজ পরিবারের সদস্য কুমার কোকনাদ্রাক্ষ রায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [১৪] মানিকছড়ির রাজা মং প্রু সেইন অনেক পাহাড়ি যুবকসহ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। [১৫] সাক্ষাৎকার এবং দ্বৈতয়িক উৎস পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার বিবরণ নীচে তুলে ধরা হলো ঃ

ক. মুক্তিযোদ্ধা রণবিক্রম ত্রিপুরা

মুক্তিযোদ্ধা রণবিক্রম ত্রিপুরা ১৯৪৯ সালে খাগড়াছড়ির রামগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা চাকরিজীবী এবং মাতা নন্দ ত্রিপুরা গৃহিণী। দুই ভাই আর দুই বোনের মধ্যে বড় সম্পা ত্রিপুরা। ছোট ভাই নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এবং ছোট কৃষ্ণা ত্রিপুরা। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। রাঙ্গামাটিতে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। রণবিক্রম ত্রিপুরা সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ [১৬]

> "যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের পুরো পরিবার ভারতে চলে যায়। আমি ২৫ মার্চ রাত থেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং পরবর্তীতে শুনতে পাই বাবা ভারতের আগরতলায় গিয়ে বাংলাদেশ মিশনে এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ছোট ভাই নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা প্রথম পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। ভারতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য গঠিত ইয়ুথ ক্যাম্পগুলোতে আদিবাসী ছেলেদেরকে সংগঠিত করেছে। পরবর্তীতে সেও যোগ দেয় প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে। তবে যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না। যুদ্ধের পরে দেখা হয়েছে, স্বাধীন দেশে।"

রণবিক্রম ত্রিপুরা ১৯৬৮তে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭০ সালে ছাত্র রাজনীতি দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান আমলে রণবিক্রম ত্রিপুরা জেল খেটেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ [১৭]

---

[১২] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[১৩] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩।

[১৪] সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, মল্লিকপুর, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

[১৫] বিপ্লব চাকমা, *'পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে'*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৬ ও ১৩।

[১৬] মেসবাহ কামাল ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, 'মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীর ভূমিকা', প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ঃ ২১৭-২১৯।

[১৭] রণবিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৩/০২/২০০৯।

"১৯৬৮, ৬৯ এবং ৭০ সালে প্রায়ই জেলে যেতাম, কারণ পাকিস্তানি এসডিও-র গাড়ির গ্লাসে ঢিল মেরে ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। ২১ ফেব্রুয়ারিতে আমরা খালি পায়ে হেঁটে শহীদ মিনারে যাচ্ছি আর তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা আমাদের নীতিবোধে আঘাত করেছিল। পুলিশ ধরে নিয়ে ৫ দিন জেলে রেখেছিল।"

মুক্তিযুদ্ধের সময় রণবিক্রম ত্রিপুরার বয়স ছিল ২২ বছর। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র থাকাকালীন তিনি সরাসরি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, ছাত্রলীগ করতেন এবং সব ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ [১৮]

"বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমার হৃদয়কে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তবলছড়ি বাজারে বড় রেডিওতে ফুল ভলিউমে আমরা জেলা সংগ্রাম পরিষদের সবাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনছিলাম। গৌতম দেওয়ান, মাহু, কামাল, আবুল কালাম, মনিষ দেওয়ান, অনীল তঞ্চঙ্গ্যা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই ছিলেন। শুনতে শুনতে আমরা সবাই উত্তেজিত হচ্ছিলাম আর মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা আদিবাসীরা ছাত্রলীগ করতাম দেখে অনেকে হাসত। এই আন্দোলন মূলত ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন। কিন্তু আমরা তো বাঙালি নই! আমাদের মাতৃভাষা তো বাংলা নয়! তখন উপলব্ধি করেছিলাম পশ্চিমাদের দ্বারা আমরা শোষিত হচ্ছি এবং আমার সাথে যারা দল করতেন গৌতম দেওয়ান, মনিষ দেওয়ান; সবাই স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করেছিলাম। তখন আলোচনায় শুনতাম, কাগজের দাম পাকিস্তানে দুই পয়সা, এখানে চার আনা। আনা বলতে ১৬ আনায় ১ টাকা বুঝাত। এভাবে বলত আমরা চার আনায় কিনেছি, পাকিস্তানে দুই পয়সায় বিক্রি হচ্ছে। আমাদের আদমজী জুট মিলের পাট নিয়ে পাকিস্তানে প্রক্রিয়াজাত করা হতো। এরপর সেটা বিদেশে চলে যেত। আমাদের ঠকিয়ে তারা বেশি টাকা নিয়ে যায়। এভাবে আমাদের বুঝিয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের কাছ থেকে যদি বাঙালিরা ন্যায্য অধিকার পায় তবে আমরা চাকমা-মারমা-ত্রিপুরাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যারা আছি তারাও স্বাধিকার আন্দোলনের সুফল পাব। এজন্য এটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন হলেও আমাদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।"

রণবিক্রম ত্রিপুরা যুদ্ধে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেন ঃ [১৯]

"২৫ মার্চ রাতেই বেরিয়ে পড়েছি। রাঙ্গামাটিতে যুদ্ধ শুরুর আগেই ট্রেনিং নিয়েছি রাইফেলস ক্লাবে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন এমনকি ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আগে থেকেই ট্রেনিং চলছিল। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ থেকে বলা হয়েছিল যে, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমরা দলভুক্ত হয়ে ২৫ মার্চ রাতে প্রথমে ঘাঘরা নামক একটা জায়গায় ব্যারিকেড দেই। তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসি ছিলেন এইচ. টি. ইমাম। তিনিও সরাসরি আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মূলত ওনার নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণায় আমরা যারা ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের লোকজন ২৫ মার্চ রাতে পুলিশ বাহিনীর সাথে রাস্তায় রাস্তায় গাছ কেটে ব্যারিকেড দিয়েছি। সাধারণত ইপিআর'দের সংগঠিত করেছি। তখন ডিসি, এসপি সম্পৃক্ত হওয়ায় প্রশাসনও আমাদের সহযোগিতা করে। সুবিলাস চাকমা, সুবোধন চাকমা, মনিষ দেওয়ান, প্রভুধন চৌধুরী

[১৮] ঐ।
[১৯] ঐ।

মারমা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। প্রভুধন চৌধুরী একজন দারুণ যোদ্ধা। উনি চন্দ্রঘোনা মিশন এলাকায় আমার সাথে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করেছেন। সে সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন জনাব সাইদুর রহমান; তবে উনি আদিবাসীদের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। আমরা নিজেরাই নেতৃত্ব গড়ে নিয়েছি।”

রণবিক্রম ত্রিপুরা আরও বলেন ঃ [২০]

> “জনসংহতি সমিতির নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার দলের লোকজন নিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। ২৬-২৭ শে মার্চে উনি সক্রিয়ভাবে আমাদের সাথে কাজ করেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা তুলে এমনকি মুরগী, মাছ, চাল-ডাল নিয়ে রান্না করে মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রন্ট-লাইনে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি নিজেও বহুবার পৌঁছে দিয়েছি।”

ট্রেনিং প্রসঙ্গে রণবিক্রম ত্রিপুরা বলেন ঃ [২১]

> “রামগড় পতন হলো, সম্ভবত এপ্রিলের শেষদিকে, ভারতে চলে গেলাম। ভারতে বিএসএফ-এর ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং করি। ১৫ থেকে ২১ দিনের ট্রেনিং। এমনিতে রাইফেল, স্টেন, কার্বাইন চালাতে জানতাম। মর্টার ট্রেনিং এবং মেশিনগানের উপর ট্রেনিং নিলাম। ৮১ এম.এম ট্রেনিং করলাম। আমরা বাংলাদেশের কয়েকজন ছেলে, তাদের মধ্যে মনসুর নামে একজন, আমরা ‘রেডি টু ফায়ার’-এ রেকর্ড ব্রেক করলাম। ‘রেডি টু ফায়ার’-এ একটা হাতিয়ারকে ফায়ার করার জন্য একজন ইন্ডিয়ান আর্মি যত সময় নিত তার চেয়ে কয়েক সেকেন্ড আগে আমরা এটা করলাম। ইন্ডিয়ান রেকর্ড ব্রেক করার পরে ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং বললেন, তোমরা ইন্ডিয়ান রেকর্ড ব্রেক করেছো, এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক! এরপরে রামগড়ে ভিতরে ঢুকে ওভারহেড শেলিং করলাম। এরপর মানিকছড়ির ভিকরসলা, টিনটহরি, গাড়িটানা এসব জায়গায় ওভারহেড শেলিং করলাম। পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ঐ অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করেছি। এরপরে লিডারশীপ ট্রেনিংয়ের জন্য দেরাদুনে চলে যাই। ওখানে নেতারা ভাষণ দিয়েছিলেন, যেমন তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি প্রমুখ।”

প্রশিক্ষক সুবেদার ঘটাক সিং ছিলেন খুব পারদর্শী। ট্রেনিংয়ে উনি বলতেন, “সেলফ্ ডিফেন্স, দেন ফাইট।” রণবিক্রম বলেন, “ঘটাক সিংয়ের এই কথাটা যুদ্ধের সময় কাজে লেগেছে।” দেরাদুনের টেনডুয়াতে ট্রেনিং হয়েছিল। রণবিক্রম ত্রিপুরার নেতৃত্বে প্রথম অপারেশন হয়েছে যজ্ঞছলায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ [২২]

> “আমরা ক্যাম্পে ছিলাম। ক্যাম্পগুলো খানিকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। ওয়ারলেস-এর মাধ্যমে জেনেছি পাঞ্জাবী আসছে; সাথে সাথে পজিশনে চলে গেছি। তারা আমাদের দেখতে পেয়ে ফায়ার করেছে। আমাদের সতর্ক

---

২০ ঐ।

২১ মেসবাহ কামাল ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, ‘মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীর ভূমিকা’, প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ঃ ২২০-২২১।

২২ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২১-২২২।

করার জন্য গার্ড দিচ্ছিল রামগড়ের কালাচাঁন ত্রিপুরা নামে একজন খুব বুদ্ধিদীপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। যজ্ঞছলায় হানাদার বাহিনীর প্রায় ৩০-৪০জনের একটা দল ছিল, আমরা ছিলাম ১৬জন। ৭জন পাঞ্জাবী মেরেছিলাম। সেখানে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা ছিল ত্রিপুরা। ১৬জনের মধ্যে প্রায় ১১জন ত্রিপুরা। বাকিরা মারমা ও বাঙালি, নামগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। বরুন নামে একজন বাঙালি হিন্দু ছেলে ছিল। একজন মারমা ছিল তুখোড় যোদ্ধা, ছেলেটার নাম ভুলে গেছি। এখন সে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। আমাদের প্রথম অপারেশনে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। ওখান থেকে আমরা পাক বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলাম। এরকম অসংখ্য ছোট ছোট অপারেশন আছে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম। এটা ছিল ১ নং সেক্টর। যজ্ঞছলায় আমাদের প্লাটুন কমান্ডার ছিল না। আমরা গ্রুপগুলোকে কমান্ড করতাম। আমি আসলে ছাত্রলীগ করতাম, আবার মুজিব বাহিনীর সাথেও সম্পৃক্ত ছিলাম। যখন যজ্ঞছলা অপারেশন হয় তখন আমি বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্সের ডিসট্রিক্ট অর্গানাইজার। রামগড় এবং মহালছড়িতে অভিযান করেছি। গাড়ীটানায়, ডিগরুসুলায় এবং পাতাছড়া আক্রমণ প্রতিহত করেছি। আমরা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছি। এই গেরিলা যুদ্ধ করতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। সফল হয়েছি কারণ জঙ্গলটা আমাদের চেনা ছিল এবং জঙ্গলে কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে সেই কৌশল জেনেছিলাম; কিন্তু পাকিস্তানিরা সেটা জানে না।”

রণবিক্রম ত্রিপুরা আনুমানিক প্রায় ত্রিশের মত অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। তার বড় এবং সর্বশেষ অপারেশন ছিল ৮ ডিসেম্বরের রামগড় অপারেশন। কিন্তু এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতীয় বাহিনীর সাথে যৌথভাবে করা অপারেশন। এই প্রসঙ্গে রণবিক্রম ত্রিপুরা বলেন ঃ [২৩]

> “এটার মূল কৃতিত্ব ভারতীয় বাহিনীর হয়ে যায়। মূল অপারেশন ছিল ‘বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স’ (BLF)-এর যুগ্মছড়াতে, অপারেশনটি ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। BLF এর লাস্ট ইনডাকশান ছিল চট্টগ্রামের বাঁশখালি, সাতকানিয়া, কক্সবাজার, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান। নভেম্বরের শেষের দিকে পাঁচশ’রও বেশি মুক্তিযোদ্ধা ভারতের বৈষ্টপুর থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। আমাদের লোকজন তাদেরকে গাইড করে নিয়ে আসে এবং ৩০-৩৫ মাইল রাস্তা হেঁটে তারা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার নেতৃত্বে ছিল প্রায় ১৫০জন। তাদেরকে আমি বলেছিলাম, আপনারা পালা করে ঘুমাবেন কেননা পাহারা দিতে হবে। তারা ডিফেন্সে আলাদা জায়গায় ছিলেন। সবাই ঘুমিয়ে গেছেন, হঠাৎ আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। যুগ্মছড়া থেকে গাড়িটানা প্রায় দেড় মাইল দূর থেকে। গুলির আওয়াজ শুনে জেগে গিয়ে তারা ফায়ার করেছেন। ঘুম থেকে উঠে এলোপাথাড়ি গুলি! যেহেতু ঐ অঞ্চলটা মুক্তিযোদ্ধাদের নখদর্পণে ছিল ফলে দ্রুত তারা কাউন্টার আক্রমণ করে। আমাদের দলে ১৫০-এর মত ছিল। আর পাকিস্তানিরা ছিল অনেক বেশি। পাকিস্তানিরা পিছন থেকে আক্রমণ করায় আমাদের দেরাদুন থেকে ট্রেনিং করা দুজন যোদ্ধা শহীদ হলেন, আর আমাদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর ৭-৮জন নিহত হয়েছিল। এরপর রকেট লঞ্চার, মেশিনগান ইত্যাদি ফেলে পাঞ্জাবীরা পালিয়ে যায়। ঐগুলো সব কালেকশন করে আবার ডিফেন্সের জন্য পজিশন নিলাম। এরপর আমরা সহযাদ্ধাদেরকে খুঁজতে শুরু করলাম, কে কোথায় আছেন। পরে শহীদদের লাশগুলো তাদের দেশের বাড়ি

---

[২৩] ঐ।

রাউজান পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি, রাস্তার মধ্যেই কবর দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি। এতবড় একটা অপারেশনে আমরা পাল্টা আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু দুজন সহযোদ্ধা হারালাম। এটা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

সোনাইপুর ব্রিজ অপারেশন ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে রণবিক্রম ত্রিপুরা বলেন ঃ [২৪]

“সোনাইপুর ব্রিজটি আমরা উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ব্রিজটি আর্মি ক্যাম্পের পাশে ভারতের বর্ডার বরাবর ছিল। রামগড়ের যেটা চা-বাগানের ক্যাম্প নামে পরিচিত ছিল, সেখানে পাঞ্জাবীরা সব সময় ঐ ব্রিজটার পাহারায় থাকত। একদিন আমি, লীলামোহন ত্রিপুরা এবং আর একজন বাঙালি ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রিজের খুব কাছাকাছি গিয়েও সার্চলাইটের জন্য পৌঁছাতে পারিনি। সার্চলাইট দিয়ে ওরা আমাদের দেখার চেষ্টা করছিল এবং ওদিক থেকে ব্রাশফায়ার করলেই আমরা মারা যাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে লাইট আমাদের উপর দিয়ে চলে যায়, তখন আমরা কোনক্রমে পানির ওপর ভাসতে ভাসতে ফিরে আসি।”

রণবিক্রম ত্রিপুরা আরও জানান ঃ [২৫]

“ভারতীয় বাহিনী যেমন সহযোগিতা করেছে অনুরূপভাবে তিব্বতি বাহিনীও আমাদের সহযোগিতা করেছে। দেরাদুনের টানডুয়াতে তিব্বতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হচ্ছিল। তারা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। আমাদের সাথে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। মেজর জেনারেল চিংওয়ানের নেতৃত্বে প্রচুর তিব্বতী সৈন্য আসে। তারা আমাদের দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছেন। যুদ্ধে তিব্বতী অনেক সৈন্য আহত হয়েছেন। গুলি লেগে মারা গেছে কেউ কেউ; আমার জানা মতে সাঁতার জানেননা বলে নৌকা ডুবিতেও মারা গেছেন। তিব্বতীয়দের মধ্যে ক্যাপ্টেন নোয়ান বিক-কে আমি দেরাদুনে দেখেছিলাম। স্বাধীনতার পরে রাঙ্গামাটিতে এসেছিলেন। এই তিব্বতীদের নাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আসা উচিত। তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান জানানো উচিত।”

রাজাকারদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ [২৬]

“আমার এলাকা রামগড়ে অনেক রাজাকার ছিল। এরা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ছিল। এই রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারগুলোর অনেক ক্ষতি করেছে, অনেককে হত্যা করেছে। যেসব ত্রিপুরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের বাড়িঘর, আসবাবপত্র, ঘরের খুঁটি, সব নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের রাঙ্গামাটিতে যে বাড়ি ছিল তার সব টিন খুলে রাজাকাররা মসজিদে দিয়েছিল। রাজাকার ও পাঞ্জাবী মিলে বাইলাছড়ি-সহ নানান জায়গায় নারীধর্ষণ করেছে।”

---

[২৪] রণবিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৩/০২/২০০৯।
[২৫] ঐ।
[২৬] ঐ।

তিনি আরও বলেন ঃ [২৭]

"বীরাঙ্গনাদেরকে আমরা সম্মান দিতে জানি না। আমরা দুই লক্ষ মা-বোনের লাঞ্ছনার কথা বলি। আসলে আরও অনেক বেশি মা-বোন লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তাদের আমরা মূল্যায়ন করিনি। সামাজিকতার জন্য কেউ প্রকাশ করেননি, স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। সাবরুমে নারী নির্যাতনের বহু ঘটনা ঘটেছে। লাস্ট অপারেশন ৮ ডিসেম্বরে যৌথ বাহিনীসহ আমরা রামগড় শত্রুমুক্ত করি। রামগড় দখল করে মেয়েদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম। আমরা আসার আগেই তারা মেয়েদেরকে সরিয়ে ফেলেছিল, কয়েকজনকে মেরে ফেলেছিল। ঐ মেয়েদের কি অবস্থা হয়েছিল জানতে পারিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার এলাকায় কেউ বীরাঙ্গনার মর্যাদা পাননি।"

রণবিক্রম ত্রিপুরা আরও বলেন ঃ [২৮]

"শুধুই সেনাবাহিনী কি খেতাব পাওয়ার যোগ্য? আরও অনেকেই অসীম সাহসিকতায় যুদ্ধ করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সোনাইপুর ব্রিজটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, যদি মারা যেতাম তবে কি বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব পেতাম? সারা বাংলাদেশে অনেকেই বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতীক খেতাব পাবার যোগ্যতা দেখিয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ [২৯]

"অস্ত্র হাতে হয়তো যুদ্ধ করেননি অনেকেই, কিন্তু যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তারাও মুক্তিযোদ্ধা। সব এলাকাতেই নারী-মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন যারা আমাদের ভাত রেধে খাইয়েছেন। গাড়িটানার সুরেন্দ্র মাস্টারের স্ত্রী আমাদের সাথে নয় মাস ধরে সংগ্রাম করেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি পিঠের মধ্যে বাঁশের থ্রুবোন বেঁধে নিতেন এবং থ্রুবোনের ভেতর করে কার্বাইন এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে নিয়ে যেতেন। ধরা পড়ার ভয়, মরণের ভয়, কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। যে মানুষ পিঠে করে, কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে গ্রেনেড নিয়ে গেছে, কার্বাইন নিয়ে গেছেন - তিনি অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা। তাকে সংবর্ধনা দেওয়া উচিত ছিল। যারা সবসময় আমাদের মালপত্র, অস্ত্র ও গোলাবারুদ এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে বহন করে নিয়ে গেছেন - তারাও মুক্তিযোদ্ধা। আবার অনেকে পথে পাঞ্জাবী বা রাজাকার আছে কিনা এসব তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। নাকপা, পাতাছড়া, বাটনাতলী, ডাইনছড়ি - এসব এলাকায় ত্রিপুরা জাতির বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড করতেন। তারা অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা।"

[২৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২৭।
[28] রণবিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৩/০২/২০০৯।
[২৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২৮ ।

রণবিক্রম ত্রিপুরার এলাকা শত্রুমুক্ত হয় ৮ ডিসেম্বর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

> "৭ তারিখ রাতে ইন্ডিয়ান একটা বিমান থেকে বম্বিং হয়েছে। পিছনে ইন্ডিয়ার বম্বিং, মাঝে পাঞ্জাবী, পিছে আমরা - দুই দিক থেকে ওদের ঘেরাও করেছি। তখন ওদের অবস্থা এত শোচনীয় যে বড় হাতিয়ার, ভারী গোলাবারুদগুলো রেখে পালিয়ে গেল। আমাদের ছেলেরা তখন অস্ত্রগুলো কালেকশন করেছে। ১৬ ডিসেম্বর গাড়িটানা, যুগ্মছড়া, ফটিকছড়ি থেকে শত্রু বিতাড়িত হয়। তখন রেডিওতে খবর পেলাম আমরা বিজয় লাভ করেছি।"

রণবিক্রম ত্রিপুরার সাথের কয়েকজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হলেন প্রভুধন চৌধুরী, সুবিলাশ চাকমা, মনিষ দেওয়ান, কালাচাঁন ত্রিপুরা, লিজা মোহন ত্রিপুরা, বিজয় ত্রিপুরা, হেমন্ত রঞ্জন ত্রিপুরা, অনিল তঞ্চঙ্গ্যা। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে রনজিত বড়ুয়া, বরুন, কানু, স্বপন, চিত্ত, নিরঞ্জন, ইফতেখার, শফিক, আলমগীর, জাহাঙ্গীর, রুহুল আমিন প্রমূখ অনেকেই তার যুদ্ধের সাথী ছিলেন। যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তার কিছু বন্ধু। যুদ্ধে জীবনদানকারী শহীদদেরকে খেতাব প্রদান-সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান করা হোক - এটা তিনি মনে প্রানে চান।[৩০]

যুদ্ধে নারীদের উপর অত্যচার হয়েছে এই প্রসঙ্গে রণবিক্রম জানান ঃ[৩১]

> "শরণার্থী শিবির কাঁঠালছড়ির ক্যাম্পে যুদ্ধকালীন সময়ে অক্টোবরের দিকে একদিন কল্যাণী (স্ত্রী) এসে বললেন, 'আমি গ্রামে (রামগড়ের পশুরামঘাটে) থাকতে পারছি না, পাঞ্জাবী ও রাজাকারদের হাত থেকে যুবতী, মহিলা কেউই রেহাই পাচ্ছেন না। রাজাকাররা বাড়িতে ডাকাতি করছে, সে সময় জঙ্গলে লুকিয়ে আমি কোন মতে বেঁচে এসেছি'। এরপর আমরা বিয়ে করে আগরতলায় অভয়নগরে কল্যাণীকে বাবা-মা'র কাছে রেখে দুদিন পর যুদ্ধে চলে আসলাম। স্বাধীনতার পরে তার সাথে আবার দেখা হয়েছে।"

মুক্তিযুদ্ধের পর রণবিক্রম ত্রিপুরা বঙ্গবন্ধুর কাছে ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ[৩২]

> অস্ত্রগুলো ভারতীয় বাহিনী পর্যায়ক্রমে ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২২ ডিসেম্বর তারিখে রাঙ্গামাটির সার্কিট হাউজে জমা নিয়েছিল।

খ. কোম্পানি কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা

১৯৭১ সালে রামগড় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম মহকুমা সদর এবং এই এলাকার ছাত্র-যুবকদেরকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং গ্রহণের ব্যাপারে যারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা। যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা বলেন ঃ

---

[৩০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২৯।
[৩১] রণবিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৩/০২/২০০৯।
[৩২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২৯।

> "পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৭ এপ্রিল খাগড়াছড়ি এবং ২ মে রামগড় মহকুমা সদর এলাকা দখল করে। দখলের পর তারা রামগড়, গুইমারা, মানিকছড়িসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে আদিবাসী বহু রমণীকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণের পর বিবস্ত্র অবস্থায় বন্দী করে রাখে। এই অবস্থায় তারা রমণীদের ক্যাম্প সংলগ্ন ফেনী নদীতে গোসল করতে নিয়ে যেত। এ দৃশ্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম থেকে বেশকয়েকদিন ব্যাপী প্রত্যক্ষ করা গেছে। ওপার থেকে জনতা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালে তাদেরকে নদীতে নামানো বন্ধ হয়।"[৩৩]

হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা রামগড় পতনের পর ২৫জনের একটি গ্রুপ নিয়ে ভারতের হরিনা ক্যাম্পে যান। সেখানে যাওয়ার পর ৪০জনের একটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে তাকে ভারতে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অম্পিনগরে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ২ মাস গেরিলা আক্রমণের কলাকৌশলসহ রাইফেল, এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি, হ্যান্ড গ্রেনেড, হাই এক্সপ্লোসিভ এবং কমান্ডো ট্রেনিং গ্রহণ করেন। রাতের অন্ধকারে তাদেরকে টার্গেট প্র্যাকটিস দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে জুলাই মাসে রামগড় মহকুমার সব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একত্র করে বেশ কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়। উক্ত কোম্পানির অধিনায়ক করে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে গেরিলা অপারেশন এবং পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১ নং সেক্টরের অধীনে হরিনা থেকে ৩০ কিমি দূরবর্তী সীমান্ত এলাকা ভারতের বৈষ্ণবপুরে একাত্তরের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে সাব সেক্টর স্থাপন করা হয়। সেখানে অবস্থানরত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গেরিলা আক্রমণ পরিচালনার জন্য হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরাকে কমান্ডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ছিল তাঁর অপারেশন ক্ষেত্র। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বৈষ্ণবপুর ও বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা রামগড় মহকুমা হয়ে চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলে নিরাপদে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা পালন করেন। যার ফলে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারে যেমন হরিণা, উদয়পুর, আগরতলা, অম্পিনগর, শলীছড়ি, দেমাগ্রী ইত্যাদি ট্রেনিং সেন্টার থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষে সক্রিয়ভাবে নিজ নিজ এলাকায় অপারেশন পরিচালনার জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম মহকুমার বৈষ্ণবপুর সাব সেক্টর হয়ে রামগড় সীমান্ত অতিক্রম করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, কুমিল্লাসহ অন্যান্য অঞ্চলে গোপনভাবে ও নিরাপদে পারাপারে সক্ষম হন। এই কাজে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা কোম্পানির গেরিলা বাহিনী ও রামগড় মহকুমার আদিবাসী হেডম্যান, কার্বারী, যুবকরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরার নেতৃত্বে নাকাপা, কুমারীপাড়া, পাগলাপাড়া, মানিকছড়ি, ডাইনছড়ি, যজ্ঞছলা ও গাড়িটানা এলাকার গহীন অরণ্যে গোপন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এই গেরিলা ক্যাম্পগুলোতে ঐ এলাকার আদিবাসী হেডম্যান কার্বরীসহ সকল স্তরের জনগণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছিলেন। এখান থেকে পাকিস্তান বাহিনীর গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করে পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ এবং গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো। কোম্পানি কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা প্রথম গেরিলা অপারেশন করেন। একাত্তরের ৫ জুলাই রামগড়

[৩৩] হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২২/০২/২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

নাকাপা এলাকায় তিনি বাংলাদেশ এফএফ ফোর্স গ্রুপ নং ৯১-এর ১৬জন সদস্য নিয়ে রামগড়ে পাকিস্তান বাহিনীর হেড কোয়াটারের বিভিন্ন অবস্থান রেকি করেন এবং উক্ত এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এখানে তিনি পাকিস্তান বাহিনীর একজন সহযোগীকে আটক করেন, তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তিনি এখানে সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। সেই পাকিস্তানি সহযোগীকে হরিনা ক্যাম্পে সোর্পদ করা হয় বিচারের জন্য। এই অপারেশনে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরার সহযোগী যোদ্ধারা হচ্ছেন, রঞ্জিত দেববর্মন, সমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ধীমান কান্তি বড়ুয়া, ভূবন ত্রিপুরা, নীলা মোহন ত্রিপুরা প্রমুখ।

একাত্তরের ১৩ আগস্ট পুরো এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাসহ হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা রামগড়ে পাকিস্তান বাহিনীর সদর দপ্তরে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এখানে প্রায় ১ ঘণ্টা পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের উপর গুলি বর্ষণ করে পাকিস্তান বাহিনীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করেন। এই অপারেশনে এলএমজি, এসএলআর, এসএমজি এবং রাইফেল ব্যবহার করা হয়। এই অপারেশনে আরও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা রণবিক্রম ত্রিপুরা। রণজিত দেববর্মণ, সমর চক্রবর্তী, ধীমান বড়ুয়া, ভূবন ত্রিপুরা, নীলা মোহন ত্রিপুরা প্রমুখ।

বৈষ্ণবপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পের পাশ থেকে দুজন গুপ্তচরকে একাত্তরের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদায় করে এই দুজনকে হরিণা ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। একাত্তরের ১০ সেপ্টেম্বর মানিকছড়ি থানার অন্তর্গত ডাইনছড়ির চেম্প্রু পাড়া এলাকায় পাকিস্তান বাহিনী বিরুদ্ধে ১২জনের এক দুর্ধর্ষ গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা দল নিয়ে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা সেখানে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ১টি এলএমজি, ১০টি এসএলআর, বেশ কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড ও গুলি এবং তার এসএমজি ব্যবহার করেন। মানিকছড়ি রাজবাড়ি পাকিস্তান বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি এবং হেডকোয়ার্টার ছিল। পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানকে রেকি করার জন্য ২জন যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং দূর থেকে দেখলেন মারমা গ্রামে পাকিস্তান বাহিনী পজিশন নিচ্ছে।

হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা আরও দেখলেন যে পাকিস্তান বাহিনী তাদের খুব কাছাকাছি ৫০ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। তিনি এবং তার সহযোদ্ধারা দেরি না করে অটোমেটিক এসএমজি, এলএমজি এক সাথে ওপেন করেন এবং অনবরত গুলি বর্ষণ করতে লাগলেন। পাকিস্তানিদের পক্ষে আশ্বারোহী একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৫০/৬০জনের একটিবৃহৎ বাহিনী আক্রমণে অংশ নেয়। তাদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র ছিল মর্টার, এলএমজি, অটোমেটিক চায়নিজ রাইফেল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ব্রাশ ফায়ারের সাথে সাথে ক্যাপ্টেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিচে পড়ে যায় এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা মরিয়া হয়ে ওপার থেকে গুলি বর্ষণ ও মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। একটি গোলা হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরার এক হাতের ব্যবধানে এসে পড়ে, তবে জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে ছিল বলে তা বিস্ফোরিত হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন তিনি বেঁচে যান। সেদিন প্রায় আধাঘণ্টা পাহাড়ের পাদদেশে এবং পাহাড়ের উপর থেকে পাকিস্তান বাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ করে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ১২জন পাকিস্তানি সৈন্যকে খতম করেন। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে হিট এন্ড রান গেরিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং এ্যামুনেশন প্রায় শেষ হওয়ার পূর্বেই সেই স্থান ত্যাগ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হয়নি।

অতপর পাকিস্তান বাহিনী প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মারমা গ্রামে আগুন ধরিয়ে গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। সেখানে প্রায় ১০০ মারমা পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা আশ্রয়হীন আদিবাসীদের সেই দিন রাতেই ভারতের আশ্রয় শিবিরে নিয়ে আসেন এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ১ নং সেক্টর সদর দপ্তর ভারতের হরিনা ক্যাম্পে লিখিতভাবে অপারেশনের বিবরণ দাখিল করেন।

নাকাপা ব্রিজের টিলার উপর রোড ডিভিশনের একটা ছোট্ট বাংলোতে পাকিস্তান বাহিনী ক্যাম্প খুলেছিল। কিছুটা দূরে গুইমারাতে পাকিস্তান বাহিনীর একটা হেডকোয়ার্টার ছিল। নাকাপা পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিপদজনক ছিল বিধায় হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা এই ক্যাম্পটি আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ২০জনের একটি দল গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য রামগড়ে নাকাপা এলাকা অতিক্রম করে ভারতের বৈষ্ণবপুর সাব-সেক্টরের দিকে এগিয়ে আসার সময় পাকিস্তান বাহিনী তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে, এতে তাদের ৫জন আহত হন। হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা তাদেরকে চিকিৎসার জন্য ভারতের বিএসএফ-এর কাছে নিয়ে যান। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ১০জন মুক্তিযোদ্ধার একটি গ্রুপ নিয়ে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা নাকাপা পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প আক্রমণ করেন। তিনি পাগলাপাড়া গোপন ক্যাম্প হয়ে অগ্রসর হন। সেখান থেকে ভারতে গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে আসা ৮/১০জনকে সাথে নেন। সেদিন সূর্য ডোবার পূর্বেই নাকাপা আর্মি ক্যাম্পের কাছে এসে ক্যাম্প লক্ষ্য করে কয়েকটি ব্রাশফায়ার করেন। পরের দিনই পাকিস্তান বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে স্থানটি ত্যাগ করে।

৭ অক্টোবর যোগ্যছলা এলাকাতে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা একটি সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই এলাকায় গুপ্ত আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ৬০জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এদিন সকাল ৮টার সময় হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা ইনফরমার এর মাধ্যমে জানতে পারেন পাকিস্তানিদের প্রায় ৫০/৬০জনের একটি বিরাট বাহিনী যোগ্যছলা এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে। এইসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা তার সহযোদ্ধাদের নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে পজিশন নিতে নির্দেশ দেন। তিনি কে কোথায় পজিশন নিবে তা দেখিয়ে দেন। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, রাইফেল এবং হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেন। টিলা থেকে তিনি দেখছিলেন শত্রুপক্ষ লম্বা লাইন ধরে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা ব্রাশ ফায়ার করেন, প্রায় ২০ মিনিট গোলাগুলি বিনিময়ের পর ৯জন পাকিস্তানি সৈন্য খতম হয়। বাকিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হয়নি। একাত্তরের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে রামগড় মহামুনি এলাকায় এক সফল গেরিলা অপারেশনে ১জন কর্নেলসহ ১৭জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করা হয়। এইঅপারেশনে মুক্তিযোদ্ধারা মর্টার ব্যবহার করেন। হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরারনেতৃত্বাধীন কোম্পানির রামগড় এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জিত ত্রিপুরা, রাজেন্দ্র ত্রিপুরা, এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

একাত্তরের ১৫ নভেম্বর যোগ্যছলা থেকে ৩ কিমি দূরবর্তী গুপ্তকেন্দ্র গাড়িটানা নামক স্থানে ৪০জনের উপর একটি মুক্তিযোদ্ধার দল নিয়ে হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা পাকিস্তান বাহিনীর উপর সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ প্রতিহত করেন।

সেদিন ভোর ৪টার দিকে পাকিস্তান বাহিনীর গুলির শব্দ যেখান থেকে আসছিল ঠিক সেই দিকে তাক করে মুক্তিযোদ্ধারা একটানা এলএমজি থেকে গুলি বর্ষণ করেন। কিছুক্ষণ পর ওপাশের গোলাগুলির শব্দ হলে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। সেখানে যেয়ে দেখেন পাকিস্তান বাহিনী পশ্চাদপসারণ করেছে। তবে এই যুদ্ধের পর ৪জন মুক্তিযোদ্ধার হদিস পরবর্তীতে পাওয়া যায়নি।

একাত্তরের ৬ এবং ৭ ডিসেম্বর রামগড়ে পাকিস্তান বাহিনী অবস্থানে যৌথবাহিনীর পক্ষে বিমান আক্রমণ চালানো হয়। পাকিস্তান বাহিনী রামগড় হেডকোয়াটার ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং ৮ ডিসেম্বর বিকাল ৪টার দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রামগড়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। পুরো ৭ মাস ৬ দিন রামগড় হানাদার বাহিনীর অধিকারে ছিল। পাকিস্তান বাহিনী রামগড় হেডকোয়াটার ছেড়ে যাবার পূর্বে পুরো সীমান্ত এলাকা এবং বিভিন্ন জায়গায় এন্টিপার্সোনেল মাইন পুঁতে রেখে যায়। এগুলোর বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন রামগড়বাসী পঙ্গুত্ববরণ করেন। হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা তার সংগ্রামী সাথীদের নিয়ে পুঁতে রাখা এন্টিপার্সোনেল মাইনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার দায়িত্ব পালন করেন এবং যুদ্ধ-উত্তর পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৩৪]

গ. মুক্তিযোদ্ধা মংসা থোয়াই চৌধুরী

মংসা থোয়াই চৌধুরী রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের লুব্রিম্রম গ্রামে ১৯৫২ সালের ৩০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কঙনিয় চৌধুরী একজন হেডম্যান ছিলেন। মাতা আনাই চৌধুরী। তাদের মূল পেশা চাষাবাদ ছিল। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। ছয় ভাই-বোন ছিলেন।

শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মংসা থোয়াই জানান যে, শৈশবে রাবারের কামঠা দিয়ে পাখি শিকার করতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। একদিন তার মা বোঝালেন যে তারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং জীব হত্যা মহাপাপ। এরপর তিনি পাখি শিকার ছেড়ে দেন। ১৯৭১-এ এই মংসা থোয়াইকেই যুদ্ধে নামতে হয়েছে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি গুইমারা জুনিয়র হাই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক গেরিলা নেতা সন্তু লারমা তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এরপর ভর্তি হন রামগড় সরকারী হাই স্কুলে। রাজনীতির সাথে যুক্ত হন নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়। তখন ২-৩ বছর ফেনীতে ছিলেন। সে সময় ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত হন এবং পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হত। পরিস্থিতি বেশি উত্তপ্ত হলে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চর জব্বার, চর আলেকজান্ডার, মীর ওয়ারেশ প্রভৃতি এলাকায় তারা লুকিয়ে থাকতেন। পরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ফেনীতে ফিরে আসতেন। ফেনী পাইলট স্কুল থেকে ১৯৭২ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন।

---

[৩৪] মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, 'অশ্রু-সাগরে মিলিত প্রাণ মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা-জনগোষ্ঠী', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের সময় মংসা থোয়াই চৌধুরীর বয়স ছিল ১৯ বছর। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ দিকে পাঞ্জাবীরা তাদের গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামকে তছনছ করে দেয়। গুইমারা সরকারী হাসপাতালের চতুর্দিকে বাংকার করে। ক্যাম্পে প্রায় ৬০/৭০জন পাকিস্তানি ছিল। তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করে রাজাকার হাসু মিয়া (হাসু কসাই নামে সবাই তাকে চেনে)। পাঞ্জাবীরা গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীর উপর শারীরিক ও মানসিক নানারকম অত্যাচার শুরু করে। গ্রামবাসীকে দিয়ে মাটি কাটাত, জঙ্গল পরিষ্কার করাত, ঘরে ঘরে গিয়ে হাঁস-মুরগী ধরে এনে এবং গোলা থেকে ধান তুলে এনে বাজারে বিক্রি করত। ফলে গ্রামের লোকজন না খেয়ে দিন কাটাতে থাকে। কেউ কিছু বলার সাহস পেত না, বললেই ভয় দেখাত অস্ত্র দিয়ে। এ বিষয়গুলো মংসা থোয়াই-এর মনকে দারুনভাবে নাড়া দেয়। তিনি লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান শুনতেন। সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে যোগদানের।

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে মংসা থোয়াই চৌধুরীর বাবা-মা দুজনই তাকে সহায়তা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য রওনা হবার পরপরই পাঞ্জাবীরা তার ভাইদের উপর অনেক অত্যচার করেছে। কিন্তু তারা মুখ খোলেন নি। তিনি শুনলেন, দূর-দুরান্তের সব মন্দিরের পুরোহিত, মসজিদের মাওলানাদেরকে ডেকে পাঞ্জাবীরা কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়েছে কোন মুক্তিযোদ্ধাকে যেন আশ্রয় না দেয়া হয়; যদি কেউ কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দেয় তাহলে তাকে গুলি করে মারা হবে। ভলিবল খেলার সুবাদে মংসা থোয়াই চৌধুরীকে সবাই চিনত। মংসা থোয়াই চৌধুরী মাত্র তিনদিনের মধ্যে মারমা ছাত্র ও খেটে খাওয়া মানুষ মিলিয়ে ২৪জনকে সংগঠিত করে দূরবর্তী এক গ্রামে মিটিং করছিলেন। ৮জন পাঞ্জাবী ও ৪-৫জন রাজাকার সেখানে হাজির হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ঐদিন গ্রামে একটি মারমা মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল এবং গ্রামের লোকজন বললেন যে তারা সবাই সে বিবাহ অনুষ্ঠানে এসেছেন। মাটিরাঙায় বসে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ত্রিপুরায় যাবেন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ক্ষুধার্ত ছিলাম। স্থানীয় লোকজন নিজেদের খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় চাল বিক্রি করতে চাইলেন না। এ অবস্থায় দেখলাম ৮-৯ বছরের একটা মেয়ের খুব জ্বর। আমাদের দলে একজন ছিলেন যিনি কিছু চিকিৎসা জানতেন। তার সাথে সিরিঞ্জ ও পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন ছিল। তিনি মেয়েটাকে চিকিৎসা দেওয়ায় খুশি হয়ে গ্রামের লোকজন খুব আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের ২৪জনকে মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ালেন।’’

পরদিন বৈষ্ণবপুর দিয়ে নদী পার হয়ে ত্রিপুরার এক ক্যাম্পে গেলেন। ক্যাম্পে তাদের প্রাথমিক মেডিকেল পরীক্ষা করে তালিকাভুক্ত করে। এরপর তাদের গাড়িতে করে হরিণা ১ নম্বর সেক্টরে ইয়্যুথ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। দক্ষিণ ত্রিপুরার পালাটানা ক্যাম্পে আর্মস ও এ্যামিনিউশনের প্রশিক্ষণ নিলেন। ভারতীয় সৈন্যরাই মূলত ট্রেনিং দিতেন। ট্রেনিং প্রদানকারীদের একজনের নাম ছিল শকিক সিং। তিনি সদালাপী ছিলেন এবং নিরামিষ ভোজন করতেন। আর্মস প্রশিক্ষণ হলো থ্রি নট থ্রি, এসএলআর, স্টেনগান বা এসএমজি, লাইট মেশিনগান, বেবিগান (ব্রিটিশ এলএমজি), হেভী মেশিনগান, ২ রকম হ্যান্ড-গ্রেনেড (৩৬ ও ৪৫, অর্থাৎ একটা গ্রেনেডে বিস্ফোরণের পর বডিটা ৩৬ টুকরা হয়, আরেকটাতে ৪৫ টুকরা), দুই ইঞ্চি মর্টার, তিন ইঞ্চি মর্টার ইত্যাদি। ওখান থেকে কাঁকড়াবনের বিশাল জঙ্গলে ও শালবনে ট্রেনিং নিলেন। ২৪ দিনের আর্মস ট্রেনিং ও ৭ দিনের জঙ্গল ট্রেনিংসহ ৩১ দিনের ট্রেনিং নিলেন।

দেশে ঢুকে প্রথমেই তারা গুপ্ত হামলা শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে মংসা থোয়াই চৌধুরী বলেন, ট্রেনিংটাই ছিল মূলত গেরিলা যুদ্ধের উপর। তবলছড়ি, বেলছড়ি, তান্দম এসব এলাকায় প্রথমে ২-৩জনকে পাঠিয়ে রেকি করা হতো। আগে ছদ্মবেশে গিয়ে চাষা বা কাঠুরিয়া সেজে দেখে আসতে হতো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অবস্থান কি, কোন দিক দিয়ে তারা বেশি আসা-যাওয়া করে ইত্যাদি। সে তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অ্যাম্বুশ করা হতো। এরপর শুরু হতো গেরিলা হামলা। গেরিলা যুদ্ধের মূল বৈশিষ্ট্য হলো– গেরিলা যোদ্ধারা যেখানে আক্রমণ করেন, আগেই সেখান থেকে পালানোর পথ ঠিক করে রাখেন। এভাবে বেলছড়িতে পাঠানো হলো, ওখানকার রিপোর্ট পাবার পর পর্যালোচনা করা হলো যে কীভাবে সেখানে যাবেন, কোথায় অবস্থান নেবেন, সেখানকার কোন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ইত্যাদি। মংসা থোয়াই চৌধুরী বলেন ঃ [৩৫]

> "এভাবে পরিকল্পনা করার পর ঐ পয়েন্টে গিয়ে আমরা যোগাযোগ করতাম। ১৫জনের গ্রুপ। গেরিলা আক্রমণ করতে গেলে ১৫জনের উপরে গ্রুপ করলে সমস্যা। প্রথম অভিযানে আমরা কোথায় থাকব, কোন হাতিয়ার ব্যবহার করব এগুলো নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। ভারী হাতিয়ার গুপ্ত অভিযানে নেওয়া হতনা, আমরা রাইফেল ও এলএমজি নিই, আর কোমরে গ্রেনেড ঝুলিয়ে নিই। বেশিরভাগ সময় খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরতাম। আমাদের দলের ২জন লুঙ্গি কাঁছা মেরে পরতেন। আমার সাথে ৩জন বাঙালি ছিলেন। একজন তাজুল ইসলাম, অন্য দুজনের নাম মনে নেই। আমার প্লাটুনের ইয়ংসথয়, নাসথয়, কালা মারমা – এরা সবাই ছিলেন মারমা। আমরা জানলাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তান্দম ক্যাম্প থেকে রাতে রওনা দিয়ে ভোরে আসবে। ওদের এ্যাটাক করার জন্য এ্যাম্বুশ দিলাম। আমাদের সাথে দুজন গাইড ছিল, দুজনই গ্রাম-প্রধানের ছেলে। ওরা বললো, আমরা মরলেও একসাথে থাকব। আমাদের সাথে স্টেনগান আর এসএমজি ছিল, ২টা লাইট মেশিনগানও ছিল। রিজার্ভে আমার কাছে ৩০০ বুলেট ছিল। একটা ম্যাগাজিন লোড করে ৫টা ম্যাগাজিন স্পেয়ার নিলাম, সবার কাছে হ্যান্ড-গ্রেনেড ছিল। গ্রাম থেকে মাইলখানেক ভেতরে মন্দির থেকে ডাকবাংলা বাজারের দিকে যেতে শর্টকাট একটা দেড় মাইলের পথ আছে। এই পথটা হানাদাররা ব্যবহার করে। ওরা টহল মেরে প্রধান রাস্তা দিয়ে এসে এদিক ঘুরে মন্দির দিয়ে বের হয়। আমরা ১২টা থেকে সারা রাত বসে রইলাম। ভোরের আজানের দশ বা পনের মিনিট পর বুঝতে পারলাম ওরা আসছে। আমরা রেডি হলাম, জঙ্গলের খস খস শব্দ; পাখির আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দ নেই। গ্রাম-প্রধানের ছেলে বলল, ওরা ৩জন আসছে। আমি ভাবলাম ৩জনকে মারার পরে যদি সবাই আসে, তাহলে পালাতে পারব না। ৩জনের পর বাকী ৭জন এল। ৭জনের পর ২জন, এরপর ৯জন। এই চার গ্রুপ এল। আমাদের টার্গেট ছিল শেষ গ্রুপটাকে মারব। কারণ প্রথম গ্রুপটাকে মারলে এরা আক্রমণ করতে পারে; আর পিছনের গ্রুপটাকে আক্রমণ করলে ওদের পিছনে ঘুরতে সময় লাগবে। পালানোর পথ রেখেছি একটা সামনে, একটা পিছনে। মাঝে রাস্তা, আমরা ২ দিকে এ্যাম্বুশ করেছি। শেষের ৯জনের পিছনে দেখি সিভিল ড্রেসে ২জন লোক আসছে। রাজাকার ভেবে শেষের টিমটাকে ফায়ারিং শুরু করলাম। ভাগ্যিস আমরা যে জায়গায় এ্যাম্বুশ নিয়েছি তার পাশে একটা ছড়া ছিল। ৪জন স্পটেই মারা গেল। কিছু লাফ দিয়ে ছড়ায় পড়ে গেল। ঠিক ৫০টা ফায়ার করেই আমি উইথড্র

[৩৫] মংসা থোয়াই চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, খাগড়াছড়ি জেলার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড অফিসে গৃহীত।

করলাম। বাকিরা চলে গেল। ওখান থেকে আরও নিচের দিকে ত্রিপুরা আর মারমাদের সম্মিলিত একটা গ্রাম আছে, ১০-১২টা বাড়ি। আমরা ওখান থেকে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ফেনী নদী ক্রস করে ইন্ডিয়াতে ক্যাম্পে গেলাম। আমার গ্রুপে ১৫জন-সহ গ্রাম-প্রধানের ছেলেরাও আসল। খাওয়া-দাওয়া সেরে কোম্পানি কমান্ডারকে রিপোর্ট করলাম – স্যার, আমরা একটা অপারেশন করে আসলাম। ৪জন হানাদার মারা গেছে। উনি বললেন ভেরী গুড, একজন মারা গেলেও সাকসেস। এত অল্প বয়সে তুমি একটা দলকে লীড করছ, এটাই আমার কাছে বড় পাওয়া। ”

মংসা থোয়াই চৌধুরীর সেক্টর ১ নম্বর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন অশোক দাশগুপ্ত, ডাক-নাম বাবুল চৌধুরী। মংসা থোয়াই চৌধুরী বলেন ঃ [৩৬]

“এরপর আরও ৩টা গুপ্ত-হামলায় অংশগ্রহণ করেছি। বেলছড়িতে আরেকটা এ্যাম্বুশ করেছিলাম। আগে রেকি করে সেখানে গেলাম, ওরা ঐদিন ওদিক দিয়ে আসেনি। ফলে যখন আমরা জানলাম হানাদার বাহিনী পিছন দিক দিয়ে আসছে তখন আমরা ভীতিকর অবস্থায় পড়ে গেলাম এজন্য যে ওরা আমাদের দেখে ফেলে কিনা। বেলছড়ি বাজারের খুব কাছাকাছি শরণার্থী পাড়া ছিল, তখন আমরা ওখান থেকে সরে আরও ভেতরে চলে গেলাম। কারণ ঐ জায়গা আমাদের অচেনা। গাইডের মাধ্যমে আমরা যাই। এরপর যখন খবর এল, ওরা বেলছড়ি বাজার থেকে মাটিরাঙার দিকে আসছে তখন ওখান থেকে এসে এ্যাম্বুশ করার জন্য ঐ গ্রামের পশ্চিম পাড়ে গেলাম। গ্রামে যাইনি। কারণ গ্রামে যদি আমাদের উল্টা এ্যাম্বুশ করে। অপেক্ষা করে ওখান থেকে চলে গেলাম। ৩ দিন পর আবার ঐ বেলছড়িতে এলাম। তখন সফল হলাম। ঐদিন একজন হানাদার বাহিনী মারা গেছে। ৫টি হামলার পর গেরিলা হামলা আর করি নি।

পরবর্তীতে সরাসরি হামলায় অংশগ্রহণ করি। কোম্পানি কমান্ডার পুরো পানছড়ি রেকি করেন এবং আমাদের ব্রীফ করেন। সম্ভবতঃ ৩টা প্লাটুন ছিল ঐ অপারেশনে। আমার প্লাটুন নম্বর ছিল ২০৯। আমার পুরো প্লাটুন যাবে। কোম্পানি কমান্ডার স্কেচ দিয়ে দেখালেন, “চৌধুরী, তোমার প্লাটুন নিয়ে এই জায়গায় তুমি যাবে, এই জায়গায় অবস্থান করবে, আর আমি এই জায়গায় প্লাটুন নিয়ে থাকব।” পানছড়ি এলাকার একটা ম্যাপ ছিলো। পানছড়ি বাজারের বিপরীতে একটা পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ে আমরা অবস্থান নেব, পাঞ্জাবীদের অবস্থান কোথায় সেটা দেখে নিলাম। ঐ বাজারে তেমন কোনো লোকজন ছিল না। বর্ডারের পাশে ৯-১০টার দিকে গেলাম। তার আগে আমরা গণলাইনের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে জানলাম যে পাঞ্জাবীরা ওখানে আসে না। আগে আসত, বর্ডার এলাকায় টহল দিত। আমাদের কোম্পানি কমান্ডারের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর আবার গণলাইনে খবর আসল যে ঠিক ১১টায় আমরা ফায়ার ওপেন করব। আমার প্লাটুনে ছিল ২৯জন। প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন মংশে অং মারমা; ঐদিন অসুস্থ ছিলেন বিধায় আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে। আমি সেকশন কমান্ডার। এরপর রাত ১১টা ১ মিনিটে কোম্পানি কমান্ডার ফায়ার ওপেন করলেন; ৫ মিনিট পর হানাদার বাহিনী পাল্টা ফায়ার করলো। ফায়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল। আমাদের পিছনে ২০০-৩০০ গজ দূরে একটা

---

[৩৬] মংসা থোয়াই চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত; অধ্যাপক অজয় রায় এবং শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ঃ ২২৫-২৩০।

রকেট লঞ্চার ব্লাষ্ট হয়। তবে আমরা এমন জায়গা অবস্থান নিয়েছি, ওখানে লঞ্চার ব্লাষ্ট হলেও স্প্লিন্টার আমাদের গায়ে আসবে না। আমরা একটু নিচু জায়গায় ছিলাম। অসাবধানতাবশতঃ আমরা পাঞ্জাবীদের অবস্থানের ৪০০ গজের মধ্যে চলে এলাম। তখন ভোর চারটা বাজে। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ওখানে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষন পর আর পাকিস্তানিদের হদিস পাইনা। সকালে আমাদের এখান থেকে ৩জন লোক পাঠানো হলো ওরা কোথায় আছে দেখার জন্য। খবর নিয়ে জানাল পাঞ্জাবীরা গত রাতে মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে ভাইবোনছড়ার দিকে চলে গেছে। ৩৫জন পাঞ্জাবী ছিল, ২জন পাঞ্জাবী খুব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। কিছু রাজাকার পানছড়ি ক্যাম্পে ছিল। খবর আসার পর কোম্পানি কমান্ডার-এর নির্দেশমত আমরা হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে উঠলাম। ওখানে রক্তের দাগ পাওয়া গেল। পানছড়ি ক্যাম্পে উঠে একটা ফায়ারিং দিয়ে জানালাম আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এসেছি। তখন 'জয় বাংলা' বলে বাজারের লোকরা দৌড়ে এল। এটা ১৩ ডিসেম্বরের কথা। এরপর পানছড়িবাসীরা গরু জবাই করে খাওয়াল।

আমরা ৩ নম্বর প্লাটুন ওখান থেকে ভাইবোনছড়ার দিকে এগোবো। আমরা জানলাম ভাইবোনছড়া বাজারের পাশে একটা পাকা বিল্ডিংয়ে ওরা আস্তানা নিয়েছে এবং ওখানে একটা টাওয়ার আছে বাইনোকুলার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার বললেন, আমাদের এগোতে হবে। এখানে টহল দেয়ার জন্য ১৬জনের একটা দল হলো। এর মধ্যে আমি ছিলাম কোম্পানি কমান্ডার। ভাইবোনছড়ার পশ্চিমে চেঙ্গী নদীর বিপরীতে একটা মারমা গ্রাম আছে। আমরা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ওখানে গিয়েছি। ঐদিন মঙ্গলবার, হাটের দিন, সাড়ে ৩টা হবে। আমাদের অবস্থান টের পেয়ে ওরা সরাসরি একটা রকেট লঞ্চার ছুঁড়ে দিলো; ওটা ঠিক আমাদের পেছনে গিয়ে পড়ল। আমরাও ফায়ারিং শুরু করলাম। চতুর্দিক থেকে ফায়ারিং শুরুহলো। হাটের দিন ছিল বিধায় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা বেশিদূর এগোয়নি; পানছড়ি চলে গেলাম। মূল রাস্তা ধরে এসে শুনলাম ওরা খাগড়াছড়ি চলে গেছে। তখন ক্যাপ্টেন বললেন যে, খাগড়াছড়ির দিকে এগোব।

পরদিন ১৪ ডিসেম্বর ৩টার দিকে এগোলাম। ভাইবোনছড়ার লোকজন আনন্দিত চিত্তে আমাদের গ্রহণ করলো। 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান দিল। তবে সোর্সের মাধ্যমে আমরা খবর পেলাম যে, ওরা খাগড়াছড়ির দোকান লুটপাট করছে। আমার প্লাটুন ছিল আগে। তখন প্লাটুনের কাভারিং-এ কিছু নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর লোক ছিল। ওরা থ্রি ইন মর্টার, টু ইন মর্টার এগুলো কাভারিং দিত। গাছবান এলাকার কাঠের ব্রীজের কাছে একটা চাকমা বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির থেকে হঠাৎআমাদের ওপর ফায়ার করল। আমরা এম্বুশে পড়ে গেলাম। পরে জানতে পারলাম ওখানে পাক বাহিনীর লোক তেমন একটা ছিল না, রাজাকার এবং মিজোরামের বিদ্রোহী কিছু লোক পাক বাহিনীকে সমর্থন করেছিলে। ওরা গাছের উপরে উঠে ফায়ার করলে আমাদের একজনের উরুতে লাগে। আমরা লাফ দিয়ে ব্রীজের ওপর থেকে গাছবান ছড়ায় পড়ে গেলাম। ছড়া থেকে আমরা ২দিক থেকে পজিশন নিয়ে আমরাও ফায়ার ওপেন করলাম। ওরা পাহাড়ের উপর থেকে করছে, আমরা নিচ থেকে শোয়া অবস্থায় ফায়ার করছি। ঘণ্টা খানেক যুদ্ধ চলে। এরপর আমাদের কাভারিং পার্টি থেকে সাপোর্ট আসার পর ওরা পালিয়ে যায়। এরপর আমাদের ২জনকে ত্রিপুরা নিয়ে চিকিৎসা করেছি। এরপর আমরা ওখান থেকে ১৪ তারিখ রাতে খাগড়াছড়ির দিকে এগোলাম। তবে পূর্বের একটা ঘটনা বলি, আমরা পানি না পেয়ে কলা

গাছের বগলি কেটে খেয়েছিলাম ও ক্ষুধায় ভিতরের সাদা অংশ খেয়ে থাকতাম। রাতে শহরে এলাম, ঐদিক থেকে আমরা একভাগ হয়ে চেঙ্গী নদী পর্যন্ত গেলাম। ১৪ তারিখ রাতে মহকুমা শহরে অবস্থান নেই। ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে খবর আসল, যে সামনের দিকে এগোও। এগোতো এগোতে সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের দেখা হলো। শুনলাম, পাঞ্জাবীরা গতকাল রাতেই দোকানপাট সব ভেঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ১০জনকে খাগড়াছড়ি পুরো অবস্থানটা আধা ঘণ্টার মধ্যে জানার জন্য পাঠানো হলো তারা সব দেখে আসলেন কোম্পানি কমান্ডার বললেন যে এখন আমরা শত্রুমুক্ত তারিখটি ছিল১৫ ডিসেম্বর। গুইমারা হাইস্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছি। যুদ্ধের সময় নারী নির্যাতনের ঘটনা অহরহ আমার চোখে পড়েছে। আদিবাসী মেয়েরা সেসময়টা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

ঘ. মুক্তিযোদ্ধা কংজরি মগ

মুক্তিযোদ্ধা কংজরি মগের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে, খাগড়াছড়িতে। তার পিতার নাম কংকেও মগ এবং মাতার নাম আপুমা মগ। তার পিতা-মাতা উভয়েই কৃষিকাজ করতেন। তিনি খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ২১ বছর। তিনি আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধে যাওয়ায় তার পরিবার থেকে চাঁদা আদায় করা হয়েছে, হুমকি দেয়া হয়েছে। তিনি জানান যে জন্মভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে দলভুক্ত হয়ে তিনি মুজিব বাহিনীতে যোগ দেন। তার ক্রমিক নং ছিল ২১৮। ভারতের হরিনা ও গৌহাটিতে তার ৪০ দিনের ট্রেনিং হয়েছিল। তিনি রাইফেল, স্টেনগান, এসএলআর, এলএমজি ইত্যাদি অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়েছিলেন। একদিন তিনি বিকেল ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ করেছিলেন। এই ঘটনাটা তার খুব মনে পড়ে। তার প্লাটুন কমান্ডার ছিল এঞহিলা। তিনি ৩-৪ টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময় তার সহযোগী একজন বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা হারিয়েছেন এবং তাকে চট্টগ্রামে সমাহিত করেন। ১৫ ডিসেম্বর তার এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে তিনি অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার নাম তালিকাভুক্ত হয়নি। [৩৭]

ঙ. প্লাটুন কমান্ডার উক্য চিং বীরবিক্রম

অসংখ্য আদিবাসী যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ বাঙালি ও আদিবাসী এক হয়ে দেশকে মুক্ত করেছিলেন। বান্দরবানের উজানীপাড়ার মারমা যুবক উক্য চিং, ১৯৭১ সালে ই.পি.আর বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং সেই অবস্থান থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ করেছেন মূলত ঃ উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর জেলায় ৮ নং সেক্টরে। অনেকগুলো উলেখযোগ্য অপারেশনে তিনি অংশ নিয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের

[৩৭] কংজরি মগ-এর সাক্ষাৎকার, ১১ এপ্রিল ২০১০, ঢাকায় গৃহীত।

জন্য আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র তিনি "বীরবিক্রম" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন প্লাটুন কমান্ডার।[৩৮]

বাই সো মারমা ও নাগ সানু মারমার সন্তান উক্য চিং মারমা। তিনি ১৯৩৭ সালে ১৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তারা দুই ভাই ও দুই বোন ছিলেন। উক্য চিং মারমার বাবা কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। বিশেষ করে কাঠের ওপর নকশার কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমের কাজ। শুধুমাত্র অবস্থাপন্ন আদিবাসীরাই কারুকাজ সমৃদ্ধ বাড়িঘর নির্মাণ করতেন। তাই বছরের বেশির ভাগ সময়ই বেকার কাটাতেন। সেই কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল। এর ভিতর দিয়েই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করতেন তিনি। উক্য চিং বান্দরবান রাজবাড়ি স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। পরবর্তীতে বাবা-মার বিবাহ বিচ্ছেদ ও আর্থিক অস্বছলতার কারণে সংসারের দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। সেই সময় তার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ইপিআর-এ চাকরির চেষ্টা করেন। সেখানে মৌখিক পরীক্ষা, শারীরিক পরীক্ষা ও মেডিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিজ যোগ্যতায় চাকরি পান। উল্লেখ্য তার সঙ্গে আরও ৯জন আদিবাসী যুবক ছিলেন তারা সকলেই চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের ১৭ই নভেম্বর ইপিআর-এ যোগদান করেন।[৩৯]

১৯৫৮ সালে তিনি বিয়ে করেন। এই সময় তিনি কোর্টচাঁদপুরে বদলী হন। সেখানে তিন বছর অবস্থান করার সময় ব্যান্ড প্রশিক্ষনের পাশাপাশি হকি খেলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের জন্য দিনাজপুর সেক্টর ১৯৬৩ সালে ইপিআর আন্তঃসেক্টর ট্রফি চ্যাম্পিয়ান হয়। পরবর্তীতে তিনি হকি টিমের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

মে মাসে লালমনিরহাটের পার্শ্ববর্তী কাউয়াহাট এলাকায় অপারেশন পরিচালনার নির্দেশ পান উক্যচিং। সেখানে উক্যচিং-এর নির্দেশে ৪জন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা একজন পাকিস্তানি হানাদারকে বেঁধে আনে, যার থেকে অনেক গুরুত্বপূণ তথ্য পাওয়া যায়। এরপর উক্যচিং সৈন্যটিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। কাউয়াহাট গ্রামে পাকিস্তানিরা বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে দেয় এবং সকল পুরুষদের ধরে এক জায়গায় এনে তাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। উক্যচিং সহযোদ্ধাদের নিয়ে লাশগুলো যথাসম্ভব সম্মানের সাথে কবর দিয়ে দেন।

তার স্মৃতিচারণ থেকে জানা গেছে যে তারা অবস্থান নিয়েছিলেন একটি নদীর পাড়ে। পরদিন পড়ন্ত বেলায় তারা দেখলেন পাকিস্তানি বাহিনী নদীর অপর পাড়ের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রাত বাড়লে উক্য চিং, তার বাহিনী নিয়ে নদী পার হলেন, সবাইকে সাবধান থাকতে বললেন – পাঞ্জাবীরা থাকলে এ্যাকশনে যেতে হবে। তারা গিয়ে দেখেন গ্রামের পুরুষ লোকগুলোকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে ঘরের চালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানীরা। পুড়ে সবার শরীর কালো হয়ে গেছে। চেনা যাচ্ছে না, কারো গায়ে কাপড় চোপড় নাই। তবে সেখানে কোন মহিলার মৃতদেহ ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা তখন অন্যপাড়া থেকে কোদাল এনে এক-একটা গর্তের মধ্যে ২/৩জন করে দাফন করলেন। মৃতের সংখ্যা ছিল ৩০জনের বেশি। কিন্তু মেয়েরা কোথায় গেল? তাদের উক্য চিং, খুঁজে পেলেন না। পেলেন একজন বৃদ্ধকে,

---

[৩৮] লে. কর্নেল (অব:) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, ইউ কে চিং, বীরবিক্রম আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা, শুধুই মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা ২০১০, পৃষ্ঠা ঃ ১৭-৪০, ৫৫-৬০।

[৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮-৩৭।

সাথে ছোট একটা বাচ্চা। তারা কচুখেতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। বুড়ো মানুষটির কাছে তিনি বিস্তারিত সব শুনলেন। মুক্তিবাহিনী সদস্যদের নদীর অপর পাড়ে ফেরত পাঠিয়ে সবশেষে উক্য চিং যখন নৌকায় ফিরছেন তখন তিনি হঠাৎ একটি বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন, এতে তার মনে হলো গ্রামের মেয়েরা হয়তো নদীর বালুচরের মধ্যে থাকতে পারে। তিনি মাঝি সহ নৌকা নিয়ে পার্শ্ববর্তী বালুচরে পৌঁছালেন, তার হাতে একটা অস্ত্র ও পিঠে ৭/৮টা গ্রেনেড বাধা ছিল। নৌকার মাঝিকে বললেন বাম সাইড দিয়ে যেয়ে বালুচরটা দেখবে, পাঞ্জাবীরা যদি লুকিয়ে থাকে তাহলে যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবে। আর যদি না থাকে তাহলে গোটা বালুচরটা ঘুরবে। এরপর উক্য চিং দেখেন বালুচরের মধ্যে ১জন ২জন ৩জন করে গর্ত করে বসে আছে, সবগুলো মেয়ে। তিনি নৌকা থেকে নামলেন, আর মাঝিকে বললেন যে কয়জন করে পারো সবাইকে পার কর। নদী পার করার পর তাদেরকে একটা প্রাইমারি স্কুলে ঢুকালেন। ওখানে যারা মাতব্বর-মাস্টার আছেন তাদের সব ঘটনা বললেন, আর ওদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর তাদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আর ৬জন সিপাহীকে ডিউটিতে রাখলেন। সারারাত এভাবে কাটার পর সকালে তাদেরকে নাস্তা-পানি খাওয়ানো হলো। তারপর সবার একটা লিস্ট করলেন এবং সবাইকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে পৌঁছে দিলেন। ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রকরা তাদের জন্য তাড়াহুড়া করে সকল প্রকার রেশনের ব্যবস্থা করে দিলেন। এভাবে গ্রামের অসহায় সদ্যবিধবা বা পিতৃ-ভাতৃহারা নারী-শিশুদের রক্ষা করেছেন আদিবাসী বীরযোদ্ধা উক্য চিং। [৪০]

ভূরঙ্গামারী থেকে পাকিস্তানি সৈন্য জয়মনিরহাটের দিকে পালিয়ে যেতে চাইলে তাদের প্রতিহত করার জন্য রোড-ব্লক পার্টি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় উক্যচিং-এর প্লাটুনকে। উক্য চিং যুদ্ধের এক পর্যায়ে মেজরের নির্দেশে তার ইউনিটের সকল সদস্যদের নিয়ে ভূরুঙ্গামারীর দিকে অগ্রসর হন। যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে বোম্বিং শুরু হলো। ইউ কে চিং তার সিপাহীদের নির্দেশ দিলেন বাংকার তৈরি করতে যাতে বোমা পড়লেও না ভাঙ্গে এবং ভেতরে মানুষ সুরক্ষিত থাকতে পারে। শ্যাওড়া গাছ কেটে সেখানে বাংকার তৈরি করা হলো এবং পাক বাহিনীরা যাতে গাড়ি নিয়ে অগ্রসর হতে না পারে সেইজন্য ৩০০ গজ দুরে মাটি উচুঁ করে রোড ব্লক দেওয়া হলো। এরপর তিনি পাকা রোডের উপরে ডানে ১ টা, বামে ১ টা অটোমেটিক এলএমজি বসিয়ে দিলেন, আর মাইনের সাথে তার লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সেগুলো বসিয়ে দিলেন এমনভাবে যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ রাস্তা দিয়ে আসার সাথে সাথে তারের সাথে ধাক্কা লেগে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়। এ ছাড়া ইউকে চিং তার সিপাহীদের ডিউটি বন্টন করে দিলেন। পরের দিন ৭জন মুক্তিযোদ্ধা উক্য চিংকে কিছু না বলে বাজারের দিকে গেলেন, তারা বুঝতে পারেননি পাঞ্জাবীরা রাস্তায় এ্যামবুশ করেছিল, সিপাহীদের দেখামাত্র পাঞ্জাবীরা ফায়ার করলে ১জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। উক্য চিং সেখানে যেয়ে দেখলেন একজন পাঞ্জাবী সৈন্য ওয়ারলেসে কথা বলছে। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি ফায়ার করেন এবং পাঞ্জাবীরা সেখান থেকে সরে যায়। তবে পাকিস্তান বাহিনীরা বুঝতে পেরেছিল ঐ লাশটি নেওয়ার জন্য মুক্তিফৌজরা এদিকে আসবে। তাই রাস্তার কিনারে তারা আবার এ্যামবুশ করে রাখে। এদিকে উক্য চিং সহ ৪/৫জন লাশটি উদ্ধার করতেগেলে পাঞ্জাবীরা ফায়ার করে। তাতে একজন সিপাহী পায়ে আঘাত পেয়ে পড়ে যান। তাকে এবং উক্য চিং-এর সাথে থাকা একজন স্বল্প বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাকে

[৪০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাবীরা হত্যা করে। লাশগুলোকেও তারা সাথে করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরের দিন ভারতের মেঘালয় থেকে ভারতীয় ফোর্স আসলো উক্য চিং -এর কাছে। ফোর্সদের ভিতরে তিনজন ছিল রাজপুত ও কয়েকজন শিখ, এক জন ছিলেন সিগন্যালম্যান, তাদের সাথে ওয়ারলেস ও ম্যাপ ছিল। ম্যাপ খুলে তারা উক্য চিং -এর কাছ থেকে ভুরঙ্গামারী বাজারের রাস্তাঘাট ও পাকিস্তান বাহিনীদের বাঙ্কার সম্পর্কে তথ্য নিলেন, এবং বাইনোকুলার দিয়ে বাজারের অবস্থান দেখে নিলেন। সেই দিন ৪ টার সময় পুরো একটা কোম্পানি নিয়ে ভারতীয় ফোর্স আসে এবং উক্য চিং -এর কাছ থেকে বাঙ্কারের দায়িত্ব বুঝে নেয়। তাদের দুজন অফিসার মিলে ২৫টা মর্টার লাগালেন। সকালে তারা যে জায়গাটা দেখে গিয়েছিলেন। সারারাত সেখানে ফায়ারিং করালেন। এই আক্রমনে কমপক্ষে ৪জন পাকসেনা খতম হয়। ভারতীয় কোম্পানি পরদিন ফিরে যায়। তারপর উক্য চিং ভুরুঙ্গামারীর দিকে আরও অগ্রসর হলো। ভুরঙ্গমারীর প্রায় মাইলখানেক আগেই উক্য চিং-এর বাহিনী সেখানে পজিশন নিলেন এবং আশেপাশে দেখে নিয়ে সেখানে বাঁশ পুতে তাবু করে থাকার ব্যবস্থা করলেন। রাত ৪ টার দিকে পাকসেনারা তাদের উপর ফায়ার শুরু করলো, কিন্তু মুক্তিবাহিনীরা কোন গুলি ছুড়লেন না। সকাল বেলা তারা, চৌধুরী হাটের দিকে অগ্রসর হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর পর একটা বিল পার হয়ে তারা বাংকার খুড়লেন। লেফটেন্যান্ট সামাদ ছিলেন তাদের সাথে; তিনি বললেন “ইউ কে সাহেব আজ ৮:০০ টার সময় Advance হতে হবে।” তিনি আরও বললেন “আপনার লোকেরা যাবে ডান সাইডে, আর আমি যাবো পাকা রোডের উপর দিয়ে”, তার কথা মতো উক্য চিং তার লোকজন নিয়ে ডান সাইডে চলে গেলেন এবং যেয়ে সেখানে মরিচা খোদাই ক'রে অবস্থান নিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর ৩জন সিকিউরিটির লোক সেটা দেখে চলে গেল। উক্য চিং তখন তার সিপাহীদের বললেন শত্রু দল এখনই ফায়ারিং শুরু করবে, কিন্তু উপায় নেই– আমরা তাদের সীমানার মধ্যে ঢুকে গেছি। ঠিক তাই হলো, সারারাত শত্রুরা ফায়ারিং করলো, ইউকে চিং সিপাহীদের নিয়ে সারারাত বাঙ্কারের ভিতরেই ছিলেন। সকালে আবার রেকি করে তারা ফিরে গেলেন। তারপর দিন, লেফটেন্যান্ট সামাদ সাহেব বললেন গতদিনের মতো করেই অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু সেখানে মরিচা খোড়া ছিলনা। লেফটেন্যান্ট সামাদ পাকা রোডের উপর দিয়ে এগোতে যেয়ে মেশিন গানের সামনে পড়লেন। গুলি তার মাথায় লাগে এবং তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাওয়ার পর রাতের আধারে দুজন মুক্তিযোদ্ধা ক্রলিং ক'রে এগিয়ে কম্বল দিয়ে লাশটাকে রোলিং করে নিয়ে আসেন। সকালে তাকে গোসল করিয়ে জানাজা পড়িয়ে ভুরুঙ্গামারীর পাশে দাফন করা হয়। ৭ দিন পরে সেখানে একটা পাকা পিলার বসিয়ে জায়গাটাকে লেফটেন্যান্ট সামাদনগর নামকরণ করেন তারা। ভূরঙ্গামারীতে উক্যচিং-এর নের্তত্বে রাতের অন্ধকারে তীব্র যুদ্ধ চলে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় পাকিস্তানি সৈন্যদের অনেকেই মারা যায় এবং অস্ত্র-শস্ত্রের ক্ষতি হয়। তখন তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উক্যচিং মুক্তিবাহিনী নিয়ে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প দখল করে। সেখানে একটি ঘর থেকে ২০জন নারী কে মুক্ত করেন। এরপর উক্য চিং তার সিপাহীদের নিয়ে আরও সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। এর মধ্যে ইন্ডিয়ান ফোর্স এসে যুক্ত হয়। পথিমধ্যে উক্য চিং দেখলেন কয়েকটি গাছের নিচে মাইন বসানো আছে এবং সেগুলো খুব কৌশলে ডালপালা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে যে, ফোর্স গাড়ি নিয়ে ঐ ডালপালার উপর দিয়ে গেলেই সেটার বিস্ফোরণ ঘটবে। উক্য চিং ভারতীয় ফোর্সকে সেটা দেখালেন এবং মাইনগুলো অকার্যকর করে দিলেন। এই এলাকার ক্ষেত মজুরদের

সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সেখানে দুজন পাঞ্জাবী সৈন্যকে আটক করে। তাদেরকে গাছের সাথে বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, জানতে চাওয়া হয় তাদের ফোর্স কোথায়? অস্ত্রসস্ত্র কোথায়? এই দুজনকে মুক্তিযোদ্ধারা চার্জ করে হত্যা করতে চাইলে উক্য চিং এই যুক্তিতে তাদের নামান যে "এদের মারলে কোন লাভ হবেনা, বরং বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ইন্ডিয়ান ফোর্স এদেরকে পাকিস্তানে পাঠাবে। ওখানে আমাদের বাঙালি ভাই আছে। একজন পাঞ্জাবী দিলে ওরা ২০জন বাঙালি ফেরত দেবে"। এরপর ঐ দুজন পাকসেনাকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে তিস্তা ব্রীজের ওপার থেকে পাঞ্জাবীরা সাদা ফ্লাগ ওড়াল। উক্য চিং তার সিপাহীদের নিয়ে গরুর গাড়িতে করে রংপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। রাত ৯টায় তিনি রংপুর পৌঁছালেন, সেখানে যেয়ে দেখেন শত্রুসৈন্য যারা সারেন্ডার করেছে তাদেরকে কলেজের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পরের দিন তিনি রংপুর টাউন হলের দিকে গেলেন। টাউন হলের পিছনে একটা ছোট্ট পাকা ব্রীজের কাছে দেখতে পেলেন রক্তে ভেজা কিছু চাটাই পড়ে আছে। একটা একটা করে মোট ৭টা চাটাই সরিয়ে দেখলেন কচুরিপানার নিচে ৭টা মেয়ের লাশ ভাসছে। লাশগুলো দেখেই তিনি বুঝলেন তাদের উপর কতটা অত্যাচার হয়েছে। তিনি খুব মর্মাহত হলেন এবং এই ঘটনার জন্য তিনি রাজাকারদের ধিক্কার জানালেন। কারণ পাঞ্জাবীরা তো জানতো না কার বাড়িতে কোন মেয়ে আছে, জানতো রাজাকাররা। তিনি অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় লাশগুলো পুকুর থেকে তোলার ব্যবস্থা করালেন।

উক্যচিং বাগভান্ডারে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জোরলো প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি প্রায়ই বিওপি থেকে ফাইটিং পেট্রল পাঠিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের অসর্তক অবস্থায় পেলে আক্রমণ করে তাদের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করতেন একদিন একটি ছোট পাকিস্তানি পেট্রল গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করেন। এই খণ্ডযুদ্ধে একজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত এবং ৩/৪জন সৈন্য আহত হন। তবে একজন কম বয়েসীমুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। বাগভান্ডারেই প্রথমবারের মত উক্যচিং ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর। ভূরঙ্গামারীতে উক্যচিং ভারতীয় বাহিনীকে রেকি করার জন্য সর্বোচ্চ সাহায্য করেন। যার ফলে পরদিন রাতে ভারতীয় দল ৬টি মর্টারের গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান আক্রমণ করতে সমর্থ হয়।[৪১]

উক্য চিং যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন যুদ্ধ যে কি ভয়াবহ তা এ প্রজন্মের অনেকেই জানেন না, লোকের মুখে শুনে বই পড়ে তারা কিছুটা ধারণা মাত্র পেয়েছে। যুদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। তিনি আরও বলেন পাকিস্তান বাহিনীরা মেয়েদের নির্যাতন ক'রে তারপর নদীর কিনারে নিয়ে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করে লাশ লাথি দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাথে ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার দেখা হয়েছে। জেনারেল অরোরা উক্য চিং -এর সাহসিকতার প্রশংসা করছেন। এবং তাকে ভারতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, বলেছেন "উক্য তুমি আমার সাথে চল, তুমি যা চাইবে তা পাবে।" উত্তরে উক্য বলেছিলেন আমার বাড়ি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টসে, ৯ মাসের যুদ্ধে আমার মা-বাবা-সন্তানরা জীবিত না মৃত কোন খবর জানি না। দেশের এবং আত্মীয়-স্বজনের

---

[৪১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫-৬১।

মায়া ত্যাগ করে তিনি যেতে পারেন নি ভারতে। অথচ উক্য চিং এর মতো একজন "বীরবিক্রম" দেশপ্রেমিক পরিবারের ১১জন সদস্য নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দিনযাপন করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। [৪২]

চ. মুক্তিযোদ্ধা সুবর্ণ চাকমা

সুবর্ণ চাকমা একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন একজন মেজর ও হাবিলদারের কাছে। প্রাথমিকভাবে অনেক আদিবাসী যুবক অস্ত্র প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দেয়। কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছিল। তার যুদ্ধ এলাকা ছিল বান্দরবান। তিনি ছোট ছোট বেশ কিছু অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন এবং পুরো নয় মাস যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীনের পর বান্দরবনে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের সাথে পাহাড়িরাও একইভাবে নির্যাতিত ছিল। পাকিস্তানিরা পুরো দেশে জুলুম চালিয়েছিল। পাকিস্তান মানেই আমাদের কাছে ছিল অত্যাচারী। [৪৩]

ছ. মুক্তিযুদ্ধে লুসাই

লুসাইরা যুদ্ধের সমর্থনে মিছিলে ও সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিবাহিনীকে পথ চিনিয়ে বর্ডার পার করে মিজোরামে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীকে সাতকানিয়া এলাকা, বিশেষ করে কক্সবাজার টেকনাফ থেকে মিজোরামের দিকে চলে যেতে সাহায্য করেছে। মুন্নম পাড়া প্রাইমারি স্কুল ঘরে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং স্থানীয় লুসাই পরিবারগুলোই যৌথভাবে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্কুলঘরে মুক্তিযোদ্ধারা আছে এই খবর পেয়ে রাজাকাররা এসেছিল স্কুল তল্লাশি করতে। স্থানীয় লুসাই লালমি থাংগার বাবা ডাঙ্গা লুসাই তখন ছিলেন পুলিশে চাকরিরত। রাজাকারের তল্লাশিকালে ঘটনাক্রমে ডাঙ্গা লুসাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজাকারদের হুশিয়ার করে তিনি বলেছিলেন শরণার্থীদের কাছ থেকে কোন অর্থ বা সম্পদ নিবানা এবং কোন নারীকে অসম্মান করবানা। সেদিন তিনি এভাবেই নারী ও মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলেন।[৪৪]

জ. মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মং রাজা মং প্রু সেইন ও রানী নিহার দেবী

১৯৭১-এর প্রাথমিক প্রতিরোধের সময় মং রাজা মং প্রু'র মানিকছড়িতে অবস্থিত রাজবাড়িটি সাধারণ জনগণের আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। রাজা তার ভাণ্ডারের সব সম্পদ আশ্রিতদের অন্ন-সংস্থানের জন্য নিয়োজিত করেন। রাজবাড়ির নানুমা দেবী হলঘর। এটা তার মা রাজকুমারী নানুমা'র নামে। তার মা রাজকুমারী নানুমা আইন শাস্ত্রের উপর ডিগ্রি

---

[৪২] মেসবাহ কামাল, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, অশ্রুসাগরে মিলিত প্রাণ ঃ মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠী, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

[৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭-৮৮।

[৪৪] লাল্লিযাং থাংগার সাক্ষাৎকার ১৬/০৭/২০০৩।

লাভ করেছিলেন এবং অত্যন্ত বিদূষী নারী ছিলেন। এই হলঘরটিকে মং প্রু সাইন রাজার স্ত্রী রানী নিহার দেবী একটি হাসপাতাল করে নিজে এবং পাহাড়ের বেশ কয়েজন আদিবাসী নারীকে নিয়ে সেবার কাজে লেগে যান। যে-সকল মেয়েরা পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়েছিলেন সেসব মেয়েদের গর্ভপাত তিনি করিয়েছিলেন। এই মেয়েরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। রানী তাদের সন্তানস্নেহে যত্ন নিয়েছেন। বেঁচে থাকার শক্তি যুগিয়েছেন। মং রাজা মং প্রু সাইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলেন। তিনি তার ৩৩টি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। সেই সাথে তার নিজের 'কার' ও কয়েকটি জিপ তাদের নিকট হস্তান্তর করেন। মানিকছড়ি পতনের পর তিনি সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ত্রিপুরার হরিনা ক্যাম্পে চলে যান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ সংগঠিত করার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন। এ সময় রাজা মপ্রু'র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার খবর বিবিসি-সহ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সকল বিবেকবান ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান।[৪৫] *মং রাজার মুক্তিযুদ্ধ*, গ্রন্থটিতে উল্লিখিত হয়েছে "বর্তমানের পুরো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাটি ছিল মং সার্কেলের অধীন একটি দেশীয় স্ব-শাসিত রাজ্য। ১ মার্চ ১৯৭১-এ জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে প্রতিবাদে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। শুরু করে দুর্বার আন্দোলন। মং সার্কেলের রাজা মপ্রু সেইন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এসকল মিটিং মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। স্বাধীনবাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ৩ মার্চ থেকেই এই পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শাখা গঠিত হয় এবং মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাটির সর্বত্রই জনতা দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন। রাজা মপ্রু সেইন তাঁর স্ব-শাসিত এই রাজ্যটির সর্বস্তরের জনতাকে ঐ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। ব্রিটিশশাসিত ভারতে স্ব-শাসিত এই রাজ্যটির রাজা বা রানীদের যে সর্বসময় ক্ষমতা ছিল, তা পাকিস্তানি শাসকরা ধীরে ধীরে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া কাপ্তাই বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পার্বত্যবাসীদের অনেক আবাদি জমি কাপ্তাই লেকের অথৈ পানির নিচে চলে যায়। সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে পার্বত্য অঞ্চলের অগণিত আদিবাসী জনগণ। পাকিস্তান সরকার এসকল সর্বস্বহারা জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেয় নি। আবাদী জমিগুলো পানির নিচে চলে যাবার জন্য তেমন কোন ক্ষতিপূরণও দেয়নি।" পাকিস্তান সরকারের উপর পাবর্তবাসীদের একটা ক্ষোভ ছিল। যার ফলে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সংগ্রামে যুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ঃ [৪৬]

[৪৫] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীরবিক্রম (বরখাস্ত), মং রাজার মুক্তিযুদ্ধ, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৭০-৭৪।

[৪৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

''পাকিস্তান সরকারের ঐ বিমাতাসুলভ আচরণে পার্বত্যবাসীরা ছিল ক্ষুব্ধ। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে তাই পার্বত্যবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে আসে। রাজা মংপ্রু সেইন তাঁর রাজ্যের রাজধানী মানিকছড়িতে অবস্থান নিয়ে এসকল আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। অবশেষে আসে ২৫ মার্চের কালো রাত্রি। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক শাসকগোষ্ঠি ঢাকার রাজপথে নামিয়ে দেয় তাদের লেলিয়ে দেয়া সেনাবাহিনী। সংগঠিত হয় মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। নিরস্ত্র দেশবাসীর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে অস্ত্রের ভাষামতেই ওদেরকে গণহত্যার সমুচিত জবাব দিতে হবে। স্বাধিকার আন্দোলন তাই প্রয়োজনের তাগিদেই সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নিয়ে নেয়। চট্টগ্রামে অবস্থিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকার গণহত্যার সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতাকামী জনতার কাতারে এসে শরিক হন। ওদিকে চট্টগ্রামে ই পি আর বাহিনীর বাঙালি সৈনিকেরাও ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর পরই ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে অবস্থান নিয়ে নেয়। খাগড়াছড়ি এবং তৎসংলগ্ন চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকার বি ও পি'গুলিতে অবস্থানরত ই পি আর বাহিনীর বাঙালি সৈনিকেরা ২৬ মার্চেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে চট্টগ্রাম শহর অভিমুখে রওয়ানা দেয়। ৩০ মার্চ চট্টগ্রাম শহরে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর পতন ঘটতে শুরু করে। ঐ একই দিন কালুর ঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটিও পাক-বাহিনী দখল করে নেয়। ২ এপ্রিলের মধ্যেই চট্টগ্রাম শহর এবং শহরতলীর সব কয়টি অবস্থান হানাদার বাহিনীর দখলে চলে যায়। হানাদার বাহিনী এবং তাদের লেলিয়ে দেয়া বিদ্রোহীরা শহর জুড়ে চালায় ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ। ভীত-সন্ত্রস্ত নগরবাসী সবকিছু ফেলে শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচার জন্য শহর ছেড়ে চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-নাজির হাট-ফটিকছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি ও রামগড় এলাকায় এসে আশ্রয় নিতে শুরু করে। চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়ক এলাকায় বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে হানাদার বাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধ চলার কারণে ঐ পথ হয়ে বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলার লোকজনের চলাচল নিরাপদ ছিল না। ফলে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য জেলার লোকেরা হাটহাজারী-নাজির হাট-ফটিকছড়ি-নারায়ণ হাট-হেঁয়াকো-রামগড় অথবা হাটহাজারী-নাজিরহাট-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-ডানছড়ি-রামগড় হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে গিয়ে ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ বা ভারতীয় এলাকা হয়ে নিজ নিজ জেলার গ্রামাঞ্চলের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে শুরু করে। নর-নারী শিশুসহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঐ জনস্রোত মানিকছড়িতে এসে জমায়েত হতে থাকে। ক্রমেই রাজা মংপ্রু সেইনের মানিকছড়ি রাজবাড়িটি অসহায় জনতার একটি আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসকল অসহায় মানুষের মুখে অন্ততঃ একমুষ্টি অন্ন তুলে দেবার জন্য রাজা মংপ্রু সেইন তাঁর রাজভান্ডার খুলে দেন। রাজবাড়ির বিশাল আকারের রান্না ঘরটিতে (যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে) বড় বড় হাড়িতে পাক চলতে থাকে রাত দিন ভর। রাজা মংপ্রু সেইন অকাতরে এসকল মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবার সর্ববিধ ব্যবস্থা নেন। রাজবাড়ির নানুমা দেবী হল ঘরটি রূপ নেয় একটি হাসপাতালের। রাজা মংপ্রু সেইনের স্ত্রী রানী নিহার দেবী নিজেই ধাত্রী হিসেবে লেগে যান অসুস্থ মা-বোনদের চিকিৎসা-সেবায়। গর্ভবতী মা-বোনদের গর্ভপাত নিজ হাতেই করতে লাগলেন। রানীকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে পার্বত্যবাসী মা-বোনেরা। সে ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য! মানবতার সেবায় এমন দৃষ্টান্ত, যা ইতিহাসে বিরল। একাত্তরের অবস্থানে নিজেকে

না ফেলা পর্যন্ত এমনতর দৃশ্যের কল্পনা করাও আজ অসম্ভব। রাজা মপ্রু সেইন রামগড় পর্যন্ত পথিমধ্যে তাঁর প্রজা সাধারণকে সর্বস্ব দিয়ে এসকল অসহায় ও আশ্রয়প্রার্থী জনসাধারণের খাবার-দাবার ও আশ্রয় দেবার নির্দেশ পাঠান। দরিদ্র পার্বত্যবাসীরাও তাদের রাজার নির্দেশ মান্য করেন অক্ষরে অক্ষরে। ”

মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীর আশ্রয় ও প্রতিরোধ সংগ্রাম-এর বিষয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ[৪৭]

‘‘হাজার হাজার শরণার্থীর আশ্রয়, খাবার এবং চিকিৎসা দানের পাশাপাশি রাজা মপ্রু সেইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে শত্রুমুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রজাসাধারণকে সাথে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর এবং মুক্তিবাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যদেরকে মানিকছড়ি এবং রামগড় প্রতিরক্ষার কাজে তাঁর নিজস্ব বিভিন্ন ধরণের ৩৩টি আগ্নেয়াস্ত্র বিতরণ করেন। ওদিকে রামগড়ের প্রতিরক্ষা কাজেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে থাকেন। রামগড়ে এ সময় মেজর জিয়াউর রহমান হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজা মপ্রু সেইন মেজর জিয়াকে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে তাঁর নিজের এবং রাজ্যের প্রজা সাধারণের পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রাজা মপ্রু সেইন তাঁর নিজস্ব প্রাইভেট কার এবং জীপগুলো মুক্তি বাহিনীর কাজে নিয়োজিত করেন। ঐ সময় মহলছড়িতে মিজোরামের বিদ্রোহীদের দু'টি ব্যাটেলিয়ন অবস্থান নিয়ে ছিল। মিজো ব্যাটেলিয়ন দু'টি দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। রাজা মপ্রু সেইন মিজো ব্যাটলিয়ন দু'টির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনার জন্য রামগড়ে গিয়ে ভারতীয় বিএসএফ অফিসারদের সাহায্য কামনা করেন। ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী রাজা মপ্রু সেইনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করেন। বিএসএফ এর একটি ব্যাটেলিয়ন রামগড়-মহলছড়ি পাহাড়ি পথে অবস্থান নিয়ে কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি-মহলছড়ি হয়ে মেজর মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে রামগড়ের উদ্দেশে অগ্রসরমান বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যদের পশ্চাদাপসরণে সাহায্য করে। ৩০ এপ্রিলে অগ্রসরমান পাক-বাহিনী তিনদিক দিয়ে রামগড়কে ঘিরে ফেলেছিল। মানিকছড়ি এবং রামগড়ের পতন ছিল তখন অত্যাসন্ন। তড়িঘড়ি করে রাজা মপ্রু সেইন তাঁর রাজবাড়ির সদস্যদেরকে ভারতের সাবরুমে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। ৩০ এপ্রিল এবং ১ মে ৭১-এ দু'দিন রাজপরিবারের সদস্যরা মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার ও আসবাবপত্র রাজবাড়ির বিভিন্ন স্থানে গর্ত করে পুঁতে যাবার কাজে নিয়োজিত থাকলেন। ২ মে '৭১-এ খুব ভোরে রাজা মপ্রু সেইন তাঁর রাজ পরিবারের সদস্যদেরকে নিজস্ব দুটি গাড়িতে করে জালিয়াপাড়া হয়ে রামগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। রামগড়ে পৌঁছেই তিনি মেজর ও ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে দেখা করেন। ঐদিন সকাল থেকেই রামগড় শহরের উপর শত্রুর ব্যাপক আর্টিলারীর গোলা বর্ষণ চলছিল। পাক-বাহিনীর কিছু গোলা ভারতীয় এলাকার সাবরুম শহরের উপরেও গিয়ে পড়ছিল। রামগড়ের পতন অত্যাসন্ন ভেবে রাজা মপ্রু সেইন প্রচন্ড গোলা-গুলির মধ্যেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রামগড় শহর সংলগ্ন নদীটি অতিক্রম করে সাবরুমে গিয়ে পৌঁছান।

[৪৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম শহরটিও তখন নিরাপদ ছিল না। কারণ মাঝে মধ্যেই পাকিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত আর্টিলারীর গোলা এই শহর ও শহরতলী এলাকায় পড়ছিল। এই দিনই সন্ধ্যার পর রাজা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইতোমধ্যেই মুক্তিবাহিনীর জন্য স্থাপিত হরিণা ক্যাম্প সংলগ্ন রূপাইছড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। রূপাইছড়িতে স্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য এক বিশাল ক্যাম্প। অন্যান্য শরণার্থীদের মতই রাজা মংপ্রু সেইন তাঁর রাজপরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেন। রূপাইছড়িতে অবস্থান নিয়ে রাজা মংপ্রু সেইন পার্শ্ববর্তী হরিণা ক্যাম্পের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের রিক্রুটিং, সামরিক প্রশিক্ষণদান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা পদ্ধতির ছোটখাটো অপারেশন পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে থাকেন। ওদিকে বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকরা রূপাইছড়ি এবং হরিণাক্যাম্পে এসে রাজা মংপ্রু সেইনের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেন। ৭১-এর মে মাসের মাঝামাঝি বি বি সিসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে রাজা মংপ্রু সেইনের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংবাদ ফলাও করে প্রচার হতে শুরু করে। আমাদের মহান স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে রাজা মংপ্রু সেইনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রূপাইছড়ি ও হরিণাক্যাম্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎকারদান করে রাজা মংপ্রু সেইন আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার আবেদন জানান। ”

এক পর্যায়ে রাজা মংপ্রু সেইনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে

‘‘রাজা মংপ্রু সেইনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর জন্য একটি বিষকাঁটা সম। রাজা মংপ্রু সেইনকে হত্যা অথবা ছিনতাই করে নেবার জন্য দখলদার পাক বাহিনী মরিয়া হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে তারা খাগড়াছড়ির পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থানকারী মিজো বিদ্রোহীদের নিয়োজিত করে। এ সংবাদ যথাসময়ে ভারতীয় বিএসএফ অফিসারদের নিকট পৌঁছে যায়। রাজার নিরাপত্তার জন্য বিএসএফ বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার পরও অল্পের জন্য রাজা মংপ্রু সেইন কয়েকবারই ছিনতাই হবার হাত থেকে রক্ষা পান। রূপাইছড়িতে রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গের অবস্থান দিন দিনই বিপদ সঙ্কুল হয়ে ওঠে। আগস্ট মাসের প্রথম দিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রাজা মংপ্রু সেইন এবং তাঁর রাজপরিবারের সদস্যদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন। আগরতলায় ঐতিহাসিক ‘প্রসন্ন সদনে’ রাজা মংপ্রু সেইন এবং তাঁর রাজ পরিবারের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ”

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার বিষয়টি প্রচারিত হয়।

‘‘আগরতলায় অবস্থান করে রাজা মংপ্রু সেইন মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সাংগাঠনিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তাছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এম এন এ এবং এম পি এ-দের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডেলিগেশন এবং সংবাদ

সংস্থার লোকজনকে সাক্ষাৎকার দেয়া ছাড়াও এখানে অবস্থানকালে তিনি বেশ কয়েকটি এ্যামবুশ ও রেইড ধরনের অপারেশনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। রাজা মংপ্রু সেইন ছিলেন একজন চৌকস সুটার। তিনি তাঁর ঐ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। আগরতলায় অবস্থানকালেও রাজা মংপ্রু সেইনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সংবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হয়।"

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং দালালরা রাজার বাড়িটি দখল করে নেয়

"ওদিকে রাজা মংপ্রু সেইনকে ছিনতাই করে নেবার সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পাকদখলদার বাহিনী তাঁর মানিকছড়ির রাজবাড়িতে তাদের আঞ্চলিক সদর দফতর স্থাপন করে। দখলদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দালালরা রাজার সব কয়টি গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া জবাই করে খেয়ে ফেলে অথবা লুট করে নিয়ে যায়। রাজবাড়ির সকল মূল্যবান আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। রাজার নিজস্ব চিড়িয়াখানার দুস্প্রাপ্য প্রাণীগুলোও লুট করে। পুরো রাজবাড়িটিকে একটি আর্মি ক্যাম্পের নিজস্ব রূপ দেয়। রাজার রাজভান্ডার শূন্য করে সব কিছুই লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বার্মার কারিগর দিয়ে তৈরি রাজার বহু মূল্যবান ফার্নিচারগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। রাজবাড়ির শস্যভান্ডারে রক্ষিত কয়েকশ মণ ধান ও চাউল লুণ্ঠণ করে। রাজার মূল্যবান হাতি ও ঘোড়াগুলোও বিক্রি করে দেয়। দখলদার বাহিনী তছনছ করে দেয় পুরো রাজবাড়িটি। আগরতলায় অবস্থান করেই রাজা মংপ্রু সেইন বিভিন্ন লোক মারফৎ দখলদার পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক রাজবাড়িতে সংগঠিত ধ্বংসযজ্ঞ এবং লুটপাটের এসকল সংবাদ পান।"

এসকল সংবাদ তিনি মোটেই বিচলিত হননি। তাঁর একটিই কথা ছিল "মাতৃভূমির স্বাধীনতার চেয়ে আমার রাজত্ব বা রাজভান্ডারের মূল্য কোন অংশেই বেশি নয়"। রাজত্ব, রাজ্য এবং রাজভান্ডারের সব কিছুই পিছনে ফেলে রেখে রাজা মংপ্রু সেইন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কাজেই রাজভান্ডার বা রাজবাড়ির সব কিছুই লুট করে নেবার সংবাদে তিনি তার দেশের সেবার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। লেখক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, অথচ ঐ একই সময়ে এদেশের অগণিত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা সামান্য চাকরির লোভ সংবরণ না করতে পেরে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নি। [৪৮] একাত্তরের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে রাজা মংপ্রু সেইন এবং তাঁর রাজপরিবারের সদস্যদেরকে ত্রিপুরা মহারাজার রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়। ত্রিপুরার রাজ পরিবারটি বহুকাল আগেই বিবাহ সূত্রে মং রাজ পরিবারের সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজা কিরিত বিক্রম সাদরে রাজা মংপ্রু সেইনের পরিবারের সদস্যদের তাঁর রাজপ্রাসাদে স্থান দেন। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত রাজা মংপ্রু সেইনের পরিবার মহারাজার বাড়িতেই শরণার্থী হিসেবে জীবনযাপন করেন। গ্রন্থটিতে আরও উল্লিখিত হয়েছে ঃ[৪৯]

[৪৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮-৫৯।
[৪৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬০-৬১।

> ''১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে রাজা মপ্রু সেইন মিত্র বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসাররা রাজা মপ্রু সেইনকে অনারারী কর্নেল র‍্যাঙ্ক প্রদান করে তাদের একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠান। আখাউড়া অপারেশনে মিত্রবাহিনীর হয়ে রাজা মপ্রু সেইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আখাউড়া পতনের পর তিনি মিত্রবাহিনীর ইউনিটের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসেন। আশুগঞ্জ এবং ভৈরব অপারেশনে রাজা মপ্রু সেইন অংশগ্রহণ করেন। ১৭ ডিসেম্বর রাজা মপ্রু সেইন মিত্রবাহিনীর ইউনিটের সাথে শত্রুমুক্ত ঢাকা শহরে এসে পৌঁছান। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজা মপ্রু সেইন পুনরায় আগরতলায় ফিরে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রামগড় হয়ে মানিকছড়িতে ফিরে যান। রামগড় থেকে মানিকছড়ি যাবার পথে হাজার হাজার পার্বত্যবাসী রাজপরিবারকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানান। রাজবাড়িতে ফিরে এসে রাজপরিবারের সদস্যদের এক বেলা আহারের জন্য একটি প্লেট বা একটি হাড়িরও ব্যবস্থা ছিল না। ফটিকছড়ি থেকে ভাড়ায় নেয়া হাড়ি-পাতিল বা বাসন-কোসন দিয়ে রাজা মপ্রু সেইনের রাজ পরিবারের সদস্যদের প্রথম আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালে রাজবাড়ির সব কিছুই দখলদার পাকিস্তান বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় লেলিয়ে দেয়া রাজাকাররা লুট করে নিয়েছিল। ঐ ধ্বংসস্তপের মধ্যেই রাজা তাঁর রাজবাড়ির পুনঃনির্মাণ এবং কৃষি কাজের মাধ্যমে রাজবাড়িকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রজাদের সার্বিক কল্যানেও তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেন। ''

মুক্তিযুদ্ধকালীন দখলদার পাকিস্তান বাহিনী রাজা মপ্রু সেইনের রাজবাড়ি ধ্বংস ও রাজভাণ্ডার লুট করেই ক্ষান্ত থাকে নি। মং সার্কেলের বিকল্প রাজা হিসেবেও তারা অন্য একজনকে দাঁড় করিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। রাজা মপ্রু সেইন-এর মুক্তিযুদ্ধে অবদানকে লেখক মূল্যায়ন করেছেন এভাবেঃ[৫০]

> ''যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরকার রাজা মপ্রু সেইনকে উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন হলে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য রাজা মপ্রু সেইন তাতে যোগ দেন। বঙ্গবন্ধু রাজা মপ্রু সেইনকে চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার গভর্নর হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। ১৫ আগস্ট ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে রাজা মপ্রু সেইনের গর্ভনর হিসেবে আর দায়িত্ব পালন করা হয় নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে রাজা মপ্রু সেইনের পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের পুনর্বাসন, অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিনিয়ে একটি ডেলিগেশনের নের্তৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। ঐ ডেলিগেশনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও ছিলেন। রাজা মপ্রু সেইন সব সময়ই তাঁর প্রজা সাধারণের মঙ্গল কামনায় ছিলেন সচেষ্ট। ১৯৮৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাজা মপ্রু সেইন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বা তার বিশালক্ষতিপূরণের জন্য কিছুই পান নি। কোন সরকারই আর্থিক কোন সাহায্য বা অনুদান দেয়নি ধ্বংস্তুপে পরিণত রাজবাড়িটি পুনঃনির্মাণে।''[৫১]

[৫০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।
[৫১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।

আলোচনায় এটা প্রতিয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-লুসাইসহ অন্যান্য জাতির অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক বিবেচনায় আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, লিয়ান পুম বম, মং কয্য জাই মারমা, মংসা থেয়াই চৌধুরী মারমা, লে. কর্নেল (অব.) মণীশ দেওয়ান, বরেন ত্রিপুরা, জ্যোতিবিকাশ চাকমা, কুমার কোকোনাদ্রাক্ষা রায়, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান, রসময় চাকমা, ড. কানিস্ক, তাতিন্দ্রলাল চাকমা, রণ বিক্রম চাকমা, রণজিৎ দেব বর্মণ, সমর চক্রবর্তী, ধীমান বড়ুয়া, ভূবন ত্রিপুরা, নীলা মোহন ত্রিপুরা, অশোক মিত্র কারবারী, গৌতম কুমার চাকমা, সুধা সিন্ধু খীসা, রঞ্জিত ত্রিপুরা, রাজেন্দ্র ত্রিপুরা এবং আচার্য্য জ্যোতিপাল মহাথেরো প্রমুখ। জনাব এইচ, টি, ইমাম তার লেখা *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* গ্রন্থে উলেøখ করেছেন যে মং রাজা মেজর মীর শওকত আলীকে মার্চ-এপ্রিল মাসে সহযোগিতা করেছেন।[৫২] পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্যোতিপাল মহাথেরোকে প্রবাসী বাংলাদেশী সরকারের বিশেষ ভ্রাম্যমান দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের অনুরোধে সেই দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নেন। বৌদ্ধ প্রধান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি প্রচার চালিয়েছিলেন।[৫৩]

৬. উপসংহার

পাকিস্তানের কাঠামোয় বাঙালিদের সংগ্রাম ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য, সুশাসনের জন্য এবং এই আন্দোলনে আদিবাসীরা সম্পৃক্ত ছিলেন। ৬৯-এর গণআন্দোলনে পাহাড়ি জনগণের অংশগ্রহণ ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার মানুষের উপর যে বঞ্চনা, অবহেলা, অন্যায় করেছিল পাহাড়িরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পাহাড়িরা মনে করতেন বাংলাদেশের জনগণের সাথে তাদের ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা। বাঙালিরা মুক্তি পেলে, স্বাধিকার পেলে নিশ্চয়ই পাহাড়িরাও স্বাধিকার পাবে, স্বাধীনতার সুফল পাবে। তারা বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ যার মাধ্যমেই হোক বাংলাদেশ মুক্ত হলে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুশাসনের জন্য বাঙালির এ লড়াইকে পার্বত্য আদিবাসীরা নিজেদের লড়াই ভেবেছেন। তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সকল পাহাড়ি জাতির অকুন্ঠ সমর্থন ছিল।

এম এন লারমা, সন্তু লারমা'র নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড়িদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য একটা সভা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ ও তালিকাভুক্তির জন্য ২৬ মার্চ সকালে এম এন লারমার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শতাধিক আদিবাসী ছাত্র সারিবদ্ধভাবে লাইন করে ডিসি অফিসে যান; পাহাড়ি বাঙালি সবাই তিন দিনের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও শারীরিক কসরত প্রভৃতির ট্রেনিং নিয়েছিলেন – কিন্তু পাহাড়িদের সম্পর্কে বাঙালিদের সন্দেহ

[৫২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮।

[৫৩] মেসবাহ কামাল ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, অশ্রুসাগরে মিলিত প্রাণ : মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠী, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭ এবং এইচ. টি. ইমাম, বাংলাদেশ সরকার **১৯৭১**, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৭।

ও অবিশ্বাস ছিল যা এই গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। পাহাড়িরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যের জোগান, অস্ত্র বহন, তথ্য দেওয়া এমনকি অনেককে গহিন অরণ্যে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তবুও বাঙালি নেতৃত্ব আদিবাসীদের সাধারণভাবে বিশ্বাস করেননি। তাছাড়া এ অধ্যায়ে পাকিস্তান বাহিনী ও মিজোবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষের কথা উল্লিখিত হয়েছে যার ফলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী একটি সংকটপূর্ণ অবস্থায় পড়েছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে যারা জেনারেল জিয়ার উপর মিজোবাহিনীর অতর্কিত হামলা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালি সন্দেহ বাড়াতে সহায়তা করেছিল। কারণ তিনি ধরে নিয়েছিলেন পাহাড়িদের আমন্ত্রণেই মিজোবাহিনী তাদের উপর আক্রমন করেছিল। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত এই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী জনগণও সামিল হন। অসংখ্য আদিবাসী কৃষক ও জুমচাষীরা হাতে অস্ত্র তুলে যুদ্ধ করেছিলেন, অসংখ্য আদিবাসী নারী ধর্ষিত হয়েছেন যা এই গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাক্ষাৎকার এবং দ্বৈতয়িক উৎস পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই গবেষণায় যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রণবিক্রম ত্রিপুরা, হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা, মংসা থোয়াই চৌধুরী, কংজরি মগ, রাজা মংপ্রু সেইন, উক্য চিং বীরবিক্রম প্রমুখ। কিন্তু আদিবাসীদের প্রতি বাঙালি নেতৃবৃন্দের অবিশ্বাস স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই কিভাবে নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তার বিবরণ আমরা দেখবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক "জুম্ম-জাতীয়তাবাদ"-এর তত্ত্বায়ন ও তার প্রয়োগ

১. সূচনা

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে স্বাধীনতার উষালগ্নে পার্বত্য আদিবাসীদের উপর মুক্তিবাহিনীর কর্তৃক নির্যাতন, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞের অভিযোগ, এবং রাজাকার দমনের নামে বিডিআর ও পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ এবং বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংসের বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্যাঞ্চলের স্বায়ত্বশাসন চেয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ, উত্থাপিত দাবিসমূহ, বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামারুজ্জামান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের সাথে বৈঠক এবং এসবের ব্যর্থতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন; এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক কাঠামো; পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও জুম্ম জাতীয়তাবাদের বিকাশ, মওলানা ভাসানীর সাথে এম এন লারমা ও রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎ ও শান্তিবাহিনীর জন্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আরও পর্যালোচিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর রাঙ্গামাটি সফর এবং 'উপজাতি'দের বাঙালি হয়ে যাবার আহবান, ঐ বছরেই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বিজয় এবং ১৯৭৪-এ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বোধোদয় প্রসঙ্গ। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক হত্যাকান্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির উপর তার প্রভাবের উপরও এই অধ্যায়ে অলোকপাত করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার উষালগ্নে পার্বত্য আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন বাংলাদেশের জন্ম হয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি বলে আদিবাসীরা অভিযোগ ক'রে থাকেন। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করেছিলেন এই বিষয়টিকে অজুহাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের 'পাকিস্তানপন্থী' বলে চিহ্নিত করা হয় এবং পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনা ঘটায়। আদিবাসী নেতা রূপায়ন দেওয়ান অভিযোগ করেছেন যে ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর পানছড়ি বাজারের নিকট কয়েকজন পাহাড়িকে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী। আরও অভিযোগ যে দেশ স্বাধীন হবার পর, ১৯৭২ সালে, রাজাকার নিধনের নামে বিডিআর ও পুলিশ নির্যাতন চালায় আদিবাসীদের উপর, এর মধ্যে দীঘিনালা ও বরকলের ঘটনা ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। [১]

[১] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩।

২.১. মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে হত্যাকান্ড ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞের অভিযোগ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষালগ্নে পার্বত্য আদিবাসীদের উপর মুক্তিবাহিনীর নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান: [২]

> "১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে, যত দূর মনে পড়ে, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে তাইন্‌ডং দিয়ে মুক্তিবাহিনীর একটি গ্রুপ বাংলাদেশে প্রবেশ ক'রে। সেখান থেকে তারা সরাসরি পানছড়িতে আসে। পানছড়িতে এসে রাস্তার দুপাশে যে চাকমা গ্রামগুলো ছিল সেগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। 'চাকমা রাজা পাকিস্তানের পক্ষে, তাই চাকমা কমিউনিটির সবাই পাকিস্তানের পক্ষে, এরা রাজাকার' – এই অভিযোগে ইপিআরের, সম্ভবতঃ এক্স-সুবেদার, খায়রুজ্জামান-এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বাহিনী রাস্তার দুপাশে সব চাকমা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।'
>
> 'ঘর-বাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেকেই ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। মারা গেছে মনে হয় এক/দুই জন, কিন্তু আহত হয়েছে অনেকজন; পোর্টার যারা ছিল তাদেরকেও এরা কাজে লাগাইছে। এইভাবে করতে করতে তারা খাগড়াছড়ি চলে আসে। খাগড়াছড়িতে আসার পরে রাতের বেলা রেপিং, আর্সনিং, লুটিং এসব চালাতে থাকে খায়রুজ্জামান-এর এই গ্রুপটা।'
>
> 'পরে রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কর্নেল পুরকায়স্থ-এর কাছে যেয়ে সবাই অভিযোগ করলো যে 'খাগড়াছড়ি, পানছড়ি এসব এলাকার সবকিছু শেষ'। তখন অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য তিনি একটা টিম পাঠান। চারজনকে নিয়ে একটা টিম – উগ্য জাইন, রণবিক্রম ত্রিপুরা, আমি ও প্রভুদান চৌধুরী – এই চারজনকে নিয়ে টিমটা গঠিত হয়।'
>
> 'আমরা গিয়ে খায়রুজ্জামানের সাথে কথা বললাম। তিনি দিনে-রাতে মদ খেতেন, আর তার লোকজন লুটপাট করতো।'
>
> 'আমরা গেলাম তখন ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরপরই, ২০/২১ তারিখের দিকে হবে। ওখানে হাহাকার অবস্থা। মনে মনে পাহাড়িরা সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু কি হয়ে গেল আমাদের অবস্থা! আমরা যেয়ে উনার সাথে আলাপ করার পরেও কিন্তু অপকর্মগুলো তিনি বন্ধ করেননি।"

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার খায়রুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন আরেক মুক্তিযোদ্ধা ও তদন্ত টিমের অন্যতম সদস্য যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা :[৩]

> "উনি তো মদ্যপ অবস্থায়। আমরা যখন কথা বলতে গেলাম তখন উনি ঘুম থেকে সবে উঠেছেন, চোখগুলো লাল। উনি বললেন, 'চাকমারা সব রাজাকার, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে – তাদের ভাগ্যে এটাই

---

[২] যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১২/০৫/২০১৫।

[৩] ঐ।

হবে।' আমরা বললাম, 'ভাই, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও সবাই তো ভারতে যেতে পারেনি, এখানে থেকেও অনেকে কাজ করছে। রাজাকার-আলশামস-আলবদর বাহিনীতেও পাহাড়িরা অনেকে গেছে, এটাও ঠিক। তবে কে রাজাকার, কে রাজাকার নয়, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সেটা চিহ্নিত হওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।' কিন্তু এসব ব'লে তাকে বোঝানো গেলো না। আমরা বুঝলাম এভাবে কিছু হবে না, আমরা তখন রাঙ্গামাটিতে লোক পাঠিয়ে কর্নেল পুরকায়স্থে'র কাছে সব রিপোর্ট করলাম। তিনি মেজর উগাম সিং-কে খাগড়াছড়ি পাঠালেন।'

'মেজর উগাম সিং আমাদেরকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন। উনাকে আমরা সব দেখালাম। কোথায় কি পুড়িয়ে দিয়েছে, কোথায় কি হয়েছে – সব দেখালাম। খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি থেকে পানছড়ি, পানছড়ি পেরিয়ে আরও অনেক দূর – প্রায় সীমান্ত পর্যন্ত গেছি। কয়েক শ' বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল – এক জায়গায় না, বিভিন্ন জায়গায় পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'এগুলো কি সব চাকমা বাড়ি ছিল, না অন্যান্য জাতির বাড়িও ছিল' এই প্রশ্নের উত্তরে যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা জানান: [৪]

'চাকমা বাড়ি বেশি ছিল। কারণ এর আশেপাশে ত্রিপুরা ও মারমারা তেমন ছিলনা। চাকমা বাড়ির খোঁজ খবর নিয়েই ওরা পুড়িয়েছে।'

'মেজর উগাম সিং-এর সাথে দুই প্লাটুন তিব্বতী আর্মী ছিল, দালাই লামার ভক্ত। তিনি খায়রুজ্জামানকে ক্লোজড ক'রে, ডিসআর্ম ক'রে, চাঁদের গাড়ি এনে তাদের তুলে দিলেন; বললেন 'ভাগো'। মানে, খাগড়াছড়ি থেকে তাদের বের ক'রে দিলেন। ওরা আর ফিরে আসেনি।"

খাগড়াছড়ি-পানছড়ির এই ঘটনায় ১৬ জন মারা যায়নি, মারা গেছিল ১ বা ২ জন; বাকিরা আহত হয়েছে।

খাগড়ছড়িতে তখন অনেক টেনশন, সবাই তখন ভায়োলেন্ট। উগাম সিং একটা মাঠে জনসভা করে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তার দুই-তিনদিন পর তিনি রাঙ্গামাটি ফিরে যান।"

যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, মুক্তিবাহিনীর একটি ইউনিটের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে শেষাবধি বন্ধ হয়। তবে তখন বা পরবর্তীতে কখনো এই হতাহতের বা ধর্ষণ ও শত শত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার কোন বিচার হয়নি। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিরাপরাধ ১ বা ২ জন গ্রামবাসী নিহত হওয়ার পাশাপাশি বহু মানুষের আহত হওয়া, বহু ধর্ষণ এবং শতশত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা পাহাড়িদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত চাকমা-প্রধান খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে। আর জনমুখের বিবরণীতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ঊষালগ্নে এই ধরনের ঘটনা আদিবাসীদের উদ্বিগ্ন ও হতাশ করে তোলে।

---

[৪] ঐ।

২.২. রাজাকারদের চুরি-ডাকাতি-লুটতরাজ এবং রাজাকার দমনের নামে বিডিআর ও পুলিশের নির্যাতন

১৯৭২ সালে রাজাকার দমন এবং দমনের নামে বিডিআর ও পুলিশের নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা তার সাক্ষাৎকারে জানান ঃ [৫]

> "মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার খায়রুজ্জামানের চাকমা-বিরোধী সহিংসতা নিয়ে তদন্ত করতে আমরা যখন খাগড়াছড়ি গেলাম তখন খবর পেলাম দুইজন পাহাড়ি রাজাকার সারেন্ডার করতে এসেছে, কিন্তু তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। এই মেরে ফেলার পরে ভয়ে কেউ আর সারেন্ডার করতে আসেনি। এরপর এসব রাজাকাররা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন স্থানে চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ শুরু করে। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে।'
>
> 'রাত্রিবেলা করে রাজাকাররা ডাকাতি করত, তখন আবার এদের দমন নীতির নামে পুলিশ-বিডিআর এসে সাধারণ পাবলিকদের উপর অত্যাচার করতো।'
>
> 'এরপর আমরা তৎকালীন ডিসি আহমেদ শরীফের তত্ত্বাবধানে একটি টিম গঠন করে 'শান্তি মিশন' করি – জনমানুষকে ডাকার জন্য, বন-জঙ্গলে যারা লুকিয়ে আছে, লুটতরাজ করছে, তাদেরকে বোঝানোর জন্য। ঐ সময়ে আতিকুর রহমানও ছিল, আমি ছিলাম, কল্পরঞ্জন চাকমা, তিলক চন্দ্র চাকমা, এ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা ছিলেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মিটিং করলাম। মিটিং করে বললাম তারা (রাজাকাররা) আসুক, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু কেউ আসলো না। বনে-জঙ্গলে থাকতো, মাঝে মাঝে ডাকাতি করতো। ওদের একজন কমান্ডার ছিল বিজয় সিংহ চাকমা, ইন্টারমিডিয়েট পাশ। আরও দু-একজন কমান্ডার ছিল।
>
> 'ওদিকে আবার পুলিশ-বিডিআরে'র নির্যাতন। লোকজনের জীবন অতিষ্ঠ। ত্রাহি ত্রাহি ভাব।'

২.৩. সমস্যা নিরসনে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ

দেশ স্বাধীন হবার পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা থেকে পরিত্রান পাওয়ার আশায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চারুবিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে ঢাকায় সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা। তিনি তার সাক্ষাৎকারে জানান যে:

> 'এই অবস্থার নিরসনে আমরা ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধুর সাথে ঢাকায় দেখা করি। সেখানে আমিসহ চারুবিকাশ চাকমা ছিলেন, তিনি তখন অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। তার নেতৃত্বে আমরা দেখা করি। উগ্য জাইন, মং সানু চৌধুরী, মথুরা লাল চাকমা, চন্দ্রঘোনার ফুটবল প্লেয়ার মারি – তিনি ছিলেন মারমা, রণবিক্রম ত্রিপুরা, আমি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন বাঙালি – আমরা ছিলাম

[৫] ঐ।

মোট ৭ জন। আমরা শেখ ফজলুল হক মনি ভাইয়ের মাধ্যমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করি, সুগন্ধাতে। আমাদের সাথে রাজ্জাক ভাই এবং খুব সম্ভবতঃ তোফায়েল ভাই-ও ছিলেন।'

'আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাদের সমস্যার বিষয়ে কথা বলার পূর্বে তিনি বললেন যে হানাদার বাহিনী আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, তোমরা এখন দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ কর। আমাদের টীম লিডার চারুবিকাশ চাকমা বঙ্গবন্ধুকে বললেন যে, আমাদের পাহাড়েতো অনেক সমস্যা হয়ে গেছে, কেউ কেউ তো দেশ ছাড়ার কথা ভাবছে। তখন বঙ্গবন্ধু সম্মতি দিয়ে বললেন বড় একটা বিপ্লব হয়ে গেছে এখানে, এর মধ্যে কিছু অঘটন যে হয় নাই তা নয় – আমি বিশ্বাস করি। যা হয়ে গেছে আর হবে না, পাহাড়ে যে জনগণ আছে তারা আমাদেরই দেশের লোক, আমাদের দেশেই তারা থাকবে, অন্য কোনো দেশে যাবে না।'

'চারুবিকাশ চাকমা একটি লিখিত দাবিনামাও এনেছিলেন, যেটা আমাদের বলেননি, সেখানে স্বায়ত্তশাসনের কথাও ছিল।"

২.৪. বিডিআর ও পুলিশের অব্যাহত অপতৎপরতা ঃ রাজাকার খোঁজার নামে গ্রামবাসীদের মারধর, লুট, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ

প্রদীপ্ত খীসা লিখেছেন যে, স্বাধীনতার পর পরই পুলিশ-বিডিআর রাজাকার খোঁজার নাম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায়। মারধর, লুট, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ছিল সাধারণ ঘটনা। নিচের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তার সাক্ষ্য বহন করে ঃ [৬]

খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি

১. ১০ জুন, ১৯৭২ ঃ ভাইবোনছড়া ক্যাম্পের ৪জন বিডিআর স্থানীয় রাস্তার ধারে কর্মরত একজন চাকমা ও একজন মারমা মেয়েকে নিকটস্থ বৌদ্ধমন্দিরে নিয়ে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

২. ১১ জুন, ১৯৭২ ঃ বিডিআর ক্যাম্প ইন-চার্জ ও তার সহকারীরা মাইসছড়ি গ্রামের নন্দকিশোর চাকমার বাড়িতে হানা দিয়ে তার ১১ বছরের কিশোরী কন্যা পূণ্যলতাকে ধর্ষণ করে।

৩. ২৭ জুন, ১৯৭২ ঃ পানছড়ি ক্যাম্পের একদল বিডিআর করল্যাছড়িতে গিয়ে ৪/৫জনকে গ্রেফতার করে রাজাকার সন্দেহে। সেই সাথে সুরজয় কার্বারীর দুই মেয়ের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

৪. ২৮ জুলাই, ১৯৭২ঃ বেলা ৩টার সময় ৯জন বিডিআর রাজাকার তল্লাশির নামে বাঘাইছড়ির পুনর্বাসিত গ্রামগুলোতে তল্লাশি করে। রাজাকারের সন্ধান না পেয়ে তারা অনাময়া চাকমা, কুচ্ছদেবী তালুকদার ও নিন্দারানী চাকমাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

৫. ১৬ আগষ্ট, ১৯৭২ঃ পানছড়িতে নূর আহমদ নামের এক কনস্টেবলের উৎপাতে স্থানীয় গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এই দিন নূর আহমদ ও তার দলবল গ্রামে গ্রামে মেয়ে ধর্ষণ ও জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে বেড়ায়।

---

৬ প্রদীপ্ত খীসা, '*পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩-৪৭।

৬. ১৪ ও ১৫ অক্টোবর, ১৯৭২ঃ বিডিয়ার-এর কয়েকটি সশস্ত্র দল লোগাং এলাকার সাধন মহাজনপাড়া, হরিধন কার্বারীপাড়া, অশ্বমা কার্বারীপাড়াসহ মোট ১৪টি গ্রামের অধিবাসীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তারা বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগসহ গ্রামবাসীদের টাকাপয়সা, ধান-চাল, মোরগ, গরু, ছাগল ও পরিধেয় বস্ত্র লুট করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বৌদ্ধ বিহার তছনছ ও দু'জন ভিক্ষুকে প্রহার করে এবং বিহারের ৩০,০০০ টাকা লুট করে।

বান্দরবান

৭. স্বাধীনতার পর বান্দরবান মহকুমায় বিডিআর, পুলিশ ও তাদের সহযোগীরা ১১৭ জন নারীর সতীত্ব হরণ করে।

৮. ৩১৮ নম্বর কুহলং মৌজায় রাজাকারের সন্ধানে গিয়ে বিডিআর সদস্যরা যুবতী ও বিবাহিত নারী ধর্ষণ করে। প্রকাশ্যে তারা পিতার সামনে কন্যা এবং স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। তারা গ্রামসুদ্ধ লোককে বন্দী করে প্রহার করে এবং সোনা-রূপা ও টাকা পয়সা নিয়ে যায়।

৯. ৩২৫ নম্বর কুহলং মৌজার মগপাড়ায় বিডিয়াররা সশস্ত্র হামলা চালায়। তারা পুরো গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেয় ও যুবতীদের ধর্ষণ করে।

১০. ৩৩৭ নম্বর বালাঘাটা মৌজার শরৎচন্দ্র চাকমার নববধূকে বিডিআররা ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নামধারী ব্যক্তিরা তার বাড়িতে ডাকাতি করে। শরৎচন্দ্র থানায় অভিযোগ করলে উল্টো থানা কর্তৃপক্ষ তাকে ২০০ টাকা জরিমানা করে।

১১. ৩৩৮ নম্বর রোয়াংছড়ি মৌজার পুলিশ তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামে যেয়ে গ্রামবাসীদের মারধর করে। তারা কয়েকজন যুবতিকে ধর্ষণ এবং টাকা ও সোনা-রূপার গহনা লুট করে নিয়ে যায়।

১২. ১২২ নম্বর কুতুবদিয়া মৌজায় রঘুনাথ তঞ্চঙ্গ্যার পুত্রবধূ নিখোঁজ হওয়ার ৭ দিন পর তাকে বনবিভাগের অফিস হতে উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করা হলে তারা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

১৩. বান্দরবান মহকুমার চন্দ্রঘোনা থানার ৩২৩ নম্বর চিৎমরম, ৩২২ নম্বর রাইখালী, লামা থানার ৩০১ নম্বর সরাই, ৩০৭ নম্বর চাম্বি, ৩০৩ ডলুছড়ি এবং নাক্ষ্যংছড়ি থানার ২৭৯ নম্বর বাকখালি, ২৬৮ নম্বর রেজু, ২৭১ নম্বর তমরু মৌজায়ও অনেক পাহাড়ির ঘরে নারী ধর্ষণ ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

উপরের ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃংখলার মারাত্মক অবনতি ঘটে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য মং রাজা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী ও বাংলাদেশের চিফ সেক্রেটারির নিকট তারবার্তা পাঠিয়ে আকুল আবেদন জানান। কিন্তু তার আবেদনে সাড়া দিয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা জানান ঃ [৭]

> 'বিডিআর'রা তখন অত্যাচার করেছে, মন্দিরে হামলা করেছে; ভান্তেকে মেরেছে, মেরে ফেলে নাই। আহত করেছে। এই রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। এটা বিভিন্ন জনের কাছে পাবেন। এসব নিয়ে আবার একটা প্রতিনিধি

[৭] যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১২/০৫/২০১৫।

দল ঢাকায় আসে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে। তখন ঐ টিমে আমি ছিলাম না। এম এন লারমার নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন আমি আসতে পারি নি।'

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য পৃথক বিধান এবং স্বায়ত্তশাসন চেয়ে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সেখানকার নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন চারু বিকাশ চাকমা, মং শানু চৌধুরী, দেবদত্ত খীসা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, অশোক মিত্র, রূপায়ন দেওয়ানসহ আরও কয়েকজন। দাবিনামায় উল্লিখিত চারটি দাবির মধ্যে প্রথম দাবি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র এলাকা ঘোষণা করে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।[৮]

৩.১. বঙ্গবন্ধুর কাছে উত্থাপিত দাবিসমূহ

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট নিজস্ব আইন সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ অন্যান্য দাবিগুলো ছিল: [৯]

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে;

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি'র অনুরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে;

৩। উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না করা হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩.২. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন চেয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল মানিকছড়ির রাজা মং প্রু সেইনের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি আদিবাসী প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন গণপরিষদ সদস্য এম এন লারমা, কে. কে. রায়, মিসেস বিনীতা রায়, বোমাং রাজা, সুবিমল দেওয়ান, মং শৈ প্রু এবং জ্ঞানেন্দু বিকাশ

---

৮ সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, মল্লিকপুর, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭-৪৮।

৯ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট উত্থাপিত "পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবির আবেদনপত্র", ২৪ এপ্রিল ১৯৭২। পূর্ণাঙ্গ বিবরণীর জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৪।
এছাড়া রূপায়ন দেওয়ান ০৫/০২/২০০৩ তারিখে সাক্ষাৎকারে একই কথা জানিয়েছেন।

চাকমা। প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে জরুরি কাজে বাইরে থাকায় তারা বাংলাদেশের খসড়া সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৫টি দাবি সংবলিত একটি দাবিনামা রেখে আসেন। [১০]

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি পৃথক অঞ্চল এবং সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকবে

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার প্রতিফলিত হবে

৩. শাসনব্যবস্থায় পাহাড়িদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত থাকবে

৪. জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে

৫. শাসনব্যবস্থায় এমন বিধি থাকবে যাতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে কেউ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করতে না পারে।

৪. প্রধানমন্ত্রী ও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মারকলিপি

এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন সরকারের নিকট। তিনি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বরাবরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত স্মারকলিপিতে জানান ঃ

> "আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ চারটি মূলনীতি - গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরে উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাইবোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তরের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।"

এম এন লারমা এই আবেদনপত্রে ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলে পার্বত্য আদিবাসীদের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকদের চক্রান্ত ও তার পরিণতি তুলে ধরেছিলেন। তিনি পার্বত্য জনগণের অধিকার সংরক্ষণে শুধু পৃথক শাসিত অঞ্চলের ধারণা যথেষ্ঠ নয় তা উল্লেখ করে পার্বত্য আদিবাসীদের বঞ্চনার নিরসন ও

---

[১০] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩ ।

বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে একটি যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সেই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বলেন ঃ [১১]

> "বছরের পর বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল, এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে বাস্তবে পেতে চাই।"

এ দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেন ঃ [১২]

> "জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা যথেষ্ঠ নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবেনা। এইজন্য আমরা চারটি বিষয় উত্থাপন করে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত একটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেছি। সুতরাং –
>
> ক) আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।
>
> খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে, এরকম শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।
>
> গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসনব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।
>
> ঘ) আমাদের জমিস্বত্ব- জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।
>
> ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কোন বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।"

এসব দাবির ভিত্তিতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পরবর্তীকালে আন্দোলন পরিচালনা করে।

৫. বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিগত বহুমাত্রিকতার অস্বীকৃতি

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল একটি সংবিধান রচনা করা – যে সংবিধান সকল জাতির, সকল ধর্মের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে। এই দায়িত্ব বর্তায় ১৯৭০ সালে নির্বাচিত তৎকালীন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের উপর যাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ নামের সংবিধান সভা। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৪ সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। মানবেন্দ্র

---

[১১] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল রাঙ্গামাটি থেকে প্রচারিত *বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবির আবেদনপত্র* শীর্ষক প্যামপ্লেট; পুন:মুদ্রিত, মঙ্গল কুমার চাকমা সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থ, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ১৩১-১৩৪।

[১২] ঐ।

নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার সুবাদে স্বাধীনতার পর গঠিত বাংলাদেশের সংবিধান সভার সদস্য হন; এছাড়া ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে তিনি দ্বিতীয় দফা সংসদ সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখার অধিকার অর্জন করেন। সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় সংসদের ভেতরে পাহাড়ি জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন এবং সংসদের বাইরে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছে পাহাড়ি জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে ধরেছেন।

৫.১. বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে সংবিধান সভায় বিতর্ক ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অবস্থান

বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্কে সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় বাংলাদেশের বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা জোরেসোরে উত্থাপন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। খসড়া সংবিধানের উপর সামগ্রিক আলোচনায় ২৫ অক্টোবর, ১৯৭২-এ তিনি উল্লেখ করেন যে বৃটিশ শাসনামলে, এমনকি পাকিস্তানের মতো স্বৈরাচারী সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের স্বাতন্ত্রেও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছিল যা স্বাধীন বাংলাদেশে উপেক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ [১৩]

> " ... বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।'
>
> 'আমি খুলে বলছি, বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সব সময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল, অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা – পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা! এটা আমার কাছে বিস্ময়।'
>
> 'পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এই এলাকার সেই সব ইতিহাসের কথা, আইনের কথা এই সংবিধানে কোথাও কিছু নাই।'
>
> 'মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে একজন সরল মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমাদের এলাকাটা একটা উপজাতি এলাকা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষদের কথা আমি বলতে চাই।'

[১৩] সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২, বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক ঃ সরকারী বিবরণী, খন্ড ২ সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৭২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৫।

'এই উপজাতি মানুষদের কথা বৃটিশ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিল। পাকিস্তানের মতো স্বৈরাচারী গর্ভনমেন্ট আমাদের অধিকার ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করে নিয়েছিল। জানি না, আজকে এখানে গণতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সমাজতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সেখানে কেন আপনারা আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন?'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশের খসড়া সংবিধানে উল্লিখিত জাতীয় মূলনীতি সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বরাত দিয়ে পৃথিবীর একাধিক সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন ঃ [১৪]

'পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নেও উপজাতিদের অধিকার আছে। পৃথিবীর আর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত – আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র – আমরা সেখানে দেখি, তাদের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। জানি না, আমরা কি অপরাধ করেছি?'

'আমি যতদূর বুঝতে পারি, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কি জ্বালা, তা আমি বুঝাতে পারব না। সেই জ্বালা আর কারোর ভিতর নাই। সেই জ্বালার কথা কেউই চিন্তা করেননি।"

কিন্তু 'অধিকার বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি' হিসেবে দেশের সংবিধান সভায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র 'বুকের জ্বালা'র যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিবরণীকে থামিয়ে সংসদ সদস্য নুরুল হক অভিযোগ করেন যে তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন এবং বলেন যে 'সংবিধানে উপজাতিদের অধিকারের কথা' আছে, কেননা প্রস্তাবিত সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জাতির, কৃষক শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দানের কথা আছে। এর উত্তরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন ঃ [১৫]

"আমরা করুণার পাত্র হিসেবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসেবে। তাই মানুষ হিসেবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।"

তাকে বাধা প্রদান ক'রে সংসদ সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী 'বৈধতা'র প্রশ্ন তুলে স্পিকারকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন যে শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংবিধানে 'উপজাতি' হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করছেন, অথচ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সঙ্গে তাদেরও একটা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সাজেদা চৌধুরী প্রশ্ন রাখেন 'একটি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি (অর্থাৎ বাঙালি) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?' উত্তরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার দীর্ঘ বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন: [১৬]

---

[১৪] ঐ।
[১৫] ঐ।
[১৬] ঐ।

" ... আমার যে দাবি, সেই দাবি আজকের নয়। এই দাবি করেছি স্বৈরাচারী আইয়ুব ও স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার সময়ও।'

' ... আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আমাদের জাতির পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে যুক্ত স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের .. উপজাতিদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছিলাম।'

' ... এই সংবিধানে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা বঞ্চিত মানুষ। আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। .. আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা সংবিধানে বলা হয়নি।'

'এই জন্য এই কথা বলছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা ইতিহাস। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি জানি না, আমাদের কথা তারা কেমন করে ভুলে গেলেন? আমরাও যে বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত হয়ে গণ বাংলার সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই, সে কথা তারা কি ভুলে গেছেন?'

' ... উপজাতিরা কি চায়? তারা চায় স্বাধীন গণপরিষদের অধিবেশনে তাদের সত্যিকারের অধিকারের নিশ্চয়তা।'

' ... এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। তাই আজকে আমি বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে কি অপরাধ করেছে, তা আমি জানি না।'

' ... পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশনা করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।"

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের দফাওয়ারী আলোচনাকালে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আব্দুর রাজ্জাক ভুঁইয়া সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলেন:

"বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে।"

এটা ছিল আওয়ামী লীগের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগুলোসহ বাংলাদেশের সকল সংখ্যাল্প জাতিসত্তাসমূহকে বাঙালি জাতিতে সাংবিধানিকভাবে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ। এম এন লারমা এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন:

"মাননীয় স্পিকার সাহেব, জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেন।'

'মাননীয় স্পিকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান বিলে আছে, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।" এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙালি বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা তা ভালভাবে বিবেচনা করে যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।'

'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ – কেউ বলে নাই আমি বাঙালি।

আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন; আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায় ..।"

এ পর্যায়ে স্পিকার মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কি বাঙালি হতে চান না?" উত্তরে তিনি বলেন:

"মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।"

কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে, আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া প্রস্তাবিত সংশোধনী আওয়ামী লীগের একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গণপরিষদে পাশ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার মানুষকে বাঙালি বানানোর প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণপরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান ।

দেশের নীতিনির্ধারকদের 'এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষা'-কেন্দ্রিক উগ্র-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কৌতূহল-উদ্দীপক প্রকাশ ঘটে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার পর। আওয়ামী লীগের অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং তৎকালীন সরকারের শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম 'ফ্লোর' নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তাতে তিনি বলেন: [১৭]

---

১৭ সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ), ৬ অনুচ্ছেদ ঃ নাগরিকত্বের উপর সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলামের বক্তব্য, ৩১ অক্টোবর ১৯৭২, বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক ঃ সরকারী বিবরণী, খন্ড ২ সংখ্যা ৯, ঢাকা, ১৯৭২।

Dhaka University Institutional Repository

" ... আমি পরিষদের তরফ থেকে দাঁড়িয়েছি। কারণ আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বাবু শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক, এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই পরিষদে আর ঘটে নাই। যেহেতু এর উপলক্ষ এই প্রস্তাবের সারমর্ম, সেইহেতু আমি এই প্রস্তাবের উপর দু'একটা কথা বলতে চাই।'

'যে সংশোধনীর উপর তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেছেন, সেটা গৃহীত হয়েছে। অতএব, তার উপর আমার কোন বক্তব্য পেশ করার অবকাশ নাই। আমরা জাতি হিসেবে বাঙালি। তার সঙ্গে জেনারেল ওসমানী সাহেবের সংশোধনীর একটা ভাবগত মিল আছে বলে আমি মাননীয় সদস্য বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা যাতে ভুল না করেন, সেজন্য দাঁড়িয়েছি।'

'বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে রাজী না হয়ে বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন। আমরা শুধু পরিষদ সদস্যবৃন্দই নই – আমি মনে করি, সারা বাঙালি জাতি এতে মর্মাহত হয়েছে। আমি এটা না বললে পাছে ভুল বোঝাবুঝি হয়, সেজন্য দাঁড়িয়েছি।'

'সেজন্য বলতে চাই, তিনি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের প্রস্তাব উত্থাপন না করে, বাঙালি-পরিচয়ের প্রতিবাদে যাঁদের নাম করে এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন, তাঁরা বাঙালি জাতির অঙ্গ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫ লক্ষ উপজাতি রয়েছে, তাঁরা বাঙালি। তাঁরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অঙ্গ বলে আমরা মনে করি।'

'বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি বাংলা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। এ কথা স্বীকার করার পরেও কেন তিনি চলে গেলেন, তা যদি তিনি বলতেন, তাহলে আমি এই পরিষদে তার জবাব দিতে পারতাম। তাঁর অনুপস্থিতিতেই বলছি বলে এ কথা আমাকে বলতে হচ্ছে।'

'ঐ পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা অধিবাসী, তাঁরা এই স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই অঙ্গ। বিশেষ করে কালকে আমাদের আইন-মন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁদের প্রতি দীর্ঘদিন যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের সংসদীয় আইনের আওতা এবং বাইরের সভ্য জগতের আইনের আওতার বাইরে রেখে বিচ্ছিন্ন মনোভাবের সুযোগ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছিল।'

'আমরা তা চাই না, আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা সারা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে। তা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাঙালি জাতির গর্ব হিসেবে থাকবে।'

'শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। যদি কেউ মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের যে অনুন্নত অবস্থা, তার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বাংলার অন্যান্য এলাকা অধিক অনুন্নত তাহলে তাঁরা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দরিদ্র দেশ এবং বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম। যে দেশের শিক্ষার হার কম, সে দেশ স্বভাবতই অনুন্নত হয়ে থাকে। এই অনুন্নতিই সাড়ে সাত কোটি

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ত্রিশ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়েছে সেই অধিকার সংগ্রামে এবং সেই সংগ্রামের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যে একাত্মতা অনুভব করে নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমি মনে করি, বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে যে উদ্দেশ্যে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছেন, তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের জন্য তিনি সেটা করতে পারেন নাই – যদিও তিনি গর্ব করে বলে থাকেন, আমি বাঙালি নই। আমি বলব, যাদের ভোটে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের সহযোগিতা থেকে এ হাউস বঞ্চিত হয়েছে।'

'আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তাদের জন্য সংবিধানে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাতে তাদের প্রতিটি লোকের ধর্ম, নিজস্ব আচারের যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। সামগ্রিকভাবে আমরা বাঙালি জাতি এবং বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা হচ্ছি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান – ঐক্যবদ্ধ শক্তি – যার বলে আমরা বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছি।'

'আমি আশা করি, এই ঐক্য, এই জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট করার জন্য কেউ প্রচেষ্টা চালাবেন না। যদি চালান, তাহলে সারা জাতির অন্তরে ব্যথা দেওয়া হবে। এবং ব্যথা দিয়ে কেউ হয়তো দেশের অমঙ্গলের চেষ্টা করতে পারবেন। এতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই আসতে পারে না।'

'বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এখন যেখানেই থাকুন না কেন, আমি তাঁকে আপনার মাধ্যমে আশ্বাস দিতে পারি, তাঁর বক্তব্য পেশ করার, তাঁর সংশোধনী দেওয়ার সবকিছুই বলার অধিকার আছে। কিন্তু 'বাঙালি' বলে পরিচয় দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি যদি কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান, তাহলে তিনি শুধু এই পরিষদেরই নয় – তিনি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাদের মধ্যে একটা জাতি সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন এবং সমগ্র বাঙালি জাতির মনে ব্যথা দেবেন। সে জন্যই আমি দাঁড়িয়েছি।'

'তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, তিনি পরিষদে এসে তাঁর দায়িত্ব পালন করুন। পরিষদে এসে এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহান প্রস্তাবকে সফল করে তুলুন। আমি আশা করব যে, বাঙালি হিসেবে তিনি তাঁর নিজস্ব অঞ্চল ও নিজের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি শেষ করছি।"

বাঙালি পরিচয়কে অস্বীকার করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার গণপরিষদ অধিবেশন ত্যাগ করার প্রতিক্রিয়ায় সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেয়া এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে তিনি ধর্ম-পরিচয় ও জাতি-পরিচয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারেননি এবং প্রাগৈতিহাসিক কালপর্ব থেকে বাংলাদেশে বহু-জাতির অবস্থানকে তারা আদৌ স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন যে 'যেহেতু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেছেন সেহেতু তিনি এই ইস্যুতে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন না।' তার মানে কি এটাই দাঁড়ায় যে, আত্মপরিচয়ের যতই স্বাতন্ত্র থাক, বাংলাভাষায় কথা বললেই একজন বাঙালি হয়ে যাবেন?

গণপরিষদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সালের ২ নভেম্বর সংবিধান-বিলের ৪৭ অনুচ্ছেদে সংযোজনী প্রস্তাব এনে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। এতে প্রস্তাব করা হয় ঃ [১৮]

> "৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে।"

গণপরিষদের কার্যবিবরণী পাঠে দেখা যাচ্ছে যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপনের পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংশোধনী কেন প্রস্তাব করেছেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য স্পিকারের কাছে সময় চাইলে স্পিকার ২ মিনিট সময় বরাদ্দ দেন, কিন্তু বক্তব্য শুরুর পরপরই তিনি নিজে দু'দফা বাধা দেন। এরপর জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী বাধা দিয়ে বলেন যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা 'আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তির পথে, আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অবৈধ্য ভাষায় বক্তৃতা করেন। সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে ৪৭(ক) নামের নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনের যে প্রস্তাব লারমা এনেছেন সেটা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানে।' আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী আরও বলেন '৩০ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতির বদলে যে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতি ষড়যন্ত্রমূলক এই বক্তব্য।' এর পরেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বক্তব্য দিতে থাকলে স্পিকার আরও দু'দফা বাধা দেন। পরবর্তীতে ডঃ কামাল হোসেন ফ্লোর নিয়ে বলেন 'চার মূল নীতির ভিত্তিতে আমরা শোষনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। সেইজন্য প্রত্যেক জাতির – পার্বত্য চট্টগ্রাম বা অন্য কেন এলাকার যে কোন নাগরিক হোন না কেন – আমরা সমান অধিকারের নীতিতে বিশ্বাসী এবং আমরা মনে করি যে, নাগরিকদের কোন অংশ যদি অনগ্রসর থাকে, তাহলে তাঁদের জন্য বিশেষ আইন করার বিধান রয়েছে।' এরপর তিনি স্পিকারকে অনুরোধ করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রস্তাবটিকে বিধি বহির্ভুত ঘোষণা করার জন্য। সেই অনুযায়ী স্পিকার 'It is against the basic principle of Bangalee Nationalism, এটা জাতীয় মূল নীতির বিরোধী' উল্লেখ করে প্রস্তাবটিকে বিধিবহির্ভুত বলে ঘোষণা করেন।

৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কামরুজ্জামান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের সাথে বৈঠক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 'এয়ার-স্ট্রাপিং'-এর হুমকি

১৯৭১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রামে নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে বড় সংখ্যক বাঙালির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিডিআর-ও এ ব্যাপারে জড়িত হয়। এর বিরুদ্ধে পার্বত্য জনগণ প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিকারের দাবি জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে এবং এ উদ্দেশ্যে ১৯৭২-এর অক্টোবরে একই প্রতিনিধি দল নিয়ে তারা ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এ. এইচ. এস কামরুজ্জামানের সাথে তার বাসভবনে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর

[১৮] সংবিধান-বিলের বিবেচনার (দফাওয়ারী পাঠ) উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য, ২ নভেম্বর ১৯৭২, বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক ঃ সরকারী বিবরণী, খন্ড ২ সংখ্যা ১৫, ঢাকা, ১৯৭২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৫।

উপর নির্যাতন-নিপীড়নসহ সকল দাবি মনোযোগের সাথে শুনেছিলেন। এবং তিনি তার পক্ষ থেকে জানিয়েছিলেন যে, তার একার পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি সরকারের বিষয়গুলো অবগত করবেন। [১৯]

এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের সাথে প্রায় দু'ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ অধিকার ও শাসন কাঠামো প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলেন। সেদিন আগত প্রতিনিধি দলের সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধৈর্য্যপূর্ণ দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এম এন লারমা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়ার কথা জানালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন: [২০]

> "আপনার বাঙালি হতে লজ্জা করে ? এখন অধিকার চাচ্ছেন"?

এর উত্তরে এম এন লারমা সরাসরি মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন,

> "আমি বাঙালি নই, বাঙালি হতে পারবো না"।

সে বৈঠকে বৌদ্ধ মন্দিরের বৌদ্ধ ভিক্ষু বর্ণনা করেছিলেন প্যাগোডা'র ভিতরে ঢুকে বিডিআর জোয়ানদের কয়েকজন আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ, বৌদ্ধমন্দিরের টাকা-পয়সা লুট এবং এতে বাধা দেওয়ায় বৌদ্ধ মূর্তি ও ভিক্ষুর হাত ভেঙ্গে দেওয়ার কাহিনী। উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ভিক্ষু হাতে প্লাস্টার করা অবস্থায় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বোমাং রাজা পার্বত্য পশ্চাতপদ এলাকার পশ্চাদপদ মানুষ হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তন করার দাবি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বোমাং রাজাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নান তিরস্কার করে বলেছিলেন: [২১]

> "আপনার লজ্জা করে না, আপনি তো রাজা ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন– আপনি কেন এইসব আপনার আমলে করেন নাই। এখন বলছেন আপনারা পশ্চাৎপদ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন? আপনাদের এ অবস্থার জন্য আপনারাই দায়ী।"

প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা এর প্রতিবাদে বলেছিলেন,

> "আমাদের অবস্থার জন্য কেন আপনি শুধু আমাদেরকে দায়ী করছেন? আপনারাও কি দায়ী নন? মুক্তিবাহিনী যখন অত্যাচার করলো, গণহত্যা করলো, তখন আপনারা কি করেছেন ? বিডিআর আশ্রমে যেয়ে বৌদ্ধ মূর্তি এবং ভিক্ষুর হাত ভেঙ্গে দিল। কয়েকজন চাকমা মেয়েকে ধর্ষণ করলো। ডাকাতি, লুটপাট করলো, আপনি কি প্রতিবিধান করেছেন?"

এক পর্যায়ে উপেন্দ্র লাল চাকমা মাতৃভাষায় এম এন লারমার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন

> "আজকে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন তারা আমাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেবে কিনা? না দিলে আমরা সবাই জঙ্গলে চলে যাব।"

---

[১৯] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২৫/০৭/২০০৩।

[২০] ঐ।

[২১] ঐ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের কোন সমাধানের আশ্বাস না দিয়ে ধমকের সুরে বলেছিলেন,

> "আপনারা যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামা অব্যাহত রাখেন তাহলে আমরা আকাশ থেকে এয়ার স্ট্রাপিং করবো, বোমা ফেলবো।"

এ কথাগুলোর পর প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর রুম থেকে বেরিয়ে আসেন। তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেশবাসীকে জানানোর উদ্দেশ্যে সেদিনই তারা ঢাকায় একটি প্রেস কনফারেন্স করতে চেয়েছিলেন। গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রধান প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন ঃ [২২]

> 'আমি দুঃখিত! পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে আমরা কোন রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারবো না। উপরমহলের নির্দেশ আছে। আপনাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও সমর্থন আছে, তবে আমাদের করার কিছু নাই।"

সরকারি পর্যায়ে নেতিবাচক আলোচনায় এম এন লারমা এবং দলের সকলেই চরম আঘাত পেয়েছিলেন। পাহাড়ি নেতাকর্মীরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ কোনদিন পাহাড়িদের ন্যায্য নাগরিক অধিকার দেবে না। পাকিস্তান সরকার "পূর্ব পাকিস্তানের" বাঙালিদের যেভাবে নির্যাতন করেছে ঠিক সেভাবে বাঙালি শাসক গোষ্ঠী আদিবাসীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করবে। [২৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে এম.এন. লারমা বলেন: [২৪]

> "পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এখানে প্রায় ১০ ভাষাভাষি ১৩ টি জাতি বাস করে। আমি সেই নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসত্ত্বার একজন। আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু আমাদের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের। খসড়া সংবিধানে আমাদের জাতিসত্ত্বার কথা নেই। এ কথা আমরা শুধু আজ বলছি না, ইয়াহিয়া আর আইয়ুব আমলেও বলেছি। শাসনতন্ত্রে যদি আমাদের কথা স্বীকৃত না হয়, তবে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে অনগ্রসর পার্বত্য চট্টগ্রাম কীভাবে এগিয়ে যাবে?"

তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কথাই বলেননি বরং সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমস্যার কথাই বলেছিলেন। তবে শুধু আদিবাসীদের সমস্যা নয়, সংসদে তিনি বাংলাদেশের নির্যাতিত সাধারণ মানুষের কথাও তুলে ধরেছিলেন। ১৯৭২ এর ২৫ অক্টোবর গণপরিষদে সদস্য এম এন লারমা সাংবিধানিক বিলের সমালোচনা করে বলেছিলেন ঃ [২৫]

---

[২২] ঐ।

[২৩] ঐ।

[২৪] বিপ্লব চাকমা, '*পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে*', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।

[২৫] ঐ।

"খসড়া সংবিধানে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, অধিকারের কথা প্রতিফলিত হয়নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যারা পদ্মা, মেঘনা, যমুনার বুকে দাঁড় টানে, যারা হাল চাষ করে, রেল ও কল কারখানার চাকা ঘুরায়, শাসনতন্ত্র বিলে তাদের কথা স্থান পায়নি। শাসনতন্ত্রে স্থান পায়নি নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের কথা, যারা অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে। শাসনতন্ত্র বিলে এদের অধিকারের কথা থাকলে আমি তাকে অভিনন্দন জানাতে পারতাম"।

৭. মওলানা ভাসানীর সাথে এম.এন. লারমার সাক্ষাৎ ঃ সশস্ত্র সংগ্রামে'র প্রণোদনা লাভ

এম এন লারমাকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৭২ সালে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে লারমাকে বলেছিলেন ঃ [২৬]

"লারমা স্বশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া তোমাদের অধিকার কেউ দিবে না। তোমাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। তোমার মুক্তি তোমাকেই অর্জন করতে হবে, তুমি অস্ত্র ধর লারমা।"

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয় পড়ার জন্য এইভাবে উৎসাহিত করেছিলেন মওলানা ভাসানী।

মওলানা ভাসানী এম এন লারমাকে সাহস দেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের খবর তার "হক কথা"-তে ছেপে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার ওয়াদা পালন করেছিলেন। সংগ্রামী এই জননেতা মুসলমান হয়েও পাহাড়িদের সমস্যা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি প্রদান করেননি। তিনি মুমূর্ষু পাহাড়ি জাতিগুলোকে বাঁচার ও সংগ্রাম করার সাহস যোগান। [২৭]

৭.১. মওলানা ভাসানীর সাথে রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎ ঃ বিলেত যাত্রা ও আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের পরামর্শ

১৯৭২ সালে মওলানা ভাসানীর সাথে রূপায়ন দেওয়ানের দেখা হয়েছে এবং কথা হয়েছে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ভবনে দেশি বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে মওলানা ভাসানীর সাংবাদিক সম্মেলন চলছিল। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বড় একটি ডেলিগেশন নিয়ে উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে মওলানা ভাসানীর সাথে রূপায়ন দেওয়ানের ৩০ মিনিট কথা হয়েছিল। তিনি মওলানা ভাসানীকে জানিয়েছিলেন, পাহাড়িদের উপর অত্যাচার চলছে, নির্যাতন চলছে, জমি দখল হচ্ছে, গ্রাম ধ্বংস করা হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে সরকারের কাছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েও সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পাহাড়িদের সমস্যাগুলোকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করার চেষ্টা করা হলে তাতেও বাধা দেয়া হয়েছে। রূপায়ন দেওয়ান তার কাছে কিছু পরামর্শ চেয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে

---

[২৬] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩।

[২৭] শ্রী দেবাশীষ, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী দল, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং মানবতাবাদী সংস্থাসমূহের ভূমিকা', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং-৫, ১ম বর্ষ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

মওলানা ভাসানী বলেছিলেন যে, 'আমাদের কথাই কেউ ছাপায় না, তোমাদের খবর কে ছাপাবে। তোমরা যুবক, তোমরা বিলেত যাও। বিলেত এমন একটা দেশ, যেখানে তোমরা তোমাদের প্রচার এবং অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারবে। সুতরাং তোমাদেরকে বিলেত যেতে হবে। ' তারপর থেকে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ ভাসানীর উপদেশ অনুসারে একজনকে বিলেতে পাঠাবার চিন্তা করেছিলেন। পরবর্তীতে মওলানা ভাসানীর কথাটা ঠিক হয়েছিল। কারণ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম ক্যাম্পেইনটা শুরু হয়েছিল লন্ডন থেকে। অর্থাৎ সশস্ত্র আন্দোলনের প্রচার কাজটা হয়েছিল প্রথম যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক। [২৮]

৮. পাহাড়িদের জাতি-ভাবনার মিলন ও জুম্ম-জাতীয়তাবাদের দর্শন

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগুলোকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জুম্ম জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এম.এন. লারমা এবং তাদের সম্মিলিত পরিচয় 'জুম্ম' অভিধাটি দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। জনসংহতি সমিতি প্রথম থেকে নিজস্ব বিভিন্ন প্রচারপত্রে, পুস্তিকায়, বুলেটিনে "জুম্ম" শব্দটি ব্যবহার করে আসছে। ১৯৭২ এর ২ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এম.এন. লারমা প্রথম 'জুম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ [২৯]

> "পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ি বা জুম্ম জাতি বলি'।

জুম্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে জুম থেকে। জুম্ম শব্দটি দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়। একদিকে জুম হচ্ছে পাহাড়িদের এক ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি। যেখানে ধান, তিল, তুলা, নানান খাদ্যশস্য, মরিচ, শাকসজি ইত্যাদি একত্রিতভাবে চাষ করা হয়। সেই চাষ পদ্ধতি এবং শস্যক্ষেত্রকে 'জুম' বলা হয়। [৩০] আবার অন্যদিকে জুম শব্দের বিকল্প অর্থ হচ্ছে পাহাড় বা উচ্চ ভূমি। তাই পাহাড়ের অধিবাসীকেও জুম্ম বলা হয়। 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' বিকাশের একটি রাজনৈতিক দর্শন ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো যুগ যুগ ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং এদের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক। ব্রিটিশ সরকার তাদের পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং ভূখণ্ড রক্ষার আইন কার্যকর করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানকে দেখা হলে, অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অংশ হবে, এটি যৌক্তিক এবং প্রত্যাশিত ছিল। কারণ সেই সময় এ অঞ্চলে জুম্ম জনগণের সংখ্যা ছিল ৯৮.০৫ শতাংশ, বাঙালি ছিল ১.৯৫ শতাংশ। তৎকালীন বেঙ্গল বর্ডার এওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল রেডক্লিফ জুম্ম জনগণের সকল প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা দেয়। এবং ১৯৪৮ সালের ৭ ডিসেম্বর

---

[২৮] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩।

[২৯] ঐ, ১১/০৫/২০০৪। তখন তঞ্চঙ্গ্যাদের পৃথক জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হতোনা। চাকমা জাতির অংশ মনে করা হতো।

[৩০] ঐ, ১১/০৫/২০০৪।

পাকিস্তান সরকার ১৮৮১ সালে প্রবর্তিত Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation (111 of 1881) বাতিল করলে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। জুম্ম জনগণের প্রতিবাদের মুখে পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে লংঘন করে চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিহারী ও বাঙালি মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসন করে। [৩১] যার ফলে এ অঞ্চলের আদিবাসী জাতিসমূহের উপর আঘাত আসতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে বহিরাগত কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি দখল, সরকারি উদ্যোগে বাঙালি পুনর্বাসনের ফলে নিজ ভুখণ্ডে টিকে থাকাটাই পাহাড়িদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আবাস ভূমি রক্ষার চিন্তাই তাদের জুম্ম জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি। বাংলাদেশ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এম.এন. লারমা পাহাড়ি সকল জাতিকে একত্রিত করার জন্য এই জুম্ম জাতীয়তাবাদের ধারণাটা প্রবর্তন করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এককভাবে বড় জাতির সাথে লড়াই করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একদিকে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর আচরণ, যেমন– পঞ্চাশের দশকে বাঙালি মুসলমান কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি দখল, ষাট-এর দশকের কাপ্তাই বাঁধ, আদিবাসীদের দেশত্যাগে বাধ্য করা, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে চাকমা যুবকদের বাধাদান, মুক্তিবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা ও লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, আদিবাসী নারী ধর্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি রহিতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো এম এন লারমাকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [৩২]

> "জুম্ম কথাটার ব্যবহার তখন থেকে extreme যে বাঙালি শোভিনিজম পাহাড়িদের বাঁচতে দিচ্ছে না, বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে পাহাড়িদের উপর যে নৃশংস হামলা, অবদমন চালনা হয় তার মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকার মত অবস্থাই ছিল না। তখন পার্বত্যবাসীদের উপলব্দি হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি যে জাতিগুলো আছে এদেরকে ঐক্যবদ্ধ না করলে আমরা এ ভূখণ্ডে টিকে থাকতে পারবো না। যেমন, মারমা জাতীয়তাবাদ, চাকমা জাতীয়তাবাদ, ত্রিপুরা জাতীয়তাবাদ, এককভাবে সংগ্রাম করে বাঁচতে পারবো না। সবাইকে একই আইডেনটিটির মধ্যে এনে আন্দোলনটাকে শক্তিশালী করার জন্য 'জুম্ম' নামকরণ করেছেন এম এন লারমা। তার পাহাড়িদের জাতীয়তা সম্পর্কিত এ দর্শনে আমরা প্রণোদিত হয়েছিলাম। জুম্ম মানে তো একই সাথে পাহাড়, পাহাড়ি চাষ পদ্ধতি। এ ছাড়াও পূর্বে চট্টগ্রামের অধিবাসীরা পাহাড়িদের 'জুমিয়া' বলতো।"

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জাতিগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিপরীতমুখী নানান অবস্থার সাথে নিরন্তর লড়াই নিজেদের দেহমনে ধারণ করে চলছে, নিজেদের রক্ষা কওে চলছে। নিজেদের রক্ষার ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ কালের আন্দোলন- সংগ্রামের পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির উপায় হিসেবে জুম্ম জাতীয়তাবাদ দর্শনটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। জুম্ম জনগণের ঐক্যের প্রতীক এম.এন. লারমা নিজ

---

৩১ শ্রী জগদীশ, 'অনুপ্রবেশ', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বুলেটিন নং-২৭, ৫ বর্ষ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৯ ও ২১।

৩২ রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার ১১/০৫/২০০৪।

জীবন ও কর্মের সংগ্রামে এই জাতীয়তাবাদ দর্শনটি ধারণ করেছিলেন, লালন ও পালন করেছিলেন। জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে লয়েল ডেভিড বম বলেন ঃ

> "এম এন লারমা বলতেন, পলিটিক্যালি প্রচেষ্টা করে জানতে হবে, না হলে আমরা এখানে টিকে থাকতে পারবো না। কারণ শুধু চাকমা জাতি আন্দোলন করে হিল ট্রাক্টস্ রক্ষা করতে পারবে না। সচেতনভাবে আমাদের 'জুম্ম' অর্থ জানতে হবে। এটা হচ্ছে জুম্ম জাতীয়তাবাদী কনস্ট্রাকশন, এই কনস্ট্রাকশনের অধীনে জাতিগুলো নিজেদের আইডেনটিফাই করেছে। তাদের যে অরিজিনাল জাতিসত্তা সেটাকে টেস্টিফাই করেছে। এটা সাইমালটেনিয়াস কনস্ট্রাকশন। এটা হচ্ছে এরকম যে একজন যিনি চাকমা – তিনি চাকমা এবং তিনি জুম্ম। একজন বম – তিনি বম এবং তিনি জুম্ম। একজন মারমা – তিনি মারমা এবং তিনি জুম্ম।"

'জুম্ম' ধারণাটিকে গ্রহণ করতে প্রথম দিকে বিভিন্ন পাহাড়ি জাতির মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ ছিল। চাকমাদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত লোক ছিলেন যারা এটাকে প্রথমিকভাবে গ্রহণ করতে চান নি। কিন্তু জাতির রাজনৈতিক ধারণাগত দিকটি উপলদ্ধির পর অনেকেই আর 'জুম্ম' শব্দের বিরোধিতা করেননি। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এটাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটি সরকারী স্কুলের শিক্ষক আরতি চাকমা নিজেই একটি উদাহারণ, যিনি নিজে প্রথমে এটা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তিনি বলেছিলেন 'আমার বাবাতো জুম চাষী না, আমি কেন এটা গ্রহণ করবো?'। কিন্তু 'জুম্ম' দর্শনটা বোঝার পরে তিনি এটা নিয়ে গর্ব করছেন। [৩৩] যারা বিরোধিতা করেছিলেন তারাই পরবর্তীতে এটাকে অত্যন্ত সম্মানজনক মনে করেছিলেন। জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা বলেন ঃ [৩৪]

> "এম এন লারমা বলতেন চাকমা ছাড়াও ছোট ছোট সংখ্যালঘু জাতিসত্তার কথা আমাদের ভাবা দরকার। জাতিগত নিপীড়নের কারণে তারা হারিয়ে যাচ্ছেন। এদের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। সেই সাথে পৃথিবীর যেসব নিপীড়িত শ্রেণি আছে, তাদের সকলের কথা আমাদের বলতে হবে। পৃথিবীর সকল নিপীড়িত জাতি আমাদের বন্ধু এটাই মূল কথা, শুধু পাহাড়ি না শুধু বাংলাদেশী না।"

সকল সংখ্যাল্প জাতিসমূহের সংঘবদ্ধ আন্দোলনই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়। আর এই আন্দোলন গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে জুম্ম জাতীয়তাবাদ। সকল পাহাড়ি জাতিসমূহের ঐতিহ্য, সমতা ও একতার প্রতীক জুম্ম-জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাই আজ সকলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।" [৩৫]

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিগত ঐক্যের প্রতীক হলো জুম্ম শব্দ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা জুম্ম জাতীয়তাবাদের সূচনা করে। তবে বাংলাদেশ সরকার এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্রতাকে আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকার করে চলেছে। জেনেভাস্থ বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত মাফলে আর ওসমানি ১৯৯২ সালের আগষ্টে জেনেভায় অনুষ্ঠিত UN Sub-Commision on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities-এর সম্মেলনে বলেন:

[৩৩] ঐ, ১১/০৫/২০০৪।

[৩৪] যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[৩৫] ঐ, ১১/১১/২০০২।

> "The people of the hill districts of Chittagong do not defer racially, religiously and economically from the people of other parts of Bangladesh. Race is a concept established by science -- biological and anthropological. Both these disciplines would bear out that the people of Bangladesh constitute one race -- a mixed race."

১৯৯৩ সালের জুনে ভিয়েনা আদিবাসী সম্মেলনে বংলাদেশী প্রতিনিধি বলে "There is no tribe in Bangladesh called Jumma"।[৩৬] দেশের অভ্যন্তরেও সরকার জুম্ম জাতীয়তাবাদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতিতে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক সংগঠনের সৃষ্টি করছে। কিন্তু আদিবাসীরা বুঝতে পেরেছে পাহাড়ি সকল জাতিসমূহের সম্মিলিত জুম্ম জাতীয়তাবাদই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায়।[৩৭]

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র জন্ম ঃ সাংগঠনিক প্রেক্ষাপট

৯.১. চাকমা যুবক সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের রাজনৈতিক ইতিহাস সুদীর্ঘ। ব্রিটিশ আমল থেকেই তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে। রাজমোহন দেওয়ান ভেবেছিলেন বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। সেই ধারণা থেকেই তিনি একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯১৫ সালে সর্বপ্রথম গঠিত হয় 'চাকমা যুবক সমিতি'। এই সমিতিটি ছিল মূলত একটি সামাজিক সংগঠন, যেটি যুগ যুগ ধরে জনগণের লালিত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সংগ্রাম করেছিল । এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এই সংগঠনটি কাজ করলেও জাতীয় জাগরণের বীজ এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল।[৩৮]

৯.২. চাকমা যুবক সংঘ

পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'চাকমা যুবক সংঘ'। এই সংগঠনটি সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো এবং পাহাড়ি অধিবাসীদের "মুখপাত্র" হিসেবে কাজ করত। সংগঠনের কার্যকালের মেয়াদকাল সল্প হলেও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এর অবদান অনেক।[৩৯]

---

[৩৬] জগদীশ চাকমা, 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ', আতিকুর রহমান (সম্পাদিত), *পর্বত প্রকাশ (অনুসন্ধান)*, পর্বত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৮১-২৮২।

[৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৮০-২৮১।

[৩৮] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২১।

[৩৯] ঐ।

৯.৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি

১৯২০ সালে কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যদি সংঘবদ্ধ শক্তি থাকে এবং তাদের যদি আত্মশক্তির প্রতি আস্থা থাকে তবে তারা অন্যের অনুগ্রহ না নিয়ে নিজেদের দাবি নিজেরাই আদায় করতে সমর্থ হবে। আর এই প্রয়োজনেই তিনি সংগঠন স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। পরবর্তীতে এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সংগঠিত করে তাদেরকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে তৎপর ছিলেন।[৪০] সংগঠনটি দীর্ঘ উনিশ বছর যাবৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত থাকার পর ১৯৩৯ সালে যামিনীরঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমা এই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে এটি রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়।[৪১] এই দুজন ব্যক্তিই পরবর্তীতে যথাক্রমে চট্টগ্রাম জনসমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির কর্মকাণ্ড সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এই সংগঠনটিই সর্বপ্রথম বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির বিপরীতে নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল রাজনীতিতে নিয়ে আসার বাতাবরণ তৈরি করেছিল এবং দেশ-বিভাগের আগে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণকে সামন্তপ্রভু ও ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের শাসন-শোষণ এবং তাদের অত্যাচার সম্পর্কে সচেতন ও সংগঠিত করতে প্রভুত অবদান রেখেছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম যাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হয় সে ব্যাপারে তৎপরতা চালিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তারা তৎকালীন কংগ্রেসের সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং কংগ্রেসের অন্যান্য প্রভাবশালী নেতাদের সাথে দেখা করেন। মহাত্মা গান্ধীর সাথেও তারা আলোচনা করেছিলেন।[৪২]

৯.৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি

একই বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে শরৎচন্দ্র তালুকদার ও সুনীতি জীবন চাকমার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি'।[৪৩] এই সংগঠন তৎকালীন সময়ে 'জনসমিতি'র কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত শিক্ষা বিস্তার, ছাত্রদের মাঝে নীতি-জ্ঞান প্রচার ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা প্রসারে কাজ করেছিল।

---

৪০ কামিনী মোহন দেওয়ান, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী*, দেওয়ান ব্রাদার্স, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬।

৪১ প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২১।

৪২ ঐ।

৪৩ ঐ।

৯.৫. হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন ১৮৮১' বাতিল করার ফলে এই অঞ্চলের জন্য বিশেষ বাহিনী গঠন বন্ধ হয়। পাকিস্তানি শাসনামলে পাহাড়ি জনগণের অধিকার প্রথমবারের মতো খর্ব হয়েছিল। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় 'হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' যার নেতৃত্বে ছিলেন মৃণাল কান্তি চাকমা ও অনন্ত বিহারী খীসা।[৪৪] ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ায় এই এসোসিয়েশন-এর নেতৃত্বে যে ছাত্র ও অভিভাবক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল সেখানে এম এন লারমা তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে সুধাকর খীসা, এম এন লারমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমাসহ আরও অনেক ছাত্রনেতা আবির্ভূত হন। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন যাতে পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা বহাল রাখার কথা উল্লেখ ছিল । পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের মতামত যাচাই না করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।

৯.৬. ট্রাইবাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

পাকিস্তান সরকার ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে থাকে আদিবাসী জনমতের তোয়াক্কা না করেই। এই রকম স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের একটি হলো কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ। ১৯৫৮ সালে আদিবাসী জনগণের স্বার্থের কথা না ভেবে এবং জনমত যাচাই না করেই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৬০ সালে বাঁধ নির্মাণ শেষ হলে ৯৯,৯৭৭ জন বাস্তু ও জমিহারা হয়ে পড়েন। মোট চাষযোগ্য জমি ৫৬% প্লাবিত হয়।[৪৫] এর জন্য সরকার ক্ষতিপূরণ বাবদ যে ৪ কোটি টাকা বণ্টন করেছিল তার সিংহভাগই দেওয়া হয়েছিল বনবিভাগকে। অন্যদিকে, ১৯৫৬ ও ১৯৬২-এর শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ এলাকার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হলেও ১৯৬৩ সালে জনগণের মতামত না নিয়েই 'বিশেষ এলাকার মর্যাদা' বাতিল করা হয়।[৪৬] কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না পেরে সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার আদিবাসী ভারতে এবং প্রায় ত্রিশ হাজার বার্মায় চিরদিনের জন্য চলে যায়। এভাবে শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদপদ জাতি হিসেবে জীবন ও জীবিকার তাগিদে আদিবাসীরা স্বাভাবিক নিয়মে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে শুরু করে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ১৯৬৫ সালের ১৮ই জুন চট্টগ্রামে এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'ট্রাইবাল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন'। এই সংগঠন ছাত্রদের দাবি-

[৪৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪।
[৪৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫।
[৪৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

দাওয়া ও কাপ্তাই বাঁধ পরবর্তী ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অব্যবস্থপনার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ জানিয়েছিল।[৪৭] রাঙ্গামাটিতে এই সংগঠনের একটি শাখা ছিল যার নাম 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি'। পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিতেই এই সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তর করা হয় ।

৯.৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে সাবেক ছাত্রনেতা অনন্তবিহারী খিসা এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি' গঠিত হয়, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি জনগণের মাঝে একটি প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা । পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে এই সংগঠনটির নেতৃত্বে 'নির্বাচন পরিচালনা কমিটি' গঠিত হয় এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে ১৬-দফা দাবিনামা উপস্থাপন করা হয়। এই দাবিনামার মধ্যে অন্যতম দাবি ছিলো নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আর এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম উত্থাপন করা হয় ।

৯.৮. রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত হয় 'রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি'।[৪৮] তখন থেকে রাঙ্গামাটিতে প্রায়শই রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টির সভা অনুষ্ঠিত হতো। এই বৈঠকগুলোতে এম এন লারমা, প্রীতি কুমার চাকমা, ভবতোষ দেওয়ান, রূপায়ন দেওয়ান, চাবাই মগ, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, প্রমোদ বিকাশ কার্বারী, জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা, অনন্ত বিহারী খীসা, অমরেন্দ্র লাল চাকমা, সকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, চাই থোয়াই রোয়াজা প্রমুখ পার্বত্য নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন বলে জানা যায়। এম এন লারমার উপদেষ্টা ছিলেন অনন্ত বিহারী খীসা ও উপেন্দ্র লাল চাকমা। [৪৯] বিক্রম ত্রিপুরার কাছ থেকে জানা যায় যে, ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাঙ্গামাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, তবে এটা ৪/৫জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সন্তু লারমা ছিলেন।

---

[৪৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭।

[৪৮] ঐ।

[৪৯] মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ও সন্তু লারমা চিন্তা-চেতনায় বামপন্থী ছিলেন, কমিউনিস্ট নীতি-আদর্শ ধারণ করতেন। কিন্তু ১৯৭২-এর বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তারা বুঝেছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐ মুহুর্তে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তা দিয়ে এগুনো যাবেনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সে মুহূর্তে তা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তারা তখন সেখান থেকে সরে এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথে জনসংহতি সমিতি গঠন করেছিলেন। [৫০]

এ পর্যায়ে সংগঠন ও আন্দোলনের আদর্শগত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। আন্দোলনটা কিসের ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? তারা কি উগ্র জাতীয়তাবাদী? জুম্ম জাতীয়তাবাদী? নাকি পাহাড়ি জাতীয়তাবাদী ? নাকি, তারা তাদের বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন করবেন? [৫১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর সকল জাতির সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সম্ভাবনা যাচাই এবং প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭০ সালের ১৬ মে এম এন লারমার নেতৃত্বে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ মে ১৯৭০ সালের গোপন সভায় এম এন লারমা ছাড়া উপস্থিত ছিলেনঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু, অমিয় সেন চাকমা, কালী মাধব চাকমা ও পংকজ দেওয়ান। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল আদিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, সংরক্ষণ এবং বিকাশের মধ্য দিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে সুসংহত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতি ও শ্রেণিভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দল গঠন করা হবে; যদিও এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল পাহাড়ি জাতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠনের বাস্তব অবস্থা বিরাজমান ছিলনা।[৫২]

দেশ স্বাধীন হবার পর এম এন লারমা আরও জোরালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তির জন্য সুসংগঠিত একটা রাজনৈতিক সংগঠন থাকা দরকার। [৫৩] পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণও দীর্ঘদিন ধরে তাদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। এ ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনন্ত বিহারী খীসার বাসভবনে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের একটি নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ব্যাপারে এম এন লারমার অভিমত ছিলো, পাহাড়ি জনগণের কল্যাণে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা উচিত। তিনি দৃশ্যতঃ জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের অদূরদর্শিতা ও পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপ ও নিরবতায় হতাশ ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার অভিমত ছিলো, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাই জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে জাতীয় রাজনীতির মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি দৃশ্যতঃ আঞ্চলিক দল

---

[৫০] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

[৫১] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ৩১/০১/২০০৩।

[৫২] সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০০।

[৫৩] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ৩০/০১/২০০৩।

সম্পর্কে তেমন একটা উৎসাহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে অনন্ত বিহারী খীসার অভিমত ছিল, কেউ যদি জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে বা থাকতে চায়, এটা ভালো বৈ খারাপ কিছু নয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সর্বোপরি, এখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় আলাদা হওয়ায় এখানে পাহাড়ের মানুষের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলা জরুরি। তৃতীয় এই অভিমতটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। তবে অনন্ত বিহারী খীসার অভিমত এও ছিল যে, নতুন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি না করে পাকিস্তান আমলের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'-কে পুনরুজ্জীবিত করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ – এতে দলটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, তাকে শক্তিশালী করাও সম্ভব হবে। তিনি এম এন লারমা ও জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমাকে জনসমিতির প্রাক্তন সভাপতি কামিনী মোহন দেওয়ানের কাছে পাঠান। প্রবীণ নেতা কামিনীমোহন দেওয়ান জানান যে, পাকিস্তান সরকার তাদের সংগঠন নিষিদ্ধ করেছেন। তাই এই নামে সংগঠন করা সম্ভব নয়। ফলে এম এন লারমা তার সহযোগীদের নিয়ে ১৯৭২ সালেলর ১৫ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' নামের সামান্য পরিবর্তন করে গঠন করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'।[৫৪] সেই সাথে এর আহ্বায়ক কমিটিও গঠিত হয়। এম এন লারমা আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরবর্তীতে প্রকাশ পেতে থাকে। জনসংহতি সমিতি গঠন গ্রহণযোগ্যতা লাভের মূল কারণ ছিল ভাষা, ধর্ম ও জাতিগতভাবে ভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের জাতীয়তাবোধ। তাই এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও এ সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৫] জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' নামে এর একটি অঙ্গ সংগঠন ছিল, যার নেতারাই পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৫৬]

এম এন লারমা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে সমিতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝিয়েছিলেন, কর্মীদের সংগঠিত করেছিলেন। [৫৭] আন্দোলনের ব্যাপারে ছাত্রদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মেহনতি মানুষের জন্য তার যে চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬০-এর দশকেই এই ব্যক্তিটিই যে পাহাড়িদের একমাত্র ভবিষ্যত পথপ্রদর্শক তা সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল।[৫৮]

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা (ত্রিপুরা), এম.এন. লারমা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীতে এম এন লারমাকেই সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এ সময় সেক্রেটারি

---

[৫৪] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

[৫৫] সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০২-১০৩।

[৫৬] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

[৫৭] সুধাসিন্ধু খীসার সাক্ষাৎকার, ৩০/০১/২০০৩।

[৫৮] ঐ।

জেনারেলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বি. কে. রোয়াজা। জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও সনৎ কুমার চাকমা। অর্গানাইজিং সেক্রেটারি প্রীতিকুমার চাকমা এবং কেন্দ্রীয় একটি পদে ভবতোষ দেওয়ান ছিলেন। [৫৯]

১০.১. জনসংহতি সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের একমাত্র রাজনৈতিক দল। তাই এর লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পার্বত্য জনসংহতি সমিতির দলীয় আদর্শ এবং মূলনীতির ভিত্তিতে যে সকল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে তা হলো ঃ[৬০]

উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে দশ ভাষাভাষি জুম্ম জনগণকে মুক্ত ও তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি

২) আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকরণ;

৩) ভিন্ন ভাষাভাষি সংখ্যাল্প ক্ষুদ্রজাতির মধ্যে ভেদাভেদ নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা দূরীকরণ;

৪) এই জাতিসমূহের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা;

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ দুটি, এক. নিয়মতান্ত্রিক, এবং দুই. অনিয়মতান্ত্রিক। সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারিত হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় তথা জাতীয় জীবনের সার্বিক বাস্তবতার নিরীখে। স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উভয় নীতি কৌশলকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে জনসংহতি সমিতি এম এন লারমার নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবি আদায়ের আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলেন, যার ধারাবাহিকতায় শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। [৬১]

১০.২. জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের নিজস্ব ও শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯৭২ সালে গণপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও শক্তিশালী সংগঠনের অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ন্যায্য দাবি যে তারা আদায় করতে পারছেন না সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ [৬২]

---

[৫৯] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[৬০] শ্রী জিমি, 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি', *১০ নভেম্বর-'৮৩ স্মরণে*, জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ১৬, ১৭।

[৬১] ঐ।

[৬২] সংবিধান বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্য, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২।

'আমরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে রয়েছি। অগ্রসর জাতির মত শক্তিশালী দল গঠন করে দাবি আদায় করতে পারছি না। কারণ এতে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতার দরকার, ততটা রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে উপজাতিদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে।'

পরবর্তীতে তার নেতৃত্বে জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের মত পার্বতাঞ্চলে জনসংহতি সমিতিরও বিস্তৃত কাঠামো গড়ে উঠে। মূল নীতি নির্ধারণী অঙ্গ কংগ্রেস জেলা পর্যায়ের নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়। কংগ্রেস তিন বছর পর পর নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের জন্য সভার আয়োজন করে। এতে পাশ হওয়া সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ম্যান্ডেট লাভ করে। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় রাজনৈতিক ও সশস্ত্র শাখার সমন্বয়ে এবং এর দায়িত্ব হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশনা প্রদানসহ সকল রাজনৈতিক ও সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। প্রচার ও প্রকাশনার কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং তৃণমূল সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক শাখা।

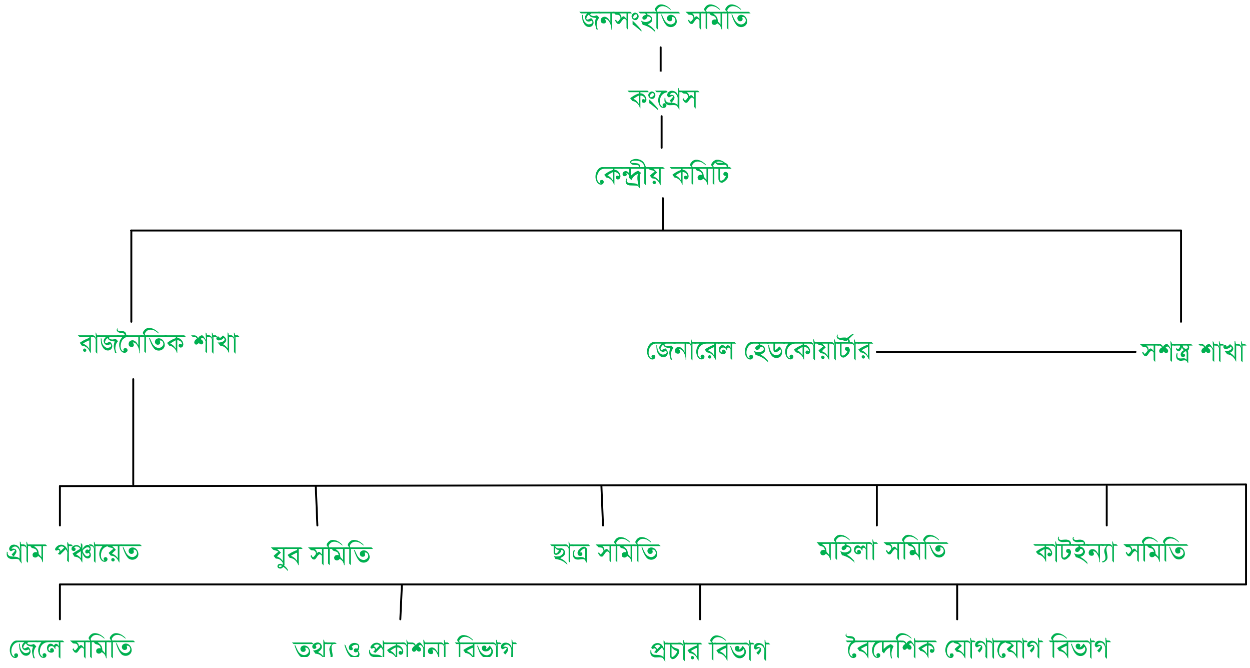

স্থানীয় প্রশাসন দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। তারা আদিবাসীদের জমি সংক্রান্ত বিরোধ, চুরি, ডাকাতি, অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করে। গ্রাম পঞ্চায়েত কোন মামলা নিস্পত্তি করতে না পারলে তা সশস্ত্র শাখার নিকট অর্পণ করে। গ্রামের লোকজনকে জনসংহতি সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, জনগণকে সংগঠিত করা, চাঁদা আদায়ে সাহায্য প্রদান, খবরাখবর আদান প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়ে থাকে।[৬৩]

[৬৩] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। জাতীয় সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পরবর্তী বছরের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, গঠনতন্ত্রের সংশোধন, কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন ইত্যাদি। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ৫ বছর পর পর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পরে সেটা সংশোধন করে ৩ বছর পর পর করা হয়েছিল। নিম্নে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সাক্ষর পর্যন্ত সময়কালে অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলনগুলো সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য নিম্নরূপ ঃ [৬৪]

সারণি ৭ : জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন

সম্মেলন	সাল	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
১ম সম্মেলন	১৯৭৭	এম. এন. লারমা	ভবতোষ দেওয়ান
২য় সম্মেলন	১৯৮২	এম. এন. লারমা	ভবতোষ দেওয়ান
৩য় সম্মেলন	১৯৮৫	সন্তু লারমা	গৌতম কুমার চাকমা
৪র্থ সম্মেলন	১৯৯০	সন্তু লারমা	গৌতম কুমার চাকমা
৫ম সম্মেলন	১৯৯৫	সন্তু লারমা	চন্দ্রশেখর চাকমা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৬০-এর দশকের গোড়ায় পার্বত্য জনগনের স্বার্থে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছিলেন, পরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন দুবার এবং দলীয় প্রধানের দায়িত্বে নির্বাচিত হয়েছেন আজীবন। তার অকাল মৃত্যুর পর রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তার সহোদর সন্তু লারমা।

১১. শান্তিবাহিনীর জন্ম

এম এন লারমা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ষাকবজ হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু জনগণের কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। উপরন্ত হত্যা, লুন্ঠন, নারী ধর্ষণ, জমি দখল নিত্য বিষয়ে পরিণত হতে থাকে। ব্যাপক হারে অন্যান্য জেলার মানুষ এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসত করানোর হুমকি তাদের উদ্বিগ্ন করে। জাতীয় বিরোধী দলগুলোর সরকারের এ নীতি বা উদ্যোগের কোন সমালোচনা ছিলনা। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধানের পথ বন্ধ হয়ে গেলে গোপন তৎপরতা শুরু হয়। পাহাড়ি জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ থেকেই মূলতঃ ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পাহাড়িদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ বাহিনী গঠিত হয়েছিল বলে এ বাহিনীর নামকরণ হয় শান্তিবাহিনী। সশস্ত্র কর্মতৎপরতা শুরু করার পূর্বে শান্তিবাহিনী কিছু সংস্কারমূলক কিছু কাজ, যেমনঃ গ্রামাঞ্চলে জুয়া খেলা ও অতিরিক্ত মদপান বন্ধ, মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদি

[৬৪] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২৬/০৫/২০১৫।

সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছিল। ক্রমে শান্তিবাহিনী জনসংহতি সমিতির শক্তির মূল স্তম্ভে পরিণত হয়। যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা সাক্ষাৎকারে জানান ঃ [৬৫]

> 'রাজাকাররা বন-জঙ্গলে থাকতো, মাঝে মাঝে লুটতরাজ করতো। তাদের তেমন কোনো নেতা ছিল না। বিজয় সিংহ চাকমা নামে একজন ছিল, তখন সেই একটু শিক্ষিত – ইন্টারমিডিয়েট পাশ মনে হয়। বাকি নামগুলো ভুলে গেছি। আর বাকি যারা, দুই একজন কমান্ডারও ছিল। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গায় তাদের উৎপাতে লোকজনের ত্রাহি ত্রাহি ভাব। পাহাড়ি বাঙালি নির্বিশেষে, একা রাস্তায় হাঁটার কোনো উপায় ছিল নাই। খাগড়াছড়ি থেকে পানছড়ি যাব, দলবেঁধে যেতে হয়, কেননা তাদের হাতে তো কম বেশি অস্ত্র আছে। এভাবে তাদের উৎপাতে মানুষজন শান্তিতে নেই। তখন জনসংহতি সমিতি করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমেই এদের দমন করতে হয়েছে। এদের দমন করার পরে পার্বত্য এলাকায় শান্তি ফিরে এসেছে। এজন্য এই বাহিনীর নাম দেয় শান্তি বাহিনী। শান্তি বাহিনী নামে জনসংহতি কমিটিতে কোনো বাহিনী ছিল না। এটা মানুষের দেওয়া নাম শান্তি বাহিনী। মানুষ বলতো – 'এরা যে কোন বাহিনী! যে বাহিনী হোক, এরা আসার পরে শান্তি এসেছে'। রাজাকারদের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে একমাত্র জনসংহতি সমিতি তাদের দমন করার পরে।'
>
> 'কিছু লোককে নিয়ে প্রথম কোথায় কোথায় রাজাকার কমান্ডার আছে তাদেরকে বুঝিয়ে সারেন্ডার করতে বললাম। তারা সারেন্ডার করল, জনসংহতি সমিতিতে অস্ত্র জমা দিল। তখন তো সশস্ত্র আন্দোলন করার কোনো কর্মসূচি আমাদের নাই। কিন্তু অস্ত্র নেয়া হয়ে গেছে। রাজাকাররাও জানে তাদের কোথায় কোথায় অস্ত্র আছে, পাকিস্তান আর্মি কোথায় কোথায় অস্ত্র ফেলে গেছে। কাপ্তাই লেক থেকে অনেক অস্ত্র পাওয়া গেছে। লংগুদু বিভিন্ন জায়গা থেকে। এভাবে আমাদের দল হওয়ার আগেই প্রথমে অনেক অস্ত্র পাওয়া গেছে। এই অস্ত্র পাওয়ার কারণে আমাদের দল একটু প্রতিবাদী হয়ে গেল।'
>
> 'জনসংহতি গঠিত হওয়ার পরে রাজাকারদের দমন করা হয়। এটা তখন এক কঠিন অবস্থা আর কি। তাদের জন্য আমাদের সাংগঠনিক কাজে প্রভাব পড়েছে। তখন দেখা গেল তাদেরকে প্রথমে দমন না করলে সাংগঠনিক কাজে হাত দেওয়া যাবে না। তাদেরকে দমন করেই সাংগঠনিক কাজে হাত দিতে হয়েছে।"

শান্তিবাহিনীর ট্রেনিং পর্বে শিক্ষা দেয়া হতো পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পাহাড়ের মানুষকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তা নিয়েও আলোচনা হতো।[৬৬]

১২. বঙ্গবন্ধুর রাঙ্গামাটি সফর ও 'উপজাতি'দের বাঙালি হয়ে যাবার নির্দেশ

১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচনী সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাঙ্গামাটি গিয়েছিলেন। এটি ছিল রাঙ্গামাটিতে একজন জনপ্রতিনিধি-সরকারপ্রধানের প্রথম সফর। এর আগে পাকিস্তান সরকারের প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে'র গভর্নর মোনায়েম খান রাঙ্গামাটি গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা

[৬৫] যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১২/০৫/২০১৫।

[৬৬] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩০।

কেউই জনপ্রতিনিধি ছিলেননা। শেখ মুজিবুর রহমানেরও এটি ছিল রাঙ্গামাটিতে প্রথম সফর। আঞ্চলিক বৈষম্য আর জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় বিভোর জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে, আদিবাসীদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন ও কাঠামোগত বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে কেউ হস্তক্ষেপ করবেনা। এতোদিন আদিবাসীদের তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদাও দেওয়া হয়নি, সেই দিনের অবসান হয়েছে। আদিবাসীরা যে-কোনো নাগরিকের সমান মর্যাদা পাবে। আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু একই সাথে তিনি এও ঘোষণা করেছিলেন যে, আদিবাসীদের প্রমোশন দিয়ে বাঙালি করা হলো।[৬৭]

তাঁর এই ঘোষণা জুম্ম জনগোষ্ঠীকে স্তম্ভিত করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। [৬৮]

এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি এবং জনসংহতি সমিতি, বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একযোগে কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের একই আসন থেকে এম এন লারমা পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

অত্যাচার নির্যাতনের যে পটভূমিকায় বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে স্বাধিকার চেয়েছিল এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিল, স্বাধীন দেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাঙালি শাসকগোষ্ঠী আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাল্প জাতিসত্তার উপর বৈষম্য ও নির্যাতন চালিয়ে সেই পটভূমিকা তৈরি করেছিল। এই কারণে এম এন লারমা আইন পরিষদ বিতর্কে এগুলো উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেছিলেন: [৬৯]

> "আপনি সেই ব্যক্তি যিনি সর্প দংশনে দংশিত হয়েছেন, আপনিই জানেন এর ব্যথা কতখানি। আর আপনি বুঝলেন না আমাদের কষ্ট। আমরা পার্বত্য মানুষ, সংখ্যালঘু। আমাদের যে বেদনা এটা কি আপনি বুঝবেন না!"

১৩. ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজপরিবার ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত ক'রে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র জয়লাভ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনঃউত্থাপন

১৯৭৩ সালে ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই আসন থেকে প্রার্থী ছিলেন জনসংহতি সমিতির মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাই থোয়াই রোয়াজা। লারমা 'মোমবাতি' প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন। জনসংহতি সমিতির প্রার্থী নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন দুই জায়গাতেই। জনসংহতি সমিতির প্রার্থী চাই

[৬৭] সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯।

[৬৮] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

[৬৯] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩।

থোয়াই রোয়াজার কাছে রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী পরাজিত হন। রাজাকে পরাজিত করলেন সাধারণ মানুষ। চাকমা রাজার ভাই সমীর রায়কে পরাজিত করলেন এম এন লারমা। নির্বাচনের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের পতন ঘটল। পাহাড়ি জনসমাজে এটা হলো একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।[৭০]

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গোটা দেশের জনমানুষের স্বার্থের পক্ষে অনেকানেক আলোচনায় অংশ নেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। ১৯৭৪ সালের ৫ জুলাই বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন ঃ [৭১]

> " ... সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, "বাংলাদেশ একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র"। এখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, এক অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের কোন বৈষম্য থাকবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যে কোনও পৃথক শাসিত এলাকা excluded or tribal area থাকবে না, বাংলাদেশ একক হিসেবে শাসিত হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আমি যে এলাকা থেকে এসেছি, আপনি জানেন, সেটা হল পার্বত্য চট্টগ্রাম। এটাকে বৃটিশ শাসন করেছে এবং পাকিস্তানও শাসন করেছে excluded area হিসেবে। বৃটিশ সরকার ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করার জন্য একটা আইন পাশ করে। এই আইনের নাম হলো ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন। তারা সেই আইনের বিধান মতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করেছে, পাকিস্তানও তাই করেছে। সেই আইন এখনও বলবৎ আছে। বাংলাদেশ সরকার এখনও সেই আইন বলবৎ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করছে। সেই আইন যদি বলবৎ থাকে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনও excluded area থেকে যাচ্ছে। অথচ সেই ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করা হচ্ছে না। Excluded area status থাকলে সেইভাবেই এই এলাকাকে শাসন করতে হবে। Excluded area উপজাতি জনগণের জন্যই হয়ে থাকে। সংবিধানে Excluded বা tribal area status স্বীকৃত হয়নি। তাই সংবিধান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অচল হয়ে পড়েছে। অথচ এই রেগুলেশনকে সংবিধানের ১৪৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে। এই অনুচ্ছেদে আছে – 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।'
>
> 'বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত এলাকা অর্থাৎ excluded area হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে নামমাত্রভাবে এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, কিন্তু সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" এবং "মৌলিক অধিকারে"র অধ্যায়ে স্বীকৃতি দেননি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম excluded area status পেলেও তার প্রকৃত মর্যাদা বাস্তবে কার্যকর হচ্ছেনা। এই অন্তঃসারশূন্য স্বীকৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামের "কাল অধ্যায়ের" সূচনা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তাদের সত্তা হারাতে বসেছে।'

---

[৭০] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[৭১] বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বক্তব্য, ৫ জুলাই ১৯৭৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী বিবরণী, খন্ড ২ সংখ্যা ২৪, ঢাকা, ১৯৭৪। বিস্তারিত বিববণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৬।

'সরকারের এই নীতি কি ধরনের। একদিকে সরকার ঘোষণা করেন excluded area বা tribal area দেওয়া হবে না। আবার অন্য দিকে প্রচলিত আইনের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে excluded area হিসেবে সরকার কর্তৃক গণ্য করা হচ্ছে। তাই একটা contradiction-এর সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার বক্তব্যের পরবর্তী পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন "জাতি"র কথা উল্লেখ করে তাদের পিছিয়ে পড়া অবস্থার কথা বলতে শুরু করলে সংসদ সদস্য বেগম তসলিমা আবেদ তাকে বাধা দিয়ে স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "মাননীয় সংসদ সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি জাতির নাম করলেন, কিন্তু বাংলাদেশে মোট একটা জাতি, আর সেটা হল বাঙালি।" সংসদ সদস্য শওকত আলী খান টিপ্পনি কেটে বলেন, "দুইটি জাতি – পুরুষ ও নারী।" এসব বাধা ও টিপ্পনিকে উপেক্ষা করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন ঃ [৭২]

" ... এই নিয়ে গণপরিষদে সংবিধান তৈরির সময় তর্কাতর্কি হয়েছিল। আমরা উপজাতীয়রা বাঙালি নই, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক – আমরা বাংলাদেশী। আজকে সরকারকে আমি জানাতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের Excluded Area Status এমনভাবে রাখার কোনো অর্থ হয় না। ***হয় আমাদেরকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত করুন, পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দিন, আর না হয় অধিকতর অধিকার দিন। মানবতার অধিকার দিন।*** একদিকে অধিকার অধিক লিখে দিয়েছেন, আর অন্যদিকে অধিকার হরণ করে নিচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঁচ লাখ মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে আদিম পর্যায়ে রয়েছে। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত উপজাতিদের সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধা করে ফেলেছে, তাদেরকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে উন্নত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ১২৭টি ছোট বড় জাতির রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করেছে প্রত্যেকের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে। তাই আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগণের মনের কথা সংসদে এসে সরকারের কাছে জানাচ্ছি। সংবিধানে একরকম লেখা হবে, আর একদিকে অন্যরকম করবেন। আমাদের মানুষ হবার পথ উন্মুক্ত করে দিন। আমি সংবিধানকে খাট বা বিকৃত করার জন্য বলছি না। তাই সরকারের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন আমাদেরকে মানবতার পথ দেখিয়ে দিন। আমরা ধনী হতে চাই না, লাখপতি হতে চাই না। যে যুগে পৃথিবীর লোক চাঁদে গিয়ে অবতরণ করেছে, সে যুগে আমরা অর্ধ-উলঙ্গ আদিম মানুষ হয়ে পড়ে থাকব কেন?'

'মাননীয় স্পিকার, স্যার, সরকারের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, আপনারা দেখুন পার্বত্য চট্টগ্রামের লোক কিভাবে জীবন-যাপন করছে। এটা যদি আপনারা করতে না পারেন তাহলে সরকারের দায়িত্ব কেন নিয়েছেন? মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে বলব আপনারা অত্যাচারী সরকার, গণবিরোধী সরকার। আপনারা যদি সরকার হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে জণসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।"

[৭২] ঐ।

১৪. ১৯৭৪-এ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সম্মতি ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বাকশালে যোগদান

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১৯৭৪ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কয়েক দফা বৈঠক হয়েছিল। তৃতীয় দিনের বৈঠকে পঙ্কজ ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যেসব ন্যায্য দাবি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নাই, বাঙালির পাশাপাশি তাদের স্বায়ত্তশাসন, সংস্কৃতি সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিব, আমাকে সময় দাও।' এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে এম এন লারমা বলেছিলেন, 'আপনি যদি তাই করেন, তাহলে আমরা আপনাদের সাথে আছি।' [৭৩]

শরদিন্দু শেখর চাকমা লিখেছেন যে, ১৯৭৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আবার রাঙ্গামাটি যান। এসময় তিনি স্থানীয় সাংসদ, হেডম্যান এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তখন তিনি তাদের জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। সেজন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩ জেলায় ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া তিনি জানান যে তিনি পুলিশ বাহিনীতে তিনশ ও রক্ষীবাহিনীতে দুইশ জন 'উপজাতি'কে নিয়োগ দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন; আর এখন থেকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা দানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। [৭৪]

শরদিন্দু শেখর চাকমা আরো জানিয়েছেন যে, এর আগে বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসন রাখার এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তখন কিছু চাকমা ছাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশে ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়। রাঙ্গামাটিতে বঙ্গবন্ধু আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিবছর 'বঙ্গবন্ধু বৃত্তি' দেওয়ারও ঘোষণা দেন। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আনারস বাজারজাতকরণের জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুর পর তার দেয়া এসব আদেশ বাতিল হয়ে যায়। [৭৫]

বাকশাল গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বাকশালে যোগদান করার আহ্বান জানান। লারমা তখন বাকশালে যোগদান করতে রাজী হননি। পরবর্তীতে আলাপ-আলোচনা ক'রে তিনি বাকশালে যোগ দেন।[৭৬] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাকশালে যোগ দেয়ার সময় বঙ্গবন্ধু লারমাকে বলেছিলেন তার কিছু লোক চাকমাদের সম্পর্কে তাকে ভুল তথ্য দিয়েছিল, সেটা তিনি পরে বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি এখন চাকমাদের জন্য কিছু করতে চান। [৭৭]

---

[৭৩] পঙ্কজ ভট্টাচার্য, এম. এন. লারমা স্মরণে শোকসভায় বক্তব্য, খাগড়াছড়ি, ১০/১১/২০০২।
বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[৭৪] শরদিন্দু শেখর চাকমা, *বঙ্গবন্ধু ও পার্বত্য চট্টগ্রাম*, বিভাস, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ঃ ১১-১২।

[৭৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৭৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২-১৩।

[৭৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১।

বঙ্গবন্ধুকে 'তার কিছু লোক চাকমাদের সম্পর্কে তাকে ভুল তথ্য' যে দিয়েছিল তার প্রমান পাওয়া যায় এরকম এক ব্যক্তির নিজের লেখা থেকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক সময়ের আওয়ামী লীগের নেতা, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় রচিত অনেকগুলো গ্রন্থের প্রনেতা এবং সেনা-সমর্থনপুষ্ট বাঙালি মৌলবাদী সংগঠন সমঅধিকার আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক আতিকুর রহমান তার *They Are Not Indigenous (The Tribes Residing in Chittagong Hill Tracts)* গ্রন্থে লিখেছেন: [৭৮]

> '.. In 1972 I reported to Bangabondhu Shekh Mujibur Rahman that the tribal leaders especially the Chakma politician have organized an anti-state armed group of their own to begun attack the peace keeping force and Bangali people. They already killed numerous Bangalies and peace keeping personal and burnt their commercial places more than once. To confirm my report he inquired the matter to local inteligents and administration, and ordered to establish two cantonment, one at Dighinala and other at Ruma. He also ordered verbally the Bengali leaders to increase their population here and declared also that settlement of them is his duty."

বঙ্গবন্ধুর ভূল ভাঙ্গাতে যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (মস্কোপন্থী) নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তাদের সাথে ছিলেন তৎকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগঠক পঙ্কজ ভট্টাচার্য।[৭৯] শরদিন্দু শেখর চাকমা লিখেছেন যে রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিসের এক সময়ের ডেপুটি সেক্রেটারী এ.এম. আব্দুল কাদের এবং তার সহকর্মী রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ. কে. ফজলুল হক মানবদরদী ও সেক্যুলার মানুষ এবং বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন; এই দুজনও বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বঞ্চনার কথা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের প্রত্যাশার কথা তাকে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাদের কথা বিশ্বাস করেন এবং রাঙ্গামাটির ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার জিন্নাত আলীর পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসনের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[৮০]

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতি এবং এম এন লারমার বাকশালে যোগদান প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন: [৮১]

> "১৯৭৫-এর মার্চে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল হবার পর এম এন লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাকশালে যোগদান করে। তার কারণ শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের চার দফা দাবির অনুকূলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এম এন লারমা ও জনসংহতি সমিতি বাকশালে যোগদান করার পর দেখা যায় তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখেননি।"

---

[৭৮] Atiqur Rahman, *They Are Not Indigenous (The Tribes Residing in Chittagong Hill Tracts),* Porbat Prokasoni, Dhaka, 2013, পৃষ্ঠা ঃ ১০২।

[৭৯] পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার, ৩০/০৫/২০১৫।

[৮০] শরদিন্দু শেখর চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০-১১।

[৮১] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০৩।

১৫. বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও সামরিক শাসন জারি ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র আত্মগোপন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন রূপ নেয়। পরিবর্তিত ঐ পরিস্থিতিতে পরদিন থেকেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আত্মগোপন করেন।[৮২] পরবর্তীতে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে হাজার হাজার আদিবাসী ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার আদিবাসী নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়। [৮৩]

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর এম এন লারমার আত্মগোপন প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন: [৮৪]

> "শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডের পর এম এন লারমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সরকারের ভেতরের পাকিস্তানপন্থীরা কিছু করতে যাচ্ছে। এতে তার গ্রেপ্তারের আশংকা ছিল। এই জন্য তিনি আত্মাগোপন করেছিলেন।"

অন্যদিকে, ঐ সময়েই চাবাই মং মারমা কাওখালি এলাকায় ধরা পড়েছিলেন এবং বরকলের উপরে হরিণায় স্নেহকুমার চাকমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৮৫]

সাংবাদিক লিখেছেন যে, শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর এম এন লারমা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত বা বার্মার সহায়তা কামনা করেছিলেন। তখন ভারত তাদের পরিকল্পনার কথা বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেয়। তবে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার দ্বার প্রশস্ত হয়।[৮৬]

১৬. উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাহাড়ি জনগণের ঘড়বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, মারপিট, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, জেল-জুলুম ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এর প্রতিকার চেয়েও ব্যর্থ হয়ে এম এন লারমা উপলব্ধি করেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তির জন্য সুসংগঠিত একটা রাজনৈতিক সংগঠন থাকা দরকার। 'নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজস্ব সংগঠন দরকার' এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি বিভিন্ন দলে থাকা পাহাড়ি কর্মীদের সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে পাহাড়ের আদিবাসী জনগণকে মুক্ত করা ও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতি গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে

---

[৮২] মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পাদিত), স্মারক গ্রন্থ, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০

[৮৩] শরদিন্দু শেখর চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

[৮৪] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০৩।

[৮৫] রূপায়ন দেওয়ান-এর সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩।

[৮৬] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩০।

জনসংহতি সমিতির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতির সামরিক সংগঠন শান্তি বাহিনী গড়ে উঠে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় রাজনৈতিক ও সশস্ত্র শাখার সমন্বয়ে। এই সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসংখ্য পাহাড়ি যুবক সন্তু লারমার সাথে যোগাযোগ করে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত পার্বত্যবাসীদের ভারতপন্থী ও পাকিস্তানপন্থী অপপ্রচার এবং এর পাশাপাশি সাংবিধানিকভাবে পাহাড়িদের বাঙালিকরণ সম্পর্কে। অন্যদিকে পাহাড়িরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি তথা সংবিধানে পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন দাবি করছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই। এ পর্যায়ে পাহাড়িরা রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ স্তর তথা বঙ্গবন্ধুর সাথেও বৈঠক করেন এবং তাদেরকে আশ্বস্তও বরা হয় যে তারা তাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত হবেন না; যদিও পরবর্তিতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ঐ প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এ অধ্যায়ে আরও বর্ণিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও 'জুম্ম-জাতীয়তাবাদে'র ধারণা বিকশিত হওয়ার প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিগত বহুমাত্রিকতার অস্বীকৃতি এবং তার বিপরীতে সংবিধানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানী সংবিধান অনুযায়ী পার্বত্যাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন দাবি, এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তা প্রত্যাখাত হবার প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়িদের জাতি-ভাবনায় একীভবন ও '*জুম্ম জাতীয়তাবাদ*'-এর বিকাশ এখানে আলোচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন-সংহতি সমিতি'র জন্ম এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা ও তার বিশ্লেষণ, জনসংহতি সমিতির সাংগাঠনিক কাঠামো, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি, জনসংহতি সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির সম্মেলন সংক্রান্ত বিবরণী।

বিলম্বে হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংখ্যাল্প জাতিগুলোর পরিচয়, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, সংস্কৃতি চর্চার অধিকার, তাদের জীবনযাত্রার ধরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি এবং তাদের ভাষার স্বীকৃতি না দিলে রাষ্ট্র হিসেবে সামনে এগোনোর জন্য প্রয়োজনীয় বৃহত্তর ঐক্য তৈরি হয় না। তাই তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করেন, কিন্তু তার দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি নিহত হন এবং দেশে জারি হয় সামরিক শাসন। এতে, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। [৮৭]

[৮৭] পঙ্কজ ভট্টাচার্য, এম. এন. লারমা স্মরণে শোকসভায় বক্তব্য, খাগড়াছড়ি, ১০/১১/২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন, সেনা কর্তৃত্বে বাঙালি সেটেলারদের বসতি স্থাপন এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম

১. সূচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে বাঙালি সেটেলারদের বসতি স্থাপন, পাহাড়ি আদিবাসী বিভিন্ন জাতির সমর্থন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের সরকারি উদ্যোগ, এম. এন. লারমার আত্মগোপন, পাহাড়িদের অভ্যন্তরীন গৃহযুদ্ধ, ঐক্যবদ্ধতার আবরন ও মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে সেনাশাসনের অধীনস্থ হয়। এ সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অসাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূল ভূকিায় জায়গা করে নেয় সেনাবাহিনী–তারা প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এর বিপরীতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রবলতর হতে থাকে। সামরিকীকরণের নিয়ন্ত্রণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ভঙ্গ করে সেখানে সেনা কর্তৃত্বে বাঙালি সেটেলারদের বসতি স্থাপন শুরু হয়। এভাবেই এগিয়ে চলে বাঙালিকরণ ও ইসলামীকরণের কাজ। বাঙালি সেটেলারদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় আদিবাসীরা তাদের নিজ আবাস ভূমিতেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। একের পর এক ঘটতে থাকে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার কর্তৃক পাহাড়িদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও উঠে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক উচ্ছেদ, ধর্মীয় নিপীড়নের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ। বিপুল সংখ্যক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়ে শরণার্থী জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। ফলে বিভিন্ন পাহাড়ি জাতির অকুণ্ঠ সংহতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ইতোমধ্যে সরকারি বাহিনী ছাড়াও শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় সহায়তায় দ্রুত নিস্পত্তি না ভিয়েতনামের মত দীর্ঘমেয়াদী গণযুদ্ধের পথ এই বিতর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিতি অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর শান্তিবাহিনীরই উপদল প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন এম. এন. লারমা। এই সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনা শাসনের হস্তগত হয়। এর কারণ ছিল মূলত ঃ তিনটি। প্রথমত, বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সামগ্রিক সময়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী মুখ্যত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তি সংগ্রামে না বাঙালি না পাহাড়ি নেতৃত্ব পাহাড়ের সকল জাতির সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বাঙালি নাকি পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষে সেটা বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করা এ বিতর্ককে আরও বেশি ঘনিভূত করে তোলে এবং তারা যে বাঙালির বিপক্ষে এ মতামত প্রধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল মিজো বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গোপন আশ্রয় স্থল, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীকে সমর্থন করেছিল এবং ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর মিজো বাহিনীর কিছু সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে গোপন আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এর প্রেক্ষিতে স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধে পাহাড়িদের নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানকে সমর্থন করার দায়ে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সময় মুক্তিবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা ১৮জন পাহাড়িকে মেরে ফেলা হয়, অপর ১৬জনকে জঙ্গলে হত্যা করা হয়, ২০০ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং কুকিছড়ায় ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেওয়া ২২জন কে হত্যা করা হয়। [১]

তৃতীয়ত, নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তা ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা লাভ করল, এবং এর সংবিধানেও একটিমাত্র জাতি 'বাঙালি' স্বীকৃতি পায়। এরই প্রেক্ষিতে এম. এন. লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং এর একটি সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মতে শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠার পেছনে দুটি কারণ প্রধান্য পেয়েছিল। প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডের তৎপরতা ও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতা, এবং দ্বিতীয়ত, পাহাড়ি জনগণের দাবির বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ প্রত্যাখ্যান। শান্তিবাহিনী গঠনের এ প্রেক্ষাপট রাষ্ট্রের নিকট 'জাতীয় নিরাপত্তা' জনিত সমস্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ সামরিক ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের রামগড়ে দক্ষিণাঞ্চলের বান্দরবানে আক্রমণ চালায়। এ সময় দিঘীনালা, আলীকদম এবং রুমায় তিনটি সেনানিবাস এবং ঘাঘরায় একটি আনসার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। [২]

---

১ Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism*, The University Press Limited, Dhaka, 2002, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৪-১৬৫।

২ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৬।

জাতীয় সংসদে এই সামরিকীকরণের বিরোধীতা করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ১৯৭৪ সালের ৫ জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি এ ব্যাপারে ডেপুটি স্পিকারের মাধ্যমে সংসদ সদস্যবৃন্দ ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন ঃ [৩]

> " .. পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি যায়গা দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদমে তিনটি সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে এবং বান্দরবানের সোয়ালকে আরও একটি তৈরি করা হবে। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে ও খাগড়াছড়িতে বি.ডি.আর উইং হেড কোয়ার্টার তৈরি করা হবে। জানিনা কিসের জন্য সেখানে এত সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি মাত্র ৪৮ মাইল দূরে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনানিবাস তৈরি করার কোন যুক্তি আমি দেখি না। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, সেখানে চাষাবাদ করার জন্য জমি খুব কম, অথচ সেই জমি দখল করে নিয়ে সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে। এমনিত কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৫৬ হাজার একর ধান্য জমি ডুবে গিয়েছে। এই সমস্ত জমি দখল করার ব্যাপারে সরকারের নিকট আমার আবেদন এই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু খাস পাহাড়ি জমি আছে, যেগুলো সেনানিবাসের জন্য বিনা পয়সায় নিতে পারেন।'
>
> 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সবই তো পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়। সেই সব পাহাড়ে বন্য জন্তুদের সাথে লড়াই করে যেই সামান্য জমি আমরা আবাদ করেছি, সেই জমি কেন সরকার নিয়ে নিবে? তাই আমি নিবেদন করব যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের লোককে আপনারা এভাবে দেখবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম মানুষকে টেনে নিন। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে নিপীড়িত ও নিগৃহীতদের পক্ষ থেকে আমার করুণ আবেদন এই যে, সবচেয়ে পিছনে যারা আছে, তাদেরকে পাশে টেনে নিন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যুগে তাদেরকে বিলুপ্ত হতে দিবেন না। বিলুপ্ত হওয়ার যুগ ছিল মধ্যযুগ। তাদের মানুষ হওয়ার সুযোগ দিন।"

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে সেনাশাসনের অন্তর্গত হয়। এ সময় হঠাৎ করে রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ইসলামিক জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয় এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালনে জায়গা করে নেয় সেনাবাহিনী। এ সময় সেনাবাহিনী ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের এই পরিবর্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও প্রভাবিত করে। ফলে এমএন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানকে নিরাপদ মনে না করায় তিনি ভারতে চলে যান এবং শান্তিবাহিনী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অন্যতম রক্ষাকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ রকম পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সেনা ক্যাম্পে পরিণত হয়। চট্টগ্রামের জিওসি পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাঙ্গামাটি, খাগড়ছড়ি, দিঘিনালা এবং বান্দরবানে মোট চারটি ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। রুমা এবং আলিকদমে একাধিক গ্যারিসনসহ (সৈন্য সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা) প্রত্যেকটি উপজেলা এবং বিভিন্ন গ্রামে সেনা ক্যাম্প স্থাপিত হয়। এমনকি চলাচলের পথেও সেনা ক্যাম্প গড়ে উঠে। মহালছড়িতে গেরিলা প্রতিহত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েনকৃত সেনাসংখ্যা সম্পর্কিত সঠিক তথ্য জানা

৩ বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র বক্তব্য, ৫ জুলাই ১৯৭৪, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী বিবরণী, খন্ড ২ সংখ্যা ২৪, ঢাকা, ১৯৭৪। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৬।

যায়নি। তবে সেনাবাহিনীর সূত্রমতে সেখানে উনিশটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন, এগারটি বিডিআর ব্যাটেলিয়ন, তিনটি আর্টিলারী ব্যাটেলিয়ন, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ন, আঠারটি আনসার ব্যাটেলিয়ন এবং চারটি আর্মড পুলিশ স্টেশন ছিল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কাপ্তাই ও গুইমারিতে ৫টি আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার ছিল। এই হেড কোয়ার্টারগুলোর অধীনে ২৬টি জোন ছিল, যার ২৩টি সেনাবাহিনীর এবং ৩টি বিডিআর-এর। সেনা ক্যাম্প ছিল ২৩০টি, ১০০টির অধিক বিডিআর ক্যাম্প এবং ৮০টির উপর পুলিশ ক্যাম্প ছিল। মনে করা হয় সে সময় বাংলাদেশের মোট সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন করা হয়েছিল।[৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে হস্তগত এবং নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দিক থেকে তাদের বিক্ষুব্ধতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে ছিল না। বরং তাদের দাবি ছিল বাঙালি বা বাংলাদেশী জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের যে মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিপক্ষে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করা। এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের বিদ্রোহ দমন প্রক্রিয়াকে তারা তাদের পরিচয় মুছে ফেলার রাষ্ট্রীয় যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়। যে-কোনো সভা-সমাবেশ এমনকি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা আয়োজনের জন্যও সেনাবাহিনীর অনুমতি আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সামরিকীকরণের নিয়ন্ত্রণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, সেখানে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনাবাহিনী তিনটি জোনে বিভক্ত করেছিল ঃ[৫]

এক. সাদা
দুই. সবুজ
তিন. লাল।

সাদা জোন ছিল সেনা হেডকোয়ার্টারের দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে বাঙালি এবং পাহাড়ি উভয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে; শুধুমাত্র বাঙালি সেটেলার অধ্যুষিত এলাকা ছিল সবুজ জোন; এবং লাল জোন ছিল পাহাড়-জঙ্গল মিলিয়ে যেখানে বাস করতেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠী।

৩. জিয়াউর রহমান কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটেলারদের বসতি স্থাপন

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী মনে করেন যে, আদিবাসী স্বার্থ বিরোধী সরকারি নীতি তাদের বিলুপ্তিকেই নিশ্চিত করছে, অগ্রগতিকে নয়। পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাপ্তাই জলবিদ্যুত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছিল, তার পরেও তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লোপ পায়নি। তাদের অস্তিত্বকে সর্বাপেক্ষা বিপর্যস্ত করেছে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক ধারাবাহিক বাঙালি পুনর্বাসনের

---

[৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২।

[৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৭-১৭৮।

ফলে। আইনগতভাবে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বলবৎ থাকলেও এর ধারা ভঙ্গ করে ১৯৫০ দশকের প্রথমদিকে রাঙ্গামাটির তবলছড়ি, বেলছড়ি, মানিকছড়ি এবং বান্দরবানের আলিকদম, লামা, নাইক্যংছড়িতে সরকারি উদ্যোগে অ-পাহাড়িদের পুনর্বাসন শুরু হয়। পাহাড়ি নেতাদের প্রবল আপত্তি, আন্দোলন, সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন স্থগিত করলেও পুনর্বাসিতদের প্রত্যাহার করা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে ভারতের বিহারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ফলে লক্ষাধিক বিহারী মুসলিম তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তানে প্রবেশ করে। এই বিহারী উদ্বাস্তুদের একটি অংশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে "সরকারি খাস জমি" (কার্যত ঃ মৌজাভুক্ত আদিবাসীদের জমি)-তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। পুনর্বাসিত বিহারীরা পাহাড়িদের তৈরি করা জমি নিজেদের দখলে নিতে শুরু করে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদে সরকার ছিল একেবারেই মৌন। একই বছরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সরকারি সফরকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপালনকারী জাতীয় পরিষদের স্পিকার ফজলুল কাদের চৌধুরী আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের 'বহির্ভূত এলাকার' মর্যাদা স্থগিত করেন। পূর্বেই নির্দেশপ্রাপ্ত আশেপাশের জেলাগুলোর অ-পাহাড়িরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করে পাহাড়িদের ঘর-বাড়ি লুটপাটসহ তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। উপরন্ত একই বছরে সরকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এগারজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য এলাকার জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা। সে অনুযায়ী কমিটির সুপারিশ ছিল পাহাড়ি এলাকার কারণে জুমচাষ ভাল হলেও এ চাষ ব্যবস্থার অবসান হতে হবে, জাতীয় অর্থনীতির কল্যাণে পাহাড়িরা ভোগের জন্য নয় কেবল বনজ সম্পদ উৎপাদনে অনুমতি লাভ করবে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য এলাকা থেকে অ-পাহাড়িদের এনে পুনর্বাসিত করা। আরেক দফা পুনর্বাসন শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এবং পরে, এমনকি আইন শৃঙ্খলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসার পরেও, পাকিস্তান শাসনামলের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক অ-পাহাড়ি এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। [৬] স্বাধীনতার পরে প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি সেটেলার রামগড় এলাকায় বসতি স্থাপন করে। [৭]

এতে পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে জেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠনের পূর্বে সরকারি উদ্যোগে অন্য জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষ পুনর্বাসন করা সম্পূর্ণ বন্ধ করবেন মর্মে এম এন লারমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। [৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিসেটেলারদের বসতি স্থাপনের হার বৃদ্ধি পায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে সামরিক শাসনের সময়ে। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান লাখ লাখ দরিদ্র বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানোর জন্য একটি গোপন বৈঠক করেন। [৯]এ সময় সামরিক শাসনের অধীনে যে পুনর্বাসন শুরু হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাহাড়িদের নিজস্ব জমি থেকে উচ্ছেদ করে বাইরের জেলা থেকে লোক এনে পাহাড়িদের

৬ সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম*, মল্লিকপুর, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪-৭০।

৭ Life Is Not Ours: The Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

৮ সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪-৭০।

৯ Life Is Not Ours, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

জাতিগত অস্থিত্বকে অবলুপ্ত করা।[১০] ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বসতি স্থাপনের ধারা আরও তীব্রতর হয়। প্রথম দিকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমতল ভূমি থেকে তিন ধাপে বাঙালিদের এ অঞ্চলে আনা হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে প্রায় ১,০০,০০০ সেটেলারকে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। এরপর ১৯৮১ সালে প্রায় ১,০০,০০০ এবং ১৯৮২-৮৩ তে প্রায় ২,০০,০০০-এর বেশি বাঙালিকে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করানো হয়। এ বিপুল পরিমাণে বাঙালি সেটেলারদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আদিবাসীরা তাদের নিজ আবাস ভূমিতেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে।[১১]

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলারদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে গোটা ঐ অঞ্চলকে বাঙালিকরণ সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত বিবরণীর যথার্থতা নিশ্চিতভাবে জানা যায় ১৯৭৮-৮১ সময়কালে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন চৌধুরীর কাছ থেকে। 'Broken Promises' শিরোনামে The Daily Star পত্রিকায় তিনি লিখেছেন যে, ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে, খুব সম্ভবত অক্টোবর মাসে, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার একটি সভায় যোগদানের জন্য জিয়াউদ্দিন চৌধুরীকে তার বাংলোতে ডেকে পাঠান। বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবনে এমন ধরণের বৈঠক যেহেতু অস্বাভাবিক ছিলনা, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেননি যে সভার বিষয়বস্তু কী। বাংলোতে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকও সেখানে উপস্থিত আছেন। সভাকক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেখানে শুধু তারা তিনজন উপস্থিত ছিলেন। পিনপতন নিরবতা ও সব কৌতুহলের অবসান ঘটিয়ে কমিশনার সাহেব সভার বিষয় উত্থাপন করলেন এবং একইসাথে অনুরোধ করলেন যে, এই বৈঠকের বিষয় যাতে চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিল সন্দ্বীপ এবং কুতুবদিয়াতে ভাঙ্গনের কারণে যারা ভূমিহীন হয়েছে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা। জিয়াউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন যে এই সংবাদে তিনি চমকে উঠেন। সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া আর নিকটবর্তী নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপে বেশ কয়েক বছর ধরেই লোকজন ভাঙ্গনের কারণে তাদের ঘরবাড়ি হারাচ্ছিলেন এবং তেমন কোন সরকারী সহায়তা ছাড়াই এসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন দেশের মূল ভূখন্ডে চলে আসছিলেন। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা আক্রান্ত মানুষগুলোকে যেভাবে যতটুকু পারা যায় তাদের সহায়তা করতে চেষ্টা করছিলেন। জিয়াউদ্দিন চৌধুরী আরো লিখেছেন সভার প্রথমাবস্থায় তিনি খুশী হচ্ছিলেন এটা ভেবে যে সরকার এই সমস্যাটা সমাধানের ব্যাপারে নজর দিচ্ছে, কিন্তু তাই বলে এই মানুষগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন? পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের কি হবে? এই শাসনবিধিতে তো অপাহাড়ি মানুষজনের সেখানে বসতি স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আছে – তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব? তার প্রশ্নের উত্তরে খুব সাধারণভাবেই কমিশনার সাহেব জানালেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দ্বীপাঞ্চলের ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্ধারিত জায়গাগুলোয় বসত করানো হবে। আর এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা নির্ধারণ করে রেখেছেন। জিয়াউদ্দিন চৌধুরীকে বলা হলো যে, দ্বীপাঞ্চলের বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে আগ্রহীদের তালিকা তৈরি ক'রে দিতে; এদের কিছুকালের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিকল্পিত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং নতুন বাড়িঘর তৈরির জন্য তাদেরকে নগদ অর্থ ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী দেয়া হবে। জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলছেন যে, বিভাগীয় কমিশনারকে

[১০] সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪-৭০।

[১১] Life Is Not Ours, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২।

তিনি বলেছিলেন, এই 'বসতিকরণ কর্মসূচি প্রকল্পে' তাদের অংশগ্রহণ কী হবে তা তিনি পরে জানাবেন এবং কয়েকদিন পরে বিভাগীয় কমিশনারকে তিনি জানিয়েছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গড়তে আগ্রহী এমন কাউকে তার জেলায় পাওয়া যায়নি, আর চট্টগ্রামকে এই কর্মসূচির বাইরে রাখা হোক। তিনি লিখেছেন যে, তখনও তিনি এটা বুঝতে পারেননি যে, এই কর্মসূচির সাথে তিনি একমত হন বা না হন তাতে খুব একটা কিছু আসে যায় না, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে তিনি থাকলেও বা না থাকলেও। [১২]

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন চৌধুরী এই প্রবন্ধে আরও লিখেছেন যে, ঐ ঘটনার পরে এই কর্মসূচি সম্পর্কে কমিশনার সাহেব তাকে আর কিছুই বলেননি, তবে তিনি জেনেছেন যে, এই কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য তার উপরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কঠোর নির্দেশ আছে। এই ঘটনার এক মাস পর কক্সবাজারের মহকুমা প্রশাসকের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, বিভাগীয় কমিশনার সাহেব ব্যক্তিগতভাবে কুতুবদিয়া ও সন্দ্বীপের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে বৈঠক করে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গড়তে আগ্রহীদের তালিকা প্রণয়ন করতে বলেছেন; নোয়াখালী ও কুমিল্লার জেলা কর্তৃপক্ষকেও একইভাবে তালিকা পাঠাতে বলা হয়েছিল পার্বত্যাঞ্চলে সেটলার পাঠানোর জন্য। জিয়াউদ্দিন চৌধুরী লিখছেন যে তার পক্ষে 'এই নির্দেশনা আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিলনা, কেননা ততক্ষনে তিনি বুঝে গেলেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এই অপারেশন বন্ধ করার সাধ্য তার নেই – এমনকি সরকারি পদ থেকে তিনি যদি সরেও যান, তারপরও এটা বাস্তবায়িত হবেই।' [১৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটলার পাঠানোর এই কার্যক্রমের বিবরণ দিতে গিয়ে জিয়াউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন ঃ [১৪]

> æStarting from the end of 1979 and through 1980, hundreds of families from the coastal areas of Chittagong and Noakhali, and river erosion affected areas of Chandpur would be transported by the truckload to the hill tracts. The first settlements would be in areas closer to Chittagong district, and then to the more interior parts of the hill tracts. The families would be housed in make shift camps first, and there after they would be given housing materials and cash. They would also be given land for cultivation under the land lease laws."

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বলবৎ থাকলেও এর ধারা ভঙ্গ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলারদের বসতি স্থাপন করানো হয়; অর্থাৎ সরকার নিজেই লংঘন করেছে রাষ্ট্রের আইন। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন চৌধুরীর লেখায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ [১৫]

---

[১২] Ziauddin Choudhury, 'Broken Promises', *The Daily Star*, April 8, 2010.

[১৩] ঐ ।

[১৪] ঐ।

[১৫] ঐ।

æThe news was astounding! I could not believe that we were participating in a plan to destroy the very foundation of a Regulation that the government had been following, at least officially, for last so many decades.'

'It was not like there weren't Bangali settlements in the hill tracts prior to 1979; but there had never been a massive transplantation of people to the area. The Bangali population had been steadily increasing, particularly after war of liberation. Officially these settlements required permission from the deputy commissioner, with limitations on leases for land holding. But even with these restrictions, the non-hill population had been rising due to the growth in trade with the main land, land grabbing, and often-illegal settlement in the forestlands at the connivance of government officials.'

However, I was very disturbed that we would be shipping loads of non-hill people to the tribal areas and thus officially flouting a regulation that had governed the area for such a long period."

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটেলারদের পাঠানোর এই সিদ্ধান্ত নেন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও তার নেতৃত্বাধীন সেনাশাসকরা এই অজুহাতে যে সেখানে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে এবং বিদ্রোহ চলছে। জিয়াউদ্দিন চৌধুরীর লেখায় রাষ্ট্রের এই মনোভাব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ [১৬]

æI was particularly surprised that this plan was being thought of at a time when the government was battling an insurgency in the hill tracts that had been going on for three years. How could we think of transporting civilians to the mouth of this Vesuvius? I was told that the government had already drawn up and agreed upon this plan to counter the insurgency. The settlers would provide a base of local support to the law enforcing agencies in their counter-insurgency operations...'

'...They were located in what became known as cluster villages under the watchful eyes of the army and armed police battalion, who would camp nearby (The armed police battalion had been deployed in the hill tracts since 1976 to support of the army to contain the insurgency).'

'The whole operation of Bangali settlement in the cluster villages was conducted under the guidance of the army. As the commander of the counter insurgency operation in the CHT, the GOC of Chittagong, Maj. General Manzoor had a major role in planning and executing the settlement operation."

---

[১৬] ঐ।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠিকে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী আদৌ বিশ্বাস করেনি এবং সেনাধ্যক্ষরা চেয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় বাঙালি সেটলারদের নিয়ে এসে তাদের দিয়ে সেনাছাউনির চারপাশে স্থানীয় একটি সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে। ভূমিহীন এই দরিদ্র মানুষগুলোকে তারা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ঠেলে দিয়েছে। অবাক করা ব্যাপার যে এই কাজে তারা মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছে ভিয়েতনামে গৃহীত মার্কিনী Strategic Hamlet কর্মসূচিকে, এবং চরম প্রান্তিক কয়েক লক্ষ ক্ষেতমজুরের ভূমির জন্য ক্ষুধাকে কাজে লাগিয়ে এই কর্মসূচিতে তারা তাদের ব্যবহার ক'রেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জিয়াউদ্দিন চৌধুরীর লেখায় আমরা এই বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই ঃ [১৭]

> æIt is interesting to note that in this operation the army was following the US counter insurgency model in Vietnam. In 1962, the US had developed a system of resettlement and population security that would eventually become known as the strategic hamlet program. In Vietnam, strategic hamlets would consist of villages consolidated and reshaped to create a defensible perimeter. The peasants themselves would be given weapons and trained in self-defence. Moreover, the strategic hamlets would not be isolated; instead, they would function as a network. The hamlets were to be used as an administrative tool to institute reforms and improve the peasants' lives economically, politically, socially, and culturally.'
>
> 'In their zeal to implement the strategic village concept, and urgency to build some kind of local support base to contain the insurgency, the planners forgot the lessons of Vietnam. In South Vietnam, the government was moving local people from their homes to the outskirts of the village to create a defence perimeter against Viet Cong guerillas. This involved moving local people within their known territory, not transplanting people from one geographic area to another. Even then the program failed because most people did not want to be moved, and were reluctant to take up arms against their own people. In the CHT the settlers were not only unwelcome to the insurgents, but also to the local people. The only friends that they had were the law enforcement authorities; but they could not guard them twenty-four hours a day."

জিয়াউদ্দিন চৌধুরী লিখেছেন যে এক্ষেত্রে কৃতিত্ব দিতে হয় পুনর্বাসিত মানুষগুলোর সাহস এবং দৃঢ় মনোবলকে, তবে এটা সম্ভব হয়েছে শুধু এ কারণে যে তারা ছিল গৃহহীন। তাদেরকে বসত গড়তে হয়েছে সম্পূর্ন প্রতিকূল অবস্থায় এবং

[১৭] ঐ।

তারা সহসাই আবিষ্কার করলো যে, তারা আগে যেমন ছিল তার চেয়ে আরো খারাপ অবস্থায় এখন পড়েছে। এই অবস্থা তাদের জীবনকে সত্যিকার অর্থেই দুর্বিসহ করে তুলেছিল। তিনি আরো লিখেছেন ঃ [১৮]

> "The first attack on a Bangali settlement happened a few months after the settlement in an area not too far from Kaptai. In a brazen attack after dark, the insurgents killed several settlers, burnt the newly built thatched-houses, and drove hundreds of men, women and children out of the "strategic village" to Rangunia in Chittagong. As deputy commissioner of Chittagong I had the misfortune of witnessing these refugees, and offered them what little relief I could. Again they were huddled in makeshift camps, and taken back to the hill tracts under police security."

অমূলক হলেও সত্য যে, পাহাড়িদের তীব্র অসন্তোষ বা বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখেও "বসতিকরণ কর্মসূচি" বন্ধ হয়নি, উপরন্তু তা পার্বত্যাঞ্চলের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত করা হয়। জিয়াউদ্দিন চৌধুরী আরো লিখেছেন যে শান্তিবাহিনী তাদের বিদ্রোহে খুব সহজেই স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থন ও সহযোগিতা পায়; তারা বিভিন্ন ধরনের ফসল ও নানা উপকরণ দিয়ে তাদের সাহায্য করতো; কারণ এই পুরো জবরদস্তিমূলক "বসতিকরণ কর্মসূচি" ছিল আদিবাসীদের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশ গ্রামগুলোতে যৌথ অভিযান পরিচালনা করত এবং শক্তভাবে স্থানীয় জনগণকে দমন করত। এছাড়া বিদ্রোহীদের নানা প্রলোভন দেখানো হতো, একই সাথে কঠোর হস্তে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের দমন করা হতো। এতে করে সেনাবাহিনী জনগন থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হতো এবং শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহীরা অধিকতর সাহসী আক্রমনের জন্য আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতো। বিদ্রোহ এবং প্রতিবিদ্রোহ দমনের জন্য এই শক্তি প্রয়োগ, পুরো দুই দশক ধরে গোটা পাহাড়ী অঞ্চলকে অশান্ত করে রেখেছিল।[১৯]

১৯৭৯ সাল থেকে শুরু হয় সারা দেশ থেকে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যেয়ে বসতি স্থাপন এবং এটা চলে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। সরকারিভাবে এটা কখনই স্বীকার করা হয়নি, তবে এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে ঃ [২০]

> "৪-৯-১৯৮০ ইং তারিখের স্মারক নং ৬৬ (৯) সি মূলে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের কাছে লেখা গোপনীয় চিঠি এবং ১৫-৯-১৯৮০ ইং তারিখের স্মারক নং ১০২৫ (৯) সি মূলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক কর্তৃক অন্য জেলার জেলা প্রশাসকদের কাছে লেখা গোপনীয় চিঠির ভাষ্যই প্রমান করে যে অন্য জেলা থেকে বাঙালিদের সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসন করা হয়েছে।"

---

[১৮] ঐ।

[১৯] ঐ।

[২০] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, স্থানীয় সরকার পরিষদ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের লংগদু, বিলাইছড়ি, বরকল, কাউখালী, নানিয়ার চর, রাজস্থলী, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাঙা, আলিকদম, লামা, মানিকছড়ি, লক্ষিছড়ি প্রভৃতি স্থানে বাঙালিদের পুনর্বাসন করা হয়। সরকার বাঙালি পুনর্বাসনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বাঙালির সংখ্যা সম অনুপাত আনতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে ১৯৭৪ সালে পাহাড়ি বাঙালি অনুপাত ছিল ৭৩ঃ ২৭; সেখান থেকে বেড়ে ১৯৮১ সালে পাহাড়ি বাঙালি অনুপাত দাঁড়ায় ৬০ঃ ৪০। প্রতিটি পুনর্বাসিত বাঙালি পরিবারের জন্য পাঁচ একর পাহাড়ি জমি অথবা চার একর মিশ্র জমি অথবা আড়াই একর ধানী জমি বরাদ্দ করা হয়। [২১]

সারণি ৮ ঃ পুনর্বাসিত জোন ও পরিবার সংখ্যা [২২]

প্রথম পর্যায় ঃ ১৯৭৯-১৯৮১ সাল

ক্রমিক নং	পুনর্বাসন জোন	পরিবারের সংখ্যা
১	তবলছড়ি	১,৮১০
২	রামগড়	৩,৫৭৯
৩	কাউখালী	২,৭৯২
৪	লামা	৭,৪৩৮
৫	আলিকদম	৭৫০
৬	ভূষনী আদম	১,৪০৮
৭	লংগদু	৮,২২৫
৮	বগাচতর	২,৭৭২
৯	নাইখ্যংছড়ি	১,৯৫৬
	মোট	৩০,৭৪০

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৮১-১৯৮২

ক্রমিক নং	পুনর্বাসন জোন	পরিবারের সংখ্যা
১	পানছড়ি	২,৩৭৫
২	গৌরাঙ্গ পাড়া	৪৫৮
৩	অভয়া	৯১৬
৪	আলুটিলা	৩,১৭৮
৫	বুড়িঘাট	১,৬৩৩

[২১] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮-১৪৯।

[২২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯।

৬	ভাইবোন ছড়া	৪১৮
৭	বড়মেরুং	২,২২০
৮	আদ্রক ছড়া	২,০৭৪
৯	কাসালং	৪১৬
১০	ভূষণ ছড়া	১,৭০৫
১১	শুভলং	৫১৮
১২	ক্যাংরা ছড়ি	৫০২
	মোট	১৬,৪১৩

বর্ধিত দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৮২-১৯৮৩

ক্রমিক নং	পুনর্বাসন জোন	পরিবারের সংখ্যা
১	অভয়া (বর্ধিত)	৩১৭
২	লক্ষীছড়ি	১,৫০০
৩	বাঙালহালিয়া	৭১৬
৪	চম্বি / ফাইতং	২,৩০১
৫	কমলছড়ি	২,২৭২
	মোট	৭,১০৬

সূত্র: মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯।

উপরের বিবরণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৯-১৯৮৩ সময়কালের মধ্যে সমতল ভূমি থেকে ৫৪,২৫৯ বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। ঐ সময়কালে পরিবারপিছু গড় জনসংখ্যা ৬ হিসেবে ধরলেও ৩,২৫,৫৫৪ জন বাঙালিকে, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় রাষ্টীয় ব্যবস্থাপনায় এবং সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায়। এভাবেই এগিয়ে চলে বাঙালিকরণ ও ইসলামীকরণের কাজ। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক আরো জানিয়েছেন যে এরপরে ১৯৮৫ সালের মধ্যে আরো ৩ দফায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু ঐগুলি বাস্তবায়ন করা হয়নি।[২৩] কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র তৎপরতার ও প্রতিরোধের মুখে আরো ৩ দফায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসনের পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

[২৩] ঐ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শতাব্দীব্যাপি আদিবাসীদের জনসংখ্যার পরিবর্তন বেশ লক্ষণীয়। ১৮৭২ সালে ৯৮ ভাগ পাহাড়ি ও মাত্র ২ ভাগ বাঙালি ছিল। ১৯০১ সালে তা বেড়ে ৭ ভাগ, ১৯৫১ ও ১৯৫৬ সালে ৯ ভাগ, ১৯৮১ সালে ৩৯ এবং ১৯৯১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৮ ভাগ বাঙালি। [২৪] সুতরাং ব্যাপকহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশের কারণে পাহাড়ি আদিবাসীদের জমি হ্রাস পেয়ে তাদের দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ১ : পার্বত্য চট্টগ্রামে জনমিতির রূপান্তর

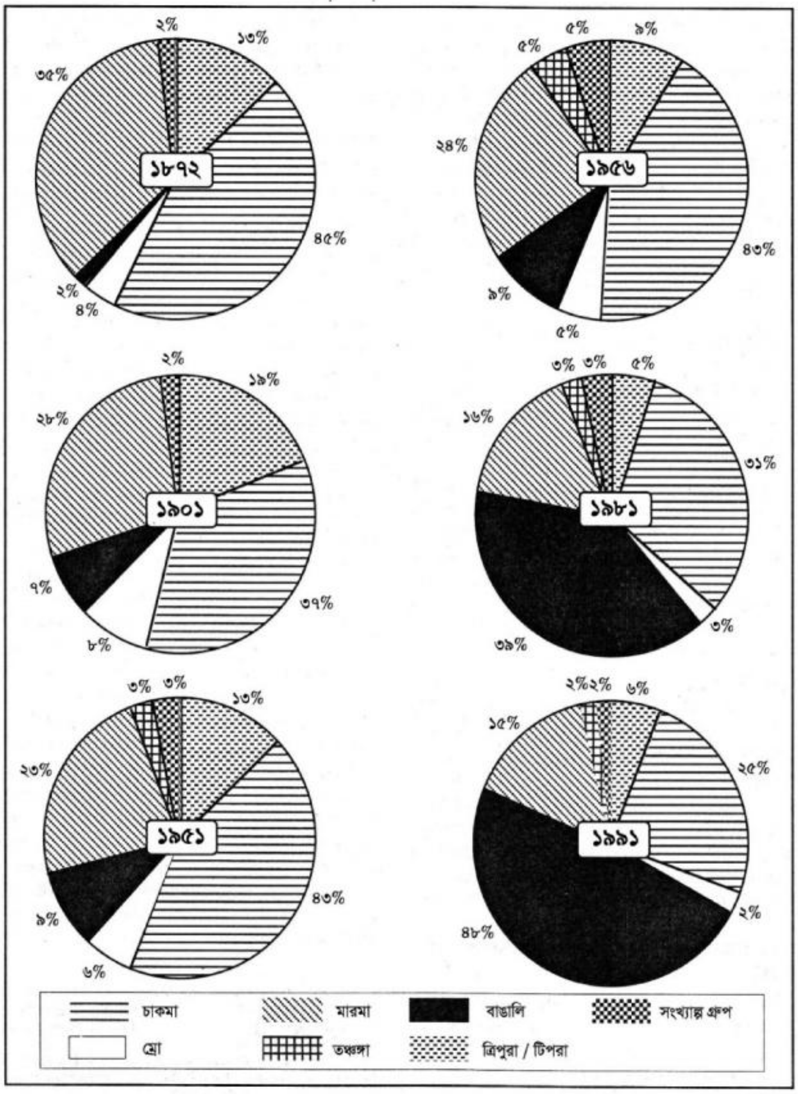

সূত্র ঃ Shapan Adnan , *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict,* পৃষ্ঠাঃ ১৪।

[২৪] Shapan Adnan, *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict, Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, , Research & Advisory Services, Dhaka, 2004, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সরকারের নেয়া পুনর্বাসন কর্মসূচির কারণে হাজার হাজার আদিবাসী জনগণ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমিতি পাল্টে যায়:

সারণি ৯ : পার্বত্য **চট্টগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহ ও বাঙালিদের উপজেলাওয়ারী অবস্থান**

ক্রমিক নং-	**জেলা ও উপজেলা সমূহ**	**জাতিসমূহ**											
		বম	চাক	চাকমা	খিয়াং	খুমি	লুসাই	মারমা	ম্রো	পাংখোয়া	তঞ্চঙ্গা	ত্রিপুরা	বাঙালি
১	**বান্দরবান**	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**
১.১	আলিকদম	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
১.২	বান্দরবান সদর	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
১.৩	থানচি	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
১.৪	নাইখ্যংছড়ি	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
১.৫	রোয়াংছড়ি	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
১.৬	রুমা	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১.৭	থানচি	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
২	**খাগড়াছড়ি**	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**
২.১	দিঘীনালা	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.২	খাগড়াছড়ি সদর	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.৩	লক্ষীছড়ি	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.৪	মহালছড়ি	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.৫	মানিকছড়ি	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.৬	মাটিরাঙ্গা	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.৭	পানছড়ি	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
২.৮	রামগড়	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
৩	**রাঙ্গামাটি**	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**
৩.১	বাঘাইছড়ি	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓
৩.২	বরকল	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓
৩.৩	বিলাইছড়ি	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
৩.৪	জুরাছড়ি	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
৩.৫	কাপ্তাই	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
৩.৬	কাউখালি	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓
৩.৭	লংগদু	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
৩.৮	নানিয়ারচর	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
৩.৯	রাজস্থলি	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
৩.১০	রাঙ্গামাটি সদর	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

সূত্রঃ Abul Barkat, Sadeka Halim, Avijit Poddar et.al, *Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts,* UNDP-CHTDF, Dhaka, 2009 / Abul Barkat, Sadeka Halim, Asmar Osman, Md. Ismail Hossain, Manzuma Ahsan, *Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and*

Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Human Development Reserch Centre (HDRC), Dhaka, 2010, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৯।

১৯৮১ সালে সেটেলারদের বসতি স্থাপন করার ফলে বাকমারা তাইডং গ্রামে কী ঘটেছিল তা ওই গ্রাম থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যাওয়া আদিবাসী শরণার্থীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ [২৫]

> "বাংলাদেশী কতৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে মুসলমানদেরকে এই এলাকায় নিয়ে আসা হয়। এর পূর্বে আমাদের গ্রাম চাকমা, ত্রিপুরা এবং মারমা অধ্যুষিত ছিল। সরকারের সহায়তায় সেটেলাররা আমাদের গ্রামে পুনর্বাসিত হচ্ছিল এবং তারা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছিল...তারা যাদের দেখিয়ে দিচ্ছিল সেনাবাহিনী তাদের বাড়িঘর লুণ্ঠন ও তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করছিল। তারা সকল খাদ্যশস্য নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেনাবাহিনীর কাছে কখনোই এর প্রতিকার চেয়েও পায়নি। চারপাশের এসকল ঘটনা নিয়ে আদিবাসীরা আতঙ্কে ছিল। তিনদিন পরে যখন একটি ঘটনায় ছয়জন আদিবাসী মারা গিয়েছিল, অন্ধকার নামার ঠিক পূর্বেই অসংখ্য সেটেলার "আল্লাহু আকবার" চিৎকার করতে করতে আমাদের গ্রামে ঢুকেছিল। তাদের আগুন জ্বালানোর পূর্বেই আমরা অনেকেই পালিয়ে চলে আসি।"

পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ সরকারের এই পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে এবং বাংলাদেশ সরকারের নিকট পুনর্বাসিত বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাহাড়ি বাঙালি সম অনুপাত করেও সরকার বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়। তবে পরবর্তীতে ম্যালেরিয়ার ভীতি ও শান্তিবাহিনীর হামলার কারণে ২৩, ৫১১টি পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করেছে। [২৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে গৌতম কুমার চাকমা বলেন ঃ [২৭]

> "ঢাকায় বিবিসি চ্যানেল ফোর-এ একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, যে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সেই জাতি স্বাধীন হবার পর বিভিন্ন এলাকায় গণহত্যা করেছে। এর সাথে ভিয়েতনামের মাইলাইয়ে'র গণহত্যার তুলনা করা যেতে পারে। আমরা সরকারকে বলেছিলাম সেনা অভিযান চালিয়ে কোন জাতিকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যে জাতি জেগে উঠেছে তাকে দাবিয়ে রাখা যাবেনা। আসুন, আমরা রাজনৈতিকভাবে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করি। জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী বলেছিলেন, 'ওরা পারবে কি করে, কিছু পারবেনা। চিটাগাং, নোয়াখালি, কুমিল্লা বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালিদের ঠেলে এনে তাদেরকে মাইনরিটি করে দেব।' অর্থাৎ এই ষড়যন্ত্র ভয়াবহ এবং সমস্যা খুব জটিল।"

---

[২৫] Life Is Not Ours, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

[২৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯।

[২৭] গৌতম কুমার চাকমা, সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

৪. সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন

সেনাবাহিনীসহ বাঙালি নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম বিষয়গুলো হল ঃ

৪.১. অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড

১৯৭৭ থেকে শুরু করে ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর নানা ধরণের নির্যাতন চালানো হয়, অনেকের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং পরিচালিত হয় অসংখ্য হত্যাকাণ্ড; এমনকি চালানো হয় একের পর এক গণহত্যা। ফলে তৈরি হয় শরণার্থী সমস্যাসহ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সমস্যা, যা বিশ্বের কাছে প্রশ্নবোধক হয়ে ওঠে। নির্যাতনের শিকার একজন আদিবাসী যিনি প্রাণ বাঁচাতে শেষাবধি ইউরোপে শরণার্থী জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক আদিবাসীকে হত্যা করে এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। রাঙ্গামাটি ও তার আশেপাশের এলাকায় রাতের বেলায় তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে যেত। তার কলেজের একজন সহকর্মী তাকে জানান যে তিনি গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে রাতে বাড়িতে ঘুমাতে পারতেন না। [২৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড ও গণহত্যার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ [২৯]

১.১। ১৯৭৭ সালের প্রথমদিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা, গুইমারা, মানিকছড়ি ও লক্ষিছড়ির কয়েকটি গ্রামে হামলা চালিয়ে ৭৩ জন আদিবাসী নারী-পুরুষকে হত্যা করে এবং তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে।

১.২। ১৯৭৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর কুকিছড়া গ্রামের নাথু চন্দ্র চাকমার পরিবারের ১২জনকে হত্যা এবং শান্তি লাল চাকমা, নাথু চন্দ্র চাকমা ও শুক্রমনি চাকমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

১.৩। ১৯৭৮-১৯৭৯ সময়ে উত্তর রুমা সেনাবাহিনী ক্যাম্পের সদস্যরা দুমদুম্যা মৌজার প্রায় ৫০টি গ্রামে হামলা চালায় এবং এর মধ্যে ২২টি গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি সুবলং উপত্যকার প্রত্যেক গ্রামে হামলা চালায়।

---

২৮ A B Chakma, 'Look Back from Exile : A Chakma Experience', published in Wolfgang Mey (ed.), *Genocide on the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : They are Now Burning Village After Village*, International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhegen, 1984, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

২৯ বিপ্লব চাকমা, '*পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে*', পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৮৭।

১.৪। ১৯৭৯ সালের ৫ মার্চ গরগজ্যাছড়ি গ্রাম থেকে সমীরণ তালুকদার ও আলোময় চাকমা নামে দুই ছাত্র এবং হল্যা নামে এক কৃষককে গ্রেফতার করে হত্যা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

১.৫। ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল কাউখালী হত্যাকাণ্ডের নায়ক ক্যাপ্টেন আবুল কালাম কানুনগোপাড়া গ্রামে হামলা চালিয়ে সিন্ধু কুমার চাকমা, অরুণ কান্তি চাকমা ও অনাবিল চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে মৃতদেহগুলি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

১.৬। ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা কল্পরঞ্জন চাকমাসহ ৭০জন পাহাড়িকে গ্রেফতার করে নির্যাতনের পর ছেড়ে দেয়।

৪.২. গণহত্যা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নতুন বসতি স্থাপনকারী বাঙালি সেটেলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের উপর অসংখ্যবার আক্রমণ করেছে। Amnesty International এবং Survival International-সহ নানান আন্তর্জাতিক সংস্থা এ ধরণের গণহত্যা, নির্যাতন ও ধর্মান্তরণ নিয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করে। Amnesty International-এর বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত রিপোর্ট থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী ও বাঙালি সেটেলারদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐ সময়ে পরিচালিত গণহত্যার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

৪.২.১. কাউখালী গণহত্যা (২৫ মার্চ ১৯৮০)

আদিবাসী জনগন এবং বাঙালি সেটেলারদের মধ্যে বিরোধের প্রথম ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ, কাউখালী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। কাউখালী গ্রামটি কালামপতি ইউনিয়নে অবস্থিত যেটি চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি যাবার পথে ৩১ মাইল দূরে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই এলাকায় বাঙালি সেটেলারদের বসতি স্থাপন করানো এবং আদিবাসী মৌজাধীন জমি সেটেলারদের মাঝে বন্দোবস্ত দেওয়া নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া বন্দোবস্ত দেয়া জমির বাইরের অন্যান্য জমিও অনেক বাঙালি সেটেলার প্রশাসনের সহায়তায় জোরপূর্বকভাবে দখল করতে থাকে। ফলে বিরোধ দ্রুত বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায়, কিছু বাঙালি নেতার ভাষ্য অনুযায়ী, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সেটেলারদেরকে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বেশকিছু পোস্টার রাতের আধারে লাগাতে থাকেন। ফলে সেটেলারদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছিল।[৩০]

[৩০] Amnesty International, *Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts,* Amnesty International Publications, London, 1986, পৃষ্ঠা ঃ ১১।

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা এবং '২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচী প্রণয়নে'র জন্য স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ ২৫ মার্চ সকাল ৯ টায় পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানীয় আদিবাসী ও বাঙালি নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। একইসাথে ঐদিনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পোয়াপাড়া বৌদ্ধবিহারের বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে লোক দেয়ার জন্য স্থানীয় ক্যাম্প অধিনায়ক আদিবাসী কারবারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ অনুযায়ী ঘটনার দিন সকালে কাউখালী সদর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রায় ৫০ থেকে ৬০জন আদিবাসী বৌদ্ধবিহারে এসেছিলেন। সভায় যোগদানের জন্য কাউখালী বাজারে আদিবাসী ও বাঙালি বেশকিছু নেতা সমবেত হয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস বিভিন্ন তথ্য প্রদান করছে। [৩১]

জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা তার গ্রন্থে বলেছেন যে, কাউখালী বাজারে সভা শুরু হওয়ার পূর্বে আনুমানিক ৯টার সময় পশ্চিম দিক থেকে একটি গুলির আওয়াজ হয় এবং সাথে সাথে বাজারের চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে গোলাগোলি শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাঙালি সেটেলারদের কাছ থেকে জানা যায় গোলাগোলির সাথে সাথে পোয়াপাড়া, বেতঝড়ি, মিতিঙ্গাছড়ি, হাতিমারা, কাশখালী, ছোট ডলু ইত্যাদি গ্রামে সেটেলারদের বাড়িঘরে আগুন জ্বলতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, এটি ছিল আদিবাসীদের সহযোগিতায় শান্তিবাহিনীর হামলা। এতে ৭জন বাঙালি নিহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই হামলা দ্রুত প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এর পরপরই সেটেলাররা কাউখালী থানা সদর এবং এর প্বার্শবর্তী পোয়াপাড়া, বেতঝড়ি, মিতিঙ্গাছড়ি, হাতিমারা, কাশখালী, ছোট ডলু, রাঙ্গীপাড়া, কচুখালী ইত্যাদি আদিবাসী পাড়ায় হামলা চালিয়ে বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এ হামলায় শতাধিক লোক মারা যায়। তবে সরকারীভাবে এর কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। [৩২]

সরকার প্রথমদিকে এই ঘটনাটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। যখন আক্রান্তরা পালিয়ে কাউখালীর বাইরে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় তখনই ঘটনাটি সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং জাতীয় সংসদে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব অংশৈ প্রু চৌধুরী কাউকালী পরিদর্শনে যান। এর পরপরই তিনজন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন এবং উপেন্দ্র লাল চাকমা আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তারা কাউখালী ঘটনার জন্য তৎকালীন সরকারকে দায়ী করেছিলেন। [৩৩]

এ ঘটনা সম্পর্কে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এবং Anti-Slavery Society-র ব্যাখ্যা হল - ১৯৮০ সালের দিকে কাউখালী গ্রামের বিভিন্ন পোস্টার দেখলেই বোঝা যায় যে সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য অভিবাসী এসে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। সেটেলারদের হাতে জমিজমা ও অনেক ক্ষেত্রে বাড়িঘর হারানো আদিবাসীগণ স্বাভাবিকভাবে এটি পছন্দ করেনি, ফলে সেখানে এক ধরনের অস্থির পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই অবস্থায় ১৯৮০

[৩১] ঐ।
[৩২] ঐ।
[৩৩] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫।

সালের ১০ মার্চ কাউখালী গ্রামের পূর্বদিকে শান্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যের মাঝে সংঘর্ষ হয় যাতে ২২জন সৈন্য নিহত হন। [৩৪]

এই ঘটনার প্রতিশোধ স্বরূপ ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ কালামপতি ইউনিয়নে সেনাবাহিনী উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে অসংখ্য আদিবাসীকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পাঁচদিন পর, ১৯৮০ সালের ১ এপ্রিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা সর্বপ্রথম কাউখালী ঘটনা নিয়ে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি মৃতের সংখ্যা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও বলেছিলেন যে, মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যাবে। সেই সময় তিনি ১১জন আদিবাসীর নাম বলেছিলেন যারা কাউখালী হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছেন। [৩৫]রাজকুমারী চন্দ্রা রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩০০ ছাড়িয়ে। [৩৬] একই কথা জানিয়েছিল পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন ১৯৯১ সালে তাদের প্রকাশিত রিপোর্টে। [৩৭]

সেই সময়ে তিনজন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন এবং উপেন্দ্র লাল চাকমা আক্রান্ত এলাকা ঘুরে এসে ১৯৮০ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন ক'রে বলেন ঃ [৩৮]

> "...স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার স্থানীয় নেতাদের মিটিং-এর কথা বলে বাজারে একত্র হবার নির্দেশ দেন। ঐ কমান্ডার স্থানীয় আদিবাসীদের পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দির পুনর্গঠনের জন্য একই সময়ে মন্দিরে আসতে বলেন। স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষ্যমতে ঐ সময় হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাজারে আসে এবং স্থানীয় নেতাদের উপর গুলি করতে শুরু করে..."।

উপস্থিত দু'জন আদিবাসীর ভাষ্যমতে একই সময়ে অনুরূপভাবে আর্মিদের দ্বারা আরেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে পোয়াপাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরে। গ্রামবাসীরা কাজ করছিলেন এসময় হঠাৎ সেনাবাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং সবাইকে লাইন করে দাঁড়াতে বলে। এরপর নিরস্ত্র আদিবাসীদের উপর সেনাবাহিনী গুলি করতে থাকে। সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের পর বাঙালি সেটেলাররা কাউখালী গ্রাম এবং তার আশেপাশের এলাকায় আদিবাসী জনগণের উপর হামলা চালায়, তাদের ঘরবাড়ি এবং মন্দিরের উপর আক্রমণ করে। এই হামলার দ্বারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাঙালি সেটেলাররা ধর্মীয় সম্প্রীতির ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলে। [৩৯]

---

[৩৪] Amnesty International, *Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts,* পৃষ্ঠা ঃ ১১।

[৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৩৬] Rajkumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* Published by: International Work Group for Indigenous Affairs, Denmark, 2000 পৃষ্ঠা ঃ ১২২।

[৩৭] Life is not Ours, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬ ।

[৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া একজন প্রত্যক্ষদর্শী আদিবাসী উপরোক্ত তিনজন সংসদ সদস্যকে বলেছেন যে, পোয়াপাড়া হাইস্কুলের পশ্চিম কোণে প্রায় ৫০জনের মৃতদেহকে গণকবর দেয়া হয়েছে। ১৯৮০ সালের ১৩ এপ্রিল নিউ নেশন পত্রিকায় একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে কাউখালি ঘটনায় ২৮জন নিহত হবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।[৪০] মৃতের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশী আর্মি ও সেটেলাররা যে ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তিনজন সংসদ সদস্য তাদের রিপোর্টে বলেন যে ঃ[৪১]

> "আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, কালামপতির ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুযায়ী এটি ঘটানো হয়েছে।"

কাউখালী হত্যাকাণ্ডের পর হাজারের অধিক আদিবাসী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে চলে যান। বাংলাদেশ সরকার এই ঘটনার জন্য কোন তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। তবে জিয়াউর রহমান সরকারের সময় ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল যার কাজ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা অনুধাবন করা। এই কমিটিকে ২৫ মার্চের কাউখালি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু তারপরেও এই সংসদীয় কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। যে সব সেনা-সদস্য এই হত্যাকাণ্ডের জন্য জড়িত ছিলেন তাদের কোন শাস্তি হয়নি এবং তারা সেখানে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।[৪২]

৪.২.২. বানরাইবারি, বেলতলা ও বেলছড়ি গণহত্যা (২৬ জুন ১৯৮১)

কাউখালী হত্যাকাণ্ডের এক বছর পরেই ১৯৮১ সালের ২৬ শে জুন বানরাইবারি, বেলতলী এবং বেলছড়িতে আরেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরাসরি জুম্মদের উপর আক্রমণ করেনি। বরং আর্মিদের পরোক্ষ সহায়তা ও নিরাপত্তায় বাঙালি সেটেলাররা বানরাইবারি, বেলতলী ও বেলছড়িতে আক্রমণ করে। এতে প্রায় ৫০০ আদিবাসী জুম্ম পুরুষ, নারী ও কিছু শিশু নিহত হয় এবং সেটেলাররা তাদের গ্রাম, জমি ও খামার দখল করে নেয়। এক হাজারের অধিক জুম্ম নিকটবর্তী বনে পালিয়ে যায় এবং ৫,০০০ এর মত জুম্ম শরণার্থী হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়।[৪৩]

---

[৪০] Amnesty International: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৪১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১২।

[৪২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

[৪৩] Report of Human Rights Congress for Bangladesh Minorities , Massacres in the CHT , 2008 Committee for International Campaign.

৪.২.৩. তেলাকাং, আশালং, গুরানগাপাড়া, এবলাছড়ি ও বায়নালা গণহত্যা (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১)

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘঠিত গণহত্যার মধ্যে ১৯৮১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সংঘটিত হত্যাকাণ্ড অন্যতম। কারণ এ সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাঙালি সেটেলাররা মিলিতভাবে ও পরিকল্পিতভাবে ৩৫টি জুম্ম গ্রামের উপর আক্রমণ চালায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ফেনী উপত্যকার আক্রান্ত এই গ্রামগুলোর মাঝে অন্যতম হলো তেলাফাং, আশালাং, গুরানগাপাড়া, তাবালছড়ি, বায়নালা ইত্যাদি। এইসব গ্রামে তারা একত্রে লুণ্ঠন করে, হাজার হাজার গ্রামবাসীকে হত্যা করে যার মাঝে ছিল পুরুষ, নারী, শিশু এবং গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। এই আক্রমণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফলে হাজার হাজার জুম্ম মারা যায়। [৪৪]

যেসব আদিবাসী বেঁচে ছিলো তারা কিছু পালিয়ে যায় ত্রিপুরা রাজ্যে এবং কিছু নিকটবর্তী বনে আশ্রয় নেয়। যদিও পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার পালিয়ে যাওয়া এইসব আদিবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ সময় তারা বর্ডার এলাকায় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে সরকার তাদের পুনর্বাসিত করে। প্রত্যেক গ্রামবাসীকে ১৮ ইউরো সমতুল্যের টাকা দেয়া হয় এবং তাদেরকে ভাগ্যে উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ সময় তারা তাদের নিজস্ব গ্রাম বা ঘরে ফিরতে পারে নি কারণ সেগুলো সেটেলাররা দখল করে নিয়েছিল। এ সময় অনেক আদিবাসী ক্ষুধা ও রোগে মৃত্যুবরণ করেছিল। [৪৫]

৪.২.৪. গোলাকপতিমাছড়া, তারাবানছড়ি গণহত্যা (জুন-আগস্ট ১৯৮৩)

পূর্বের গণহত্যার পুনরাবৃত্তি হিসেবে ১৯৮৩ সালে আবার শুরু হয় গণহত্যা। ১৯৮৩ সালের ২৬ শে জুন, ১১, ২৬, ২৭ জুলাই এবং ৯, ১০, ১১ই আগস্ট বাংলাদেশী আর্মি এবং বাংলাদেশী অভিবাসীরা গোলাকপতিমাছড়া, মাইছছড়া, তারাবানছড়ি, লোগাং, তারাবানইয়া, মারামাছইছড়া, জেজমাছইছড়া ইত্যাদি গ্রামের প্রায় শতাধিক ঘর বাড়িতে লুণ্ঠন করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এসময় তারা ৮০০জনকে হত্যা করেছিল। এদের মাঝে অধিকাংশই ছিল শিশু, বৃদ্ধ ও নারী। এই গ্রামগুলো থেকে জুম্মদের সরিয়ে বাংলাদেশ সরকার সেখানে বাংলাদেশী সেটেলারদের বসতি স্থাপন করায়।[৪৬]

[৪৪] ঐ।
[৪৫] ঐ।
[৪৬] ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩. ধর্ষণ

পাহাড়ি মেয়েদের উপরও সেনাবাহিনীর চরম নির্যাতন প্রসঙ্গে মং শৈ প্রু খিয়াং বলেন ঃ [৪৭]

> “১৯৭৫ সালে মেজর জেনারেল মঞ্জুর হিল ট্রাক্টস-এর জিওসি ছিলেন। শুনেছি তিনি বলেছিলেন যে, ‘পাহাড়িদের দেখতে চাইনা, প্রতিটা পাহাড়ি মেয়ের পেটে যেন বাঙালির সন্তান থাকে’। তার এই কথাটা সেই সময় সবার মুখে মুখে ফিরেছিল। জেনারেল মঞ্জুর-এর অত্যাচারের ফলে প্রচুর লোক জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। শান্তিবাহিনী আছে এরকম ইনফরমেশন পেলে সেনাবাহিনী পুরো পাড়া ঘেরাও করতো এবং শান্তিবাহিনীর কাউকে পাওয়া না গেলে পাহাড়ি মেয়েদের উপর অত্যাচার করতো।”

৪.৪. ধর্মীয় নিপীড়ন

‘দ্য ঢাকা কুরিয়ার’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ধর্মগত নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে অনেক। এ অঞ্চলে ১৯৭৮ সালে আট মাসে ৯টি উপজেলায় ৬৪টি বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। [৪৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মীয় নিপীড়নের প্রকৃতি ও মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান বৌদ্ধ ধর্মগুরু অজ্ঞবংশ মহাথেরো ১৯৮৫ সালে জেনেভায় জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মানবাধিকার কমিশনের *Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*-এর যে *Working Group on Indigenous Populations* রয়েছে তার কাছে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন সেই সাক্ষ্য থেকে। তিনি বলেন ঃ [৪৯]

> æThe Bangladeshi regime is persecuting the indigenous people for their religious beliefs. Numerous Buddhist temples have been looted, desecrated and destroyed. The monks are detained, tortured and murdered. For example, on 22 February 1979, the Bangladesh army ransacked the Buddhist temple at Pujgang, 20 miles north of Khagrachari, shot at the holy image of the Buddha, broke its head with riffle butts,

---

[৪৭] মং শৈপ্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

[৪৮] ঐ।

[৪৯] Statement by Ven. Aggavansa Mahathera to the Working Group on Indigenous Populations, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Commission on Human Rights, Economic and Social Council, United Nations,Geneva, 29 July – 2 August 1985.

and then played football with the head. Rev. Arniruddha Bhikkhu and Rev. Rebata Bhikkhu were beaten severely with the result that the former had suffered a serious head injury and the latter had the right hand broken.'

'On 27 December 1979, Ven. Ajara Bhikkhu and Ven. Bannitananda Bhikkhu of the Buddhist temple at Thakujyama Kalak in the Kachalong valley were hacked to death by the Bengali soldiers. During the Kalampati Union massacre on 25 March 1980, the Bangladesh army and the Bengali settlers plundered and destroyed many Buddhist temples and murdered many monks. A Parliamentary investigation team confirmed that the Buddhist temples at Betchari, Tonghapara, Chotadulu, Baradulu and Tripuradighi were completely destroyed and that those at Headmanpara, Poapara, Rangeipara, Kashkhalimukh Para, Kachukhali, Chela Chara, Roazapara, Hatirpara etc. were heavily damaged. The Bengalis broke up the Buddha's statue at Poapara Buddhist temple and then played football with the broken pieces. A few monks survived and they were left for dead. Ven. Pannasara Bhikkhu and Ven. Wannasara Bhikkhu of Roazapara Temple had their hands broken. Ven. U Chandra Griya Bhikkhu, 60, of Chaityaraja Buddhist Temple at Kashkhalimukh Para had his head injured and both hands broken.'

'The Bengali soldiers stripped a Buddhist monk of the temple at Kattali, 70 miles north-east of Rangamati, slaughtered a cow on his saffron robes and sprinkled blood on the holy image of the Buddha.'

'On 11 August 1983, Ven. Bodhipal Bhikkhu of Banavihar temple at Jedamachyachara, near Panchari, was beaten mercilessly. He fled to Agartala in Tripura State of India as he could not bear military oppression anymore."

৪.৫. জোরপূর্বক উচ্ছেদ (১৯৭৫-১৯৮৩)

বিদ্রোহ দমনের নামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক তাদের ঘর-বাড়ি ও জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রথমে একটি গ্রাম ঘেরাও করতো। অতপর তাদের প্রহার করতো এবং পুরুষদের গ্রেফতার করে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতো। সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে মং শৈ প্রু খিয়াং বলেন ঃ [৫০]

"সরকার শুধুমাত্র শান্তিবাহিনীদের কষ্ট দেয়নি, সকল পাহাড়ি জাতিকে কষ্ট দিয়েছিল। যেমন, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন জিনিসপত্র আগে কিনতো, গ্রামবাসীরা যতদূর থেকেই আসুক না কেন

[৫০] মং শৈপ্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

,,

১১/১২ টা বেজে গেলেও সেনাবাহিনী না কেনা পর্যন্ত কেউ কিছু কিনতে পারতো না, সেনারা যেটায় হাত দিতো সেটা কোন পাহাড়ি আর ক্রয় করতে পারতো না, এবং ব্যবসায়ীরা অন্যের কাছে যে জিনিস ৫০ টাকায় বিক্রি করতো আর্মির কাছে সেটা ৩০ টাকায় বিক্রি করতে হতো। কোন পাহাড়ি আগে কোন জিনিস কিনলে বাঙালি ব্যবসায়ীরাও তাদের মারধোর করতো।

১৯৭৯-তে বনশ্রী উপজেলার পাইথন পাড়ায় শান্তিবাহিনীর কর্মীরা এসে গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করতো। সেই কারণে আর্মি নিয়মিত পাড়ায় এসে পাহাড়ি ছেলেদেরকে ধরে রোয়াংছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করতো। সেখানে গাছের ডালে পা দুটো উপরের দিকে এবং মাথা নিচে ঝুলিয়ে অত্যাচার করে মাথা ন্যাড়া করে দিতো। এই গ্রামের ছেলে লালজুয়ার বম ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজে পড়ত। একবার সে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সেনাবাহিনী তাকেও পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছিল। নির্যাতনের মাত্রাটা এমন ছিল যে সুস্থ হবার পরও সে রাতে ঘুমাতে পারতো না। চোখ বন্ধ করলেই আর্মি দেখতো। পরবর্তীতে সে আর গ্রামে আসতো না। [৫১]

এই প্রসঙ্গে লয়েল ডেবিড বম বলেন ঃ [৫২]

> "সেনাবাহিনী পাড়ায় এসে খেলাধুলারত ছেলে মেয়েদের ডেকে একত্রিত করতো এবং কোন কথাবার্তা না বলে গাছের ডাল ভেঙ্গে তাদের পেটানো শুরু করত। মেয়েদেরকেও পিটিয়ে তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতো তাদের সাথে শান্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে।"

পাহাড়িদের কেনাকাটার উপরও ছিল সরকারি নিষেধাজ্ঞা। শান্তিবাহিনী পাহাড়িদের মাধ্যমে জিনিষপত্র কেনাকাটা করতো, এই ব্যবস্থাকে "গা লাইন" বলা হতো। যখন যে গ্রামে শান্তিবাহিনীর গেরিলারা আশ্রয় নিতো, সেই গ্রামের বাসিন্দাদের টাকা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা দিলে গ্রামবাসীরা সেইসব জিনিস কিনে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের দিতো। এই কারণে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে পাহাড়িদের কেনাকাটার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল, ম্যাচ, তেল ইত্যাদি তারা বেশি কিনতে পারতো না। পাহাড়িরা বেশি কেনাকাটা করলেই সন্দেহ করা হতো শান্তিবাহিনীকে সরবরাহ করা হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রির উপর সেনাবাহিনীর কড়া নজর ছিল। এই আইন গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকর ছিল। এই প্রসঙ্গে মং শৈ প্রু খিয়াং বলেন ঃ [৫৩]

> "কেরোসিন এক কেজির উর্ধ্বে মরে গেলেও দোকানদার বিক্রি করতো না। সপ্তাহে দুটো ম্যাচ কেনা যেত। খোলাবাজারে একজনের কাছে ১০ কেজি চাল বিক্রি হতো না, এটা আর্মিদের নিষেধ ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছু খোলাবাজারে লাইনে দাঁড়িয়ে কিনতে হতো। কেরোসিন, লবন, চাল, সবকিছুর জন্য পৃথক পৃথক দোকান ছিল। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস কেনার জন্য একটা লোককে অনেকবার লাইনে দাঁড়াতে হতো। দোকানগুলির মালিক ছিল বাঙালিরা। গ্রামের ভিতরে দোকান করার অনুমতি ছিল না, সব

---

[৫১] ঐ।

[৫২] লয়েল ডেভিড বম এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/২০০৩।

[৫৩] মংশৈপ্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

দোকান ছিল বাজার এলাকায়। গ্রামের ভিতরে কেউ দোকান করতে চাইলে সেনা কর্মকর্তারা বলতেন শান্তিবাহিনীর জন্য সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।”

৫. শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম

৫.১. স্বাধিকার আন্দোলন ও শান্তিবাহিনী

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে পাহাড়িরা শিক্ষা নিয়েছিলেন। সেই সাথে সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি বিকাশের সকল ক্ষেত্রকে গ্রহণ করে নিজেদের তৈরি করেছিলেন। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গে সন্তু লারমার অনুভূতি হলো, ‘পাহাড়ের আদিবাসীরা সংখ্যায় কম হলেও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাহাড়িরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আত্মবলিদানে যদি সদাপ্রস্তুত থাকে এবং সেই সাথে জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে পারে, তাহলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে।’[৫৪]

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়িরা অগ্রসর হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সামন্তবাদী শক্তি এবং অন্যান্য অপশক্তিগুলো এবং একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হলেও সংগ্রামের সঠিক আদর্শ ছিল বলে সেটা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া বাস্তবতা পাহাড়িদেরকে এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল যে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে আর পিছনে যাবার পথ নেই। স্বাভাবিক কারণে তাদের সামনে অগ্রসর হতে হয়েছে। পাহাড়ি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অস্তিত্বের অধিকার সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা আদায়ের জন্য একজনকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। এগিয়ে এসেছিলেন এম. এন. লারমা। তার নেতৃত্বে যারা সমবেত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে এই দৃঢ়তা ছিল ‘যে জাতি মরতে জানে, যারা অধিকারকামী, মুক্তিকামী, আত্মবলিদানে ভীত নয় সে জাতি অবশ্যই তার অধিকার পাবে”। এক কথায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জন্য, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আদিবাসীদের এই সংগ্রাম, যে সংগ্রাম ছাড়া তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হতে পারে না। দেশের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ, মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, লেজুড়বৃত্তি ও তাবেদারী মনোভাব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাতে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের অস্তিত্বকে চিরতরে ধ্বংস করার পাঁয়তারাটাই মুখ্য ছিল। বাস্তবতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং প্রগতিশীল ভাবাদর্শ এই জনগোষ্ঠী-কে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সাহসী করে তুলেছে।[৫৫]

এম. এন. লারমা দলীয় কর্মীদের এবং সকল পাহাড়ি জুম্ম জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “সকল জাতির জনগণকে অর্গানাইজ করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারো প্রতি বিরূপ মনোভাব রাখা উচিত না, ত্রিপুরা, মার্মা, চাকমা, মুরং, খিয়াং সকলের ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে একত্রে কাজ করতে পারলে নিশ্চয়ই পার্বত্য আন্দোলনকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমরা যারা প্রগতিশীল

[৫৪] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১৮/০৮/২০০২।

[৫৫] ঐ।

চিন্তা চেতনার সমমনা মানুষ এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ সবাইকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। নেতা হতে হবে বা নেতৃত্ব করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।"[৫৬]

এম. এন. লারমার আহ্বানে ১৯৭২-৭৪ সালে বিভিন্ন জাতির বহু আগ্রহী যুবক শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকেই ভলেনটিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন।[৫৭] শান্তিবাহিনীর কর্মীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতেন এবং পাহাড়ি জনগণ, যারা নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেও নির্যাতনের মূল শিকড় অনুসন্ধানে অক্ষম তাদের সচেতন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের অনুসন্ধানী মন যখন বাস্তবে দখলদারের জমি দখলের প্রক্রিয়া দেখেছে, জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে পাহাড়িদের উচ্ছেদে সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতা দেখেছে তখন উপলব্ধি করেছে সংগঠন ছাড়া অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। এই প্রেক্ষিতে অনেকে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারসহ সব কিছু সংরক্ষণের জন্য একমাত্র সংগঠন হলো জনসংহতি সমিতি।[৫৮] সুবর্ণ চাকমা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি শান্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ৭১-এ যাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম, পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরতে হয়েছে।[৫৯] শান্তিবাহিনী সৃষ্টির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শান্তিবাহিনী চুরি, ডাকাতি ও বিভিন্ন সামাজিক অনাচার কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু শান্তিবাহিনী বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলায় উভয় পক্ষের বহু জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

৫.২. শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম

১৯৭২-এর গোড়াতেই পার্বত্য চট্টগ্রামসহ চারটা জেলাকে 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষণা করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু পাহাড়িদের আওয়ামী লীগ সরকার 'পাকিস্তানপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, এবং স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানপন্থীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও পার্বত্যবাসীদের ক্ষমা করা হয় নাই। এখানে ইসলামী সম্প্রসারণবাদী ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী একটি মহল ছিল যাদের তৎপরতার কারণে এটা হয়েছিল। সরকার যতটা না করেছে বিশেষ মহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেটেলাররা অন্যায় অত্যাচার আরও বেশি করেছে। কথায় বলে 'সূর্যের তাপের চেয়ে বালুর তাপ বেশি'।[৬০]

সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণার পর জনসংহতির কর্মীরা প্রস্তুতি শুরু করেন, প্রথমত, জনশক্তির বিন্যাস অর্থাৎ আন্দোলনের দিকে জনগণকে ধাবিত করা, সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য কর্মীবাহিনী এবং যোদ্ধাবাহিনী গড়ে তোলা। নির্দিষ্ট সংখ্যক যোদ্ধা

[৫৬] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ৩১/০১/২০০৩।
[৫৭] কে এস মঙ-এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/২০০৩।
[৫৮] মং শৈপ্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।
[৫৯] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬, ৫৭।
[৬০] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০৩।

নিয়ে লড়াইটা হয়নি এজন্য জনগণকে সশস্ত্রভাবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই সশস্ত্রকরণ শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে নয়, জনগণের মাঝে অধিকার আদায়ের মানসিকতাও গড়ে তুলতে হয়েছিল। এভাবেই অস্ত্র শক্তির বিকাশ হয়েছিল। লড়াই করতে হলে খাদ্য ও অর্থের প্রয়োজন সেদিকেও নজর রাখতে হয়েছিল। [৬১]

বিভিন্ন দেশের স্বাধিকার আন্দোলনগুলি পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনা বিশেষ করে দর্শন এবং বাস্তবতা উভয় মিলে জনসংহতি কর্মীদেও মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে, অধিকার আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যথেষ্ঠ নয়। এখানে অধিকার পেতে হলে সংগ্রামের বিকল্প নেই। তত্ত্বগত পড়াশুনা, মার্ক্সবাদ, লেলিনবাদ, মাওসেতুং-এর চিন্তাধারার প্রভাবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এম. এন. লারমা নিয়মতান্ত্রিকভাবেই প্রতিবাদ করেছিলেন। তথাপিও তাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটক করা হলো। তিনি পাহাড়িমানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বলতে গিয়ে নির্যাতিত হলেন। সে সময় পার্বত্য-অঞ্চলের বিশেষ শাসন ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় Safety Ordinance আইনে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উন্নত এলাকা তথাকথিত উন্নয়নের নামে ডুবিয়ে দিয়ে আদিবাসীদের সর্বনাশ করলো। আর নিজের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে মানবেন্দ্র লারমা রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে অভিযুক্ত হলেন। রাষ্ট্র যখন মানুষের বিরুদ্ধে যায়, তখন মানুষের আশ্রয় নেয়ার জায়গা থাকে না। এই জন্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিজেদের রক্ষার জন্যই নিজেদেরকে সংগঠিত হতে হয়। পাহাড়ের সামন্তবাদী সমাজে এবং বিভিন্ন পশ্চাৎপদ জাতিগুলোর মধ্যে একটা জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল বাস্তবতার কারণে। বাস্তবতা ও তত্ত্বগত শিক্ষা থেকে লারমা এবং অন্যান্য সকলে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বল প্রয়োগ ছাড়া অধিকার আদায় সম্ভব নয়। [৬২]

সশস্ত্র আন্দোলনের পটভূমি প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেছিলেন ঃ [৬৩]

> "শেখ মুজিবুর রহমান বা বাংলাদেশ সরকার, আমাদের প্রতি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিল, দুর্ব্যবহার ও হুমকি দিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে সরকারের সাথে Formal Delegation-এর আলোচনায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে অধিকার দিতে সরকার রাজি নয়। যার ফলে আমরা সশস্ত্র আন্দোলনের চিন্তা শুরু করেছিলাম।" তবে শুরুতেই অস্ত্র ব্যবহার হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে জনসাধারণকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল। আত্মমুখী প্রস্তুতি আর বাস্তবতাকে সমন্বয় করে এগুতে হয়েছিল, না হলে তো বিপদ হতে পারতো। ব্যাপারটা জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য আমাদের সংগঠনের রাজনৈতিক ও সামরিক ইস্যুকে সাধারণ জনগণের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র তুলে নিলে আমাদের হঠকারিতা মূলক কাজ হতো। সেই জন্য প্রথমে জনগণের সমর্থন আদায় ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করেছি।"

---

[৬১] ঐ।

[৬২] ঐ, ২১/০৫/২০০৩।

[৬৩] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১১/০৫/২০০৪।

জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা ছিল শান্তিবাহিনী এবং এ বাহিনী একটা নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলের পাহাড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল সশস্ত্র ট্রেনিং ক্যাম্প। জঙ্গল ঘেরা বিশাল পাহাড়গুলোতে দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে হতো। এই পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট খড়ের ঘরগুলো ছিল শান্তিবাহিনীর ব্যারাক। কিছু দিন পর পর ব্যারাকগুলো স্থানান্তর করতে হতো। [৬৪] স্বশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল অস্ত্রের, কারণ প্রতিপক্ষ ছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী। শান্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ চলতো ৭১-এর পাক-বাহিনী, রাজাকার বা মুজাহিদ বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রগুলোর সাহায্যে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর পার্বত্যাঞ্চলের বাঙালি, পাহাড়ি ও রাজাকারদের হাতে প্রচুর অস্ত্র ছিল। এ সময় সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তা ছিল না। একটা রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনসংহতি সমিতির প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও অস্ত্র সংগ্রহের এটা একটা সুযোগ হয়েছিল। যে অস্ত্রগুলো এ সময় ডাকাতির কাজে ব্যবহার হতো, সেই অস্ত্রগুলোই শান্তিবাহিনী সংগ্রহ করেছিল আন্দোলন করার জন্য। [৬৫] সশস্ত্র শাখার প্রধান ছিলেন সন্তু লারমা, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানকে বলা হতো ফিল্ড কমান্ডার। শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি। তার নির্দেশ অনুযায়ী শান্তিবাহিনী পরিচালিত হতো। এই সময় হাজার হাজার পাহাড়ি যুবক নিয়মিত সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তু লারমার সাথে যোগাযোগ করে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। [৬৬]

শান্তিবাহিনীতে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগদানে ইচ্ছুক বা প্রার্থীকে সেক্টর কমান্ডার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এ ক্ষেত্রে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কারণ সম্পর্কে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির মানসিক গঠন বোঝার চেষ্টা ছিল জরুরি। কোন ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনায় আলোড়িত ব্যক্তিকে শান্তিবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হতো না। প্রার্থীর গ্রামে লোক পাঠিয়ে প্রার্থীর তথ্য যাচাইপূর্বক শান্তিবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হতো। কোন রকম সন্দেহজনক মর্মে প্রতীয়মান ব্যক্তি শান্তিবাহিনীতে যোগদানের অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হতো। [৬৭]

স্বেচ্ছাসেবক (ভলান্টিয়ার) হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের রাইফেল চালনা প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। রাইফেলের বিকল্প হিসেবে বাঁশ দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, লেফট-রাইট ও সশস্ত্র সালাম প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছিল। ১৯৭৬-৭৭ সালে ত্রিপুরা, মার্মা, মুরং জাতির জনগোষ্ঠী এক সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা রাজনীতি বিষয়েও ক্লাস করতেন। [৬৮]

শান্তিবাহিনীর কর্মীদেরকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে প্রায় ৩০০জনকে একসাথে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কর্মীদের কয়েক বছর ট্রেনিং দেওয়ার পর উপযুক্ত হলে লেন্স কর্পোরেল করা হতো। লেন্স কর্পোরেল হিসেবে মাঝে মাঝে চেক

---

[৬৪] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯।

[৬৫] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১২/০৮/২০০৩।

[৬৬] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত , ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৯।

[৬৭] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[৬৮] কে এস মং এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/২০০৩।

পোস্টের দায়িত্বে দেয়া হতো এবং কখনও কখনও রিজার্ভ এলাকায় ফাইটিং গ্রুপে পাঠানো হতো। দক্ষিণাঞ্চলে শান্তিবাহিনীর ৪ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল মাতামুহুরির সিন্ধুতে। নিরাপত্তামূলক অবস্থার উপর নির্ভর করে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তর করা হতো। কখনও দুই তিন মাস পর পর স্থানান্তর করা হতো। কখনও এমন অবস্থা হয়েছে যে, একই দিনে দুই তিন জায়গায় স্থানান্তর করতে হয়েছে। হেডকোয়ার্টারের লোকদের কাজ ছিল বই পড়া ও গোলবারুদ রক্ষণাবেক্ষণ করা। [৬৯]

শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সামরিক ট্রেনিং হতো মোবাইছড়ির উপরে। প্রশিক্ষক ছিলেন নলিনী রঞ্জন চাকমা ও অমৃত লাল চাকমা। দুজনেই পূর্বে বিডিআর-এর হাবিলদার ছিলেন। ১৯৭৫ সালে জনসংহতি সমিতির কর্মী সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ৫ হাজার। তারা সার্বক্ষণিক গ্রাম ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পার্টির কাজ করতেন। এ সময়ের মধ্যেই জনসংহতি সমিতির সদস্যরা পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি শক্তিশালী network তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। [৭০]

শান্তিবাহিনীর মিলিশিয়া প্রশিক্ষণ হয়েছিল পাহাড়ের পাদদেশে। মিলিশিয়া প্রশিক্ষণ ছিল প্রথম কোর্স। এর পরের প্রশিক্ষণ দুটিকে বলা হতো যথাক্রমে জে.এল.সি বলা হতো, অর্থাৎ 'জোন লিডারশিপ কোর্স' এবং সি.এল.সি বা 'কমবাইন্ড লিডারশিপ কোর্স। প্রশিক্ষণগুলো বিভিন্ন ব্যাচে বিভক্ত ছিল। ১৪ দিন, ২০ দিন, ২৫ দিনও হতো, যখন দেখা যেত পরিস্থিতি অনুকূলে নয়, যে-কোনো সময় সরকারের কাছে ইনফরমেশন চলে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, তখন প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হতো। যে-কোনো মুহূর্তে পুলিশ-বিডিআর আসতে পারে, এ ব্যাপারে কর্মীদের সবসময় সতর্ক থাকতে হতো। [৭১] সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রেষণামূলক (মটিভেশনাল) প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলো মূলত; অন্তর্ভুক্ত থাকতো তা হলো ঃ মার্ক্সসবাদ কি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলতে কি বোঝায়, মার্ক্সসবাদী ব্যাখ্যানুযায়ী পাহাড়িদের অবস্থান কোন পর্যায়ে, কেন সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, বাঙালিদের সামাজিক অবস্থান কি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পাহাড়িদের অবস্থান কোথায়, পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নির্যাতিত সকল মানুষের অবস্থান কোথায় ইত্যাদি। এ ছাড়াও আলোচনা হতো সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে, শান্তিবাহিনী কি ধরনের রাজনীতি করছে, সর্বহারা মুভমেন্ট কি, প্রলেতারিয়েট কাকে বলে ইত্যাদি। [৭২]

রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ঃ কর্মীদের আন্দোলনের ব্যাপারে প্রেষণা যোগানো ও উদ্বুদ্ধ করা। রাজনৈতিক প্রশিক্ষক ছিলেন সন্তু লারমা, যতিন্দ্রলাল ত্রিপুরা। যতীন বাবু সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাশ নিতেন, তার অনুপস্থিতিতে গৌতম কুমার চাকমা, চাবাই মং প্রমুখ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতেন। মাঝে মধ্যে অন্যান্য কর্মীরাও ক্লাশ নিতেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন।[৭৩] প্রশিক্ষকরা যেমন ক্লাশ নিতেন তেমনি অনেক সময় প্রশিক্ষণার্থীদেরও কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে বলা হতো। এটিও ছিল একটি শিক্ষা পদ্ধতি। এ ছাড়াও

---

[৬৯] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[৭০] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ৩১/০১/২০০৩।

[৭১] ঐ, ৩১/০১/২০০৩।

[৭২] ঐ।

[৭৩] ঐ।

প্রশিক্ষণার্থীদের লিখিত এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা হতো। Practical হতো। Raid ও Ambush প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাতে হতো। [৭৪]

এ প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুরা বলতে চেয়েছেন ঃ [৭৫]

> "মিলিশিয়া ট্রেনিং-এ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার কথা বলা হতো। তবে Leak Out হয়ে যেতে পারে এই জন্যে কোন Line-এ যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ তা পরিষ্কার করে বলা হতো না। কারণ তাদের সবাইকে তো বাঁচতে হবে। পাহাড়িদের বাঙালি বানিয়ে ফেলছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তারা কোন অধিকার পেল না, সাংবিধানিকভাবে কোন স্বীকৃতি পেল না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ কোন মৌলিক অধিকারও পায়না। অন্যদিকে এ অঞ্চলে বাঙালি অনুপ্রবেশ চলছে, এ বিষয়গুলোসহ বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভূল বুঝাবুঝি রয়েছে তা মিলিশিয়া প্রশিক্ষণে বলা হতো।

১৯৭৩-৭৪ সালে শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর এম. এন. লারমা ভারত বা বার্মার সহায়তা কামনা করেন। ১৯৭৩-৭৫ সাল পর্যন্ত বার্মার সাথে যোগাযোগ করা হলেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কারণ ঐ সময় বার্মা নিজেদের সমস্যা নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল। এছাড়াও সে সময় বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে বর্মী সরকার চাননি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত তারা কোন সাড়া দেননি। কারণ শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক অব্যাহত ছিল।[৭৬] ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কেন্দ্রীয় নেতার সাথে এম. এন. লারমার আলোচনা হয়। এম. এন. লারমা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভারতের সহায়তা কামনা করেন। ভারতের পক্ষে যতদূর সম্ভব সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি সভার পর এম. এন. লারমা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সন্তু লারমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৭৫ সালে ২৬ সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ির কুকিছড়ায় সন্তু লারমা ও শান্তিবাহিনীর অপর দুই সদস্য পুলিশের হাতে আটক হন। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত 'র'-এর সাথে যৌথ সভায় সন্তু লারমার পরিবর্তে যোগ দিয়েছিলেন ভবতোষ দেওয়ান এবং প্রীতিকুমার চাকমা। [৭৭] তবে পরবর্তী সময়ে গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং শান্তিবাহিনীর মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শান্তিবাহিনীর ১৮-২১জন সদস্যসহ ২৬জন অফিসারকে উত্তর প্রদেশের দেরাদুন প্রশিক্ষণ একাডেমীতে উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের যোগান দিয়ে শান্তিবাহিনীকে সহায়তা করা হয়েছিল। [৭৮]

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার সন্তু লারমা গ্রেফতার হন। জেলে থাকার সময় নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদসহ তার উপরে অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়। ১৯৭৫-৮০ এই সময় সন্তু

[৭৪] ঐ।

[৭৫] ঐ।

[৭৬] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০০।

[৭৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০১।

[৭৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০১-১০২।

লারমাকে একমাস রাখা হয়েছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। পাঁচ বছর জেলে থাকার পর ১৯৮০ সালে তিনি বিনা শর্তে মুক্তি পান। সেই সময় সেখানকার জি.ও.সি. ছিলেন জেনারেল মঞ্জুর। জিয়াউর রহমান জেনারেল মঞ্জুরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার জন্য। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার পরিচিতি জানানো বা তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া ক্ষমতা পত্রটি জনসংহতি সমিতিকে হস্তান্তর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু ক্ষমতায়ন পত্রের কপি না দেখে জনসংহতি সমিতি আলোচনায় বসতে আগ্রহী হয়নি। [৭৯] ১৯৭৫-৮০ সালে সন্তু লারমা জেলে থাকাকালীন শান্তিবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রীতি কুমার চাকমা। [৮০] এই সময়ে শান্তিবাহিনী প্রচণ্ড চাপের মুখে ছিল। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে মোতায়েন করেছিল হাজার হাজার সেনাবাহিনী ও বিডিআর। এ কাজে সরকারের এক দিনে ব্যয় হতো প্রায় দেড় কোটি টাকা। এই সময়ে সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতনে হাজার হাজার পাহাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে। প্রেসিডেন্ট জিয়া বঙ্গবন্ধুর চ্যালেঞ্জকে বাস্তব রূপ দিতে চার লক্ষাধিক বাঙালিকে বসতি গড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। এবং এই সেটেলাররাই দখল করতে থাকে পাহাড়িদের ঘরবাড়ি, জমি। ফলে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আর এসব মোকাবেলার জন্য শান্তিবাহিনীকে তৎপর হতে হয়েছিল। [৮১]

দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ রাঙ্গামাটির শঙ্খ রিজার্ভে (সাঙ্গু নদী) শান্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ হতো গভীর বনের ভিতরে। এখানে অস্ত্রের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজনীতি বিষয়ক ক্লাসও নেয়া হতো। প্রশিক্ষক ছিলেন আলিক্সি। রাজনীতি বিষয়ক ক্লাশে আলোচনা হতো মহিলাদের সম্মান করতে হবে, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে হবে, মদ পানকে নিষিদ্ধ করা হবে। আত্মসমর্পণকে নিরুৎসাহীত করা হতো। অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণকে জাতির সাথে বেঈমানী হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হতো। বহু আগে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা আবাস শুরু করেছেন, ব্যবসা করছেন, আদিবাসীরা রাজনীতির চক্রান্তে নিমজ্জিত হয়েছে, এই চক্রান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। [৮২]

রাজনীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হতো ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট’ অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে ধারণা দেয়া হতো। তারপর ‘ব্রিটিশ আমলে পাহাড়িদের অবস্থা’, ‘পাকিস্তান আমলে কি হলো’, ‘বাংলাদেশ হওয়ার পর কি অবস্থা হলো’ ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার কথা বলা হতো। এছাড়াও ‘আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা’ থেকে বর্তমান ‘আধা- সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা’র কথা আলোচনা আসতো। পাহাড়িদের এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা থেকে কীভাবে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হতো। শত্রু ও মিত্র চিহ্নিতকরণ করা হতো। বুঝানো হতো পাহাড়ি ও আদিবাসীদের মধ্যে যেমন সবাই আমাদের মিত্র না, শত্রুও আছে। বাঙালির মধ্যেও আমাদের সবাই

[৭৯] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।
[৮০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।
[৮১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।
[৮২] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

শত্রু না, মিত্রও আছে। এমন অসংখ্য বাঙালি আছেন যারা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন, আমাদের পক্ষে প্রচার করেন। প্রশিক্ষকদের দেওয়া এ ধারণাগুলো কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতো'।[৮৩]

৬. শান্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো

জনসংহতি সমিতির মিলিটারী কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সশস্ত্র গ্রুপ হলো শান্তিবাহিনী। শান্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড 'জেনারেল হেড কোয়ার্টারস' দ্বারা পরিচালিত হতো। শান্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ ঃ[৮৪]

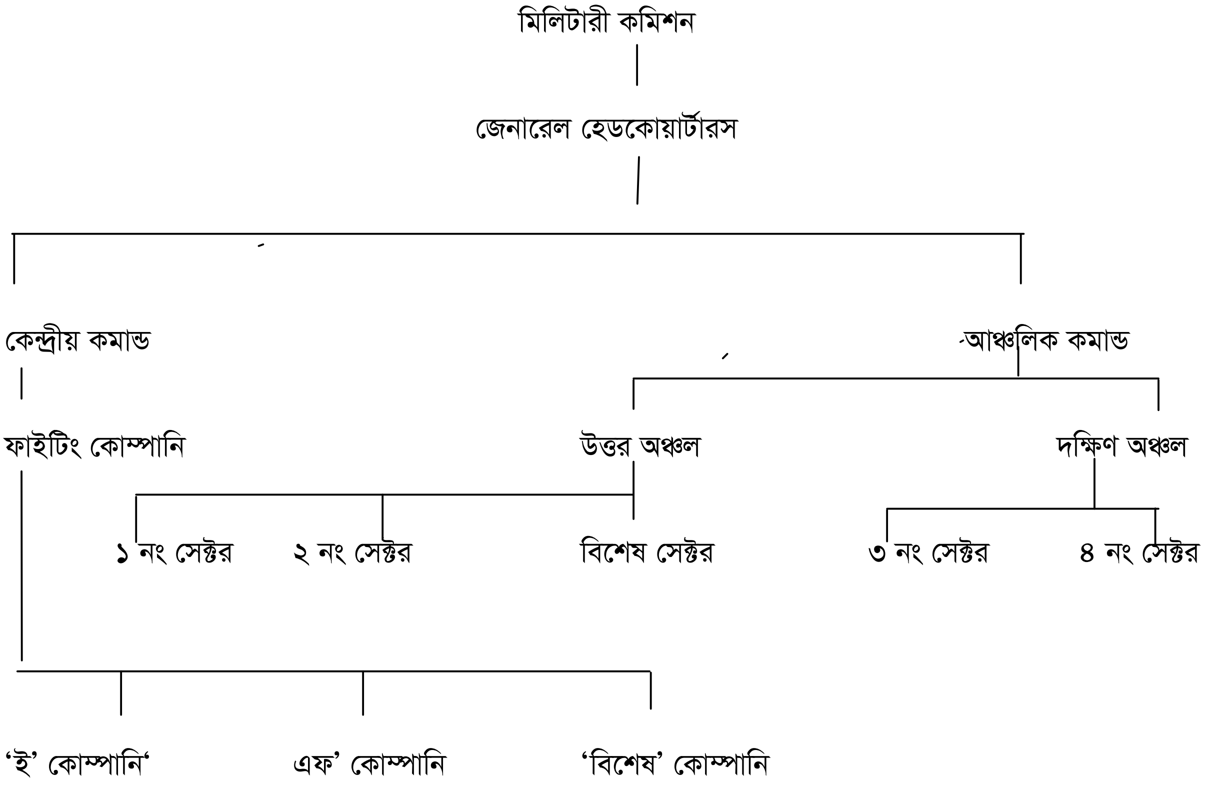

৭. শান্তিবাহিনীর সেক্টরসমূহ

শান্তিবাহিনী তাদের কর্মকাণ্ডের সুবিধার জন্য পার্বত্য অঞ্চলকে দুটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিল। যথা ঃ 'উত্তর অঞ্চল' এবং 'দক্ষিণ অঞ্চল'। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল বিভাজনকারী হিসেবে কর্নফুলী নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কর্নফুলী নদীর উত্তর পার্শ্ব 'উত্তর অঞ্চল' এবং দক্ষিণ পার্শ্ব 'দক্ষিণ অঞ্চল' হিসেবে বিভক্ত ছিল। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অঞ্চল দুটিকে কতকগুলি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। উত্তর অঞ্চলকে তিনটি সেক্টর যথা ঃ ১ নং ও ২ নং সেক্টর

[৮৩]বিক্রম ত্রিপুরার'র সাক্ষাৎকার, ৩১/০১/২০০৩।

[৮৪] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪।

এবং বিশেষ সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলকে তিনটি সেক্টর যথা ঃ ৩ নং, ৪ নং ও ৫ নং সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টর একাধিক জোনে বিভক্ত। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ [৮৫]

(ক) উত্তর অঞ্চল

১ নং সেক্টরের অধীনস্ত জোনগুলি হলো ঃ

(১) ওয়ালা জোন ঃ চন্দ্রঘোনা থানার উত্তরাংশ এবং কাউখালী থানার দক্ষিণাংশ এই জোনের অন্তর্গত।
(২) ইছামতি জোন ঃ কাউখালী থানার পশ্চিমাংশ, লক্ষীছড়ি থানার পূর্বাংশ ও মানিকছড়ি থানা নিয়ে এই জোন।
(৩) বুড়িঘাট জোন ঃ নানিয়ার চর থানার পশ্চিমাংশ ও কাউখালী থানার পূর্বাংশ।
(৪) গুইমারা জোন ঃ মাটিরাঙা থানার দক্ষিণাংশ, রাামগড় থানা ও মানিকছড়ি থানার কিছু অংশ নিয়ে এ জোন।

উত্তর অঞ্চলের ২ নং সেক্টরের অধীনস্ত জোনগুলি হলো ঃ

(১) নানিয়ার চর জোন ঃ নানিয়ার চর থানার উত্তরাংশ এবং মহালছড়ি থানার দক্ষিণাংশ নিয়ে এ জোন।
(২) লংগদু জোন ঃ সমগ্র লংগদু থানা নিয়ে এ জোন।
(৩) রাংগাপানি মেরুং জোন ঃ দীঘিনালা থানার দক্ষিণাংশ এবং বাঘাইছড়ি থানার পশ্চিমাংশ এ জোনের অন্তর্গত।
(৪) কমলছড়ি জোন ঃ মহালছড়ি থানার উত্তরাংশ এবং খাগড়াছড়ি থানার দক্ষিণাংশ।

উত্তর অঞ্চলের আওতাধীন বিশেষ সেক্টরের জোনগুলি হলো ঃ

(১) পানছড়ি জোন ঃ পানছড়ি থানার পূর্বাংশ এবং খাগড়াছড়ি থানার উত্তরাংশ।
(২) দীঘিনালা জোন ঃ দীঘিনালা থানার উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম অংশ এবং খাগড়াছড়ি থানার পূর্বাংশ নিয়ে এই জোন।
(৩) কাসালং জোন ঃ বাঘাইছড়ি থানার উত্তর ও পূর্ব অংশ এবং দীঘিনালা থানার রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা।

(খ) দক্ষিণ অঞ্চল

দক্ষিণ অঞ্চলের আওতাধীন ৩ নং সেক্টরের জোনগুলি হলো ঃ

(১) নারা জোন ঃ বান্দরবান থানার উত্তরাংশ এবং রাজস্থলী থানা নিয়ে এই জোন।
(২) তারাচা জোন ঃ বান্দরবান থানার দক্ষিণাংশ এবং লামা থানার উত্তরাংশ।
(৩) গাইন্দা জোন ঃ বিলাইছড়ি থানার পশ্চিম অংশ, রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানার দক্ষিণাংশ এবং জুরাছড়ি থানার পশ্চিমাংশ নিয়ে এ জোনের অবস্থান।

[৮৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪-৯৬।

দক্ষিণ অঞ্চলের ৪ নং সেক্টরের জোনগুলো হলো ঃ

(১) লামা জোন ঃ লামা থানার দক্ষিণাংশ এবং সমগ্র নাইক্ষংছড়ি থানা নিয়ে এ জোন।

(২) আলিকদম জোন ঃ সমগ্র আলিকদম থানা।

(৩) মধু জোন ঃ থানচি থানার পূর্বাংশ এ জোনের অন্তর্গত।

(৪) সাংগু জোন ঃ থানচি থানার দক্ষিণাংশ

দক্ষিণ অঞ্চলের আওতাধীন ৫নং সেক্টরের জোনগুলো হলে া ঃ

(১) শুভলং জোন ঃ বরকল থানার পশ্চিমাংশ, নানিয়ারচর থানার দক্ষিণাংশ ও রাঙ্গামাটি সদর থানার পূর্বাংশ নিয়ে এ জোন।

(২) রাইখ্যং জোন ঃ সমগ্র বিলাইছড়ি থানা নিয়ে এ জোনের অবস্থান।

(৩) বগা জোন ঃ রোয়াংছড়ি থানার পূর্বাংশ।

(৪) হরিনা জোন ঃ বরকল থানার উত্তর ও পূর্বাংশ নিয়ে এ জোন।

১৯৮১-৮৪ সালে বিরাজমান শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসানের পর জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি সেক্টরের নাম পরিবর্তন করে 'ডিসট্রিক্ট' ও জোনের নাম পরিবর্তন করে 'এরিয়া' করে। পরিবর্তিত নামগুলো হলো ঃ

উত্তর অঞ্চল

১ নং সেক্টর (যশোর ডিস্ট্রিক্ট)

২ নং সেক্টর (বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট)

বিশেষ সেক্টর (সিলেট ডিস্ট্রিক্ট)

দক্ষিণ অঞ্চল ঃ

৩ নং সেক্টর (কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট)

৪ নং সেক্টর (ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট)

৫ নং সেক্টর (রংপুর ডিস্ট্রিক্ট)

কেন্দ্রীয় কমান্ড ও আঞ্চলিক বা ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডের মাধ্যমে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনা করা হতো। কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে তিনটি ফাইটিং কোম্পানি ছিল। এদের কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা ছিল না। কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করতো। আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যরা জেলা কমান্ডারের নির্দেশে

জেলাগুলোতে অপারেশন পরিচালনা করতো। দীঘিনালা সদর থানার উত্তরাংশে জনসংহতি সমিতির প্রধান কার্যালয় এবং শান্তিবাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত ছিল। [৮৬]

জনশ্রুতি আছে, শান্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার প্রথম দিকে ভারতের মিজোরামে ছিল এবং পরে ত্রিপুরায় নিয়ে আসা হয়। এ বিষয়ে উষাতন তালুকদার বলেন, 'আমাদের হেড কোয়ার্টার ছিল ভ্রাম্যমাণ। গভীর জঙ্গলই ছিল তার ঠিকানা। কিছুদিন মায়ানি রিজার্ভ, কিছুদিন কাসালং রিজার্ভ - এভাবে স্থানান্তর হতো হেড কোয়ার্টার। এই রিজার্ভগুলো বিশাল গাছের জঙ্গল, দিনের বেলায়ও অন্ধকার, দুর্গম পথ। [৮৭]

দক্ষিণ অঞ্চলের ৩, ৪ এবং ৫নং সেক্টরের সদর দপ্তরকে উপ-কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দক্ষিণ অঞ্চলের কমান্ড পোষ্ট বি নামে আখ্যায়িত। ১০০জন সশস্ত্র সৈন্য সর্বদা কমান্ড পোষ্ট বি এর সদর দপ্তরের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। বিশেষ সেক্টর ব্যতীত অন্যান্য সেক্টরগুলো যুদ্ধ ময়দান হিসেবে চিহ্নিত। এই কারণে 'ই' এবং 'এফ' কোম্পানির সৈন্যদের সারাবছর সামরিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হতো। যুদ্ধ করাই তাদের দায়িত্ব ছিল। শান্তিবাহিনীরা সাধারণত গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করত। তাদের কর্মকাণ্ড ছিল রেইড, অ্যাটাক, অ্যামবুশ ইত্যাদি। অবসর সময়ে বিভিন্ন দেশের গেরিলা যুদ্ধের উপর লেকচার প্রদান ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়ানো হতো। সবসময় তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। এজন্য তাদের ছুটি ছিল খুব কম। [৮৮]

৮. শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব

সংখ্যাগত বিবেচনা, লেখাপড়া এবং অন্যান্য দিক থেকে চাকমা অপেক্ষা মারমা বা ত্রিপুরা যেমন পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী, তেমনি নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা ছিল অনেকটাই তাই। মারমাদের মধ্যে সিনিয়র লিডার ছিলেন চাবাই মং, তিনি *পাহাড়ী ছাত্র সমিতি*'র সভাপতি ছিলেন। চাবাই মং বি কমান্ড পোস্টে ছিলেন। এই সময় গৌতম চাকমা ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি। চাবাই মং এবং সন্তু লারমা ঢাকায় কাজ করতেন। ফলে সে সময় তারা সমমনা লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতেন এবং একই সাথে সরকারকে পাহাড়িদের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত করানোরও চেষ্টা করতেন। [৮৯] ১৯৭৫-এ শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন জারি হলে ১৯৭৬ সালে তারা দুজনই বন্দী হন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮০ সালে তারা জেল থেকে মুক্তি পান। সন্তু লারমা আন্দোলনে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু চাবাই মং আন্দোলনে আসেননি, তবে আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। শান্তিবাহিনীতে মার্মা জাতির সদস্যরা আঞ্চলিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন নেতৃত্ব

---

[৮৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৯৬।

[৮৭] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯।

[৮৮] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৬।

[৮৯] ঐ।

দিয়েছেন।[৯০] শান্তিবাহিনীতে ত্রিপুরা জাতির কর্মী ছিল অনেক, তবে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কর্মীর অভাব ছিল।[৯১] এই প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুরার ভাষ্য হলো ঃ ''ছাত্র জীবন থেকে এম. এন. লারমা ও সন্তু লারমার সাহচর্য পেয়েছি বলে রাজনীতিতে আসতে সক্ষম হয়েছি।"[৯২]

নেতৃত্বের আন্ডারগ্রাউন্ড পর্যায়ে ছাত্র সংগঠনের কাঠামো সম্পর্কে সন্তু লারমার ভাষ্য থেকে জানা যায় যে ঃ[৯৩]

> "কর্মীদের পরিবারগুলো ধীরে ধীরে ভারতে আশ্রয় নেয়। যদিও ভারত আশ্রয় দিতে চাচ্ছিল না। তবুও নানা রকম কলা কৌশল অবলম্বন করে আজকে এক পরিবার, কালকে এক পরিবার এভাবে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ এই পরিবারগুলো পাহাড় থেকে পাহাড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, অন্যদিকে এদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। স্কুলে ভর্তি হলেও তাদের পক্ষে স্কুল করা সম্ভব ছিল না। ফলে ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটছিল। সরকার উত্তর সেনা সংখ্যা বাড়িয়ে ক্যাম্প সম্প্রসারিত করছিল। এই অবস্থায় একশোর কাছাকাছি পরিবার ধীরে ধীরে মিজোরামে চলে যায়। পরিবারগুলো সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে চোপড়া স্ট্রিটে আশ্রয় নেয়। সেখানে ছাত্ররা 'প্রবাসী পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' নাম দিয়ে কাজ করেছে। ওখানে অনেক ছাত্র গ্রাজুয়েশন, পোষ্ট গ্রাজুয়েশন করেছেন। তারপরও একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ছাত্র সংগঠনের ধারাবাহিকতা ছিল ১৯৮০ দশকের গোড়া পর্যন্ত। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ছাত্র সমাজ আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে থাকে।"

৯. সশস্ত্র সংগ্রামে পাহাড়ি নারী

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে পাহাড়ি মহিলা সমিতির ৩৫জন সদস্য সর্বপ্রথম শান্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। প্রথমদিকে এই অগ্রগতির পথ মোটেই সহজ ছিলনা। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়েছে। কারণ রক্ষনশীল জুম্ম সমাজ সাধারণভাবে নারীদের বর্হিমুখীতা পছন্দ করেন না। নারী কর্মীদের নানা কটুবাক্য, উপহাস শুনতে হতো। এম. এন. লারমা ও সন্তু লারমা সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সুকৌশলে নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন।

শান্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন টুটু দিদি। তিনি শান্তিবাহিনীর বান্দরবান জেলায় মহিলা সমিতির সাথে কাজ করতেন। ১৯৭১ সালে তিনি পরিবারসহ বার্মায় চলে যান এবং ফিরে আসেন শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর। কে এস মং-এর বাবার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে বাঘাইছড়িতে নারীদের দলে রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শান্তিবাহিনীতে

[৯০] ঐ।
[৯১] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।
[৯২] বিক্রপুরার সাক্ষাৎকার, ৩১/০১/২০০৩।
[৯৩] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার ১৩/০৮/২০০২।

আরও কয়েকজন নারী কর্মী ছিলেন। তাদের একজন হলেন মানহাং তাপসি ওরফে ননীবালা চাকমা। ননীবালা চাকমা গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে নারীদের সঙ্গবদ্ধ করতেন। মূলত বলি পাড়া (থানচি থানা), বড় মধু, ছোট মধু প্রভৃতি এলাকায় তার কার্যক্রম ছিল। সকল পাহাড়ি জাতিকে তারা আন্দোলন বিষয়ে জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন। পাহাড়ের অনেক নারীই এই কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। নারীদের এ ধরনের সহযোগিতা শান্তিবাহিনীর কর্মীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।[৯৪]

মহিলা সংগঠনের অনেক কর্মী অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পাহাড়ি মহিলা সমিতির সদস্যরা শান্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সেবা-যত্ন, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবর দিয়ে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। অনেকে এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত থাকার কারণে নিরাপত্তার অভাবে স্বাভাবিক জীবনের আকর্ষণ ছেড়ে জঙ্গলের জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন।[৯৫]

১০. শান্তিবাহিনীর তৎপরতা ও জনসমর্থন ঃ 'শ্যাডো গভর্নমেন্ট'

১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ছিল শান্তিবাহিনীর জোয়ারের সময়। এ সময় প্রত্যয় আর সাহস নিয়ে যুবকেরা দলে দলে যোগ দিয়েছে শান্তিবাহিনীতে। স্বাধিকার স্বপ্ন এসব কর্মীদের পৌঁছে দিয়েছে এক কঠিন জীবনে। ঘুম-খাওয়া ব্যতীত কঠোর পরিশ্রম আর প্রশিক্ষণ ছিল তাদের জীবনীশক্তি। শান্তিবাহিনীর লড়াইয়ের পক্ষে সাধারণ পাহাড়িদের সমর্থন ছিল বিশাল। তথাপিও ১৯৭৭ সালে শান্তিবাহিনীতে সাময়িক এক সংকট কালের আগমন ঘটে। ১৯৭৮ সাল থেকে আবারও শুরু হয় এ বাহিনীর লড়াইয়ের জোয়ার। সংখ্যাগতভাবে ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়া যুবকের সংখ্যা সর্বাধিক। কারণ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক সামরিকবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আর সামরিকবাহিনীর নির্যাতন অত্যাচারও ছিল সীমাহীন। সামরিকবাহিনী পাহাড়িদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়েছে, এতে পাহাড়িরা বাধ্য হয়েছে ঘর-জায়গা-জমি ফেলে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিতে। অনেকে পার্বত্য এলাকার গহীন জঙ্গলেও আশ্রয় নিয়েছে। পাহাড়িদের ফেলে যাওয়া ঘর-বাড়ি-জমিতে বসানো হয়েছে সমতল থেকে নিয়ে যাওয়া বাঙালিদের। এ সময় শান্তিবাহিনীকে একই সাথে দুটো শক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে, একদিকে শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ভারতের মিজো বাহিনী এবং অন্যদিকে সর্বদা তৎপর বাংলাদেশ সামরিকবাহিনী। তথাপিও সে সময়ের শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার ঊষাতন তালুকদার এই সময়টিকে শান্তিবাহিনীর 'রাইজিং পিরিয়ড' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিদিন সহায়-সম্পত্তি হারা, কাজ হারা শত শত যুবক শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে। গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাঁচ হাজারের বেশি সদস্যের সমন্বয় ঘটে শান্তিবাহিনীতে। শান্তিবাহিনীর হাতে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা হতাহত হতে শুরু করে। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ এবং দেশের অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফলে প্রকৃত তথ্য জানা বা যোগাযোগ

[৯৪] কে এস মং এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/২০০৩।

[৯৫] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।

করা সম্ভব ছিল না। শান্তিবাহিনী দ্বারা প্রতিদিন একাধিক সেনা ও বিডিআর ক্যাম্প আক্রান্ত হতো এবং স্বাভাবিকভাবেই আহত হতো সেনা-বিডিআর সদস্য। আক্রান্ত সেনা এবং ক্যাম্পের অস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যরা হস্তগত করতে পারতো সহজেই। শান্তিবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হিসেবে সেনাবাহিনীর তৎপরতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ পাল্টা আক্রমণ গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা শান্তিবাহিনীর উপর সম্ভব ছিলনা বিধায় তা অনিবার্য হিসেবে আরোপিত হতো নিরীহ গ্রামবাসীর উপর। গোটা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, পাহাড়ি মেয়েদের উপর নির্যাতন করে তারা প্রতিশোধ নিতো। শান্তিবাহিনীর পদ্ধতিগত কৃতকার্যতার একটি অন্যতম কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষের মানসিক সমর্থন আর সহযোগিতা। শান্তিবাহিনীর যে নিজস্ব সোর্স ছিল গ্রামবাসীর মাধ্যমে সে সোর্সের কাছে পৌঁছে যেতো সেনাবাহিনীর তৎপরতার কথা। ফলে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা নিরাপদ আশ্রয় নিতে সমর্থ হতো। [৯৬] দুই হাজার যোদ্ধাকে মোকাবিলা করতে হাজার হাজার সৈন্য আনা হয়েছে পাহাড়ে। তারপরেও সৈন্যরা প্রতিনিয়তই নাজেহাল হয়েছে শান্তিবাহিনীর হাতে। এর অন্যতম কারণ শান্তিবাহিনীর প্রতি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অকুণ্ঠ সমর্থন। [৯৭] এই প্রসঙ্গে ঊষাতন তালুকদার বলেন ঃ [৯৮]

> “শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রামবাসীরা আমাদের সমর্থন যুগিয়েছেন। যখনই যে পরিবারে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে হাজির হয়েছে, তারাই তাদের রান্না করে খাইয়েছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন। পার্বত্য মহিলা সমিতির সদস্যরা তাদের কাপড়সহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের যোগান দিয়েছে।”

পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের অনুকুল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে শান্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে শান্তিবাহিনীর খরচ চালানো হতো। শান্তিবাহিনীর প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতির সমর্থন ছিল। তবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা এই তিন জাতির অংশগ্রহণ বেশি ছিল।[৯৯]

কার্যক্রম পরিচালনার এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকা শান্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল সামান্য অংশের উপর। ঊষাতন তালুকদারের কথায় সে চিত্র বোঝা যায়। তিনি বলেছেনঃ [১০০]

> “আসলে আমরা ছিলাম একটা ‘শ্যাডো গভর্নমেন্ট’। গ্রামের বিচার থেকে শুরু করে সবকিছুই আমরা নিয়ন্ত্রণ করতাম। পাহাড়িরা কখনো প্রশাসনের কাছে যেতো না। খুনের মামলা থেকে শুরু করে সবকিছুই আমরা দেখতাম। সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ এরকম প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। এভাবেই আমরা

[৯৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪২, ৪৩।
[৯৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫, ৭৯, ৯২।
[৯৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪১।
[৯৯] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩০।
[১০০] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শ্যাডো গভর্নমেন্ট' চালাতাম। এ কারণে পাহাড়ি সমাজে কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা ছিল না।"

১১. পাহাড়ি আদিবাসী বিভিন্ন জাতির সমর্থন

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম একটি বিশেষত্ব হলো চাকমা, বম, খিয়াং, খুমী, লুসাই, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, মুরং, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতির সমন্বিত সমাজ। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর লড়াই আন্দোলনের প্রতি সকল জাতির সমর্থন ছিল। তবে সংগঠনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা এই তিন জাতির জনগোষ্ঠীর। চাকমারা অত্যাধিক ত্যাগী একটি জাতি হিসেবে খ্যাত এবং সে কারণে জনসংহতি সমিতিতে চাকমাদের অংশগ্রহণ বেশি, এ উপলদ্ধি অন্যান্য জাতির মানুষদের। তবে জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম এবং শান্তিবাহিনীর লড়াই যে কেবল চাকমাদের নয় তা তারা আত্মস্থ করতে পেরেছিল বলে এ আন্দোলনের প্রতি পাহাড়ের সকল জাতির মানুষের মানসিক সমর্থন ছিল।[১০১] এম, এন, লারমা নেতা হিসেবে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। শুধু চাকমা নয়, অন্যান্য সকল জাতির জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উঠে আসা নেতৃত্বকে তিনি সবসময় উৎসাহিত করেছেন। তিনি যতিন্দ্রলাল ত্রিপুরাকে প্রায়শ বলতেন যে, ত্রিপুরা জাতি থেকে নেতৃত্বে আসতে হবে, তা না হলে স্থিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। এই প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুরা বলেছিলেন ঃ [১০২]

> "পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ধরে রাখার মতো গুণাবলী ছিল বলেই লারমার নেতৃত্বের প্রতি সকল জাতির শ্রদ্ধা ছিল।"

এ প্রসঙ্গে মং শৈ প্রু আরও বলেন ঃ [১০৩]

> "শান্তিবাহিনীতে অংশ গ্রহণ করা মানুষ ত্যাগী হয়। আর এই ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তি। আমাদের এলাকা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলনা। তাই অংশ গ্রহণ কম ছিল।"

১১.১. ত্রিপুরা জাতি

ত্রিপুরা জাতি শান্তিবাহিনীর আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল এবং আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বাস করে মূলত ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও জঙ্গল এলাকায়। গভীর জঙ্গলে শান্তিবাহিনীর কর্মীদের বাজার ও রসদ পৌঁছানোর কাজটি নিয়মিত তারা করেছে। ত্রিপুরা পাড়াগুলোতে সেনাবাহিনীর অত্যাচার ছিল চরম। বিশেষ করে শান্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অনেক

---

[১০১] মং শৈ প্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

[১০২] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

[১০৩] মং শৈ প্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

অত্যাচারিত হয়েও শান্তিবাহিনী-লড়াই- আন্দোলন সম্পর্কে তারা কোন তথ্য বের করতে পারেনি। এটা প্রমাণ করে যে, ত্রিপুরা জাতি স্বতস্ফুর্তভাবে শান্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। ত্রিপুরাদের মধ্যে কয়েকজন গোপন সংবাদদাতা ছিল যারা গণ-লাইনের মাধ্যমে শান্তিবাহিনীকে সবধরনের তথ্য সরবরাহ করতো। [১০৪]

১১.২. মারমা জাতি

শিক্ষিত ও জাতীয় বোধে অগ্রসর সকল জনগোষ্ঠী আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে মারমা জাতিরও মানসিক সমর্থন ছিল। তবে সক্রিয় আন্দোলনকারীদের শতকরা আশি ভাগই ছিল চাকমা।[১০৫] মারমা সমাজ পশ্চাৎপদ। মারমারা রাজনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে তেমন সচেতন এবং চেতনাবোধে অগ্রসর নয়। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ও তারা কখনো আন্দোলন করেনি। তাই মারমাদের অনেকে শান্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তীতে ফিরে এসেছে। শুরু থেকেই শান্তিবাহিনীতে মারমাদের অংশগ্রহণ কম ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটিতেও মারমাদের সংখ্যা ছিল কম। কারণ তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেনি।[১০৬] যোগ্যতার মাপকাঠিতে চাকমাদের মধ্যে অনেক কর্মী আছে যারা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আবার মারমা সমাজ থেকে ত্রিপুরা সমাজের অনেক অগ্রগ্রতি হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরাদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ অগ্রসরমান। [১০৭]

মারমাদের শান্তিবাহিনীতে অবস্থান প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুরা বলেন ঃ [১০৮]

> "শান্তিবাহিনীতে অনেক মারমা জাতির সদস্য ছিল। মংচং চৌধুরী শান্তিবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তিবাহিনীতে থাকেন নাই। ঐ সময় লারমা বাবু, সন্তু বাবু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাকে ধরে রাখতে পারেন নাই। তিনি থাকলে শান্তিবাহিনী আরও বেশি মারমা কর্মী পেতো এবং আরও বেশি শক্তিশালী হতে পাতো।"

১১.৩. মুরং জাতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা কম ছিল সেই প্রেক্ষিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ কম ছিল। তবে শান্তিবাহিনীর প্রতি সমর্থন ও আন্তরিকতা কম ছিল না। কারণ চাকমাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকলে একমত, প্রজন্মকে সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে চাকমাদের উৎসাহ বেশি। এজন্য খিয়াং জাতি প্রথম থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের জনসংহতি সমিতির সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ম্রাও মাস্টার।

---

[১০৪] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ৩১/০১/২০০৩।

[১০৫] ঐ, ৩১/০১/২০০৩।

[১০৬] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২৫/০৭/২০০৩।

[১০৭] ঐ, ২৫/০৭/২০০৩।

[১০৮] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

তিনি এই দক্ষিণাঞ্চলের থানাগুলোতে পরিচালক হিসেবে রিলিফ বিতরণের কাজ করতেন, বিচার-সালিশও করতেন। তার এই কর্ম পরিচালনাকালে তিনি দেখেছেন ত্রিপুরা, মারমা এবং মুরং জাতি কীভাবে শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছে। শান্তিবাহিনীকে মুরংরা খাদ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র, পোষাক এবং অস্ত্রের নিয়মিত যোগান দিতো। তারা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের এক পাড়া থেকে অন্যপাড়ায় নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করতা। মুরং জাতি শান্তি বাহিনীকে সমর্থন এবং সহযোগিতা দিয়েছিলো। বান্দরবান ও চিম্বুক পাহাড়ে অনেক মুরং পরিবার বাস করতো তারাও জনসংহতি সমিতিকে সমর্থন দিয়েছিলো। হিল ট্রাক্টসে আদিবাসী জাতিসমূহের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে বিশ্বাস করেন সমগ্র পাহাড়ি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি বাহিনী আন্দোলন করেছে। [১০৯]

১১.৪. বম জাতি

সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করলেও বম জাতি শান্তিবাহিনীকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল। তারা শান্তিবাহিনীর জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করত, চাঁদা তুলে দিতো। বমরা কখনও শান্তিবাহিনীর বিপক্ষে কোন কাজ করেননি বা শান্তিবাহিনীর কর্মীদের নামে সেনাবাহিনীর কাছে তথ্য প্রদান কারেন নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বম এবং চাকমাদের সম্পর্ক ভাল। বমরা চাকমাদের পছন্দ করে এবং তাদের ভাল ও সরল বলে বিশ্বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার আন্দোলনে বমদের সমর্থন ছিল জোরালো। শান্তিবাহিনীর লোকজন যখন আন্ডার গ্রাউন্ডে ছিল সেই সময় বমরা সহযোগিতা করেছে এবং তারা বিশ্বাস করতো শান্তিবাহিনী আন্দোলন করছে পাহাড়িদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তাদের যে-কোনোভাবেই সহযোগিতা করতে হবে। শান্তিবাহিনীর কর্মীরা তাদের সুন্দর ব্যবহার দিয়ে বমদের খুব কাছে টেনেছিল এই কারণে শান্তিবাহিনী গ্রামে এলে তাদের দেখলে কিশোর যুবক সকলে খুশীতে আত্মহারা হয়ে পরতো। তারা পাহাড়িদের জীবনে এতটা প্রভাব ফেলেছিল যে, এখনও বয়োজ্যেষ্ঠরা শান্তিবাহিনীর অনুপস্থিতি অনুভব করে। বমদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে না শান্তিবাহিনী কোন খারাপ কাজ করেছে। জুম্ম জাতি ধারণাটা বুঝতে অনেকের অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু শান্তিবাহিনীর ধারণাটা সকলের কাছে পরিষ্কার। রুমাতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মধ্যে বম জাতি প্রথম কমিটি গঠন করেছিল। [১১০] প্রশাসনের চাপে অনেকে প্রকাশ্যে শান্তিবাহিনীকে সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। তবে সকলের মানসিক সমর্থন ছিল। এই প্রসঙ্গে লয়েল ডেভিড বম বলেন, "বম জাতি মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও জেলা পরিষদ হলো শান্তিবাহিনীর আন্দোলনের ফল। জেলা পরিষদ থাকার কারণে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরির সুবিধা, গীর্জা নির্মাণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল।"[১১১]

---

[১০৯] ম্রাও মাস্টারের সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[১১০] লয়েল ডেভিড বম'র সাক্ষাৎকার, ১০/০৭/২০০৩।

[১১১] ঐ।

১১.৫. খিয়াং জাতি

অন্যান্য জাতির ন্যায় খিয়াং জাতিও শান্তিবাহিনীর কর্মীদের নিরাপদে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা স্বতস্ফূর্তভাবে করেছেন এবং সব সময় শান্তি বাহিনীকে সমর্থন দিয়েছেন। তারা উপলদ্ধি করেছিলেন শান্তি বাহিনী পাহাড়িদের স্বার্থে কাজ করছে। খিয়াং জাতি শান্তিবাহিনীর বিপদ হতে পারে এমন সংকেত পেলে নিরাপদ অবস্থান নেওয়ার সংবাদ পৌঁছে দিতো। সেনাবাহিনী হঠাৎ করেই যে-কোনো পাড়ায় শান্তিবাহিনীর খোঁজে ঢুকে পড়তো। এ সময় খিয়াং পরিবারে আশ্রয়ে থাকা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের লুকিয়ে রাখা বা পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিচিত করার ব্যবস্থা তারাই করতো। তাদের নিরাপদে সরিয়ে দিতে না পারলে শান্তিবাহিনীর পোষাক খুলে নিজেদের ঘরের মানুষের পোষাক পরতে দিতেন এবং পরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করতেন। বিভিন্নভাবে খিয়াংরা শান্তিবাহিনীর কর্মীদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। খিয়াং জাতির শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশ্বাস করেন চাকমারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা অন্য সকল জাতির উপর কর্তৃত্ব বা খবরদারী করার জন্য আন্দোলন করেনি। সকল সংখ্যাল্প জাতিগোষ্ঠীর জন্য বা পাহাড়িদের জন্যই তারা আন্দোলন করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে শঙ্খ ও মাতামুহুরির মধ্যে পড়েছে রুমা, আলিকদম ও থানচি থানা – এই তিন থানায় জনসংহতি সমিতিকে সাংগঠনিক কাজ করতে হয়েছে বেশি। [১১২]

১১.৬. খুমী জাতি

খুমী জাতি শান্তিবাহিনীর আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম ছিল। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে রুমা থানায় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা যখন আসতেন, গ্রামবাসী যার যেমন সামর্থ ছিল তাদেরকে আশ্রয়, খাবারসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা করতেন। [১১৩]

১৯৭৫-৭৬ সালে দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ রাঙ্গামাটির আলিকদম ইউনিয়নের চেটিয়ানলা পাড়ায় শান্তি বাহিনী প্রবেশ করে। হিরু বাবু, অগ্র বাবু, শেখর কমান্ডার, সুখন বাবু, রক্সী, সহকারী কমান্ডার দেবাশীস এলাকায় সাধারণ মানুষকে শান্তি বাহিনীতে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কথা, অত্যাচারের কথা বোঝাতেন। পাহাড়ের সকল জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কেন সে বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাদের প্রচারে এখানে অনেকেই শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে হানাচরণ ত্রিপুরা বলেন ঃ [১১৪]

> আমি ৭৬-এ দক্ষিণাঞ্চলে যোগ দিই। শেখর বাবু দক্ষিণাঞ্চলের সব সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। আমি যেদিক দিয়ে ঢুকেছি সেই চেকপোষ্টের দায়িত্বে ছিলেন হিরুবাবু।

---

[১১২] মং শৈ প্রু খিয়াং এর সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩

[১১৩] দোনুক প্রু মারমা ও থাংকু খুমি-র সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

[১১৪] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

১১.৭. লুসাই জাতি

লুসাই জাতি চেয়েছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সমস্যা সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা হোক। তবে তারা শান্তিবাহিনীর আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিল। কারণ তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, সরকারের সাথে আলোচনায় তাদের অধিকার ফিরে আসবে না। পাহাড়িদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের বিরূপ আচরণ তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের বাঙালি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান সরকারে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পাঠিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে পাহাড়িদের কোনঠাসা করে ফেলেছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে লুসাই জাতি শান্তিবাহিনীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। লুসাইরা খাদ্য, অর্থ এবং নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করত। শান্তিবাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক ছিল যাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল প্রখর। তারা সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা করতো, শান্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখতো। [১১৫]

১১.৮. তঞ্চঙ্গ্যা জাতি

তঞ্চঙ্গ্যা জাতি শান্তিবাহিনীকে সমর্থন দিতো এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শান্তিবাহিনীর সদস্য ছিল। তাদের অন্যতম ছিলেন রতন তঞ্চঙ্গ্যা। [১১৬]

স্বাধিকার আন্দোলনে বিভিন্ন জাতির ভূমিকা প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুরা বলেছেন ঃ [১১৭]

> "পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হোক, দুঃখী মানুষের শাসন ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হোক এটা সকলের কাম্য। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা আছে, তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ হোক।" আমাদের ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করা দরকার। একদিকে বার্মা, অন্যদিকে ভারত এদিকে বাংলাদেশ। আমাদের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কি বলে? বাংলাদেশের নির্যাতিত আপামর জনগণ যারা এক শ্রেণির যারা এই লাইনের মানুষ। তাদেরকে নিয়ে যদি আমরা সংগ্রাম করি তবে এর ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী। কারণ অশান্তির যাঁতাকলে এখনও আমরা পিষ্ট হচ্ছি। রাজা আছে, হেডম্যান আছে – এই ব্যবস্থাটাকে ধরে রাখছে বিভিন্ন সরকার। ব্রিটিশ সরকার, পাকিস্তান সরকার ধরে রেখেছিল – বাংলাদেশ সরকারও ধরে রেখেছে। তার কারণ হলো যদি এই সিস্টেমটা বজায় রাখা যায়, তাহলে ওদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ লোকজনকে কন্ট্রোলে রাখা যায়।

বান্দরবনে শান্তিবাহিনীর প্রভাব ও লোকবল ছিল উভয়ই ছিল প্রবল। মারমাদের সাথে তেমন কোন সংঘর্ষ শান্তিবাহিনীর হয়নি। তবে কয়েকজন উস্কানি দিয়েছিল। [১১৮] পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিসত্তার মধ্যে রুমা থানায়

[১১৫] লাল্লিয়াং থাংগার সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩।
[১১৬] বিক্রম ত্রিপুরার ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ৫১/০১/২০০৩।
[১১৭] ঐ।

প্রায় সব জাতির লোক বসবাস করেন। সে জন্য সরকার একটা কৌশল অবলম্বন করে সেখানে জাতিগত দ্বন্দ্ব লাগাতো, মুরং বাহিনীকে ব্যবহার করা হতো শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। [১১৯]

বান্দরবনের আলিকদমে মুরং এবং ত্রিপুরার পাশাপাশি কয়েকটা চাকমা পরিবার বাস করতো তাদের বেশির ভাগ শান্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলো। [১২০] আলিকদম, লামা এবং নাইক্ষ্যংছড়ি থানার জনগণও একইভাবে শান্তিবাহিনীকে সমর্থন করাসহ সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। [১২১] সাঙ্গু এলাকার মাতামুহুরী লামা থেকে ত্রিপুরা, মারমা, মুরং জাতির প্রায় ৫০০ জন সদস্য শান্তি বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলেন। [১২২]

বান্দরবান জেলায় জনসংহতি সমিতি'র প্রাথমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন কিউ লা হিউ মারমা। অতপর ম্রাও মাস্টার এবং পরর্বতীতে যোগ দেন বৌদ্ধ রাম ত্রিপুরা ওরফে কেহ লাও ভান্তে যিনি মেজর ভান্তে হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ভিক্ষু থাকাকালীন সময়ে তিনি তাঁর বক্তৃতায় ধর্মীয় অনুশাসনের পাশাপাশি জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব রক্ষার কথা বলতেন। বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি, রুমা, রোয়াং ছড়ি প্রভৃতি জায়গায় জাতীয়তাবাদের উপর বক্তৃতা ও আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। তার গঠনমূলক আলোচনা শুনে অনেকে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। বান্দরবান জেলার অসংখ্য পরিবার শান্তিবাহিনীর কার্যক্রমকে সমর্থন জানাতো ও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। জনগণের উপরেও শান্তিবাহিনীর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। [১২৩]

১২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য জাতির সাথে চাকমা জাতির একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব তৈরির পেছনে সরকারের ভূমিকা ছিল, তবে চাকমা জাতির কোন কোন সদস্যের গরিমাও ছিল। এই প্রসঙ্গে বিক্রম ত্রিপুরা বলেন ঃ [১২৪]

> "আমার সহকর্মী যারা চাকমা, তাদের বলতাম চাকমাদের মোডিফাই কর সংগঠনের খাতিরে, না হলে সমস্যা হবে। আমরা যত আদর্শের কথা বলি না কেন, ঐক্যের কথা বলিনা কেন, আমাদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণ-কার্যকলাপের মধ্যে আমরা তা দেখাতে পারি না। মেজরিটি অংশটা কথায় কথায় বলতো 'আমরা পার্টি', 'আমরা বাহিনী'। এগুলো বলার কারণে সংগঠনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কারণ আমরা যখন পার্টি করতাম তখন ত্রিপুরারা অন্যদের বলতো 'ওটাতো চাকমা পার্টি', 'লারমা পাটি', তোমরা ওখানে কি ? তখন আমরা বলেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতি আছে। সামগ্রিকভাবে তাদের বিভিন্ন সমস্যা

[১১৮] ম্রাও মাস্টারের সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।
[১১৯] রামথন বম এর সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩।
[১২০] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।
[১২১] ঐ।
[১২২] ঐ।
[১২৩] হানাচরণ ত্রিপুরা ও ম্রাও মাস্টারের সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।
[১২৪] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।

আছে। চাকমাদের সমস্যা ও ত্রিপুরাদের সমস্যা এক না, কারণ চাকমারা শিক্ষা, সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে অন্য সকল জাতির থেকে উন্নত; তবে হিল ট্রাক্টস-এ আমাদের সবার সমস্যা সামগ্রিকভাবে এক।”

১৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগ

১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা অনুধাবনের জন্য এ অঞ্চলে যান। এটি ছিল তার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম সফর। এ সময় সফরকালে তিনি রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী নেতাদের সমন্বিত এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। তার এ উপস্থিতিকে লক্ষ্য ক'রে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে লিপিবদ্ধ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কর্মসূচি গ্রহণের দাবি। এর প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে ‘অর্থনৈতিক সমস্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং অর্থনৈতিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। [১২৫] জেনারেল জিয়াউর রহমান এ উন্নয়ন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তকেই বাস্তবায়ন করেন। [১২৬]

১৩.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পার্বত্য সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় পাহাড়ের জনগণকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা। এ লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মতামত গ্রহণ পূর্বক পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি অধ্যাদেশ নং ৭৭ বলে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করেন। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের ১৪ জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রথমবার এবং পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে ২০ অক্টোবর এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা পায়। বোর্ডের গঠন কাঠামো ছিল নিম্নরূপ ঃ

- চেয়ারম্যান
- ভাইস চেয়ারম্যান
- পদাধিকার বলে সদস্য ঃ
  - জেলা প্রশাসক - রাঙ্গামাটি
  - জেলা প্রশাসক - খাগড়াছড়ি

[১২৫] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪-১৪৬।
[১২৬] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।

জেলা প্রশাসক - বান্দরবান

সার্বক্ষণিক সদস্যবৃন্দ ঃ

সদস্য - প্রশাসন,

সদস্য - অর্থ,

সদস্য - পরিকল্পনা,

সদস্য - বাস্তবায়ন ও

প্রকল্প পরিচালক।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এবং ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার পদাধিকারবলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের সমমানের সরকারি কর্মকর্তা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের কাজে সহায়তার জন্য ১১ জন নেতৃস্থানীয় পাহাড়িকে নিয়ে কনসালটেটিভ কমিটি গঠিত হয়, যারা সার্কেল চীফ ও চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত। কনসালটেটিভ কমিটি বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বোর্ডকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ বোর্ডের মাধ্যমে পার্বত্য তিন জেলায় রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভার্ট নির্মাণ দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, মহুকুমা-থানায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, গ্রামে-গঞ্জে অফিস-আদালত বৃদ্ধি এবং কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও উন্নতি সাধিত হয়েছে।[১২৭]

তবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতার কারণে এই বোর্ড অনেকটা ব্যর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের এরূপ উন্নয়নকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী শান্তিবাহিনীর লড়াই-সংগ্রাম বন্ধে সরকারের একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছে। রাস্তা-ঘাটের যে উন্নয়ন হয়েছে তা ব্যবহৃত হচ্ছে মূলত সেনাবাহিনী চলাচলের সুবিধার্থে। অফিস-আদালত দালান-কোঠায় বিজিডি, সেনাবাহিনী, পুলিশ সরকারি আমলাদের কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। পাহাড়িদের পুনর্বাসনের নাম দিয়ে গুচ্ছগ্রাম সৃষ্টি করে পাহাড়িদের বাধ্য করছে অবরুদ্ধ জীবনযাপনে। বনায়নের নামে বন-জঙ্গল উজাড় হচ্ছে। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নিধন করার অভিপ্রায় নিয়ে। [১২৮]

১৯৯৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নেতৃস্থানীয় কোন পাহাড়ি ব্যক্তি বা এলাকার কোন সংসদ সদস্য বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হবেন। [১২৯]

---

[১২৭] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪-১৪৬।

[১২৮] শ্রী রবি, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়' *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

[১২৯] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫-১৪৬।

১৩.২. ট্রাইবাল কনভেনশন গঠন

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পাহাড়ি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি বিস্তৃত "অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তৎকালীন সরকার। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আন্দোলন এবং তৎপরতা বন্ধের পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৭ সালে ট্রাইবাল কনভেনশন ('উপজাতি পরামর্শসভা') নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। ট্রাইবাল কনভেনশন গঠনের তাৎক্ষণিক পটভূমি ছিল ১৯৭৭ সালের ২৯ মে তারিখে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অতর্কিত হামলায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যের প্রাণহানি। এ ঘটনা স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তৎকালীন সরকারের উপলব্ধিতে আসে যে, শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে পাহাড়িদের বিদ্রোহ দূর করার ক্ষেত্রে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা আবশ্যক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সালের ২ জুলাই সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি নেতাদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সভা আহ্বান করেন। এই সভা ৪ জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই সভার মাধ্যমেই ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের মাধ্যমে ট্রাইবাল কনভেনশন জন্মলাভ করে। এ সভায় মূলত ঃ দু'টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ [১৩০]

> প্রথমত, সহিংস পন্থার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবিআদায়ের আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানো, এবং
>
> দ্বিতীয়ত, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়াভিত্তিক আন্দোলন বিষয়ে শান্তি বাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন।

ট্রাইবাল কনভেনশনের সভাপতি নির্বাচিত হন মং রাজা, সহ-সভাপতি চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় ও বোমাং রাজা এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পান চারু বিকাশ চাকমা। ট্রাইবাল কনভেনশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি জনগণের গোপন তৎপরতাকে প্রকাশ্য ও জাতীয় রাজনীতির মূল ধারা এবং উন্নয়নের সাথে পাহাড়িদের সম্পৃক্ত করা। ট্রাইবাল কনভেনশনের কর্মপরিধি ছিল ঃ [১৩১]

(ক) পার্বত্য জনগণের সাথে সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা;

(খ) উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সরকারের সঠিক ভাবমূর্তি পাহাড়িদের মাঝে তুলে ধরা;

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পাহাড়িদের সম্পৃক্ত করা;

(ঘ) শান্তির লক্ষ্যে জনগণের মাঝে প্রচারণা চালানো;

(ঙ) সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং

---

[১৩০]. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।

[১৩১] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।

(চ) শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করা।

ট্রাইবাল কনভেনশনের সভায় সশস্ত্র পন্থার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় দাবি আদায়ের জন্য জনসংহতি সমিতির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭৭ সালের ৩০ জুলাই কনভেনশনের নেতাদের সাথে শান্তিবাহিনীর প্রথম বৈঠক নানিয়ার চরে এবং দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কাউখালী থানার বাদলছড়ি গ্রামে। একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির বিশেষ অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। [১৩২]

১৩.২.১. জনসংহতি সমিতির সাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের আলোচনা

ট্রাইবাল কনভেনশনের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া আদায়ের সশস্ত্র আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালনার আহ্বান জানানোর উপায় হিসেবে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে খোলাচিঠি এবং বিবৃতি প্রচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত জনসভার মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলন পন্থা সঠিক নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। একইসাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার কৌশলও অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৭৭ সালের ৩০ জুলাই নানিয়াচরে শান্তিবাহিনীর নিম্ন পর্যায়ের কয়েকজন সদস্যের সাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের সদস্যদের সাক্ষাৎ হয়। (এটি ছিল ট্রাইবাল কনভেনশনকে গ্রহণ না করার একটি প্রকাশ)। একই বৎসর ১৭ আগস্ট জুরাছড়িতে জনসংহতি সমিতির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদেরসাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ট্রাইবাল কনভেনশনের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে সরকারের সাথে বৈঠক করার প্রস্তাব দিলে তারা তৃতীয় কোন দেশে বৈঠক আয়োজনের শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ট্রাইবাল কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্প রঞ্জন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্পর্কে সরকারের সাথে আলোচনায় বসার বিষয়ে ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর কাউখালী উপজেলার বাদলছড়ি গ্রামে জনসংহতি সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। কিন্তু এ সম্মতি বাস্তবায়নের পূর্বেই ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির সন্দেহ জন্ম নেয়। এরূপ ধারণা থেকে জনসংহতি সমিতি ট্রাইবাল কনভেনশনের সাথে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দেয় এবং উপরন্ত ট্রাইবাল কনভেনশনের গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে শান্তিবাহিনী অপহরণের মাধ্যমে হত্যা ও গুম করে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আক্রমণের কারণে ট্রাইবাল কনভেশনের নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে হলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।[১৩৩] সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা

[১৩২] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।
[১৩৩] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬১-৬২।

লিখেছেন যে, জেনারেল জিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালে আলোচনার একটি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও ভারতের সহযোগিতা পাওয়ার আশ্বাসে জনসংহতি সমিতি এ সুযোগ গ্রহণ করেনি। [১৩৪]

১৩.২.২. সরকারের সাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের আলোচনা

ক. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ

প্রেসিডেন্টের আদিবাসী বিষয়ক উপদেষ্টা বিনীতা রায়ের মধ্যস্থতায় ট্রাইবাল কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমা এবং যুগ্ম সম্পাদক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ১৯৭৮ সালের ১১ ডিসেম্বর বিএনপি'র কার্যালয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ বৈঠকে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে জেনারেল জিয়াউর রহমান এতে সম্মত হননি।[১৩৫]

খ. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

১৯৭৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ট্রাইবাল কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে ট্রাইবাল কনভেনশনের ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় তৎকালীন স্বরাষ্টমন্ত্রী এ. এস. এম মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ বৈঠকে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা, সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মত বিনিময় হ'লেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ইতিবাচক কোন সমাধান পাওয়া যায়নি।[১৩৬]

১৩.২.৩. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ

১৯৮০ সালের ১৮ মে রাঙ্গামাটি সরকারী সার্কিট হাউজে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি পুনর্বাসন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ দুটি দাবি বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সরকারের এ উদাসীনতায় ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ হতাশ হন এবং ট্রাইবাল কনভেনশনের পক্ষে ভূমিকা পালন থেকে কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।[১৩৭]

[১৩৪] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩০।
[১৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩।
[১৩৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩-৬৪।
[১৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.২.৪. ট্রাইবাল কনভেনশনের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে জিয়া সরকারের ভূমিকা ঃ

জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি আদায়ের আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে এ অঞ্চলে বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে সেই সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের কাউখালী, নানিয়ারচর, লংগদু, বিলাইছড়ি, বরকল, রাজস্থলী, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাংগা, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, লামা ও আলিকদম উপজেলায় সরকারী তৎপরতায় বাঙালি অনুপ্রবেশ শুরু হয়। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের প্রবল আপত্তি জানানোর পরেও ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বাঙালি অনুপ্রবেশ একই ধারায় সংঘটিত হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশ ছিল সরকারের পক্ষ থেকে একটি কৌশল, যার উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি এবং বাঙালি জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আন্দোলন দমন করা। সরকার এ কৌশল বা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত যেখানে ছিল ৭৩ এবং ২৭, সেখানে ১৯৮১ সালে সে অনুপাত এসে দাঁড়ায় ৬০ এবং ৪০-এ। পাহাড়ের নেতাদের হিসেব অনুযায়ী এ সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় দুই লক্ষাধিক বাঙালির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।[১৩৮]

ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের দাবি যে, তারা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-র মুক্তির জন্য সরকারের কাছে চাপ দিতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে চারু বিকাশ চাকমা সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণের নিকট থেকে মতামত নিতে থাকেন। মতামতে দেখা যায়, অধিকাংশ পাহাড়ি জনগণ গ্রেপ্তারকৃত সন্তু লারমাকে মুক্তি দিয়ে তার সাথে আলোচনার দাবি করে। চারু বিকাশ চাকমা এই দাবি জিওসি জেনারেল মঞ্জুরের নিকট পেশ করেন এবং এরই প্রেক্ষিতে সরকার জেলখানায় সন্তু লারমার সাথে আলোচনাক্রমে ১৯৮০ সালের ২২ জানুয়ারি তাকেসহ অনিমা চাকমা, বিভূতি চাকমা এবং চাবাই মগকে রাঙ্গামাটিতে এনে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের সামনে মুক্তি দেয়।[১৩৯]

১৯৮১ সালের ১৮ এপ্রিল তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বান্দরবান মহুকুমাকে এবং ১৯৮৩ সালের ১৩ অক্টোবর খাগড়াছড়ি মহকুমাকে পৃথক দুইটি জেলা হিসেবে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটিও একটি পৃথক জেলায় পরিণত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করার বিষয়ে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর অধিকাংশের আপত্তি ছিল। তারা মনে করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ছোট ছোট জাতিতে বিভক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে একটি ঐক্যগত শক্তি বিরাজমান। তাদের অভিযোগ তিন জেলার বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে সরকার মূলত ঃ তাদের এই ঐক্যবদ্ধতাকে বিনষ্ট করেছে।[১৪০]

---

[১৩৮] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮-১৪৯।
[১৩৯] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪।
[১৪০] ঐ।

চারু বিকাশ চাকমা সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ চার দফা দাবি সরকারের নিকট পেশ করেন। এসব দাবি নিয়ে কনভেনশনের নেতাদের সাথে জিয়াউর রহমানের প্রাথমিক আলোচনাও শুরু হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি পুনর্বাসন ও ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।[১৪১]

জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট সাত্তারের ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৮২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির আদিবাসী বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা জনাব সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং বাঙালি উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট আদুস সাত্তারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাষ্ট্রপতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি, বিরাজমান সমস্যা এবং সমাধানের বিষয়ে মত বিনিময় হলেও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পন্থায় ঐক্যমত গঠিত হয়নি। তবে সে সভায় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।[১৪২]

১৩.২.৫. ট্রাইবাল কনভেনশনের ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদের উদ্যোগ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে প্রথম ১৯৮২ সালের ২৭ জুলাই পার্বত্য নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। বৈঠকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তার আন্তরিকতার কথা জানান এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল হান্নাফ ১৯৮২ সালের ২ আগস্ট রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। এর ধারাবাহিকতায় ৪ আগস্ট ১৯৮২-তে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের এ দলটি নিজেরা একটি বৈঠকে মিলিত হ'য়ে দু'টি উপ-কমিটি গঠন ও উপ-কমিটির উপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করে ঃ

> প্রথমত, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া নির্ধারণ পূর্বক খসড়া দাবিনামা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় 'খসড়া প্রস্তুত উপ-কমিটি'র উপর।
>
> দ্বিতীয়ত, জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করে তাদের দাবি-দাওয়া জানার জন্য উপেন্দ্রলাল চাকমাকে প্রধান করে একটি 'যোগাযোগ উপ-কমিটি' গঠন করা হয়।

দাবিনামার খসড়া প্রস্তুত এবং অনুমোদনের জন্য উপ-কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ একাধিকবার বৈঠক করলেও নিজেদের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে দাবিনামা প্রস্তুত বা অনুমোদন সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির কাছ থেকে দাবি-দাওয়া জানার বিষয়ে যোগাযোগ উপ-কমিটির ভূমিকাও কার্যত ব্যর্থ

---

[১৪১] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫-১৪৬।

[১৪২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯; জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তার এবং সরকারের মধ্যে তৃতীয় কোন পক্ষের ভূমিকা স্বীকার করে নেয়নি।[১৪৩]

তবে এরূপ অবস্থার মধ্য দিয়েও ট্রাইবাল কনভেনশনের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা কার্যকর রাখার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৩ সালের ৩০ আগস্ট ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জি. ও. সি এবং 'গ' অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল মান্নাফ রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি জনগণের এক সমাবেশে পেশকৃত ভাষণে ট্রাইবাল কনভেনশন পুনর্গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ৩১ আগস্ট ১৯৮৩ রাঙ্গামাটির পাহাড়ি জনগণের নেতাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় শান্তিময় দেওয়ানকে আহ্বায়ক ক'রে ট্রাইবাল কনভেনশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৬-২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ পর্যন্ত একাধিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনের প্রস্তাব করেন। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে এক জনসভায় পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্যাকেজ ডিলের প্রস্তাব দেন।[১৪৪] এ প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনবিধি সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা হয় ১৯৮৩ সালের ১২ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত এক সভায়, যেখানে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান।[১৪৫]

১৩.২.৬. ট্রাইবাল কনভেনশনের গ্রহণযোগ্যতার সংকট

মূলত ট্রাইবাল কনভেনশন সফল না হওয়ার মূল কারণ ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস। ট্রাইবাল কনভেনশন ছিল সরকার এবং শান্তি বাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি উভয় দিক থেকে অবিশ্বাসের শিকার। শান্তিবাহিনীর ধারণা ছিল ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতারা সরকারের লেজুরবৃত্তি করার অভিপ্রায়ে কনভেনশনে যোগ দিয়েছে। এ বিশ্বাস থেকে কনভেনশনের গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অনেক নেতাকে শান্তিবাহিনী অপহরণ ও হত্যা করেছে। অপরদিকে সরকারের ধারণা কনভেনশনের পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ ভিতরে ভিতরে শান্তিবাহিনীর সমর্থক। [১৪৬]

বস্তুত ঃ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অনেকে মনে করেন ট্রাইবাল কনভেনশন গঠন করা হয়েছিল মূলতঃ শান্তি বাহিনী ও জনসংহতি সমিতির কাউন্টার সংগঠন হিসেবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে জনসংহতিকে ঠেকানোই ছিল

[১৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৬।

[১৪৪] Life Is Not Ours, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

[১৪৫] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯-৭০; মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৫।

[১৪৬] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।

এর উদ্দেশ্য। তারা হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করেছেন। ট্রাইবাল কনভেনশনে যুক্ত ছিলেন চেয়ারম্যান তিলক চন্দ্র চাকমা, চারুবিকাশ সেন, জ্ঞানেন্দু কিশোর চাকমাসহ আরও অনেকে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত যুবকদের এ সংগঠনে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা হত এবং তাদেরই বেশি সংযুক্ত করা হয়েছিল। এ ধারণা থেকে যুবকদের নেওয়া হয়েছিল যে, তারা সাধারণ মানুষদের কনভেনশনের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম হবে। ট্রাইবাল কনভেনশনে চাকমাদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। ট্রাইবাল কনভেনশন মিটিং-এ শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলা হতো।[১৪৭] শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপ সর্ম্পকে আলোচনা হতো, এর সদস্য হিসেবে হেডম্যান কারবারীদের উপস্থিত হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এই অভিযোগও আছে যে কনভেনশনের সভাগুলোতে উপস্থিত না হলে শিক্ষকদের বেতন কর্তন হতো, এমনকি 'দুস্কৃতকারী' আখ্যা দিয়ে জেল খাটানো হতো। বিপুল সংখ্যক জনগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনী গ্রাম ঘেরাও করে মানুষ নিয়ে আসতো।[১৪৮]

বাংলাদেশ সরকার ট্রাইবাল কনভেনশন গঠনের পর প্রচার করতে থাকে যে, কনভেনশন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকারকে সর্বাত্মক সহায়তা দিবে। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ হলেও সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার জন্য বিকল্প শক্তি হিসেবে ট্রাইবাল কনভেনশকে দাঁড় করানো। 'মূল রাজনীতি'র সাথে সম্পৃক্ততার নামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে শক্তিহীন করার মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর আন্দোলনকে প্রতিহত করা ছিল লক্ষ্য।[১৪৯]

পার্বত্য চট্রগ্রামে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের পথ হিসেবে জিয়াউর রহমান সামরিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তবে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ বা আন্দোলন দূর করার জন্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং এ উপলব্ধি থেকে তিনি ট্রাইবাল কনভেনশন সৃষ্টি করেন। ট্রাইবাল কনভেনশন গঠনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল সরকার এবং শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি সমঝোতামূলক মধ্যস্থতা সৃষ্ঠি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে শেষাবধি সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা ট্রাইবাল কনভেশনের পক্ষে সম্ভব না হলেও এ কথা বললে ভুল হয়না যে, এ সংগঠনটি অনেকখানি সিভিল সোসাইটির ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী হয়। ট্রাইবাল কনভেনশন জনসংহতি সমিতির তথা শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আন্দোলনের পরিবর্তে সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে এবং একই সাথে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে জনসংহতি সমিতির অন্যতম নেতা সন্তু লারমাকে মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে জনসংহতির সাথে আলোচনার পথ প্রশস্ত করার বিষয়ে। কারণ ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ কখনই চাননি জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত পোঁছাতে বা কোন সমঝোতায় অবতীর্ণ

[১৪৭] বিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩।
[১৪৮] শ্রী অনুপ, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।
[১৪৯] শ্রী রবি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

হতে। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাগণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবী হিসেবে পার্বত্য চট্রগ্রামের স্বায়ত্বশাসন প্রদান এবং সরকারীভাবে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালির অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবীতে শুরু থেকেই একাট্টা ছিলেন। কিন্তু এ দুটি দাবির ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাদের বাধ্য করে তাদের ভূমিকা থেকে নিষ্ক্রিয় হতে।

১৩.৩. শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ

সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি ছিল জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রতিপক্ষ দল। এছাড়াও মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, পাহাড়ি যুবক সংঘ, ট্রাইবাল পিপলস্ পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণের উদ্যোগ থাকলেও আন্দোলনে চাকমা জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রকাশ থাকার কারণে তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। জনসংহতি সমিতি এসব প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতিতে যোগও দিয়েছিল। পার্বত্য এলাকায় বেশ কয়েকটা ডাকাতের দল ছিল, জনসংহতি সমিতি তাদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরেছিল।

১৩.৩.১. পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতি যখন স্বাধিকার আন্দোলনে খুব তৎপর সেই সময় সর্বহারা দলও পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে তাদের আন্দোলন শুরু করে। রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলোর বাইরে (সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ) সর্বহারা পার্টি ছিল শান্তিবাহিনীর অন্যতম সমস্যা। সিরাজ শিকদার ১৯৭২ সালের শেষ দিকে পার্বত্যাঞ্চলে সর্বহারা পার্টির উত্থান ঘটান। তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে বেইজ এলাকা বা ভিত্তিভূমি ধরে নিয়ে সমতল এলাকায় বিপ্লবকে প্রসারিত করা। সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদার পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়শই আসা-যাওয়া এবং অবস্থান করতো। সর্বহারা পার্টির কর্মী বৃদ্ধির জন্য তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বক্তব্য পেশ করতো। এই বক্তব্যের একটি বড় অংশে থাকতো জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে থাকা চাকমাদের বিরোধীতা। তারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মনে বিশ্বাস স্থাপনের চেষ্টা করতো যে, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালিত হলে সেটা হবে শুধুমাত্র চাকমা আন্দোলন। ফলে পাহাড়িদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় হলেও শুধু চাকমারাই হবে ভোগের অধিকারী অধিকার, অন্যান্য জাতির জনগোষ্ঠীর কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবেনা। বাম আন্দোলনের নামে তারা মূলত চাকমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের পক্ষ থেকে সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গা। তিনি ছিলেন সিনিয়র কমান্ডার। সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে ছিলেন ফিলিপ গাইন, আর প্রমোদ বিকাশ কারবারী ছিলেন সশস্ত্র গ্রুপের কমান্ডার। গৌতম দেওয়ান রাঙ্গামাটি কলেজের ইংরেজীর শিক্ষক থাকা অবস্থায় সর্বহারাদের সংস্পর্শে আসের এবং পরবর্তীতে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। রূপায়ন চাকমা নামে আরও একজন সর্বহারা পার্টিতে ছিলেন। [১৫০]

[১৫০] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

সুদত্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গা এবং বিজয় কেতন চাকমার সাথে জনসংহতি সমিতির আন্দোলন নিয়ে এম. এন. লারমা, সন্তু লারমা ও যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভা হয়েছিল। সভায় তারা জনসংহতি সমিতির কর্মসূচির সাথে একমত হয়েছিল। কিন্তু সভার পরদিন সকালেই তারা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। সর্বহারা পার্টির সাথে শান্তিবাহিনীর বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছিল। প্রথম সংঘর্ষ হয়েছিল চন্দ্রঘোনা ও চিক রমার দক্ষিণে। এই সংঘর্ষে তাদের গুলিতে জনসংহতি সমিতির একজন বুকে গুলিবিদ্ধ হয় এবং জনসংহতি সমিতির আক্রমণে সর্বহারা গ্রুপের তিনজন মারা যায়। সর্বহারা পার্টির সাথে শান্তিবাহিনীর অপর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল বান্দরবনের রোয়াংছড়ি এলাকায়, নোয়াপতোং এবং রাজস্থলী এলাকার গবমারা গ্রামে। সংঘর্ষের জন্য তৈরি এ দলে প্রায় ৭৫/৭৭জন সদস্য ছিল, যার সিনিয়র নেতা ছিলেন প্রমোদ কারবারী। আক্রমণটি আসে সর্বহারা পার্টি থেকে। তবে পাল্টা আক্রমণে সর্বহারা পার্টিও দুই প্লাটুন আক্রমণকারী বিপর্যস্ত হয়েছিল। জনসংহতি সমিতির পক্ষে কমান্ডার ছিলেন স্নেহরাজা চাকমা ধ্রুব। ১৯৭৪-৭৬ সাল পর্যন্ত বান্দরবান এবং রাইক্ষ্যং এলাকায় সর্বহারা পার্টির কর্মীদের তৎপরতা বেশি ছিল এবং এ এলাকার কিছু অংশ সর্বহারাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সর্বহারাদের প্রধান কমান্ডার ছিল বাঙালি, জুনিয়র ছিল পাহাড়ি। সর্বহারা পার্টির নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে কিছু লোক এম. এন. লারমার কাছে প্রতিকারের দাবি জানিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন, 'সর্বহারা পার্টির বিরুদ্ধে জনসংহতিকে ক্যাম্পেইন করতে হয়েছিল।'[১৫১]

১৯৭৪ সালের মে মাসের দিকে শান্তিবাহিনীতে পাঁচমিশালী বাহিনী নামে একটি কোম্পানি গঠিত হয়েছিল। কমান্ডার ছিলেন তাতিন্দ্র লাল চাকমা। এ সময় সর্বহারা পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন জোন কমান্ডার লঙ্গ কুমার তংচঙ্গা। সর্বহারা পার্টিও এবং শান্তিবাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষে শান্তিবাহিনী জয়লাভ করে এবং সর্বহারা পার্টির অস্ত্রগুলো দখল করে। সর্বহারাদের সঙ্গে সংঘঠিত প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই শান্তিবাহিনী জয়লাভ করার ফলে তাদের অস্ত্রগুলো শান্তিবাহিনীর দখলে আসে। [১৫২]

সর্বহারা পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসংহতি সমিতিকে প্রতিরোধ করা। তাদের প্ররোচনায় জনসংহতির কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং ব্যাপক হানাহানি হয়েছিল। পাহাড়ি জনগণের সমর্থন লাভের জন্য সর্বহারা পার্টি বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করতো। সর্বহারা পার্টি সশস্ত্র বাহিনী গ্রামে এসে মহাজন, কারবারীদের ধান, চাল লুট করে জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতো। এতে জনগণের মধ্যে সর্বহারাদের পক্ষে কিছুটা সমর্থন সৃষ্টি হয়েছিল ফলে তারাও অন্যান্য পাহাড়িদের মনে প্রত্যয় জাগানোর চেষ্টা করতো এবং অনেকে বিশ্বাস করতে সক্ষম হয়েছিল যে, সর্বহারা পার্টি সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং পাহাড়িদের সুখ শান্তির জন্য কাজ করছে, পাহাড়িদের উপর কেউ যেন অন্যায় অত্যাচার করতে না পারে সেটাও তারা দেখবে। পাহাড়ি জনগণের কিছু সমর্থন তারা লাভও করেছিল। ভাষাগত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে, কমিউনিজম সাম্যবাদ পদ্ধতির অনুসারী। জনগণের আংশিক সমর্থন লাভ করলেও বিভিন্ন কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বহারা পার্টি বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের

---

[১৫১] ঐ।

[১৫২] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার এবং গোলাম মোর্তোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩।

অবস্থান এবং আন্দোলনের যে স্তর সেই স্তরে শ্রেণি সংগ্রাম সম্ভব ছিল না। পাহাড়ের মানুষ বিশেষতঃ বান্দরবনের মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মের প্রতি তারা দুর্বল। সর্বহারাদের মতে, ধর্ম প্রগতির পক্ষে নয়। এই মতের পক্ষে শ্লোগান তুলে তারা বৌদ্ধভিক্ষুদের বিরুদ্ধাচারণ করতো। জুতা পরে অস্ত্রসহ মন্দিরে প্রবেশ করতো, মন্দির অসম্মান করতো। এ আচরণগুলো সাধারণ জনগণ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ সহজে মেনে নিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে গৌতম কুমার বলেন, "একবার সর্বহারা পার্টির গেরিলারা রাজস্থলী এলাকার ফারোয়াতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে ৩০/৩৫টি অস্ত্রসহ তাদের বেশ কিছু পোষাক এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরও কিছু পোষাক লুট করে নিয়েছিল। অতপর মন্দিরে গিয়ে লুট করে আনা পোষাক পরিয়ে তারা বুদ্ধিষ্ট মংকে প্রকাশ্যে নাচিয়েছে। এছাড়াও যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তারা বুদ্ধিষ্ট মং-এর বিচার করেছিল। বিচারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বুদ্ধিষ্ট মংকে ২০/২৫ মাইল দূর থেকে প্রতি সপ্তাহে তাদের ক্যাম্পে এসে হাজিরা দিতে হতো। শেষ পর্যন্ত একদিন সর্বহারা পার্টির একজন কর্মী বুদ্ধিষ্ট মং-এর কানের কাছে গুলি চালিয়ে হত্যা করে এবং তার মৃতদেহ পাহাড়ের নিচে ফেলে দেয়। এই ঘটনায় পাহাড়ি জনগণ সর্বহারা পার্টির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এ ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি।" সর্বহারা পার্টির সদস্যরা শান্তিবাহিনীর নাম ভাঙ্গিয়ে ডাকাতি করে, লুটপাট করে। সাধারণ জনগণ এ বিষয়গুলোর সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সর্বহারা পার্টির অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে রূপায়ন দেওয়ান বলেন যে, রাইক্ষ্যং এলাকায় জনসংহতি সমিতি থেকে নমিনেশন পেয়েছিলেন গুণিচরণ তনচঙ্গা। তিনি ছিলেন ইউপি মেম্বার। তিনি সুদত্ত বিকাশ তনচঙ্গার আত্মীয় ছিলেন, সম্পর্কে তার দাদু হতেন। তিনি সুদত্ত বিকাশ তনচঙ্গাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। গুণিচরণ তনচঙ্গা জনসংহতি সমিতির পক্ষে কাজ করেছিলেন বলে তাকে হত্যা করেছিল সুদত্ত বিকাশ তংচঙ্গা। গুণিচরণের সাথে ছিলেন লক্ষী তনচঙ্গা বলে একজন সাম্পান মাঝি, সে নায়ে করে কর্মীদের এপার ওপার করতো, সেই কারণে একই জায়গায় দুজনকেই হত্যা করা হয়। মাঝি অনুনয় করে বলেছিল ''আমি সাম্পান মাঝি, সাম্পান বাওয়া আমার কাজ। আমি মাঝি, সর্বহারা আসলেও জীবিকা নির্বাহের জন্য নৌকা করে পার করি। শান্তি বাহিনী আসলেও পার করি"। এই হত্যার খবর জনসংহতির কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে পার্টি কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে সর্বহারাদের এলাকায় গিয়ে সুদত্ত বিকাশ তনচঙ্গার আপন কাকা এবং সেই সাথে রূপময় তনচঙ্গা সহ আরও কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। রূপময় তনচঙ্গাকে অনুসন্ধান করে সর্বহারাদের কিছু কাগজ-পত্র পাওয়া গেলে তাকে জনসংহতি সমিতির ক্যাম্পে নিয়ে আসে এবং অন্যদের ছেড়ে দেয়। এদেরকে অনেকদিন জনসংহতির কর্মীরা আটকে রেখে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ দেয় এবং জুম্ম চাষে বাধ্য করায়। জনসংহতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বহারাদের কাছ থেকে জনগণকে বিছিন্ন করা এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল। [১৫৩]

শান্তিবাহিনীর সাথে সর্বহারাদের রাজস্থলী এলাকার হারাজোনে এবং রোয়াংছড়ির রাইক্ষ্যং এলাকায় বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছিল। জনসংহতি সমিতির আক্রমণের কারণে সর্বহারা দল চিম্বুক এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা চিম্বুকের দক্ষিণে চিটাগাং বর্ডারের কাছে থানচির পূর্ব দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এভাবে জনসংহতি

[১৫৩] রূপায়ন দেওয়ান সাক্ষাৎকার, ১২/০৮/২০০৩।

সমিতির রাজনৈতিক এবং সশস্ত্র চাপে পড়ে সর্বহারা পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে হানাচরণ ত্রিপুরার ভাষ্য হলো ঃ [১৫৪]

> ''বান্দরবান থেকে উত্তরে রাইক্ষ্যং-এর ৭৪, ৭৫, ৭৬ সালে সর্বহারা পার্টি গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে ছিল এবং রাইক্ষ্যং-এর কিছু অংশ তারা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শান্তিবাহিনী সর্বহারাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্রসহ একজনকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছিল। এতে সর্বহারা পার্টি একেবারে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পরে। কারণ তাদের ধারণা ছিল যোদ্ধা হিসেবে তারা অত্যন্ত সাহসী। সর্বহারা পার্টি পুলিশ ব্যাটলিয়ান ফোর্স দখল করেছিল। অথচ শান্তিবাহিনী তাদেরই একজনকে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনায় শান্তিবাহিনীর প্রতি এলাকার জনগণের আস্থা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।''

১৩.৩.২. খিয়াং ডাকাত দল

খিয়াং জনগোষ্ঠীর কয়েকজন যুবক মিলিত হয়ে একটি ডাকাত দল গঠন করেছিল। এ দল সম্পর্কে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [১৫৫]

> ''১৯৭৪ সালে সর্বহারাদের সাথে যুদ্ধ করতে রাজস্থলী এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি খিয়াং জাতির কয়েকজন লোক জনসংহতি সমিতির নাম ব্যবহার করে ডাকাতি করছে। তাদের দলকে আটক করে যথেষ্ঠ শাসন করেছিলাম, কিন্তু শাস্তি দেইনি। কারণ তারা আমরা উভয়ে পাহাড়ি মানুষ। তাছাড়া সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে একে অপরের প্রতি মায়া-মমতা, সহানুভূতি দরদ থাকে অনেক বেশি। এই অনুভূতিটা আমাদের মধ্যেও কাজ করেছিল। তাছাড়া পাহাড়িরা সংখ্যালঘু হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা শোষণ, অন্যায়, অবিচার সবার উপরেই তো করতো। এসব চিন্তা করে খিয়াং জনগোষ্ঠীর ডাকাত দলকে সেদিন ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।''

১৩.৩.৩. মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট

শান্তিবাহিনীর আরেক প্রতিপক্ষ দল ছিল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। মিজোদের সম্পর্কে রূপায়ন দেওয়ান বলেন, ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মিজোদের আশ্রয় দিয়েছিল। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত অঞ্চলে বিশেষ করে বান্দরবান এলাকায় মিজোদের অবাধ বিচরণ শুরু হয়। তবে তাদের অবস্থান ছিল মূলতঃ গভীর জঙ্গলে। বরকলের একটা অংশে তাদের আধিপত্য ছিল সর্বাধিক। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তারা কাছালং রির্জাভের বগাইছড়ির উত্তরে অবস্থান নিলেও মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হলে মিজোরা পালিয়ে যায়। জনসংহতি সমিতির সাথে

[১৫৪] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[১৫৫] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১২/০৮/২০০৩।

প্রথম দিকে তাদের কোন যোগাযোগ বা বৈরীতা ছিল না। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মিজোদের সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [১৫৬]

> "মিজোদের সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। বম কমিউনিটির সাথে প্রথম দিকে মিজোদের সুসম্পর্ক ছিল, ফলে বম পাড়াগুলোতে তারা নিরাপদে থাকতো এবং বম মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতো অতি সহজেই। যে মেয়েকে পছন্দ হতো তাকেই বিয়ে করতো। বিয়ের কিছুদিন পর স্ত্রী ও বাচ্চা ফেলে রেখে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই চলে যেতো। এতে মিজোদের বিরুদ্ধে বম জনগোষ্ঠীর জনমত গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও মিজোদের জীবনধারা ছিল অত্যন্ত উচ্ছৃংখলপূর্ণ। যুক্তিহীনভাবে জনগণের সাথে দুর্ব্যবহার করতো, বিক্রয়কারীর কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে মূল্য পরিশোধ করার কোন অভ্যাস তাদের ছিল না। জে. এস. এস-এর সাথে মিজোদের সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল হিল ট্রাক্টসের একটা অংশ মিজোরা তাদের বলে দাবি করতো। সে কারণে মিজোরা জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কাজে বাধা দিতো এবং দাবি করতো এ অঞ্চল তাদের। মিজোদের মধ্যে এক ধরনের অহংকার ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামো অপেক্ষা মিজো ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট অধিকতর শক্তিশালী। সামরিক এবং রাজনৈতিক কোনদিক থেকেই তারা শান্তিবাহিনীকে গুরুত্ব দিতো না। মিজোরাই প্রথম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। জনসংহতি সমিতি পাল্টা আক্রমণ চালালে প্রথম সংঘর্ষে জনসংহতি সমিতির তিনজন কর্মী মারা যায়। পরবর্তীতে মিজোদের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতিকে জোরালো ক্যাম্পেইন করতে হয়েছিল।'
>
> 'মিজোদের বিরুদ্ধে রুমা এলাকার পূর্ব দিকে সবচেয়ে বড় অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল। এই অপারেশনে মিজোদের ফরেন মিনিস্টার শান্তিবাহিনীর আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন। শান্তিবাহিনীর এ সাফল্যে মিজোবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষে শান্তিবাহিনী মিজোদের অস্ত্র, যেমন টমিগান, পিস্তল ও রিভলবার দখল করেছিল। শেষ পর্যন্ত মিজোরা শান্তিবাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং অস্ত্র হারিয়ে অনেকে আত্মসমর্পণ করে। পর পর কয়েকটি সংঘর্ষে শান্তিবাহিনীর কাছে পরাজিত হলে মিজোরা বলতে শুরু করে শান্তিবাহিনী রাজনীতিতে পারদর্শী আর মিজোরা যুদ্ধে।"

শান্তিবাহিনীর অন্যান্য প্রতিপক্ষ প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন ঃ [১৫৭]

> "শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধি সরকার উভয়ে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, রাজাকার, মুজাহিদ দমনের চেষ্টা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপদ্রুত' এলাকা ঘোষণা করে। সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে শান্তিবাহিনী ও সাধারণ জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। ঐ সময় বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। বলেছিল, স্যারেন্ডার করলে কিছু হবে না। কিন্তু যারা স্যারেন্ডার করেছিল তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এইজন্য অন্যান্য দলগুলো স্যারেন্ডার না করে সংঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতের দল গঠন করেছিল। এই দলগুলোকে শান্তিবাহিনী দমন করেছে। তারা রাজাকার, মুজাহিদদের অস্ত্রগুলো কব্জা

[১৫৬] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১২/০৮/২০০৩।

[১৫৭] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০২।

করেছিল। এগুলো খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল, এগুলো ছিল এক ধরনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কমান্ডার হিসেবে আমি নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং পাইপ গান নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম এদের বিরুদ্ধে।”

১৩.৩.৪. চাকমা পিপলস পার্টি

চাকমা পিপলস পার্টি ছিল শান্তিবাহিনীর আরেকটি প্রতিপক্ষ। ১৯৭২ সালে ‘চাকমা পিপলস প্যার্টি’ (সিপিপি) নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়েছিল। এ সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রেমজেন্দু বিকাশ চাকমা, শ্যামল চাকমা প্রমূখ। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র চাকমা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনার লক্ষ্যে সংগঠনটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সকল পাহাড়ি জাতির জনগোষ্ঠীর পক্ষে সমানভাবে এম. এন. লারমা প্রবর্তিত জুম্ম জাতীয়তাবাদ ধারণাকে আত্মস্থ করা সম্ভব হয়নি। ফলে চাকমাসহ আরও কোন কোন পাহাড়ি জাতি নিজস্ব জাতিগত পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায় নিয়ে এরূপ সংগঠন সৃষ্টির চেষ্টা করে। চাকমা পিপলস পাটিও ছিল তেমনি একটি সংগঠন। এ সংগঠনের উগ্র কর্মসূচিকে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়েছে। তবে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দও রাজনৈতিকভাবে জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এ সংগঠনকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও কাঠামোগত যে, অবস্থা সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চাকমা জাতির নেতৃত্বে চাকমা সংগঠন দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। চাকমা পিপলস পার্টির সদস্যগণ এ বাস্তবতা উপলদ্ধি করে এবং সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে ট্রাইবালস পিপলস পার্টি আ্যখ্যা দেয়। এ সংগঠনের সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয় সুবলং এবং রাজস্থলীর চিংখোতে। এ এলাকাগুলোতে তাদের ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে শান্তিবাহিনীকে বেগ পেতে হয়নি। শান্তিবাহিনীর আক্রমনে তারা বাঘাইছড়ি এবং কাছেলং-এর দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়। এখানেও তারা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। এক বছর তাদের সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষের পর ৭৩ সালের শেষ দিকে এ সংগঠন নির্মূল হয়ে যায়। এর অন্যতম কারণ ছিল জনসংহতি সমিতির উপর জনমানুষের আস্থা, যা এ সংগঠন অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। [১৫৮]

১৩.৩.৫. ‘বামাঞ্ঞাতা’ সংগঠন

বান্দরবান এলাকায় মার্মাদের উদ্যোগে বামাঞ্ঞাতা নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। কোন রাজনৈতিক মতাদার্শগত ভিত্তি এই সংগঠনে ছিলনা বললেই চলে। গ্রামের মানুষদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে সম্পদ লুট করা ছিল এদের কর্মকাণ্ডের মূল অংশ। বান্দরবান থেকে সাত মাইল উত্তরপূর্বে মোংজাই পাড়ার কাছে বড় গ্রামে শান্তিবাহিনীর হাতে বামাঞ্ঞাতা সংগঠনের সদস্য ধরা পড়ে। গ্রামবাসীরাও তাদের বিপক্ষে ছিল এবং তাদের সহায়তায় শান্তিবাহিনীর পক্ষে এদের নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হয়। তারা শুধু ডাকাতি করতো। বান্দরবানের মোংজাই পাড়ার সংঘর্ষে এ সংগঠনের ১৬/১৭জনের

[১৫৮] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১২/০৮/২০০৩।

একটি দলের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীকে অপারেশন পরিচালনা করতে হয়। এই অপারেশনের প্রত্যক্ষদর্শী রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [১৫৯]

> "তাদেরকে আটক করার পর গ্রামবাসীকে বললাম, এদেরকে চিনে রাখেন, এরা দূরবর্তী এলাকা থেকে এসে ডাকাতি করে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। যারা লুটপাট করে, মানুষের শান্তি কেড়ে নেয় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল শান্তিবাহিনীর প্রথম কাজ। শান্তিবাহিনীকে যাদের দমন করতে হয়েছিল তারা ছিল অত্যন্ত সংঘবদ্ধ দল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবময় চাকমা'র দল। বুড়িঘাট, নানিয়ারচর এবং আশেপাশে এলাকায় এরা ডাকাতি করতো।"

১৩.৩.৬. পাহাড়ি যুবক সংঘ

১৯৭৩ সালের শুরুতেই পাহাড়ি যুবক সংঘ আত্মপ্রকাশ করে। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি লুটপাট। তাদের নেতা ছিল পঙ্কজ দেওয়ান। এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [১৬০]

> "এই সংঘে দুএকজন রাজপরিবারের ছেলেও ছিল। এরা শুভলং এ ডাকাতি করতে যেয়ে শান্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল। তাদের কাছ থেকে এসএলআর-সহ ৪/৫টা অস্ত্র উদ্ধার করে তাদেরকে রাঙ্গামাটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। শান্তিবাহিনীর হাতে অস্ত্র খুইয়ে রাঙ্গামাটির কোর্ট বিল্ডিং সংলগ্ন মাঠে জনসংহতি সমিতিকে গালিগালাজ করে পাহাড়ি যুবক সংঘের লোকেরা পাবলিক মিটিং করেছিল।"

১৪. জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই শান্তিবাহিনীতে তাদের কম্যুনিস্ট চিন্তাধারার ভিত্তিতে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যে তারা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কমিউনিস্ট আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকা পড়তে উদ্বুদ্ধ করনে। কিছু সদস্য চুয়াত্তরের প্রথম দিকে গোপনে 'ট্রাইবেল পিপল্স পার্টি' বা টিপিপি গঠন করলে দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ টিপিপি গঠনের মূল নেতাদের দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন। [১৬১] দলের সদস্যদের একটি অংশের উদ্যোগকে দলের নেতৃবৃন্দ ষড়যন্ত্রমূলক উপদলীয় কার্যকলাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জনসংহতি সমিতি বিশেষতঃ এম. এন. লারমা যে আদর্শ, উদ্দ্যেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার প্রতি মতান্তর সৃষ্টি ক'রে এই অংশটি

[১৫৯] ঐ।

[১৬০] ঐ।

[১৬১] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ১১৫-১১৮।

নতুন দল সৃষ্টি করে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের অভিযোগ এর পিছনে সরকার এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক মহলের সংশ্লিষ্টতা ছিল।[১৬২]

জনসংহতি সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম বিরোধ দেখা দেয় ১৯৭৭-৭৮ সালে। প্রীতি কুমার চাকমা, দেবজ্যোতি চাকমা, ভবতোষ দেওয়ান ও ত্রিবঙ্গিল দেওয়ান পার্টির মধ্যে উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে। ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায়। এম. এন. লারমার সাথে তাদের মতানৈক্য ছিল আন্দোলনকে দ্রুত নিষ্পত্তি করাকে কেন্দ্র ক'রে। তারা চেয়েছিল অন্য কোন দেশ বা কোন শক্তি অর্থাৎ বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্রয়ে গিয়ে সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা। এবং এ পথে মীমাংসার বিষয়ে তারা জনসংহতি সমিতের নেতৃবৃন্দের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এখানেই ছিল এম. এন. লারমার সাথে বিভেদপন্থীদের মৌলিক পার্থক্য। তিনি কখনোই অন্য কোন দেশ, রাষ্ট্র বা শক্তির উপর নির্ভর করে আন্দোলন করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সর্বদাই বলতেন ঃ [১৬৩]

> "আমাদের নিজস্ব শক্তি দিয়ে যত সময় প্রয়োজন তার মধ্য দিয়েই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, অন্য দেশ বা শক্তির সাহায্য নিলে আমাদের আরও বেশি সমস্যা সৃষ্টি হবে"।

এছাড়া এ লারমা নেতৃত্ব মনে করতেন দেশ পরিচালনার জন্য যে দক্ষ লোকবল প্রয়োজন তা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে। বিভেদপন্থীরা আন্দোলনের এ কৌশলকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা ভারতের সহায়তা নিয়ে আন্দোলনকে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। এ বিষয়ে যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা বলেন ঃ[১৬৪]

> "এম. এন. লারমার নেতৃত্বের প্রতি ভারতের সমর্থন ছিল না। কারণ এম. এন. লারমা কখনও বিদেশী শক্তির সাহায্য চাননি। তিনি ছিলেন মার্কস বা লেলিনপন্থী। ছাত্র জীবন থেকে তার চিন্তা চেতনার সাথে সকলেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন পার্বত্যাঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা। তার সে ইমেজ ছিল, এবং তাঁর কোন বিকল্পও ছিল না। এম. এন. লারমা এবং সন্তু লারমা দু'জনেই ছিলেন বামপন্থী। এজন্য ভারত সরকার প্রীতি গ্রুপকে ব্যবহার করেছিল। কারণ ভারত সরকার মার্কসবাদী নয়, জাতীয়তাবাদী। এই জন্য ভারত সরকার নেতৃত্বের পরিবর্তন চেয়েছিলো।"

অভ্যন্তরীণ বিরোধ সম্পর্কে সুধাসিন্ধু খীসা বলেন, জনসংহতি সমিতির মধ্যকার একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার দ্রুত সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা বলেছিল বিদেশী সহায়তা নিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। এম.এন. লারমা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে তার দলকে দীর্ঘ মেয়াদে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করছিলেন।[১৬৫] পার্বত্যাঞ্চলের

[১৬২] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০৩।

[১৬৩] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[১৬৪] ঐ।

[১৬৫] ঐ।

জনগণ জনসংহতি সমিতির এই গৃহযুদ্ধটাকে *‘লম্বা-বাইট্টার যুদ্ধ’* বলে অভিহিত করেছিলেন।[১৬৬] দীর্ঘমেয়াদী সময় ও নিজস্ব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি আদায়ে বিশ্বাসী এম. এন. লারমার সমর্থকদের বলা হতো লম্বা দল এবং অন্য কোন দেশ বা শক্তির সহায়তা নিয়ে সরকারের প্রতি চাপ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে স্বল্পতম সময়ে দাবিআদায়ের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সমর্থন দাতাদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে বাইট্টা দল ব’লে আখ্যায়িত করা হতো। এই প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন ঃ [১৬৭]

> “বিভেদপন্থীদের তৎপরতার শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালে। জনসংহতি সমিতির নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচি তারা গ্রহণ করতে পারছিলো না বলেই তারা বিভেদ সৃষ্টি করেছিলও গ্রুপিং করছিল। এই ষড়যন্ত্রে আন্তর্জাতিক মহলও জড়িত ছিলো। আন্তর্জাতিক মহলের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিলো।”

১৯৭৫ সালে সন্তু লারমা গ্রেফতার হওয়ার পর শান্তিবাহিনীর মূল নেতৃত্বে আসেন প্রীতি কুমার চাকমা। ইতোপূর্বে কোন্দল শুরু হলেও শান্তিবাহিনীর ভিতরে বিভক্তি শুরু হয় ১৯৮২ সালে।[১৬৮] জনসংহতি সমিতির মূল নেতৃত্বে যারা ছিলেন এম. এন. লারমা ও সন্তু লারমা, তারাও কিছু বুঝতে পারছিলেন না। কারণ, তারা অনেক সময় রিপোর্ট পেতেন না। পার্বত্য এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জায়গাটার অবস্থান এমন পশ্চাৎপদ যে, কোন সংবাদ তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব নয়।[১৬৯] এটিও সত্য যে, প্রীতি গ্রুপ এমন হীন কাজ করতে পারে এটা তারা ভাবতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে কে এস মং বলেন ঃ [১৭০]

> “প্রীতি গ্রুপের লোকেরা জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য নানা রকম পাঁয়তারা করে। তাদের দল জন সংহতিকে চ্যালেঞ্জ করে। এটা অন্য কোন দেশের সাপোর্ট না পেলে করা সম্ভব না। ১৯৮২ সালে প্রীতির দলকে ভারতীয় বিএসএফ গ্রেফতার করার ভান করে এক জায়গায় জড়ো করে আবার অস্ত্রশস্ত্রসহ ছেড়ে দেয়। কারণ ভারত সরকারের সাথে তাদের একটা সমঝোতা ছিল।”

এ সময় এম. এন. লারমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রীতি কুমার চাকমা নতুন দল গঠন করলে শান্তিবাহিনীর প্রায় অর্ধেক গেরিলা প্রীতি কুমার চাকমার দলে যোগ দেয়। এ দুই দল একত্রিত ভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আক্রমণে অংশ নিলেও হঠাৎ করেই দল দুটির মুখোমুখি অবস্থান এবং যুদ্ধ জঙ্গলের নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয় এবং ১৯৮২ ও ১৯৮৩ এই দুটি বছর এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। জনসংহতি সমিতির বার্ষিক সম্মেলন ছিল ১৯৮২ সালের ২০

---

[১৬৬] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও ম্রাও মাষ্টারের সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২ ও ২৫/১০/২০০৩।

[১৬৭] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০৩।

[১৬৮] গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

[১৬৯] কে. এস. মং এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/২০০৩।

[১৭০] ঐ।

সেপ্টেম্বর। এই সম্মেলনে প্রীতি কুমার চাকমা আন্দোলন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। এ প্রেক্ষিতে তার বক্তব্য ছিল বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমার যে দেশই তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রাধান্য দিবে সে দেশের সাথে সুযোগ-সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রুত একটা আপোষের দিকে তারা অগ্রসর হবে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা এই তিনটি দেশের যে কোন একটির পতাকা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবে। এম. এন. লারমা তার এই চিন্তার বিরোধিতা করেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল সত্যিকার সাফল্য অর্থাৎ পাহাড়ি জাতির মুক্তির জন্য দীর্ঘমেয়াদী কঠোর সংগ্রাম করার পক্ষে তার অবস্থান তুলে ধরেন। সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মার্কসবাদ, লেলিনবাদ এবং মাও সেতুং-এর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পাহাড়ি জাতির সাফল্য অর্জিত হতে পারে।'[১৭১] এভাবে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য চলতে থাকলে সংঘাত অনিবার্য ভেবে যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এম. এন. লারমার কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি ছোট্ট একটা বক্তব্য দিয়ে সভা শেষ করে দেন'। তখন সভাপতি হিসেবে যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা বক্তব্য দিলেন ঃ [১৭২]

> "আমরা এখানে বহুদলীয় পার্লামেন্ট না, আমরা এক দলের, একই আদর্শের, একই বিশ্বাসের, একই নীতির লোক। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য থাকতে পারে, এখানে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে, আক্রমণাত্মক কোন সমালোচনা হবে না। কেউ এভাবে বক্তব্য দিবেন না।"

প্রীতি কুমার চাকমা এই সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির সভাপতি হতে চাইলেও এম. এন. লারমাই শেষাবধি সভাপতি হন। এতে প্রীতি কুমার চাকমা অন্যপথে নেতৃত্বে আসার কথা ভাবতে থাকে। এর পর থেকে এই দুই দলের মধ্যে বিভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৭৩]

প্রীতি কুমার চাকমা ছিলেন একটি সেক্টরের প্রধান। এই সেক্টরের অবস্থান বান্দরবান হওয়ার কারণে এ অঞ্চল থেকে যারা জনসংহতি সমিতির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছিলেন, তারা সকলেই প্রীতি কর্তৃক প্রভাবিত ছিল। সেটা আদর্শগতভাবে না হলেও সামরিকভাবে প্রভাবিত ছিল। ফলে বান্দরবান থেকে যারা শান্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের নেতা যেহেতু প্রীতি, ফলে তারা অনেকেই প্রীতি গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যান। অন্যান্য অনেকে প্রকাশ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষে ভূমিকা নেয়া থেকে বিরত থাকেন। ফলে এ দু'গ্রুপের মধ্যে প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধতে থাকে। দুই গ্রুপের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় ১৯৮৩ সালে ১৪ জুন। এই সংঘর্ষে লারমা গ্রুপের হাতে প্রীতি গ্রুপের কমান্ডার অমৃত লাল চাকমা ওরফে বলি ওস্তাদ-সহ অনেকে নিহত হন।[১৭৪]

---

[১৭১] গোলাম মোর্তোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৪।

[১৭২] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[১৭৩] ঐ।

[১৭৪] কে. এস. মং-এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/২০০৩।

১৫. ঐক্যবদ্ধতার আবরণ ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হত্যাকাণ্ড

জনসংহতি সমিতির মধ্যে বিভেদের এই অবস্থায় যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা প্রীতি গ্রুপ ও লারমা গ্রুপের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রীতি গ্রুপের সাথে আলোচনায় বলেছিলেন 'ভ্রাতৃঘাতী লড়াই করে কোন লাভ হবে না; আমরা যে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছি, সে অধিকার আদায়ের পথটি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব। নানা কারণে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। কাজেই ভুল ত্রুটি যা হয়েছে সেটা বাদ দিয়ে মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।' তারপর বেশ কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় সবাইকে নিয়ে একসাথে বসে নেগোশিয়েশনের জন্য চিঠি-পত্র দিয়েছিলেন যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা। জনসংহতি সমিতির পক্ষে কাজ করেছিলেন মাধব চন্দ্র চাকমা ওরফে মিহির। দুগ্রুপের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্বের সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে আবার সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে সিদ্ধান্ত হয় পুনর্মিলনের। এর মাধ্যমে দু'গ্রুপের মধ্যে একসাথে পথচলা শুরু হয়।[১৭৫] ১৯৮৩ সালের শেষদিকে দুই দলই সকল বিরোধ ভুলে একত্রে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়। প্রীতি দলের একত্রিত হওয়ার এই সম্মতি ছিল মূলত ঃ একটি কৌশল।[১৭৬]

তারা এটিকে একটি অন্যতম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর এম. এন. লারমাকে হত্যা করে। এই অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে এম. এন. লারমার সাথে তার বড় ভাই শুভেন্দু প্রভাস লারমা নিহত হন। সন্তু লারমা নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, গুলিবিদ্ধ হয়েও প্রাণে বেঁচে যান। এম. এন. লারমার হত্যার স্থান নিয়ে দুই ধরণের মত আছে। জনসংহতি সমিতির নেতাদের মতে খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্ত অঞ্চল দুদকছড়িতে। কিন্তু জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমার 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার' সংকলনে পাওয়া যায় যে, এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল ভারতের অভ্যন্তরে।[১৭৭] তবে উমে মং-এর কথা থেকে জানা যায় যে, এম. এন. লারমা যেখানে নিহত হয়েছিলেন সেটি ছিল খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা, তার পাশের গ্রামে ছিলেন উমে মং। তিনি সে রাতে গুলির শব্দ পেয়েছিলেন।[১৭৮]

পুনর্মিলন এবং একসাথে থাকা-খাওয়া শুরুর প্রায় দেড় মাস পরে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ এম. এন. লারমা নিহত হন। [১৭৯] পার্বত্যাঞ্চলের জনগণ এম. এন. লারমাকে হত্যার জন্য 'বাইট্টা গ্রুপ'কে দায়ী করেছিলেন। [১৮০] তার হত্যা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা বলেন ঃ [১৮১]

---

১৭৫ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

১৭৬ গোলাম মোর্তোজা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৪।

১৭৭ ঐ।

১৭৮ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।

১৭৯ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

১৮০ ঐ এবং ম্রাও মাষ্টারের সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২, ২৫/১০/২০০৩।

"প্রীতি গ্রুপ ভাগ হ'য়ে পরবর্তীতে আবার 'ক্ষমা কর এবং ভুলে যাও' নীতির ভিত্তিতে এম. এন. লারমার সাথে মিলিত হয়েছিল। তবে প্রীতি গ্রুপ ধ'রে নিয়েছিল এম. এন. লারমা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কারণ প্রীতি গ্রুপ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘটাতে চেয়েছিল। এম. এন. লারমা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা মনে করেছিল তিনি প্রতিশোধ নিতে পারেন। এই চিন্তা থেকেই তারা ষড়যন্ত্র করে এম. এন. লারমাকে হত্যা করেছিলো।

মৃত্যুকালীন সময়ে এম. এন. লারমার কথোপকথন সম্পর্কে শান্তিবাহিনীর এলএমজি ম্যান সৌমিত্র বলেন ঃ [১৮২]

'যারা গুলি করেছিল, লিডার তাদের চিনতে পেরেছিলেন। সামনাসামনি তাদের সাথে কথা হয় লিডারের। আমি শুনেছিলাম লিডারের কথা। লিডার বলেছিলেন, আমাকে হত্যা ক'রে একটি জাতির অধিকার আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনকে কি তোমরা ধ্বংস করে দিতে পারবে? পারবে না। আমাকে হত্যা করতে পার। আমার বন্ধুদের হত্যা করতে পার। অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে হত্যা করতে পার। কিন্তু আমাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে না। '

এম. এন. লারমার মৃত্যু প্রসঙ্গে ঊষাতন তালুকদার বলেন ঃ [১৮৩]

"জীবিত এম. এন. লারমার চেয়ে মৃত এম. এন. লারমা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন। 'বেঈমান' দের চিহ্নিত করা গেল। কারা একটি আদর্শকে হত্যা করেছে, কারা দলের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তখন সকলের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় যে, দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রকে ব্যবহার করেছে। এরা এম. এন. লারমাকে হত্যা করেছে। সবাইকে হত্যা করবে, জাতিকে শেষ করে দেবে। ষড়যন্ত্রকারীদের দিয়ে আন্দোলন চলে না। এরা উচ্চাভিলাষী, ভোগবাদী, পরনির্ভশীল হয়ে সহজে সবকিছু পেতে চায়। দলীয় কর্মীরা আরও বেশি জ্বলে উঠলো। জঙ্গিরূপ ধারণ করলো। তখন গৃহযুদ্ধ নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে গেল। এম. এন. লারমার মৃত্যুর পর সকলে বুঝতে পারলেন তিনি কত মহান ছিলেন।"

এম. এন. লারমা সম্পর্কে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [১৮৪]

"জুম্ম জাতির জন্য তিনি নিজের জীবন দিয়ে দিলেন। উনি যে দেশপ্রেমিক, মানব প্রেমিক ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর কর্মীরা তা উপলব্ধি করেছে বেশি। নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য কিছু করেননি।"

---

[১৮১] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[১৮২] গোলাম মোর্তোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮।

[১৮৩] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[১৮৪] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১১/০৫/২০০৪।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক প্রণীত গ্রন্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে, শান্তিবাহিনীর মূল নেতৃত্ব পরিবর্তনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চাপ ছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার বাবু গোপাল কৃষ্ণ চাকমা তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারে লারমা চীনপন্থী কম্যুনিস্ট এবং ছাত্রাবস্থা থেকেই মাওবাদে বিশ্বাসী। তাই গোয়েন্দা সংস্থা 'র' শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা শান্তিবাহিনীর জেনারেল সেক্রেটারি ভবতোষ দেওয়ানকে ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি সময়ে আগরতলায় নেতৃত্ব পরিবর্তনের নির্দেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে ভবতোষ দেওয়ান ও প্রীতি কুমার চাকমা ১৯৮২ সালের আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসে জিএইচকিউ কল্যাণপুরে কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যে কোন উপায়ে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশ পাওয়ার পরই প্রীতি গ্রুপ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পার্টির লোকজনের নিকট তার বিরূপ সমালোচনা করে। তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগ তোলে। প্রীতি গ্রুপ আরও প্রচার করে, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি পুনর্বাসন করেছে এম. এন. লারমার কারণে। লারমা দ্রুত বিপ্লব শেষ করলে বাংলাদেশ সরকার পুনর্বাসনের সুযোগ পেতনা এবং পাহাড়িরাও সংখ্যালঘুতে পরিণত হত না। ভবতোষ দেওয়ান, প্রীতি কুমার চাকমা, এবং কলকাতায় অবস্থানরত ভান্তের সহায়তায় গোপাল কৃষ্ণ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন নেতৃত্ব, সংবিধান, দলীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতসহ ইত্যাদি বিষয়ে অর্থাৎ একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নকশা প্রস্তুত করে। এতে আরও উল্লেখিত ছিল, ভারতীয় সহায়তা পেলে শান্তিবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দলিলটি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হাতে পড়ে। [১৮৫]

১৯৮৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতি থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এতে এই হত্যায় প্রীতি দলকে দায়ী করা হয়। অপর পক্ষে ১৯৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি অপর একটি বিলিকৃত প্রচার পত্রে লারমাকে হত্যার দায়ে জনসংহতি সমিতিকেই দায়ী করা হয়। তবে এম. এন. লারমাকে যে প্রীতি দলই হত্যা করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এ প্রসঙ্গে সন্তু লারমার ভাষ্য হলো ঃ [১৮৬]

> "দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ফলে আমাদের নেতা এম. এন. লারমা নিহত হন। আমরা ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়ার নীতির উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হ'তে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের স্থানে আমিসহ আরও অনেকে ছিলাম। কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিলাম। নেতাসহ আরও অনেকে নিহত হন সে রাতে। এরশাদ সরকার এই বিদ্রোহীদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই সুযোগে ১৯৮৫ সালের ২০ এপ্রিল প্রীতি দলের ২৩৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে।"

এরপরে শান্তিবাহিনীর মূল অংশের নেতৃত্বে থাকেন সন্তু লারমা।

[১৮৫] মেজর জেনারেল (অব:) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ১০৫।

[১৮৬] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ১০/০৮/২০০৩।

১৬. উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন, তার বিরুদ্ধে পাহাড়ের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং এতে শান্তিবাহিনীর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে মূলত আলোচিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী'র গঠন, কমান্ড স্ট্রাকচার, স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে শান্তিবাহিনী'র সম্পৃক্ততা, সশস্ত্র সংগ্রাম ও শান্তিবাহিনী'র নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে পাহাড়ি বিচারব্যবস্থা। এছাড়াও আদিবাসী বিভিন্ন জাতির শান্তিবাহিনীকে সমর্থন, শান্তিবাহিনীর নারী সহযোগী এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে পাহাড়ি নারী-পুরুষের মিলিত ইত্যাদি প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রের তরফে পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিকে সামরিকায়ণ করা হয়েছে, আরেকদিকে বাঙালি সেটেলারদের বসতি করানোর মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রমের জনমিতি পাল্টে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসনকে মোকাবেলা করেছে শান্তিবাহিনী। সেনাবাহিনী বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি গণহত্যা, অসংখ্য পাহাড়ি নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মগত নির্যাতন, পাহাড়িদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা সহ নানাবিধ নির্য়াতন চালায় যা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শান্তিবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য নানান কৌশল যার মধ্যে পাহাড়ী ছাত্রসমিতির কর্মীদের প্রলোভন থেকে শুরু করে মানসিক নির্যাতন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন, জেনারেল জিয়া'র *ট্রাইবাল কনভেনশন* গঠন, বাঙালি পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন আদিবাসী জাতির মধ্যে দ্বন্দ্বের বিস্তার-চেষ্টা ছিল অন্যতম। এছাড়াও তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে আরও নানান রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিপক্ষকে যথা পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, খিয়াং ডাকাত দল, 'বামাঞ্চাতা' সংগঠন, পাহাড়ি যুবক সংঘ ইত্যাদি। সর্বোপরি, সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনে উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত আলোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। এর বাইরে ছিল নিজেদের মধ্যেকার আদর্শিক, রণনৈতিক ও রণকৌশলগত নানান দ্বন্দ্ব যার সুত্র ধরে পাহাড়িদের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের উপর প্রীতি-গ্রুপের হত্যা ও নির্যাতন এবং এম. এন. লারমা'র হত্যাকাণ্ড। জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর ভিতর ১৯৮২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গ্রুপ ও প্রীতি গ্রুপের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৮২-৮৩ এই দুই বছর গৃহযুদ্ধ চলার পর ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, শুভেন্দু প্রভাস লারমাসহ কয়েকজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা ও সংগঠককে হত্যা করে। গুলিবিদ্ধ হয়েও সন্তু লারমা প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখবো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসেবে জ্যোতিপ্রিয় বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)-র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন এবং রাষ্ট্রের জাতিগত ও ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে অব্যাহত সশস্ত্র সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ঃ সন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন, রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা, সমঝোতা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

১. সূচনা

সপ্তম অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসেবে সন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা, ধর্ষণ, অগ্নিকান্ড ও হত্যাকান্ড (১৯৮৫-১৯৯৭), গণহত্যা, ধর্মান্তর ও নির্যাতন (১৯৮৫-১৯৯৭), সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত ও সহিংসতা, শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ, সমঝোতা উদ্যোগ ও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির চেষ্টা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে এছাড়াও ধর্মান্তরন ও নির্যাতন, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ, আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা, গণহত্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গণহত্যা যেমন ভূষণছড়া গণহত্যা, খাগড়াছড়ি-পানছড়ি গণহত্যা, মাটিরাঙ্গা গণহত্যা, লংগদু গণহত্যা। এ অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত ও শান্তিবাহিনীর উল্লেখযোগ্য কিছু অপারেশন। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ এবং এরশাদের ইতিবাচক সাড়া ও “জাতীয় কমিটি” গঠনের ঘোষণা এবং এই জাতীয় কমিটির সাথে পাহাড়ি নেতাদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তী পরিস্থিতি, বিএনপির শাসনামল ও আওয়ামী লীগের শাসনামলে রাজনৈতিক নিস্পত্তির চেষ্টা এখানে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তির পরবর্তীতে প্রণীত আইন ও তার সংশোধনের কথাও এই অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে।

২. সন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর পুনর্গঠন

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধানের পাশাপাশি এর সশস্ত্র শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[১] এই নেতৃত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সন্তু লারমা বলেন ঃ [২]

[১] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩০।

"তাঁর শহীদ হবার পর দায়িত্বটা আমি নিই নি। সে সময়কার কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক আলাপ-আলোচনা করে। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বে আসিনি। আমার কর্মকাণ্ড, যোগ্যতা বিচার করেই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।"

উর্ধতন একজন সরকারী কর্মকর্তা লিখেছেন যে, শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই সন্তু লারমা প্রীতি গ্রুপের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান এবং এই উপদলটিকে সম্পূর্ণরূপে কোনঠাসা করে ফেলেন। একদিকে শান্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা অন্যদিকে সরকারি বাহিনীর আক্রমণের কারণে ১৯৮৫ সালে শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপ সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে এবং কয়েক দফা আলোচনা শেষে বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছে।[৩] ১৯৮৫ সালের ২০ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর ২৩৩ জন সদস্য আত্মসমর্পন করে এবং মেজর জেনারেল এস নুরুদ্দীন খানের কাছে অস্ত্র জমা দেয়।[৪] ২৯ জুন বাংলাদেশ সরকার ও প্রীতি গ্রুপের মাঝে আত্মসমর্পন ও পুনর্বাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তবে দলনেতা প্রীতি কুমার চাকমা ও ভবতোষ দেওয়ান আত্মগোপনে থেকে যান। [৫]

প্রীতি গ্রুপের বিলুপ্তির পর বিদ্রোহীদের মাঝে উপদলীয় কোন্দলের অবসান ঘটে।[৬] অধিকাংশ পাহাড়ি উপলব্ধি করেন যে তারা প্রীতি গ্রুপ দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন। এই কারণে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মূল ধারার সাথে একাত্ম হবার সিদ্ধান্ত নেন।[৭] এই সময় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে একচ্ছত্রভাবে আসীন হন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সন্তু লারমার নেতৃত্বে পুনর্গঠিত শান্তিবাহিনী নতুনভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্ষমতা সুসংহত করার পর সমগ্র ১৯৮০-এর দশকব্যাপী সন্তু লারমার শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহী কার্যকলাপের মাত্রা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনী, এবং সরকারি ও বাঙালি অসামরিক লোকজন বিভিন্নভাবে তাদের হামলার শিকার হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকারও মিশনারী কার্যক্রমের আড়ালে সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াতে থাকে।[৮] ফলে এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে। পার্বত্য জনগনের প্রবল সমর্থনের কারণে শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সময়কালে শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল আট হাজারের অধিক।[৯]

---

[২] নজরুল কবীর, *বিপ্লবী সন্তু লারমা*, পাঠসূত্র, ঢাকা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭।

[৩] সৈয়দ আবু রায়হান, *পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ, প্রকাশিতব্য পান্ডুলিপি*, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।

[৪] মাহফুজ পারভেজ, *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।

[৫] সৈয়দ আবু রায়হান, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা ঃ ৪৬; মাহফুজ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।

[৬] মাহফুজ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।

[৭] সৈয়দ আবু রায়হান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬।

[৮] মাহফুজ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮।

[৯] গোলাম মোর্তোজা, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-৩০।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার দ্বিচারি ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিকে তারা শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনার কথা বলে, অন্যদিকে পার্বত্য জনগণ ও শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানকে জোরদার করতে থাকে।

পাহাড়িদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ভূমি সমস্যা। ব্যাপক হারে বাঙালিদের পুনর্বাসনের কারণে তারা ভূমির অধিকার হারাতে থাকে। পাহাড়ি জনগণ আলোচনার মাধ্যমে ভূমি সমস্যা, জাতিগত স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ফলে তারা দাবি আদায়ে অর্থাৎ নিজস্ব জাতীয়তা ও স্বার্থ বজায় রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার পাহাড়িদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেনাবাহিনীর শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করে। সরকারি নিরাপত্তাবাহিনীর পাশাপাশি সেটলার বাঙালিদের একাংশ পাহাড়িদের ওপর নানা ধরনের হয়রানিমূলক আচরণসহ ও পাহাড়ি জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের দমন নির্যাতন চালায়। তারা পাহাড়িদের হত্যা ও মারধর করে, জমিজমা দখল করে নেয়, বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় ও পাহাড়ি নারীদের ধর্ষণ করে।

৪. ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড (১৯৮৪-১৯৯৭) [১০]

১। ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই মহালছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ হোসেনের নেতৃত্বে সৈন্যরা মহালছড়ি থানার খুলারাম পাড়া গ্রামের বিনোদ বিহারী খীসার বাড়ি আক্রমণ করে এবং ক্যাপ্টেন কর্তৃক খীসার স্ত্রী ধর্ষণের শিকার হন।

২। ১৯৮৫ সালের ২২ জুলাই রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু থানার তিন টিলার আর্মি ক্যাম্পের সেকেন্ড লেঃ মহসীনের নেতৃত্বে সৈন্যরা করালছড়ি গ্রামের নন্দী বালা চাকমা ও লিপিকা চাকমা এবং বড় আঠার ছড়া গ্রামের উজুনী চাকমা ও শান্তিবালা চাকমাকে ধর্ষণ ও তাদের অলংকার লুণ্ঠন করে।

৩। ১৯৮৫ সালের ১৬ আগষ্ট যক্ষা বাজার আর্মি ক্যাম্পের ৩০৫তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক সুবেদার তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে সৈন্যরা যক্ষা বাজারের দেবছড়ি গ্রামের জরিপ মোহন চাকমার বাড়িতে হামলা করে তার কন্যা জলঙ্গ রানীকে (১৬) পিতা-মাতার সম্মুখে গণধর্ষণ করে।

৪। ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ডের পর পাহাড়িরা ভারতের মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই শরণার্থীদের কিছু অংশ লঞ্চে করে দেশে আনার সময় ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি লঞ্চের কেবিনে বিডিআর-এর সদস্যরা গোরস্থান

[১০] বিপ্লব চাকমা, '*পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সন্ধানে*', পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৮৭।

গ্রামের নিরলতা চাকমা, লক্ষী মিতা চাকমা, সুরঙ্গ দেবী চাকমা এবং ভূষণছড়ার বিরস্বী চাকমাকে গণধর্ষণ করে।

৫। ১৯৮৬ সালের ১৭ মার্চ ৩০৫তম ব্রিগেডের ফকিরাছড়া আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যরা বরকল থানার সুবলং গুচ্ছগ্রামের হরিলাল চাকমার মেয়ে গুরিমিলা চাকমা (১৪) এবং হেঙগত্যা চাকমার মেয়ে মিলাসো চাকমাকে (১৫) ধর্ষণ ও পরে হত্যা করে।

৬। ১৯৮৬ সালের ৮ মে সেনাবাহিনী, বিডিয়ার, ভিডিপি ও বহিরাগত বাঙালিরা রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার লাল্যাঘোনা, তুলাবান, উগলছড়ি ও জীবঙ্গছড়া এলাকার গ্রামগুলোতে হামলা করে সম্পদ লুটপাট ও তাদের ব্যাপক নির্যাতন করে ঘর-বাড়ি এবং বৌদ্ধ বিহার আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এতে কমপক্ষে ১২জন ব্যক্তি ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হন। বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালিয়ে চারটি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস এবং বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাসর ভিক্ষুকে প্রচন্ড মারধর করে।

৭। ১৯৮৬ সালের ২৫ মে পানছড়ি থানার ভাইবোনছড়া আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যরা অপারেশনের নাম করে নিকটবর্তী পাহাড়ি গ্রামের বসতবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।

৮। নানিয়ারচর আর্মি ক্যাম্পের এক সেনা ইউনিট থেকে ১৯৮৬ সালের ২৯ জুন কাঠালতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সভায় পাহাড়িদের উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এতে গন্যমান্য পাহাড়িরা যোগ দিলে তাদেরকে শান্তিবাহিনীকে সহায়তা না করার জন্য বলে সভাশেষে ৬জন পাহাড়িকে আটক করা হয়। আটককৃত একজন বাঙ্গামুরার মুকুন্দ লালা চাকমা। তাকে নির্যাতনের পর ১০,০০০ টাকা নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ৫ জন হলেন,

(১) স্মৃতিময় দেওয়ান, পিতা- মাধবচন্দ্র দেওয়ান

(২) নির্মলেন্দু খীসা, পিতা- ইন্দ্র রাজ খীসা

(৩) অমরকান্তি দেওয়ান, পিতা- সহস্র দেওয়ান

(৪) ভূবন চন্দ্র চাকমা, পিতা- ধর্ম চরণ চাকমা ও

(৫) প্রবীন চন্দ্র চাকমা, পিতা- কুলেশ ধন চাকমা।

এরা প্রত্যেকেই কাঠালতলীর অধিবাসী। আটকের পর তাদেরকে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৯। ১৯৮৬ সালের ১ জুলাই হাতিমারা আর্মি ক্যাম্পের সৈন্য ও সেটলার বাঙালিরা মানিকছড়ির ধেপ্পুয়ার চিনি অং মারমার পুত্র পইসা'উ মারমা ও তার ছেলে মংমং মারমার বাড়িঘর লুটপাট করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

১০। ১৯৮৬ সালের ২ জুলাই মানিকছড়ি থানার ফকিরানলা মৌজার ৭০ বৎসর বয়স্ক মানি মারমাকে সেটলার বাঙালিরা জবাই করে হত্যা করে। একই দিনে বাঙালিরা হাতিমারা বাজারের দোকানদার পচঞ্চা মারমাকে (৭০) জবাই করে।

১১। ১৯৮৬ সালের ২ জুন ধেপ্পুয়া'র মং মারমার পুত্র অঙথুয়্যাঙ মারমা, অঙজ্যায় মারমা, চাইহ্লাপ্রু মারমা, সাথুই মারমা, হায়অঙ মারমা, এ্যারে মারমা, চাইলা মারমা, থয়অংঙ প্রু মারমা ও অঙ্যা মারমার গরু, বাছুর, ছাগল এবং অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

১২। ১৯৮৬ সালের ৩ জুলাই হাতিমারা ক্যাম্পের সৈন্য ওসেটলারবাঙালিরা হাফছড়ির ফকিরনলা মৌজার অংথুরী মারমার পুত্র ব্রেহ্লু মারমা, মজী মারমার পুত্র সাজেই মারমা, সাজেই মারমার পুত্র উগগ মারমা, মংমং সী মারমা, অংসী মারমা, থোয়াইচা মারমা, চিনি অং মারমার পুত্র জুসী মারমা, রুরা অং মারমার কন্যা এ্যানাই মগনী, মনেই মারমার পুত্র কংহ্লা প্রু মারমা, অক্কুয়া মারমার পুত্র কিয়াযাই মারমা, হ্লা চাই মারমা, রু খ্যা মারমার পুত্র পাইসু মারমাসহ অনেকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গবাদি পশু ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুটপাট করে।

১৩। ১৯৮৬ সালের ৩ জুলাই লক্ষীছড়ি থানার কালা অং মারমার স্ত্রী অপ্রুমা মারমা, চাইথং মারমার স্ত্রী মিশু প্রু মারমা, ও কিয়ো হ্লা প্রু মারমার ১৭ বৎসরের কন্যা মিনুপ্রু মারমাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়। একই দিনে সেটলার বাঙালিরা লক্ষিছড়ির কালাপানি গ্রামের উ হ্লা প্রু মারমার পুত্র থোয়াই হ্লা অং মারমা, থোয়াই হ্লা মারমার স্ত্রী উ চোঙমা মারমা ও হ্লা থোয়াই মারমাকে হত্যা করে লাশ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে এবং মস্তক বিহীন লাশ কালাপানি নদীতে ভাসিয়ে দেয়। একই দিনে গুইমারা গ্রামের জিয়ো চউ মারমা (৩১), উলুপ্রু মারমা (২৩) ও মঅংপ্রুকে (২৬) রামগড় থেকে আসার পথিমধ্যে নক-কাবা ব্রিজের নিকট সেটলার বাঙালিরা জবাই করে হত্যা করে এবং লাশগুলো নদীতে ফেলে দেয়।

১৪। ১৯৮৬ সালের ৪ জুলাই হাতিমারা আর্মি ক্যাম্পের সৈন্য ও সেটলার বাঙালিরা মানিকছড়ি থানার হাফছড়ির ফকিরনালা মৌজার অংয়্যাজাই মারমার পুত্র থোয়াং মারমা, মজী মারমার পুত্র সাথোয়াই মারমা, খ্যা প্রু মারমার পুত্র ক্যাজাই মারমা, রাস মারমার পুত্র কংচাইরী মারমা, অংজাই মারমা, পুতং মারমার পুত্র হ্লা ব্রে চাই মারমা, মং কিয়ো মারমার পুত্র অথোই মারমা, চাই হ্লা মারমার পুত্র অং প্রু মারমা, মং হ্লা মারমা, মং মারমার পুত্র উগ্রে মারমা, মং প্রু মারমার পুত্র মং মারমা, সাথু অং মারমার পুত্র মং হ্লা মারমা, অঙ্যা মারমার পুত্র হংচাই মারমা, নিদা অং মারমার পুত্র সাজেই মারমা, মংথোয়াই মারমার পুত্র উগে গ্রি মারমা, ক্যাজো মারমা প্রমুখ ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে বিভিন্ন সম্পত্তি লুটপাট করে।

১৫। ১৯৮৬ সালের ৯ জুলাই মেরুং থানার গুলছড়ি গ্রামের সুন্দর্যা চাকমার পুত্র বিনান্দ রাখাল চাকমাকে বাজার হতে বাড়িতে আসার পথে সেটলার বাঙালিরা অপহরণ করে। অদ্যাবধি তার কোন খোঁজ মেলেনি। একই দিনে সৈন্যরা কৃষ্ঠমোহন চাকমার পুত্র মোমেন্দ্র চাকমাকে তার বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। মোমেন্দ্র চাকমার বাড়ি ছিল দীঘিনালা থানায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই পানছড়ি থানার জীবনশ্বর পাড়ার ৬জন চাকমা নারীপুরুষকে বাজার হতে ফেরার পথে শনটিলার নিকট সেটলার বাঙালিরা পথরোধ করে। তাদের মধ্যে একমাত্র নারীকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৫জনকে হত্যা করে। আর উক্ত মহিলাকে গণধর্ষণ করার পর হত্যা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সময় এক সেটলার তাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করার জন্য তার বাড়িতে নিয়ে আসে। এখানে সেই আদিবাসী নারী সেটলারের পূর্বের স্ত্রীর সহায়তায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উক্ত ঘটনাটি জোনাল আর্মি কমান্ডারকে জানানো হলেরও এর কোন বিচার করা হয়নি।

১৭। ১৯৮৬ সালের ৮ আগষ্ট দূরছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সৈন্যরা রাঙ্গামাটি জেলার সিজক স্কুলের বীথিকা চাকমা (১৫) অষ্টম শ্রেণির, দিপ্তী চাকমা (১৫) নবম শ্রেণির, চিগন মিলা চাকমা (১৩) ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রি ও কালাবি চাকমা (১৮) নামের একজন গৃহকর্মীকে স্কুলে আসার পথে আটক করে সারারাত তাদের ধর্ষণ করে।

১৮। ১৯৮৬ সালের ৮ আগষ্ট হতে ১০ আগষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলার বাঙালিরা বাঘাইছড়ি থানার আমতলী, খাগড়াছড়ি, পাবলাখালী, খেদারমারা, উলুছড়ি, বটতলী প্রভৃতি গ্রামে হামলা চালিয়ে লুটতরাজ, নির্যাতন, ধর্ষণ ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের হত্যা করে।

(১) সূর্য কুমার খীসা (৮২)।
(২) মৃত্যাঞ্জয় চাকমা (১৬), পিতা-কালি কিংকর চাকমা।
(৩) তরুন কান্তি চাকমা (১২), পিতা-কান্তিময় চাকমা।
(৪) বিমল কান্তি চাকমা (৭২), পিতা-পামকুমার চাকমা।
(৫) ভাগ্য বাপ চাকমা (৫৫), পিতা-পরিমল চাকমা।
(৬) ভেলু মিলা চাকমা (১৬) তাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়।
(৭) রজনী কান্তি চাকমা, পিতা-কালা কুমার চাকমা।
(৮) সুমিতা দেবী চাকমা (১৮), পিতা-বাজাবাপ চাকমা, তাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়।
(৯) শুক্রমনি চাকমা, পিতা-রবি বরণ চাকমা।
(১০) কালো দেবী চাকমা (২২), পিতা-খুলারাম চাকমা, তাকে গণধর্ষণ করার পর হত্যা করা হয়।
(১১) বিরজা বালা চাকমা (৪৭), স্বামী- কালি কুমার চাকমা।
(১২) নিয়তি বালা চাকমা (২০), পিতা-কালি কুমার চাকমা, তাকেও ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়।
(১৩) সোনা চাকমা (১২) ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।
(১৪) বালা চাকমা, স্বামী- ফুলেস্বর চাকমা, তাকেও গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়।

১৯। ১৯৯০ সালের ১৯ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজবন বিহার হতে বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দানোৎসব হতে নৌকাযোগে ফেরার পথে রাঙ্গামাটি সদর থানার ১০৭ নং ও ১০৮ নং বড় আদাম মৌজার ১৪জন কিশোরী ও যুবতী, ১০জন যুবক, ২জন বৃদ্ধাকে ১০৪ নং ঝগড়াবিল মৌজার বিলাইছড়ির নিকট সেনাবাহিনীর ৬৫ পদাতিক ব্রিগেড ২১ বেঙ্গলের পেট্রোল ডিউটিরত সদস্যরা তাদের গতিরোধ করে।

তাদেরকে অমানুষিক নির্যাতনের পর ১৪জন কিশোরী ও যুবতীকে বন্দুকের নলের মুখে পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

২০। ১৯৯১ সালের ১০মে রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালি থানার ৯৮ নং কচুখালী মৌজার মিতিঙ্গাছড়ি গ্রাম ৫ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ কর্নেল দেলোয়ার হোসেন ও লেঃ আনিসের নেতৃত্বে আক্রমণ করা হয়। গ্রামবাসীদের ব্যাপক নির্যাতন ও বাড়িঘর ধ্বংস করে ১৭জনকে আটকের পর ঘাগড়া জোনাল হেড কোয়ার্টারে এনে আবার নির্যাতন করা হয়। এদের মধ্যে ১৫জনকে পরের দিন ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্রজ মোহন চাকমার পুত্র বাঁশীরাজ চাকমার (৩৯) অঙ্গহীন মৃতদেহ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অবশিষ্ট একজন সুরজ্যা চাকমার পুত্র পদ্মাবাশী চাকমার (৩৯) আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২১। ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি জোনের বাজারপাড়া আর্মি ক্যাম্পের ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক সেনা কর্মকর্তা মহালছড়ি থানার গরগজ্যাছড়ির মঅং মারমাকে হত্যা করে।

২২। ১৯৯২ সালের ২৭ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার উল্টাছড়ি ক্যাম্পের মেজর মিজান সাধুলাল চাকমা (১৮) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে।

২৩। ১৯৯২ সালের ৩০মে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলার বাঙালিরা রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী থানার ধুলুপাড়ার ৭জন পাহাড়ি ও একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে গুরুতর আহত করে এবং ৪০টি ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। একই দিনে বেতছড়ি গুনিয়াপাড়া আর্মি ক্যাম্পের ৮ম ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের মেজর মোর্শেদের নেতৃত্বে সৈন্যরা রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর থানার বেতছড়ি গ্রামের দজ্যা পাড়ায় হামলা চালিয়ে গ্রামবাসীদের নির্যাতন, সম্পদ লুটপাট ও বসতবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এছাড়াও উক্ত স্থানের ৭জন নারীকে ধর্ষণ করে।

২৪। ১৯৯২ সালের ১৫জুন লে. কর্নেল শাহাবউদ্দীনের নেতৃত্বে বাবুছড়া গুচ্ছগ্রামে হামলা চালিয়ে অমর কান্তি চাকমাকে গ্রেফতার করে এনে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

২৫। ১৯৯২ সালের ২৯ জুন নানিয়াচর জোনের হেডকোয়ার্টারের ৮ম ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে সৈন্যরা নানিয়ারচর থানার শঙ্খখোলা গ্রামের ৮০জন পাহাড়িকে আটক করে এবং ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী ১৩জন কিশোরীকে ধর্ষণ করে।

২৬। ১৯৯৩ সালের ১৮ এপ্রিল রাঙ্গামাটি কলেজের ছাত্র নীতিশ চাকমা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সঠিক বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় স্থানীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে অভিযোগ করতে গেলে মহালছড়ি ভিডিপির সদস্যরা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

১৯৯১ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯২ সালের জুন পর্যন্ত পাহাড়ি নারী ধর্ষণের সংখ্যা ৪৭। মনে করা হয় এ সংখ্যা বেশি হবে, কারণ অনেক নির্যাতিত নারীই তার নির্যাতনের বিষয়টি প্রকাশ করতে চান না বিধায় এর প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৯১ এবং ১৯৯৩ এর মধ্যে ধর্ষিতাদের মধ্যে শতকরা ৯৪ ভাগের বেশি ধর্ষিতা হয়েছেন বাঙালি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগের বেশি নারীর বয়স ১৮ বছরের নীচে। [১১]

৫. গণহত্যা (১৯৮৪-১৯৯৭)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদররা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে পাহাড়িদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য তাদের উপর যে গণহত্যা চালানো হয়, মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে তা এক অজানা অধ্যায়। বাঙালিদের পাশাপাশি যে আদিবাসীদের সংগ্রাম ও ত্যাগে ভাস্বর এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীনতার পরে সেই আদিবাসীদের উপরে অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যা চালানো হয় পাকিস্তানি কায়দায়। নীচে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটলার বাঙালিদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১. ভূষণছড়া গণহত্যা (৩১ মে ১৯৮৪)

ভারতের সীমান্তবর্তী শহর বারকল যার অবস্থান রাঙ্গামাটি শহরের ১৫ মাইল পূর্বে। ১৯৮১ সালে প্রায় ৫০০ বাঙালি পরিবারকে বারকাল উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন ঃ গোরস্থান, ভূষণছড়া এবং ছোটা হরিনা গ্রামে বসতি স্থাপন করানো হয়। বসতি স্থাপনকারী সেটলাররা বলেছিলেন যে, আদিবাসীদের তাদের ভূমি থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে আদিবাসী জনগণ আর্মি ক্যাম্পগুলোতে এ নিয়ে দীর্ঘদিন অভিযোগ জানিয়ে আসছিল যদিও তাদের অভিযোগ এর কোন প্রতিকার হয়নি। [১২]

১৯৮৪ সালের ৩১ মে সমকালে আদিবাসী জনগণের সাথে একত্রিত হয়ে শান্তি বাহিনী গোরস্থান, ভূষণছড়া এবং ছোটা হরিনা গ্রামের সেটলারদের উপর আক্রমণ করে। এতে প্রায় ১০০জন সেটলার মারা যায় এবং তাদের ঘরবাড়ি লুন্ঠন করা হয় এবং পুড়িয়ে দেয়া হয়। একই সাথে স্থানীয় তিনটি বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস) ক্যাম্প আক্রমণ করা হয়েছিল তাই তারা সেটলারদের সাহায্য করতে পারেনি। ভূষণছড়া গ্রাম সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেটলারদের উপর আক্রমণ বাংলাদেশী সংবাদ মিডিয়াগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন

---

[১১] Life Is Not Ours, The Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, পৃষ্ঠা ঃ ৯। আরও দেখুন Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৭-১৭৮।

[১২] Amnesty International, *Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts,* Amnesty International Publications, London, 1986, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

মুহম্মদ এরশাদ ৫ জুন ১৯৮৪ সালে আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। জুম্ম জনগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নিরাপত্তাবাহিনী খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। [১৩]

কিছু জুম্ম জনগণ উপরিক্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে দ্রুত তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বনে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছু তাদের গ্রামেই থেকে যায়। ৩১ মে সেটলারদের উপর আক্রমণের কিছু পরেই সেনাবাহিনীর ২৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩০৫ বিগ্রেড এবং বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ১৭ ব্যাটালিয়ন এর সদস্যদের সাথে সেটলারদের একত্রিত হয়ে আদিবাসী এলাকাগুলোতে আক্রমণ করে; এর মাঝে হাটবাড়িয়া, সুগুরিপাড়া, গোরস্থান, তারেনগাঘাট, ভূষণছড়া এবং ভূষণবাগ উল্লেখযোগ্য। [১৪]

এই হত্যাকাণ্ডের বেশ কয়েক মাস পর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আক্রান্ত আদিবাসীদের মাঝে ৬৭জন মৃত আদিবাসীর নামে তালিকা তৈরি করে যাদের মাঝে ২১ জন ছিলো শিশু যাদের বয়স ১০ বছরের নিচে। [১৫]
হাটবাড়িয়া গ্রামের একজন আদিবাসী তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন যে ঃ

> "আমার গ্রাম বরকল পুনর্বাসন জোনের মধ্যে পড়েছে যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক মুসলমানরা বসতি স্থাপন করে আসছিল। ফলে সেখানে দুই সম্প্রদায়ের মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। ১৯৮৪ সালে গ্রীষ্মের দিকে দুই সম্প্রদায়ের মাঝে বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল এবং মুসলমানরা প্রায় আমাদের এই বলে শাসাচ্ছিল যে, সেনাবাহিনী এসে আমাদের শিক্ষা দিয়ে যাবে। ৩১ শে মে মুসলমানদের একটি বড় গ্রুপসহ সেনাবাহিনী এসেছিল এবং যাদের মাঝে কিছু মুসলমান ছিল সশস্ত্র। তারা আমাদের গ্রামে ধ্বংস করেছিল। নারীদের ধর্ষণ করল এবং আদিবাসীদের হত্যা করল। আমি দেখেছিলাম দু'জন নারীকে ধর্ষণ করল এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করল। আমার দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন আরতিকে কয়েকজন সেনা মিলে ধর্ষণ এবং তার শরীরে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে বিকৃত করে ফেলেছিল। শিশুসহ অনেক মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিছু মানুষকে প্রকাশ্যে মারা হয়েছিল যার মাঝে আমি ছিলাম। আমরা পাঁচ ছয়জন ছিলাম যাদের গাছের ডালে উল্টো করে মারা হচ্ছিল। সম্ভবত আমাকে মৃত ভেবে ছেড়ে দিয়েছিল এবং এভাবেই আমি বেঁচে যাই। ঐ দিনের স্মৃতি এখন পর্যন্ত আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। নারীদের স্পর্শকাতর অংশে সৈন্যদের আঘাতের চিৎকার এর দৃশ্য স্মরণ করে আজো আমার মনে শীতল শিহরণ বয়ে যায়। তারা সকলে চিৎকার করছিল বাংলাদেশে আর কোন চাকমা জন্ম নেবে না (No Chakmas will be born in Bangladesh)।"[১৬]

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ৬৭জন মৃতের যে নামের তালিকা পেয়েছিল সেখানে আরতি চাকমার নাম ছিলো। তার বিবরণে বলা হয়েছিল যে, তার বয়স ছিলো ২২ বছর, বাস করত ২টি বাড়িয়াতে এবং ধারালো ছুরি দিয়ে তার স্তন

---

[১৩] ঐ।
[১৪] ঐ।
[১৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪।
[১৬] ঐ।

কেটে ফেলা হয়েছিল। ৬৭জনের মাঝে নারীর মৃতদেহ ছিল ১১টি যাদের প্রায় সবাই মৃত্যুবরণ করার আগে ধর্ষিত হয়েছিল এবং ৯জন দশ বছর বয়সের নীচের শিশু ছিলো।[১৭]

সুঘুরিপাড়া গ্রামের ২৫জন মৃত মানুষের মাঝে ১৭জন ছিল নারী এবং শিশু। শিশুদের সবাই ছিল পনের বছর বয়সের নীচে। সুঘুরিপাড়া গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী আদিবাসী বর্ণনা করেছেন যে-

> "সৈন্যরা গ্রামের অধিকাংশ নারীর স্পর্শকাতর অংশগুলোতে গুলি, বেয়নেট দিয়ে আঘাত করেছিল এবং তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়েছিল। গ্রামের অনেক মানুষকে তাদের ঘরের সাথে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমার বন্ধু সনাতকে অনেক আঘাত করেছিল এবং তাকে বারবার শান্তিবাহিনীর খবর জিজ্ঞাসা করছিল। যখন সে বলেছিল যে সে কিছু জানে না তখনই আরেকজন আদিবাসীকে গুলির মুখে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। গ্রামে অধিকাংশ মহিলাই ছিলো ধর্ষিত এবং আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না যে, আমরা কি করে বেঁচে গেলাম। আমি জানিনা কতজন মারা গিয়েছে তবে আমি ৩০ থেকে ৪০টি মৃতদেহ দেখেছিলাম যাদের মাঝে দশজন ছিলো ছোট্ট শিশু। অধিকাংশ শিশুকে রাইফেল দিয়ে গুলি করে শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।"[১৮]

সুঘুরিপাড়া গ্রামের মৃতদের মাঝে ছিলেন সনৎ কুমার চাকমা এবং তার ছেলে ভগবান চন্দ্র চাকমা যাদের দু'জনকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছিল।[১৯]

গোরস্থান গ্রামে মৃতের তালিকা ছিল নয়জনের। গোরস্থান গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছেন যে-

> "মে মাসের ৩০ তারিখ এর শেষ রাতের দিকে আমরা ভয়ংকার হট্টগোল শুনতে পেয়েছিলাম এবং ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিলাম কিন্তু পালিয়ে যাবার আগে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর একটি দল আমাদের গ্রামে এসেছিল এবং বাতাসে গুলি ছুড়তে ছুড়তে আমাদের নড়াচড়া করতে মানা করেছিল। এরপর কি হয়েছিল তা মনে করাটা যথেষ্ঠ ভয়ংকর, কারণ আমি হঠাৎ খেয়াল করলাম সেনাবাহিনী ঘরবাড়ির উপর এবং যেসব মানুষ দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে পালাতে শুরু করেছিল তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করল। আমার মনে হয়েছিল যে, সব শেষ হয়ে গেল। আমি দেখলাম অধিকাংশ মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই বলছিল যে, যারা মারা গিয়েছে তাদের মাঝে সাধনা মোহন এবং অক্ষয় ছিলো।"[২০]

---

[১৭] ঐ।

[১৮] ঐ।

[১৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪।

[২০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪-১৫।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, অক্ষয় ছান চাকমা, বয়স ছিল ২৫, বাবা ছিলেন শশী মোহন চাকমা যাকে তার বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আবার নিশি মোহন চাকমার ছেলে সাধনা মোহন চাকমা, যার বয়স ছিল ১৬, তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল।[২১]

৫.২. খাগড়াছড়ি-পানছড়ি গণহত্যা (১ মে ১৯৮৬)

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যা এবং এরই প্রেক্ষিতে শান্তিবাহিনীর বারবার আক্রমণের ফলে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি হয়ে ওঠে অশান্ত। এই অবস্থার অবসানের জন্য ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার ও শান্তিবাহিনীর মাঝে আলোচনার কথা থাকলেও সেই বৈঠক হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্যরা পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, নায়ারছড়ি, মহালছড়ি গ্রামগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। নায়ারছড়ি, মহালছড়ি গ্রামের 'যৌথ খামার' এর আদিবাসী মালিকদের জোর করে তাদের ভূমি থেকে উৎখাত করে দেয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে শান্তিবাহিনী ৮ই মে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোট গ্রহণে বাধা দেবার কথা ঘোষণা করে এবং আদিবাসীদের ভোট বয়কট করতে আহ্বান জানায়।[২২]

১৯৮৬ সালের ২ মে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকা রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল যে, "শান্তিবাহিনী ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে ভারতীয় সীমান্তের নিকট খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙায় বসবাসরত বাঙালিদের উপর আক্রমণ করেছিল এবং এতে ৩৮ জন বাঙালি নিহত হয়।" পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিশন ১৯৯১ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল সেখানেও তারা ১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল শান্তিবাহিনী কর্তৃক বাঙালি ও সেনাবাহিনীকে আক্রমণের কথা বলেছিল।[২৩]

অ্যামনেস্টি ইন্ট্যারন্যাশনাল এর তথ্যমতে, ভারতের ভগবানটিলা বর্ডারপোস্ট এর কাছে আশালং, ছোট আশালং এবং তাইডং এ অবস্থিত বিডিআর এর সীমান্ত ফাঁড়িতে শান্তিবাহিনীর তিনটি বড় গ্রুপ আক্রমণ করেছিল। একইসঙ্গে আদিবাসীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সেটলারদের আক্রমণ করেছিল। [২৪]

১৯৮৬ সালের ১লা মে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী এবং বাঙালিরা একসঙ্গে মিলে খাগড়াছড়ি-পানছড়ি এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে প্রবেশ করে এবং ডজনখানেক-এরও বেশি আদিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করে। অনুপ্রবেশকারী এসব গ্রামের মাঝে উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলো হলো- গোলকপ্রতিমাছড়া, কালানাল, ছোট কারমাপাড়া, শান্তিপুর, মিরঝিবিল, হিটারাছাড়া (বর্তমানে নাম খিদারছাড়া মুখপাড়া), পুজগাঙ, লাওগাঙ, হাতিমুখিপাড়া, সারভেশ্বরপাড়া,

---

[২১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

[২২] ঐ।

[২৩] Life Is Not Ours, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।

[২৪] Amnesty International, *Unlawful Killings And Torture In The Chittagong Hill Tracts*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নাপিদাপাড়া এবং দেওয়ান বাজার ছয়টি গ্রামের বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী থেকে ১৬ জন মৃত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।[২৫] যদিও অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আরও অনেক মৃতদেহ দেখার কথা বলেছেন তবে তারা সেই মৃতব্যক্তিকে সঠিকভাবে সনাক্ত কিংবা মৃত্যুর যথাযথ কারণ বর্ণনা করতে পারেননি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুযায়ী উপরিউক্ত ১৬ জন মৃতব্যক্তি ছাড়াও এই ঘটনায় আরও ২৩ জন মৃত ব্যক্তির নাম বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ৫০জন আদিবাসীর বর্ণনা থেকে যে মৃতের তালিকা করেছে সেখানেও এই ২৩ জন মৃত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। [২৬] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর তালিকা থেকে প্রাপ্ত নিহত ব্যক্তিবৃন্দের নাম নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

সারণি ১০ ঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বাঙালি সেটলার কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের নাম[২৭]

ক্রমিক নং	ইাম	গ্রাম	বয়স/বর্ণনা
১.	রত্না কান্তি চাকমা	হিতারাছড়া	৩৫ বছর
২.	পূর্নজয়তি চাকমা	হিতারাছড়া	১০ বছর (রত্না কান্তির ছেলে)
৩.	শিরিনগা চাকমা	হিতারাছড়া	
৪.	বৃদ্ধিজয়তি চাকমা	হিতারাছড়া	শিরিনগা চাকমার ছেলে
৫.	নয়ন জয়াতি চাকমা	হিতারাছড়া	শিরিনগা চাকমার ছেলে
৬.	সতীশচন্দ্র চাকমা	হিতারাছড়া	শিরিনগা চাকমার ছেলে
৭.	সুশীলা চাকমা	হিতারাছড়া	৫০ বছর
৮.	প্রভাদু চাকমা	হিতারাছড়া	৫৫ বছর
৯.	লেবি চাকমা	হিতারাছড়া	৬৮ বছর
১০.	দুশারি চাকমা	হিতারাছড়া	
১১.	দুশারি চাকমার ছেলের বউ	হিতারাছড়া	
১২.	দুশারি চাকমার ছয় বছর বয়সী নাতি	হিতারাছড়া	
১৩.	দুশারি চাকমার তিন বছর বয়সী নাতি	হিতারাছড়া	
১৪.	বানা কুমার চাকমা	শান্তিপুর, পানছড়ির নিকটে	
১৫.	গ্রাম প্রধানের বউ	ঐ	

[২৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।
[২৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।
[২৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭।

১৬.	মালতি চাকমা	শান্তিপুর	গ্রাম প্রধানের মেয়ে
১৭.	বানা শোভা চাকমা	শান্তিপুর	গ্রাম প্রধানের ছেলের বউ
১৮.	মালা বিরানি চাকমা	পুজগাং	
১৯.	মালা বিরানি চাকমার এক বছর বয়সী শিশু	পুজগাং	
২০.	আনন্দ মোহন চাকমার ছেলে	পুজগাং	
২১.	রচনা চাকমা	পুজগাং	১২ বছর
২২.	ত্রিভুজা চাকমা	পুজগাং	৩০ বছর
২৩.	ফুলরঞ্জন চাকমা	পানছড়ি পাইলট ফার্ম	১২ বছর
২৪.	মদন কারবারি চাকমা	মদন কারবারি	গ্রাম প্রধান

সূত্রঃ Amnesty International, *Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts,* Amnesty International Publications, London, 1986, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭।

খাগড়াছড়ি-পানছড়ি গণহত্যায় কয়েকজন সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিল কিছু গ্রামবাসী পরবর্তীতে তাদের চিহ্নিত করেছিল। অপর একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল পানছড়ি আর্মি এলাকার ১৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সদস্য।[২৮]

প্রত্যক্ষদর্শী, মিরঝিবিল গ্রামের ৭০ বছর বয়সী একজন আদিবাসী নারীর বর্ণনা মতে ঃ [২৯]

> "যখনই আমাদের গ্রামে সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করেছিল, গ্রামবাসী সকলে চিৎকার করে একে অপরকে গ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে বলছিল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কিছু বুঝে উঠার আগেই সেনাবাহিনী এবং আনসার বাহিনী চলে এসেছিল। তারা শতকেরও বেশি মুসলমান সেটলারদের সাথে এনেছিল ... তারা খুব দ্রুত গ্রামে লুন্ঠন শুরু করেছিল। সৈন্যরা পুরুষ এবং নারীদের প্রত্যেককে আলাদা করে দাঁড়াতে বলেছিল...'
> 'ফইদেবী নামের একজন বৃদ্ধা যিনি ঠিকভাবে উঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে পারছিল না, তাকে একজন সৈন্য খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেছিল।"

অন্যায়ভাবে ফইদেবীকে হত্যার ঘটনা মিরঝিবিল গ্রামের আরও অনেকে বর্ণনা করেছিলেন।

ভারতীয় সীমান্তের কাছে অবস্থিত দেওয়ান বাজার গ্রামের একজন আদিবাসী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্বিচারে গুলি করার বর্ণনা করে বলেছেন যে ঃ[৩০]

[২৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।
[২৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।
[৩০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।

"২রা মে সকালবেলা একদল সেনাবাহিনী ও আনসার বাহিনী আমাদের গ্রামে আক্রমণ করেছিল। সেই সময়টা ছিল ভয়ংকার এবং উত্তেজনাপূর্ণ। কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল কিন্তু অধিকাংশই গ্রামে ছিলো। অফিসার-ইন-চার্জ সম্ভবত ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন, যিনি সবাইকে বাইরে একত্রিত করেছিলেন। সকল গ্রামবাসী একত্রিত হবার পর সেনাবাহিনী রাইফেল বাট দিয়ে সকলকে মারতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে মুসলমানরা আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। হঠাৎ করে সেনাবাহিনী আমাদের উপর গুলি করতে শুরু করতে শুরু করেছিল এবং আমরা সকলে দৌড়াতে শুরু করলাম। আমি দেখেছিলাম তিন বা চারজন মানুষ পড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তারা কারা তা দেখার মতো মানসিক অবস্থায় আমি তখন ছিলাম না।"

দেওয়ান বাজার গ্রামের অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ঐ দিন আক্রমণে কমপক্ষে চারজন মারা গিয়েছিল। তিনি অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, শান্তিবাহিনীকে সহায়তা করার অপরাধে সেনাবাহিনী সকলকে একত্রিত করে মারতে শুরু করেছিল এবং কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ করে গুলি করা শুরু করেছিল। সে তার সামনে কমপক্ষে চারজন ব্যক্তিকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু দ্রুত পালিয়ে যাবার কারণে কাউকে চিনতে পারেনি। [৩১]

কালানাল এ অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু আদিবাসীদের উপর সেনাবাহিনীর অবিরত হয়রানি বর্ণনা করে বলেছেন যে,

"বিগত কয়েকমাস ধরে সৈন্যরা নিয়মিত মন্দিরে এসে গরু জবাই করত ... তারা সব সময়ই বলত যে, যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ না করি তবে তারা একদিন এসে আমাদের সকলকে হত্যা করবে। '

'১লা মে সকালবেলা দুই থেকে তিন শতাধিক সেটলারদের সাথে নিয়ে সেনাবাহিনী এসেছিল। এদের মাঝে অনেক সেটলার গার্ডদের মতো পোশাক পড়েছিল। কিছুক্ষণের মাঝেই তারা বৌদ্ধ বিহার আক্রমণের মধ্য দিয়ে লুন্ঠন শুরু করল। আমাদের অধিকাংশই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু সৈন্যরা পূর্নেন্দু নামে একজন ভিক্ষুকে ধরে ফেলল। তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে কিছুক্ষণ আঘাত করার পর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা তাকে জ্বলন্ত মন্দিরে ছুড়ে ফেলেছিল এবং তিনি সেখানে মারা গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন আমি গ্রামের অন্যান্য মানুষের সাথে দেখা করলাম তখন তারা আমাকে জানালো যে, গ্রামের দু'জন মেয়েকে সৈন্যরা ও মুসলমানরা নির্দয়ভাবে ধর্ষণ করে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।"

কালানাল গ্রামের অন্য আদিবাসীরাও বৌদ্ধ ভিক্ষুর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছিল। তাদের বর্ণনায় তারা কখনোই বলেনি যে, তাদের অনেক লোক মারা গিয়েছিল। [৩২]

পানছড়ি গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারি বুকতিধর চাকমা এবং ৮০ বছর বয়সী রূপবতী চাকমার (মতিলাল এর মা) মৃত্যু বর্ণনা করে পানছড়ি গ্রামের আদিবাসীরা বলেন যে ঃ

[৩১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২০।

[৩২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২০।

"১লা মে ১০০ জনের মতো মুসলিম সেটলারকে সাথে নিয়ে একদল বিডিআর সৈন্য আমাদের আক্রমণ করেছিল। সেটলারদের অনেকে ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলো এবং ট্রাকে চড়ে এসেছিল। সৈন্যরা ভয় দেখানোর জন্য বাতাসে গুলি ছুঁড়ছিল এবং অফিসার চিৎকার করে বলছিল যে, শান্তিবাহিনীকে সমর্থনকারী কুকুরদের মারতে তিনি এখানে এসেছেন। সৈন্যরা আদিবাসীদের ঘিরে রেখেছিল এবং অফিসার মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিল আদিবাসীদের হত্যার। আমি নিজে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী ঃ[৩৩]

১. মতিলালের মা
২. সিরার মাতা পিতা (ধারণা করা হয় তাদের নাম রমেশ চন্দ্র এবং চন্দ্রলেখা)
৩. বুকতিধার
৪. সাংঘা শর্মার মাতা পিতা

এরা ছাড়াও আমি নিশ্চিত যে, গ্রামে আরও অনেককে তারা মেরে ফেলেছে, কিন্তু সেগুলো দেখার মতো শক্তি ও সাহস আমার ছিলো না।"

ছোট কারমাপারা গ্রামের একজন নারী যিনি একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলেন তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে ঃ [৩৪]

"... যখন সৈন্যরা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করেছিল তখন মনে হয়েছিল যে আজকেই পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা ক্রমাগত অধিবাসীদের গুলি করছিল এবং আমি সাতজন ব্যক্তির মৃত্যু দেখেছিলাম যাদের মাঝে ছিলো বুকতিধার। মতিলালের মা এবং এই মেয়েটির মাতা পিতা যাদের নাম ছিল নির্মল এবং নাকরি চাকমা। তাদের গুলি করে মারা হয়েছিল যা মেয়েটি দেখেছিল। আমি সেই সময় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিলাম।"

১/২ মে এর ঘটনা সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণনা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংগ্রহ করেছে। তাদের বর্ণনানুযায়ী হিটারাছাড়া গ্রামে ২০জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। তার মাঝে ১৩জন ব্যক্তির নামসহ বিবরণ তারা প্রকাশ করেছে। এছাড়া গোলকপ্রতিমা ছাড়া গ্রামে ৪৫ বছর বয়সী সুরযাবালা নামে এক নারী মারা গিয়েছিল যার কথা বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেছিল।

অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৭ই মে পর্যন্ত পানছড়ি এলাকায় তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিল। একই দিনে তারা পুজগাঙ ও লাওগাঙ আক্রমণ করেছিল। পুজগাঙ গ্রামের একজন স্কুল শিক্ষক এই গ্রামের ৭জন মানুষ মারা যাবার কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

"৭ই মে একজন ক্যাপ্টেনের অধীনে সেনাবাহিনী ও মুসলিম সেটলাররা সকল ধরনের অস্ত্রসহ আমাদের গ্রামে অনুপ্রবেশ করেছিল। সেনাবাহিনীর অফিসার আমাদের সবাইকে শাসাচ্ছিল যে, যদি আমরা শান্তি

[৩৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২১।
[৩৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২১।

বাহিনী কোথায় লুকিয়ে আছে তা বলে না দেই তবে আমাদের পুরো গ্রাম পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আমরা কিছুই বলিনি। এই অবস্থায় সেনাবাহিনীর অফিসার তার সৈন্যদের বললেন যে, তরুণ ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা করতে। খুবই দ্রুত সৈন্য ও মুসলিম সেটলাররা মেয়েদের ধরে ফেলল। ১৫ কিংবা ১৬ বছর বয়সী মেয়ে মিনা চাকমা যে পুজগাঙ মডেল মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী ছিল, তাকে পুরো গ্রামের সামনে ধর্ষণ করে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করেছিল। এর কিছুক্ষণ পর সৈন্যরা এলোপাথাড়ি গুলি করে সকলকে মেরে ফেলতে লাগল। যদিও আমি গ্রাম থেকে সেইসময় পালিয়ে যাচ্ছিলাম তবুও আমি সাতজনের মৃত্যু দেখেছিলাম যাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবে চিনতে পেরেছিলাম। তারা হলো ঃ

১. কমলাকান্ত চাকমা
২. জীবনবাবু চাকমা
৩. লক্ষণবিকাশ চাকমা
৪. মিসেস কিওধোয়ানী, কালিয়া চাকমার বউ
৫. অনিতা চাকমা
৬. ধাউরমানি চাকমা।”

লাওগাঙ গ্রামের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে, তিনি পালিয়ে আসার সময় কমপক্ষে ২০জনের মৃতদেহ দেখেছিলেন। তিনি নিজের পরিবারে সাতজন সদস্যকে হারিয়েছিলেন।[৩৫]

১৯৮৬ সালের ৭ই মে ভারতীয় সংবাদপত্র “দ্য টেলিগ্রাফ” রিপোর্ট করেছিল যে, ৬ই মে এর অফিসিয়াল তথ্যমতে ২৯ শে এপ্রিল এর পর থেকে প্রায় ৮,০০০ আদিবাসী শরণার্থী বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সীমান্ত পার হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে চলে এসেছে। [৩৬]

৫.৩ মাটিরাঙা গণহত্যা (মে ১৯৮৬)

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বিভিন্ন গণহত্যার কারণে আদিবাসীদের একটি বড় অংশ শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষত ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। খাগড়াছড়ি-পানছড়ি গণহত্যার ফলে আক্রান্ত এলাকা থেকে অনেক আদিবাসী প্রথমে বিভিন্ন বনে আশ্রয় নিয়েছিলো। মে মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে বিভিন্ন গ্রামের পালিয়ে থাকা কয়েক শতাধিক আদিবাসী মাটিরাঙা এলাকার মানুদাসপাড়া এবং সর্বেশ্বরপাড়া গ্রামের মধ্যবর্তী জায়গায় মিলিত হয়েছিলো। কোন এক রাত্রিতে (সঠিক তারিখ জানা যায়নি, সম্ভবত মে মাসের ১ বা ২ তারিখের দিকে) তারা যখন ভারতের সীমান্তের দিকে যাবার চেষ্টা করছিল তখন তারা সৈন্যদের দ্বারা অ্যামবুশের শিকার হয়। কোন ধরনের উত্তেজনা এবং সতর্কতা ছাড়াই সৈন্যরা আদিবাসীদের উপর এলোমেলোভাবে গুলি করা শুরু করেছিল। এতে ৫০

[৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২১-২২।
[৩৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২২।

এরও অধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। [৩৭] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই মৃত মানুষের মধ্য থেকে পরিচয়সহ ১৫ জন মানুষের নিম্নোক্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ঃ

সারণি ১১ ঃ মাটিরাঙা গণহত্যায় নিহতদের তালিকা [৩৮]

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	গ্রাম
১.	বীরপাডা চাকমা	৬৪ বছর	পূর্ব খাগড়াছড়ি
২.	মিসেস লতাবি চাকমা	৬৫ বছর	গোলকপ্রতিমাছড়া
৩.	প্রভু বিকাশ চাকমা	৫৬ বছর	জগাপাড়া
৪.	তরু চাকমা	৫৬ বছর	জগাপাড়া
৫.	মিসেস কুলি চাকমা	৩২ বছর	লতিবান
৬.	মেঘবন্ধু চাকমা	৫৬ বছর	লতিবান
৭.	মিসেস উর্মিলা চাকমা	৩৬ বছর	লতিবান
৮.	অক্ষয় চাকমা	৫৮ বছর	পানখাবাড়ি
৯.	কৃতি বিকাশ চাকমা	৬৬ বছর	পানখাবাড়ি
১০.	শক্তিময় চাকমা	৪২ বছর	পানখাবাড়ি
১১.	উশাম্পি দেওয়ান	৭৪ বছর	পানখাবাড়ি
১২.	মিসেস কামালিনি চাকমা	৩৯ বছর	শান্তিপুর
১৩.	ক্ষেত্রাময় চাকমা	৪৯ বছর	শান্তিপুর
১৪.	রাখালমণি চাকমা	৯১ বছর	শান্তিপুর
১৫.	নবীন বিকাশ চাকমা	৭৪ বছর	তারাবানিয়া

সূত্রঃ Amnesty International, *Unlawful Killings and Torture in the Chittagong Hill Tracts,* Amnesty International Publications, London, 1986, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।

১লা মে বিডিআর এবং সেটলারদের আক্রমণ থেকে পালিয়ে যাওয়া সারভেশ্বরপাড়া গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী আদিবাসী বর্ণনা করেছেন যে ঃ [৩৯]

[৩৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৩।
[৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।
[৩৯] ঐ।

"... আমরা জঙ্গলে রাত পর্যন্ত সেখানে লুকিয়ে ছিলাম। সেখানে আমরা পালিয়ে আসা শতাধিক চাকমার সাথে মিলিত হয়েছিলাম। এক রাত্রে আমরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ভারতে যাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সেসময় পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল আমরা কোন পথে যাব তা অনেক আগেই কেউ সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং তারা খোলা মাঠে সশস্ত্র হয়েই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখামাত্রই তারা গুলি করতে শুরু করেছিল। অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল এবং আমি দেখলাম অনেকে আমার পাশে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি দৌড়াতেই থাকলাম। কতজন মারা গিয়েছে তা দেখার কোন সময় ছিল না। কিন্তু এটা মনে হচ্ছিল আমার গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বেঁচে গিয়েছিল।"

উপরোক্ত ব্যক্তির বর্ণনা এবং আরও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য থেকে ধারণা করা হয় অটোমেটিক অস্ত্র সম্ভবত সেটি ছিলো লাইট মেশিনগান (Light Machine Gun) যেটি থেকে গুলি করা হয়েছিল। [40]

অন্য একজন গ্রামবাসীর বর্ণনামতে ঃ [৪১]

"... আমরা সেনাবাহিনীর অ্যামবুশের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম, তারা আমাদের জন্য বড় বড় গুলি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম এবং বুলেটের বৃষ্টি হচ্ছিল। যদিও আমি খুব ভাগ্যবানের মতো দৌড়ে বেঁচেছি তবে আমি দেখেছি মানুষের গুলি লেগেছিল।"

লাওগাঙ গ্রামের একজন আদিবাসী, যিনি অ্যামবুশের সময় ছিলেন না, কিন্তু পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থান পরিদর্শন করেছিলেন তার বর্ণনা মতে,

"যখন আমি ভারত যাচ্ছিলাম পথিমধ্যে মানুদাসপাড়া গ্রামের কাছে আসলে অনেকে আমাকে বলেছিল যে, সেনাবাহিনী অনেক চাকমাকে অ্যামবুশ করে হত্যা করেছে। আমি অ্যামবুশ স্থানে গিয়েছিলাম, দূর থেকে এক পলক দেখেছিলাম এবং ৫২টি মৃতদেহ গণনা করেছিলাম।"[৪২]

রাজকুমারী চন্দ্রা রায় তার গ্রন্থে মাটিরাঙা গণহত্যা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৮১ সালে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা আক্রমণ করে প্রায় ৫০০জন আদিবাসীকে হত্যা করেছিল এবং ১৯৮৬ সালের এপ্রিলের পর থেকে আরও অনেক আক্রমণ হয় যাতে আদিবাসী নিহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। [৪৩]

৫.৪ কুমিল্লাটিল্লা-তাইদং গণহত্যা (১৮-১৯ মে, ১৯৮৬)

মাটিরাঙা গণহত্যার পর আদিবাসী জনগণের একটি বড় অংশ সম্ভবত তাদের সংখ্যা ২০০ এর বেশি, তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। পালিয়ে যাওয়া আদিবাসীরা ছিলো ত্রিপুরা জাতি। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা ভারতীয়

---

৪০ ঐ।

৪১ ঐ।

৪২ ঐ।

৪৩ Rajkumari Chandra Roy, , *Land Rights of the Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,* Published by: International Work Group for Indigenous Affairs, Denmark, 2000, পৃষ্ঠা ঃ ১২২।

সীমান্তের নিকটবর্তী দক্ষিণ ত্রিপুরার শিলাচর এ পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এই এলাকায় তাদের অবস্থান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মূলত বিডিআর এর ৩১ ব্যাটালিয়ন জেনে যায়। সৈন্যরা আদিবাসীদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং কুমিল্লাটিলা ও তাইদং গ্রামের মধ্যমর্তী সরু উপত্যকা দিয়ে তাদের হাঁটতে বাধ্য করে। উপত্যকার সীমাবদ্ধ স্থানে এনে সৈন্যরা সকলের উপর এলোমেলোভাবে গুলি করতে শুরু করে এবং অসংখ্য মানুষকে মেরে ফেলে। একসময় গুলি থেমে গেলে কিছু সংখ্যক বাঙালি আদিবাসী দলটির উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কতজন মারা গিয়েছিল তা সঠিক করে বলা না গেলেও আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে যে, এতে কয়েক ডজন আদিবাসী মৃত্যুবরণ করেছিল। [৪৪]

মাটিরাঙা এলাকার একজন চাকমা আদিবাসী তার পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে ঃ

> “বাংলাদেশী সেনাবাহিনী ক্রমাগত আক্রমণ করে যখন বিভিন্ন গ্রামবাসীকে মেরে ফেলছিল তখন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫২ টি পরিবারের একটি দল হয়ে আমরা মাটিরাঙা ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু আমরা অন্যান্য চাকমাদের মতো সৌভাগ্যবান ছিলাম না, আমরা বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর ছোট একটা দলের হাতে ধরা পড়ে যাই। যদিও আমরা সেনাবাহিনীর এই দলটার হাত থেকে পালিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলাম তবুও আমাদের তারা পরবর্তীতে ধরতে সক্ষম হয়েছিল।’[৪৫]
>
> ‘যেহেতু সেনাবাহিনী আমাদের অনুসরণ করছিল তাই আমরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম। ১৯শে মে যখন ভারতের সীমান্ত খুব কাছে মনে হলো তখন মনে হয়েছিল যে আমরা সফল হয়েছি। কিন্তু এই অবস্থায় বিডিআর এর ৩১ ব্যাটালিয়ন এর কাছে আমরা ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। ’
>
> ‘আমাদের পালানোর কোন সুযোগ ছিল না। সেনাদল আমাদের খুব কাছাকাছি হয়ে প্রত্যেককে একসাথে দাঁড়াতে বলেছিল। তারা আমাদের ঘিরে রেখেছিল এবং কুমিল্লাটিলা ও তাইডং গ্রামের মাঝে অবস্থিত সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে মার্চ করে যেতে বাধ্য করেছিল। ’
>
> ‘যখনই পুরো গ্রুপ উপত্যকার মাঝে ঢুকে গিয়েছিল ঠিক তখনই সেনাদল হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের চারপাশে অবস্থান নিল এবং এলোমেলোভাবে গুলি করতে শুরু করল। হঠাৎ করে আমরা সকলে চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম এবং সবর্ত্র মানুষ মারা যেতে শুরু করেছিল। আকস্মিক এই আক্রমণের ধাক্কা সামলিয়ে উঠার আগেই হঠাৎ শতকের বেশি মুসলমান যারা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের কাছে লুকিয়ে ছিল তারা আমাদের উপর আক্রমণ করল। আমার হিসাব মতে প্রায় ২০০ লোক মারা গিয়েছিল যারা আমাদের অর্ধেকের বেশি ছিল। আমি তাদের অধিকাংশের নামই বলতে পারব না কারণ তারা অনেক ছিল। তাদের মাঝে ছিলো রামচরণ ত্রিপুরা, ঘনশ্যাম ত্রিপুরা, তার বউ এবং চার সন্তান, মিনতি চাকমা এবং তার স্বামী, পার্বতী, কৌশল্যা ত্রিপুরা এবং আরও অনেকে। সেনাবাহিনী শিলাবৃষ্টির মতো ক্রমাগত অটোমেটিক অস্ত্র দ্বারা গুলি করছিল। আমরা

[৪৪] Amnesty International, *Unlawful Killings And Torture In The Chittagong Hill Tracts*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৪।

[৪৫] ঐ।

যারা ঐখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম তারা জঙ্গলে গিয়ে পুনরায় দলবদ্ধ হয়ে মরিয়াভাবে ভারতের সীমান্তের কাছে গিয়েছিলাম।"[৪৬]

একজন ত্রিপুরী আদিবাসী সেনাদের যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"আমি হলাম একটি বড় ত্রিপুরী আদিবাসী কলোনীর প্রধান এবং আমরা মাটিবাজার একটু বাইরে বাস করি। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এবং মে মাসের প্রথম দিকে যখন শান্তিবাহিনী বিডিআর, সেনাবাহিনী এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল তখন সেনাবাহিনী আমাদের এখানে নিয়মিত আসছিল এবং আমাদের বিরক্ত করছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম যে, আমরা এমনকি চাকমাও নই এবং শান্তিবাহিনীর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা আমাদের বিরক্ত করতেই থাকে। পরবর্তীতে ৮ই মে তারা শক্তি সামর্থ্যসহ আসে এবং আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। অফিসার ইন-চার্জ আমাদের বলে যে, হিন্দুদের বাংলাদেশে কোন জায়গা নেই। তোমরা পালিয়ে অন্যত্র চলে যাও। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী চাকমা পরিবারের সাথে আমরা পালিয়ে যাব। কিন্তু সৈন্যরা আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে পালিয়ে যেতেও দিচ্ছিলনা। তারা আমাদের ধাওয়া করছিল এবং আমরা দিনের বেলা বনে লুকিয়ে থাকতাম এবং রাতে ধীরে ধীরে এগুতাম।'

'গত রোববার (১৮ই মে) যখন আমরা সীমান্তের নিকটবর্তী ছিলাম তখন আমরা সেনাদের বড়দলের কাছে ধরা পড়ে ছিলাম। অফিসার আমাদের বলেছিল যে, আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হবে এবং আমরা আবার বসতি স্থাপন করতে পারব। তিনি আমাদের ফেরত যেতে বলেছিলেন। সেনারা আমাদের ঘিরে রেখেছিল।'

'তারা আমাদের তাইডং এবং কুমিল্লাটিলা গ্রামের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল এবং হঠাৎ আমরা হাজারেরও বেশি বুলেটের শব্দ এবং মানুষের আর্তনাদ শুনতে পাই। কমপক্ষে ২০০ মানুষ প্রধানত ত্রিপুরা আদিবাসীরা মারা গিয়েছিল। আমার পরিবারের কোন খবর আমি জানতাম না। আমি জানতাম না তারা কোথাও লুকিয়ে ছিল কিনা কিংবা মারা গিয়েছে কিনা। বুলেট চারদিক থেকে বৃষ্টির মতো ঝরছিল এবং একই সাথে মুসলমানরা উপত্যকায় এসে তলোয়ার, বর্শা, এবং ছুরি দিয়ে আদিবাসীদের হত্যা করছিল এবং নারীদের ধর্ষণ করছিল। আমরা আমাদের জীবন বাঁচাতে ভারতের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছিলাম।"[৪৭]

৫.৫ হিরাছড়ি-শরবতালি-খাগড়াছড়ি-পাবলাখালি গণহত্যা (৮-১০ আগস্ট ১৯৮৮)

বাংলাদেশী সেনাবাহিনী এবং বাঙালি সেটেলাররা ১৯৮৮ সালের ৮, ৯, এবং ১০ই আগষ্ট হিরাছড়ি, শরবতালি, খাগড়াছড়ি ও পাবলাখালি এরাকায় কয়েকশত জুম্ম মানুষকে হত্যা করেছিল। যদিও সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে সংখ্যাটা অনুমান করা হয়েছে। অনেক নারীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল। [৪৮]

---

[৪৬] ঐ।

[৪৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৫।

[৪৮] Massacres in the CHT, Report of Human Rights Congress for Bangladesh Minorities, published byCommittee for International Campaign, 2008.

শান্তি বাহিনীর এক অর্তকিত হামলায় সেনাবাহিনীর ৭জন সদস্য নিহত এবং বেশকিছু সংখ্যক সদস্য আহত হওয়ার পরপরই সেনাবাহিনী ও সেটলাররা খাগড়াছড়ি এবং আদিবাসী গ্রামগুলোতে হামলা চালায়। সরকারী ভাষ্যমতে, এতে কিছু সংখ্যক আদিবাসী হতাহত হয় এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ আদিবাসী প্বার্শবর্তী গ্রামে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালিয়ে আসা আদিবাসীদের মতে, শান্তি বাহিনীর হামলায় সেনাবাহিনীর সদস্যের নিহতের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নিকটস্থ সেনাছাউনির সদস্যরা খাগড়াছড়ি ও পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রামগুলোতে হামলা চালিয়ে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলকে গুলি করে হত্যা করে। এতে সেটলাররা সেনাবাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। আদিবাসীদের হিসাব মতে, এই যৌথ হামলায় শতাধিক আদিবাসী নারী-পুরুষ নিহত হয়েছিল। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব লক্ষীকুমার চাকমা ঐদিন পরিষদের কয়েকজন বাঙালি কর্মচারী দ্বারা প্রহৃত হয়েছিলেন। [৪৯]

৫.৬ লংগদু গণহত্যা (৪ মে ১৯৮৯)

লংগদু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর সরকারের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৯ সালের ৪ মে সন্ধ্যায় উপজেলা সদরে এবং পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রামে বাঙালিসেটলাররা হামলা চালিয়েছিল। ভিডিপি সদস্যরা থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে এই হামলার নেতৃত্ব দেয়। [৫০]

বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতা আব্দুর রশীদ অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ এবং বাঙালি সেটলাররা সন্দেহ করেছিল যে, এই আততায়ী শান্তিবাহিনীর লোক ছিল। কারণ আব্দুর রশীদ আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধে সবসময় সহায়তা ও সমর্থন করতো। যদিও শান্তিবাহিনী এই অভিযোগ অস্বীকার করছিলো। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ স্বরূপ বাংলাদেশী সেনাবাহিনী, গ্রামপ্রতিরক্ষা পার্টি (সেনাবাহিনী বাঙালি সেটলারদের দিয়ে এই পার্টি গঠন করেছিল) এবং সেটলাররা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। ৪০জন আদিবাসীকে হত্যা করেছিল যাদের মৃতদেহ পরিবারকে কখনোই ফিরে দেওয়া হয়নি এবং এতে প্রায় ১৩,০০০ আদিবাসী ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। [৫১] তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এই এলাকার বৌদ্ধ মন্দিরগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্থানীয় কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মি. অনিল বিহারী চাকমার ভূমি জোর করে দখল করেছিল এবং তার বাড়িঘরের চারপাশে বাঙালি সেটলারদের বসতি স্থাপন করেছিল। মি.অনিল বিহারী চাকমার বন্ধুরা এবং আত্মীয় স্বজনরা তাকে সবসময় সতর্ক করে বলেছিল যে, বাঙালি সেটলারদের এতো কাছে বাস করার অর্থ হলো

---

[৪৯] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, স্থানীয় সরকার পরিষদ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮।

[৫০] ঐ।

[৫১] Bina D' Costa, (2012) Edward Aspinall, Robin Leffrey, Anthony Regan (ed), *Diminishing Conflicts in Asiaand the Pacific : Why Some Subside and Other Don't*, Routledge, 2012, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ংকর বিপদকে সাথে নিয়ে বাস করা। কিন্তু তার আর অন্য কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। ঘটনার দিন সর্বপ্রথম তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এতে তার স্ত্রী, সন্তান এবং নাতিসহ তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী পাড়ার কয়েকজন লোক নিহত ও আহত হয়। ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না যা তার জীবন বাঁচিয়ে ছিল। পরবর্তীতে বার বার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেও তিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের মৃত দেহগুলো বৌদ্ধ ধর্ম ও আচার অনুযায়ী সৎকারের জন্য পাননি। [৫২] ঘটনার পরের দিন অনিল বিহারী চাকমার বাড়ির ধ্বংসস্তুপ থেকে তার স্ত্রীসহ পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এই ঘটনায় সরকারিভাবে একহাজারের অধিক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবার হিসাব পাওয়া গেছে। [৫৩]

৫.৭ মালয়া গণহত্যা (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২)

১৯৯২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মালয়াতে যাত্রীবাহী একটি নৌকাতে দুটি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। নৌকাটি মারিশ্যা থেকে রাঙ্গামাটি যাচ্ছিল। মালয়া বর্তমানে বাঙালি সেটলারদের আবাসস্থল। এই বিস্ফোরণে একজন যাত্রী মারা গিয়েছিল এবং নৌকা চালক গুরুতর আহত হয়েছিল। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা সাঁতরিয়ে তীরে এসে ছিল কিন্তু সেখানে স্বশস্ত্র বাঙালি সেটলার তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটলাররা জুম্ম পুরুষ, মহিলা এবং শিশু যাত্রীদের আক্রমণ করেছিল। প্রায় ৩০জনের মতো যাত্রীকে তারা মেরে ফেলেছিল। ১৪জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল, বাকীদের মৃতদেহ পানিতে ভেসে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জুম্ম জনগণের প্রতিনিধি রাঙ্গামাটি এবং ঢাকায় এসে সাম্প্রতিক সংঘটিত সামরিকবাহিনীর নৃশংসতার প্রতিবাদ করেছিল। [৫৪]

৫.৮. লোগাং গণহত্যা (১০ এপ্রিল ১৯৯২)

১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল সংঘটিত গণহত্যা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে একইদিনে একইস্থানে সংঘটিত সবচেয়ে বড় সহিংসতা। এটি হয়েছিল খাগড়াছড়ি জেলার লোগাং গ্রামে। বাংলাদেশী সেনাবাহিনী প্রায় পনেরশ জুম্ম পরিবারকে জোর পূর্বক সরিয়ে লোগাং গ্রামে স্থানান্তর করেছিল যেটি ছিল মূলত সেনাবাহিনীর অধীনে একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এর অনুরূপ। অপরদিকে তাদের পৈত্রিকভূমি, গ্রাম এবং খামার বাঙালি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে দেয়া হয়েছিল খাজনা মুক্ত করে। তারপর সেনাবাহিনী খুব দ্রুত এই জুম্ম জনগণের হাত থেকে মুক্তি পাবার একটি কারণ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল সেনাবাহিনী দুজন বাঙালিকে বড় ধারালো ছুরিসহ আদিবাসী গ্রামে পাঠিয়েছিল। বাঙালি দুজন লোগাং গ্রামে গবাদি পশু চারণ করছিল এমন কিছু আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ করেছিল। জুম্ম নারীরা এসময় তাদের নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করে কেঁদেছিল। এসময়

---

[৫২] Massacres in the CHT, Human Rights Congress for Bangladesh Minorities-এর পূর্বে উল্লিখিত রিপোর্ট, ২০০৮।

[৫৩] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮।

[৫৪] ঐ।

একজন জুম্ম পুরুষ তাদের উদ্ধারে জন্য এসে বাঙালিদেরকে বলেছিল তাদের ছেড়ে দিতে। কিন্তু চলে যাবার বদলে বাঙালি দুজন পুরুষকে আক্রমণ করে ও মেরে ফেলে। আক্রমণের সময় একজন বাঙালি আহত হয়েছিল। জুম্ম পুরুষকে মেরে ফেলার পর ধর্ষক দুজন বিডিআর ক্যাম্পে চলে গিয়েছিল। সেনাবাহিনী আদিবাসীদের উপর আক্রমণের জন্য যে কারণ খুঁজছিল তা তারা পেয়ে গেলে। কারণ হিসাবে তারা বলেছিল যে, আহত বাঙালিকে শান্তিবাহিনী আক্রমণ করেছিল। ধর্ষক দুজনের বিডিআর ক্যাম্পে আসার পর পরই শান্তিবাহিনীকে খোঁজার নামে সেনাবাহিনী বিডিআর এবং সেটলাররা মিলিতভাবে লোগাং গ্রামে আক্রমণ করেছিল। যেসব জুম্ম পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তাদের সবাইকে সেনাবাহিনী মেরে ফেলেছিল। তারপর আক্রমণকারীরা বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুদের জোরপূর্বক ঘরে ঢুকিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। লোগাং গণহত্যায় প্রকৃত মৃতের সংখ্যা কত তা কখনোই জানা যায়নি কারণ হত্যার পর সেনাবাহিনী অনেক মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছিলো। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে মৃতের সংখ্যা ৪০০ এর বেশি হবে। ৮০০ এর বেশি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং ২০০০ এর বেশি আদিবাসী পালিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে গিয়েছিল। [৫৫] রাজ কুমারী রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, লোগাং গ্রামে ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল সেনাবাহিনী আক্রমণ করে ১০০-ও অধিক আদিবাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। এই বিভৎস ঘটনার কারনে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ১৯৯২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে জানায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হোক। [৫৬]

৫.৯. নানিয়াচরে গণহত্যা (১৭ নভেম্বর ১৯৯৩)

১৯৯৩ সালের ১৭ই নভেম্বর নানিয়াচরে বাজারে জুম্ম জনগণের শান্তিপূর্ণ মিছিলে সেনাবাহিনীর সমর্থনে সেটলাররা আক্রমণ করেছিল। এতে ২জন জুম্ম আদিবাসী মারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম চান্দুমনি চাকমা এবং কয়েকশত এর বেশি আহত হয়েছিল। তবে রাজকুমারী চন্দ্রা রায়-এর মতে, চান্দুমনি চাকমাসহ মোট ১২জন মারা গিয়েছিল। [৫৭] র‍্যালি আয়োজিত হয়েছিল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র সংসদ এর অধীনে, যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষেই এটির আয়োজন করেছিল। [৫৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামের নানিয়ারচরের এই গণহত্যা সর্ম্পকে বিভিন্ন বাংলাদেশী সংগঠন বিশেষত জুম্ম জনগণের সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষ যেসব প্রতিবেদন দিয়েছিলেন সেখানে সকলেই মোটামুটিভাবে এই ঘটনার একই বর্ণনা করেছেন। নানিয়াচর তিন দিক থেকে কাপ্তাই লেক দ্বারা ঘেরা, তাই জনগণ সাধারণত নৌকাতেই চলাচল করেন। যেসব মানুষ

---

[৫৫] Massacres in the CHT, Human Rights Congress for Bangladesh Minorities-এর পূর্বে উল্লিখিত রিপোর্ট, ২০০৮।

[৫৬] Rajkumari Chandra Roy, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২২, আরও দেখুন Jenneke Arens, Samuel Totten, Robert K, Hitchcock (ed), *Genocide of Indigenous Peoples*, Transaction, 2010, পৃষ্ঠা ঃ ১৪১।

[৫৭] Rajkumari Chandra Roy, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২২।

[৫৮] Massacres in the CHT, Human Rights Congress for Bangladesh Minorities-এর পূর্বে উল্লিখিত রিপোর্ট, ২০০৮।

নানিয়াচরে আসে এবং যায় তাদের সকলকে নিয়মিত ভাবে বারবার সেনাবাহিনীর চেকপোষ্টে জিজ্ঞাসার এবং বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এই চেকপোষ্ট এর জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে স্থানীয় জনগণের মাঝে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছিল। ১৭ ইং নভেম্বর ছাত্রদের মিটিং এবং র‍্যালির পরপরই বাঙালি সেটলাররা ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য আহমেদ মিয়ার নেতৃত্বে একটি পাল্টা র‍্যালি প্রদর্শন করার জন্য তারাও একই দিনে অনুমতি নিয়েছিলো। এখানে পার্বত্য গণপরিষদ-এর চেয়ারম্যান মো. আইয়ুব হোসেন এবং বুড়িঘাট ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ এর নেতৃত্বে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে কয়েকশ সেটলার অংশ নিয়েছিলেন। তারা লোহার রড, বড় ছুরি, লাঠি হাতে সশস্ত্র অবস্থায় নৌকায় করে এসেছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্য চেকপোস্টে সেনাবাহিনী সেটলারদের নিরস্ত্র করেনি, ফলে এ দিন সর্বত্র একধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সেটলাররা এক সময় জুম্মা জনগণকে আক্রমণ শুরু করেছিল। এমনকি যেসব জুম্মা জনগণ লেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল তাদের চেপে ধরে মেরে ফেলা হয়েছিল। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী আক্রমণ বন্ধ করার কোন চেষ্টাই করেনি। ছাত্ররা নিকটবর্তী চায়ের দোকানের লাঠি ও জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তারপর যখন সেটলাররা পিছু হটতে শুরু করল তখন সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে একটি বাঁশির শব্দ হলো এবং তারপর সৈন্যরা ছাত্রদের উপর গুলি চালাতে শুরু করল। [৫৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের মাঝে উপরোক্ত ১৩টি গণহত্যা সবচেয়ে ভয়াবহ। তবে জুম্ম জনগণের উপর চালানো অধিকাংশ গণহত্যার উপর বাংলাদেশ সরকার থেকে কোন তদন্ত করা হয়নি। কিছু গণহত্যার পরে বিভিন্ন সংগঠনের চাপে সরকার কিছু তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল কিন্তু সেগুলো খুব বেশি ফলপ্রসূ ছিল না। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে সংঘটিত লোগং গণহত্যার পরে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেখানে রিপোর্ট করেছিল যে, বাংলাদেশী সেনাবাহিনী ও সেটলাররা মিলিতভাবে কয়েকশ জুম্ম জনগণকে মেরে ফেলেছিল যেটি পুরো দেশের জনগণ জানতে পেরেছিল। কিন্তু নানিয়াচর গণহত্যা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। অধিকন্তু আদিবাসীদের উপর আক্রমণ চালানো বা অন্যায়ভাবে হত্যার কারণে বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে কখনো কারো শাস্তি হয়নি। সর্বোচ্চ কিছু সেনা অফিসারের বদলি হয়েছে অথবা কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসরে পাঠানো হয়েছে। [৬০]

৬. ধর্মান্তর ও নির্যাতন (১৯৮৪-১৯৯৭)

১৯৯৪ সালে 'দ্য ঢাকা কুরিয়ার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মুসলমান যুবতি নারীরা পাহাড়ি যুবকদের মুসলমান হিসেবে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে সম্পন্ন করতো। আবার পাহাড়ি নারীরা মুসলিম ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান যুবকদের বিয়ে করতো। সৌদি সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত আলি-রাবিতা নামের বেসরকারি

[৫৯] ঐ।
[৬০] ঐ।

সংস্থা মূখ্যত ইসলামিক মিশনারী হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্মান্তকরণে ইন্ধন যুগিয়েছে মূলত ঃ সেনাবাহিনী। অনেক বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনী ২২টি হিন্দু মন্দির পুড়িয়ে ফেলেছে। [৬১]

এসব গণহত্যা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাসরত আদিবাসীদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাদের প্রতিদিনকার জীবন যাপন, ধর্ম, বিশ্বাস, আচার প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে তারা সর্বত্র বৈষ্যমের শিকার হচ্ছিল। তাদের জীবনের বৈষ্যম্যের কয়েকটি দিক বর্ণীত হল ঃ

৬.১ ধর্মীয় ক্ষেত্রে

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীরা অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এছাড়া অনেকে হিন্দু, খ্রিস্টান ও স্থানীয় ধর্মের অনুসারী। চাকমা, তঞ্চঙ্গা এবং মারমা হল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ত্রিপুরা হিন্দু এবং কিছু সংখ্যাল্প জাতি যেমন বম ও পাঙ্খুয়া হল খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। এছাড়া মুরং, খুমি হল সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা আদিবাসীদের সমাজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেনাবাহিনী ও বাঙালি সেটলারদের হস্তক্ষেপ তাদের এই ধর্মীয় সহনশীলতাকে বারবার ক্ষুন্ন করছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, তাদের অবমাননা করা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বাধা ধর্মীয় জীবনকে অসহিষ্ণু করে তুলছে। আদিবাসীদের জীবনে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এর অবমাননা করা এবং সেগুলো ধ্বংস করা।[৬২]

ক) বোয়ালখালী মন্দির এবং এতিমখানা, দীঘিনালা

বোয়ালখালী এতিমখানা যেটি একই সাথে মন্দির ছিল, এটি ধ্বংসের ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে আলোড়ন তুলেছিল। এই মন্দিরে আক্রমণে বেঁচে যাওয়া ৭২টি এতিম শিশুকে ১৯৮৮ সালে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ত্রিপুরায় বাসরত একজন চাকমা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বর্ণনা অনুযায়ী ঃ

> “আমি একজন চাকমা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, আমি বোয়ালখালী গ্রামে ছিলাম। সেখানে একটি অনাথ আশ্রম ছিল .. এই আশ্রমে একটি হাইস্কুল ছিল। আমরা ১৭ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলাম। ১৯৮৬ সালের ১৩ই জুন সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা দীঘিনালা উপজেলার অনেক গ্রামে ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ১৪ই জুন সকালবেলা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা আশ্রমের কাছে অনেক ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং একইসাথে আশ্রমের শস্যভান্ডার জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছিল। কিছু সময় পরে সৈন্যরা এসে বলেছিল যে আশ্রম রক্ষা করা তাদের দ্বায়িত্ব নয়, তাই তারা কিছুই করতে পারবেনা। ফলে আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এবং ঐ দিনই আশ্রম ত্যাগ করেছিলাম। আমাকে অনাথদেরসাথে নিয়েই আশ্রম ত্যাগ করতে

[৬১] ঐ।

[৬২] Life Is Not Ours, Chittagong Hill Tracts Commission, 1991, পৃষ্ঠা ঃ ৭১-৭২।

> হয়েছিল। ৮০ জন অনাথকে নিয়ে আমরা সকল সন্ন্যাসীরা বনের মধ্য দিয়ে হেঁটেছিলাম। ৭ দিন পর আমরা কারবুক রিলিফ ক্যাম্পে পৌঁছে ছিলাম এবং সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম।"

এর ঘটনার পর ১৫ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার বোয়ালখালীতে গিয়েছিল। স্থানীয় জনগণ তাকে অনাথ আশ্রমটি মুসলমান সেটলার কর্তৃক পুড়িয়ে দেবার কথা বলেছিল। [৬৩]

খ) দালাইমা মন্দির

বোয়ালখালী ঘটনা বর্ণনাকারী সন্ন্যাসীর বর্ণনা মতে ঃ

> "বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস শুধু আমার গ্রামেই ঘটেনি বরং আধিকাংশ গ্রামেই এই ঘটনা ঘটেছিল। আমি শুনেছিলাম যে, সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়সেটলাররা এসে ঘর বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমাদের আশ্রমের কাছের বেশ কিছু বৌদ্ধ মন্দির তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দালাইমা মন্দিরটি তারা আমার চোখের সামনে জ্বালিয়া দিয়েছিল। আমি দেখেছিলাম যে, এটাসেটলাররা করছিল এবং সেনাবাহিনী তা দাঁড়িয়ে দেখছিল।"

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা অনুসন্ধানে গঠিত আন্তর্জাতিক কমিশন ১৯৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ঘটনাস্থলে গিয়ে দালাইমা বৌদ্ধ মন্দিরে পুড়ে যাওয়া অবশিষ্ট অংশ পেয়েছিল যেটি ১৯৮৬ সালে পুড়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ মন্দিরটি দীঘিনালা বাজারটি অতিক্রম করে কিছু দূরে যেখানে সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্ট আছে। মন্দির প্রত্যক্ষদর্শীরা মন্দিরটি পুড়ে যাবার বর্ণণা কমিশনকে দিয়েছিল। কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সেসময় মন্দিরটির অবয়ব ছিল কিছুটা ইট ও সামান্য সিমেন্টের সমন্বয়ে। [৬৪]

গ) বাঘাইছড়ি মুখ মন্দির, দিঘীনালাঃ

ত্রিপুরায় বাসরত আদিবাসী শরণার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত কমিশনকে বর্ণণা করেছিল যে কিভাবে ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ সালে বাঘাইছড়ি মুখে অবস্থিত বাড়ি ও মন্দিরগুলোর উপর আর্মিরা বারবার আক্রমণ করেছিল। এই এলাকায় ১৭৫টি পরিবার বসবাস করত, যার মাঝে ১৩৫টি ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল এবং ৩০টি পরিবারকে নিকটতম ক্লাস্টার গ্রামে মিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গ্রামের চারপাশের সকল গাছ সেনাবাহিনী কেটে বিক্রি করে দিয়েছিল।

১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর কমিশন বাঘাইছড়িমুখ পরিদর্শনে গিয়েছিল। সেখানে যে বৌদ্ধ মন্দিরটি ছিল তাঁর কোন দেয়াল বা ছাদ অবশিষ্ট ছিলনা। কিন্তু পুড়ে যাওয়া পোলের অবশিষ্টাংশশুধু একটি বৌদ্ধ মন্দিরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে যে বৌদ্ধ মূর্তি ছিল কমিশন দেখেছিল যে, তাঁর একটি কান ভাঙ্গা, রঙ মলিন হয়ে গিয়েছিল

[৬৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫-৭৬।
[৬৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।

এবং বুদ্ধের মূর্তিটির গায়ে অনেক ধরণের চিত্র অঙ্কণ ছিল। তবুও সেখানে একটি নারকেল এবং প্রদীপ দেয়া ছিল যার অর্থ সেখানে এখনো পুজা করা হচ্ছিল।

প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানিয়েছিল যে, মন্দিরটি সেনা বাহিনী ভেঙ্গে ফেলেছিল। যেটির সত্যতা পরবর্তীতে দিঘীনালার ব্রিগেডিয়ার নিশ্চিত করেছিলেন। যদিও তিনি বলেছিলেন যে, শান্তিবাহিনী বাঘাছড়িমুখ মন্দিরটির ভিতর বিস্ফোরক স্থাপন করেছিল এবং আমাদের একটি দল তাদের ধরে ফেলেছিল। কিন্তু বিস্ফোরক গুলো আমরা নিরাপদে সরাতে পারছিলামনা তাই সেগুলোকে বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিলো তারা কেউই শান্তিবাহিনী কর্তৃক বিস্ফোরক স্থাপনের কথা কখনোই বলেনি। [৬৫]

ঘ) পুসগাং মন্দির, পানছড়ি

কমিশন ১৭ই ডিসেম্বর পুসগাং পরিদর্শনে গিয়েছিল। খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় 'মিলটন মলিট বৌদ্ধ বিহার' অবস্থিত। বিহারে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং বেদির উপরে মস্তক বিহীন তিনটি বুদ্ধের মূর্তি ছিলো। মন্দিরটি ১৯৮৬ সালে একবার এবং ১৯৮৯ সালের ২৮ শে জুন পুনরায় আক্রমণ করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাএবং কমিশনের সরেজমিন পরিদর্শন থেকে স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল যে, এটি সেনাবাহিনীই করেছিল। [৬৬]

ঙ) বেতছড়ি ক্রিস্টানপাড়া, খাগড়াছড়ি

কানাডার একটি ধর্মীয় ফান্ডের টাকায় খাগড়াছড়ির নিকটে বেতছড়ি পাড়ায় একটি চার্চ নির্মাণ করা হয়েছিল যেটি ১৯৯০ সালের ৩১অক্টোবর ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এদিন বেতছড়িতে অবস্থিত ক্রিস্টান পাড়াসহ অনেক ক্ষুদ্র গ্রাম ধ্বংস করা দেয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিল যে, বেতছড়ি ধ্বংসযজ্ঞ সেনাবাহিনী এবং বাঙালিসেটলাররা মিলে করেছিল। কমিশন ১৬ ডিসেম্বর চার্চ পরিদর্শনে গিয়েছিল। তারা দেখেছিল যে, দেয়ালগুলো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং ভিতরের সবকিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়া হয়েছিল। বাইবেলগুলোকে কেটে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল।

বেতছড়ি খ্রিস্টানপাড়া আক্রমণের ঘটনার দুটো ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় আদিবাসীরা বলছে যে, সেনাবাহিনী তাদের বলেছিল যে, এই এলাকা ছেড়ে দিয়ে কামালছড়ি ক্লাস্টার গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে। কিন্তু তারা সেখানে যেতে অস্বীকার করলে, শান্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ আছে এই অযুহাতে সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ করেছিল। আবার বেতছড়িতে পুড়ে যাওয়া গ্রামগুলির জায়গায় বর্তমানে সেনাক্যাম্প স্থাপনকারী সেনা বাহিনী বলেছে সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণণা। কমান্ডিং অফিসার বলছেন যে শান্তিবাহীনি গ্রামগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল।

---

[৬৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬-৭৭।
[৬৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা ছাড়ও বিভিন্নভাবে আদিবাসীদের ধর্মীয় জীবনে আঘাত হানছে বাংলাদেশী সেনাবাহীনি ও বাঙালি সেটলাররা। এসবের মাঝে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করা, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনে বাধা প্রদান এবং ধর্মীয় পবিত্র স্থানে ভ্রমণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। [৬৭]

৬.২ ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করা

বাংলাদেশী সেনাবাহিনী এবং বাঙালিসেটলার কর্তৃক ধর্মীয় স্থানগুলোর অবমাননা করা এবং বিভিন্নভাবে অপবিত্র করা আদিবাসীদের ধর্মীয় জীবনের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ১৯৮৫ সালে দীঘিনালার পাবলাখালিতে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। একজন মারমা সন্ন্যাসী এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এটা বলেছিলেন যে ঃ [৬৮]

> "ঐদিন প্রথমে সেটলাররা এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনীরা পুরোমন্দির ঘিরে ফেলেছিল। আমাকে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলেছিলো। আমার নাসারন্ধ দিয়ে পানি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এরপর আমাকে বুট দিয়ে লাথি মেরেছিল যার ফলে পা কেটে গিয়েছিল। সেটলরারা মন্দিরে ঢুকে সকল মেয়েকেধরে মন্দিরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি মেয়েদের কান্না মিশ্রিত চিৎকার শুনেছিলাম। সম্ভবত তাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল। তবে আমি সেটা নিজের চোখে দেখিনি। কিছুদিন পর আমি ঐ মেয়েগুলোর একটি মেয়েকে দেখেছিলাম কিন্তু একজন স্যান্নাসী হিসেবে আমার কিছু বাধা নিষেধ থাকায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি কি ঘটেছিল।'
>
> 'তারা জুতা পরে মন্দিরে ঢুকে অপবিত্র করেছিল এবং মন্দিরের খাবারগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্রতিদিন ১২টার পূর্বে আমরা প্রভু বৌদ্ধকে ভোগ দিতাম। তখন মুসলমানরা বলত 'কেন পাথর খাচ্ছেনা?' একবার আমি প্রভু বৌদ্ধকে ভোগ দিয়ে ছিলাম সেইসময় একজন মুসলমান ভিতরে ঢুকে বলেছিল যে, চল দেখি যদি পাথর খায়। কিছুক্ষণ পর তারা বলেছিল যে পাথর খেতে পারে না এবং তারা আমার হাত থেকে প্লেটটি মেঝেতে ছুড়ে ফেলেছিল। তারা গরু ও ছাগল মন্দিরে এনে জবাই করত। বৌদ্ধরা কখনো তা অস্বীকার করলে তাদের সকলকে বেঁধে মরিচ মিশ্রিত গরম পানি তাদের শরীরে ঢেলে দিয়েছিল এবং প্রায় আধঘণ্টা তাদের বেঁধে রেখেছিল। এসময় সেনাবাহিনী মন্দিরসহ তাদের বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনাগুলো ঘটার অন্যতম কারণ হল ধর্ম। সেনাবাহিনী বা সেটলাররা মুসলমান ধর্ম প্রতিষ্ঠার নাম করে আদিবাসীদের উপর এই অত্যাচারগুলো করছিল।"

---

[৬৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৭৮।

[৬৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩. ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ

ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধানে সুপষ্টভাবে থাকলেও আদিবাসীরা অধিকাংশ সময়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। সেনাবাহিনীআদিবাসীদের ধর্মীয় জীবনে কতটা বাধার সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন মারমা বৌদ্ধ ভিক্ষু বলেছেন যে ঃ [৬৯]

> ‘যে কোন ধরনের ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য সেনাবাহিনী অনুমতির প্রয়োজন হতো। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, বৌদ্ধ পূর্ণিমাসহ বিভিন্ন ধরনের পূর্ণিমা সংক্রান্ত উৎসব বছরে ৬ বার অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলো ছাড়া অন্যান্য যে ধর্মীয় উৎসব আছে তার জন্য অনুমুতি প্রয়োজন হতো। শুধু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য কোন অনুমতি লাগতো না। কিন্তু সাতদিন পর মৃতের জন্য যে অনুষ্ঠান করা হতো তার জন্য অনুমতি প্রয়োজন হতো। সন্ন্যাসীহতে চাইলে বা উৎসবের জন্য চাঁদা উঠাতেও অনুমতি লাগতো। এই অনুমতির জন্যঅফিসারদের জন্য অপেক্ষা করে দেখা করা খুবই বিরক্তকর এবং ঝামেলার ব্যাপার ছিল।”

উপরিউক্ত ঘটনাটি ১৯৮৬ সালের। কিন্তু এরপর থেকে ধর্মীয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন করা হয়। ১৯৯০ সালে খাগড়াছড়ি জেলার একটি গ্রামের আদিবাসীরা চারটি উৎসব পালনের জন্য অনুমতি চেয়েছিলঃ মাঘী পূর্ণিমা, নবউৎসব, অশ্বিনী পুর্ণিমা এবং বৈশাখী পূর্ণিমা। যখন সন্ন্যাসী সেনাবাহিনী ক্যাম্পে গিয়েছিল অনুমতির জন্য তখন সেনা অফিসার বলেছিল যে, গ্রামবাসীর সাথে শান্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে। তাই এই উৎসবগুলোতে অনেক মানুষ আসবে এবং অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পরবর্তীতে জেলা কাউন্সিলের অনুরোধে সেনাবাহিনী চারটির মধ্যে দুটো উৎসব পালনের অনুমতি দিয়েছিল। [৭০]

৬.৪. ধর্মীয় ভ্রমণে বাধা

‘চিটমারম’ (Chitmaram) পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারীদের জন্য একটি পবিত্র মঠ। যদিও এই এলাকাটি প্রধানত মারমা বসতি কিন্তু প্রতিবছর হাজারের অধিক চাকমা এই মঠে অবস্থিত পুরোনো বৌদ্ধ মূর্তিতে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসে। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতিনিয়ত জবাবদিহিতা এবং অসংখ্য চেকপোস্ট অতিক্রম করে এই বৌদ্ধ মন্দিরে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

১৯৮৬ সালের ১০ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত কমিশন চিটমারম বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিল। স্থানীয় বাংলীরা কমিশনকে জানিয়েছিলেন যে প্রতিবছর হাজারের অধিক আদিবাসী মন্দিরে আসত। কিন্তু বর্তমানে সেটি অনেক কমে গিয়েছে। কমিশন বিভিন্নজনের কথা বলেও এটা জানতে পেরেছিল যে, সেসব ভাগ্যবান ঘুষ দিতে সক্ষম

[৬৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯।
[৭০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯।

হবে শুধুমাত্র তারাই মন্দিরে যেতে পারবে। যাই হোক, ধর্মীয় বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের প্রধান বাধাই হল - চেক পোস্ট, চেক পোস্ট এবং চেক পোস্ট। [৭১]

৬.৫. ধর্মীয় নিপীড়ন নিয়ে জাতিসংঘে বৌদ্ধ রাজগুরু অজ্ঞবংশ মহাথেরো'র বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব্বোচ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজগুরু অজ্ঞবংশ মহাথেরো ১৯৮৫ সালের ২৯ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিত United Nations Economic and Social Council-এর Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities-এর Working Group on Indigenous Populations-এর অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগনের পক্ষে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি উপস্থাপন করেন: [৭২]

> æMadam Chairman,
>
> 'I, Aggavansa Mahathera, a Chakma Buddhist monk from the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, would like to draw the attention of the Members of the Working Group to the plight of the indigenous nationalities of the Chittagong Hill Tracts (CHT).'
>
> 'On 15 February 1972, the people of the CHT sent a delegation led by Mr.Manabendra Narayan Larma, to the Bangladesh leader, Sheikh Mujibur Rahman, asking for regional autonomy and retention of the Chittagong Hill Tracts Regulation of 1900 to safeguard their political, economic and cultural rights. He rejected their demands and told them "Do away with your ethnic identity, go home and become Bengalis". This statement highlights the government's policy towards the indigenous people who are ethnically, religiously and culturally distinct from the Bengalis. All Bangladeshi rulers pursued this policy designed to Bengalise and to Islamise the CHT. The present regime of Gen. Hossain Mohammad Ershad denies even the existence of these indigenous nationalities. In a submission to the Working Group on Indigenous Populations in 1983, the official Bangladesh delegate asserted that "the entire population of the territory which now comprises Bangladesh has

---

[৭১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-৮০।

[৭২] Statement submitted by Ven. Aggavansa Mahathera to Working Group on Indigenous Populations, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Economic And Social Council's Commission on Human Rights, United Nations; accessible in http://www.angelfire.com/ab/jumma/region.html.

always been and still is one people - the Bangladesh nation . Bangladesh is a country with a homogenous population.'

'The government is depriving the tribal people of educational facilities in all fields. For example, Sweden has established a polytechnic at Kaptai to educate the local people in Science and technology yet only 3 to 4 places out of 250 places are offered to the tribespeople every year. The para-medical training center at Rangamati admits only a few tribal students. Sweden closed down the Forest Development Training Centre at Kaptai as the government refused to employ tribal people. Similarly the numbers of tribal students in medical, engineering and agricultural institutions are minuscule. It is becoming increasingly difficult for the tribal students to pursue their studies because they are often arrested, detained without charge or trial, tortured and even murdered. The tribal girl students are kidnapped, raped and made pregnant by the Bengali soldiers.'

'The Bangladeshi regime is persecuting the indigenous people for their religious beliefs. Numerous Buddhist temples have been looted, desecrated and destroyed. The monks are detained, tortured and murdered. For example, on 22 February 1979, the Bangladesh army ransacked the Buddhist temple at Pujgang, 20 miles north of Khagrachari, shot at the holy image of the Buddha, broke its head with riffle butts, and then played football with the head. Rev. Arniruddha Bhikkhu and Rev. Rebata Bhikkhu were beaten severely with the result that the former had suffered a serious head injury and the latter had the right hand broken.'

'On 27 December 1979, Ven. Ajara Bhikkhu and Ven.Bannitananda Bhikkhu of the Buddhist temple at Thakujyama Kalak in the Kachalong valley were hacked to death by the Bengali soldiers During the Kalampati Union massacre on 25 March 1980, the Bangladesh army and the Bengali settlers plundered and destroyed many Buddhist temples and murdered many monks. A Parliamentary investigatiye team confirmed that the Buddhist temples at Betchari, Tonghapara, Chotadulu, Baradulu and Tripuradighi were completely destroyed and that those at Headmanpara, Poapara, Rangeipara, Kashkhalimukh Para, Kachukhali, Chela Chara, Roazapara, Hatirpara etc. were heavily damaged. The Bengalis broke up the Buddha's statue at Poapara

Buddhist temple and then played football with the broken pieces. A few monks survived and they were left for dead. Ven. Pannasara Bhikkhu and Ven. Wannasara Bhikkhu of Roazapara Temple had their hands broken. Ven.U Chandra Griya Bhikkhu, 60, of Chaityaraja Buddhist Temple at Kashkhalimukh Para had his head injured and both hands broken.'

'The Bengali soldiers stripped a Buddhist monk of the temple at Kattali, 70 miles north-east of Rangamati, slaughtered a cow on his saffron robes and sprinkled blood on the holy image of the Buddha.'

'On 11 August 1983, Ven. Bodhipal Bhikkhu of Banavihar temple at Jedamachyachara, near Panchari, was beaten mercilessly. He fled to Agartala in Tripura State of India as he could not bear military oppression anymore.'

'During the government-directed massacres in the Bhushanchara Union within Barkal Thana on 31 May 1984, Ven.Bodhi Ratna Bhikkhu, 78, of Janakalyan Bouddha Vihar at Bhushanchara, Ven. Jyotipal Sramana, 58, of Gorasthan Samaj Bouddha Vihar at Gorasthan and Ven. Jyotipal Bhikkhu, 73 of Banarupa Bouddha Vihar at Chotaharina, were beaten severely. The temples were looted and the holy images of the Buddha were broken into pieces. The monks sought refuge in Mizoram State of India.'

'International Fellowship of Reconciliation (IFOR) has disclosed that the Bangladesh armed forces occupy the Buddhist places of worship forcibly. The Buddhist temple at Maischari, 40 miles north of Rangamati, for instance, was occupied forcibly by the Bangladesh armed police for eight months. The intruders reviled the monks, slaughtered a cow on their saffron robes and smeared the image of the Buddha with blood.'

'IFOR has also revealed that the Bangladesh army prevents the people from practising their own religion. The Buddhist shrine at Chitmarong, 20 miles south of Rangamati, is the holiest of all places in the CHT and the Buddhists from every corner of the district have gone there for pilgrimage. The Bangladesh army has set up a checkpoint on the way to the shrine. People going there are asked for identity cards (special cards are required only of the tribal people) and thoroughly searched. Women are raped. Harassment has increased to such an extent that very few people dare visit the shrine.'

‘The military junta has made a secret plan to force the tribal people to become Muslims. With the financial help of Saudi Arabia, it has built an Islamic Preaching Centre and an Islamic Gultural Centre at Rangamati for this purpose. The government is also building hundreds of Mosques throughout the CHT while it is destroying hundreds of Buddhist temples with equal measures of zealotry.’

‘The Bangladesh security forces harass the tribal people and then offer them financial inducement and also freedom from oppression if they embrace Islam. Mr.Probodh Chandra Chakma, 52, of Mara Chengi within Naniachar Thana, for example, was harassed on 1 October 1984 and then enticed to become a Muslim with offer of money and freedom from oppression. Now he lives in serious mental agonies. The government has secretly circulated a letter to all military officers now stationed in the CHT encouraging them to marry tribal girls with a view to assimilating the indigenous people. As a consequence, the Bangladesh armed forces kidnapped thousands of tribal women and forced them to become Muslims and to marry Bengalis. For instance, Miss Sukrabala Chakma, 18, daughter of Mr. Lochonya Chakma, of Prodeep Para, Jurmarong within Khagrachari Thana, was taken away from her home at gun point by the Bangladesh Reserve Police of Bhaibonchara police camp on 7 August 1984. She was forced to become a Muslim and to marry a Bengali policeman from Comilla against her will.’

‘On 25 October 1984, the Bengali soldiers of Thaichara camp attacked the house of Mr. Gulohoga Chakma, 33, of Jaduchara within Naniachar Thana and told him that Bengali sperms must be infused into the wombs of tribal women so that they give birth to children of Bengali origin. Then they raped his wife until she became unconscious.’

‘I earnestly appeal to you to protect the political, economic and cultural rights of the indigenous population of the CHT. Thank you for giving me a patient hearing.’

'Sabbe Satta Sukhita Bhabantu'
'Let All living Beings Be Happy'”

৭. সহিংসতা

৭.১ সহিংসতা ঃ আদিবাসী নারীর প্রতি

“আদিবাসী নারীরা অনেক সুন্দর ও স্বাধীন হয়” - একজন সেনাবাহিনীর অফিসার এই কথটি বলেছিলেন। আদিবাসী নারীরা তাদের কাছে অনেক আকর্ষণীয়হয়। কারণ তাদের মুসলমান ধর্মে নারীরা এমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেনা। অন্যদিকে আদিবাসী নারিদের মুক্তভাবে চলাফেরা এবং সৌন্দর্য তাদের যৌনভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে সেটলার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ ও অপহরণ একটি প্রতিনিয়ত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরায় বসবাসরত একজন নারী-শরণার্থী বর্ণনা করেছেন যে ঃ

> “প্রায় ৫০জন সৈন্য রাত্রে এসে আমাদের পুরো গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে ছিল এবং আমাদের সকলকে এক জায়গায় জড়ো করেছিল। সকাল বেলায় সব পুরুষদেরকে একত্রে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। আমাকে হাত পা বেঁধে বিবস্ত্র করা হয়েছিল এবং পরে ধর্ষণ করা হয়েছিল। আমার শ্মশুরের সামনে আমাকে ধর্ষণ করেছিল। আমি ছাড়াও আরও তিনজন মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল। এরপর আমাদেরকে একত্রে বেঁধে রেখেছিল। এরপর তারা চলে গিয়েছিল। এটি ঘটেছিল ১৯৮৫ সালে আষাঢ় মাসে (জুন/জুলাই মাস)।”[৭৩]

দিঘীনালা উপজেলার বাসিন্দা বলেছেন যে-

> “খুব ভোরবেলায় পাঁচ থেক ছয়টি দল পুরো গ্রামটিকে ঘিরে ফেলেছিল। এবং কিছু সেনা ঘরে ঢুকে পরেছিল। তারা সব পুরুষদেরকে ধরে মাঠে নিয়ে গিয়ে দড়ি দিয়ে বেধেছিল। আমার স্বামীকে মেরে মৃতপ্রায় করেছিল। আমার ছেলে দৌড়ে তার বাবার কাছের গেলে তাকে ছুড়ে একপাশে ফেলে দিয়েছিল। একজন আর্মি আমার দিকে বন্দুক তাক করে গলা ধরে টেনে হিঁচড়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনজন সৈন্য আমাকে ধর্ষণ করেছিল। এই ঘণ্টনার পর আমি আর বাঁচতে চাইনি কিন্তু আমি কি করব? আমি এখনো অসুস্থ হয়ে আছি, পাগলের মত ভীত সন্ত্রস্ত। মুসলমানদের আমি এখনো ভয় পাই। আমার পাজর ভেঙ্গে গিয়েছিল। এটি ঘটেছিল ১৯৮৬ সালের জুন মাসে।”[৭৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে অসংখ্য আদিবাসী নারী পাওয়া যাবে যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনেই বাংলাদেশী সেনাদের দ্বারা ধর্ষণের স্বীকার হয়েছিলেন। ধর্ষণকে বাংলাদেশী সেনাবাহিনী ওসেটেলাররা এক প্রকার অস্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করেছিল। আদিবাসী মেয়েরা সবসময় এই

[৭৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬।
[৭৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬-৮৭।

ভয়েই থাকেন। আদিবাসী যুবতী মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোষাকগুলো পরতে ভয় পায় কারণ তারা তাদের আদিবাসী চিহ্ন যতটা সম্ভব মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। রাতে বাড়ি থেকে বের হওয়া তাদের জন্য ভয়ংকর। [৭৫]

যেসব নারী ধর্ষণের স্বীকার হয় সেসব মেয়েদেরকে তাদের পিতা বা স্বামী ঘরে তুলতে চায়না। তাদের আর কখনো বিয়ে হয়না। যদি তারা অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়ে তবে তা লুকিয়ে রাখতে হয় এবং অবশ্যই তা গর্ভপাত ঘটাতে হয়। যদি সন্তান হয়ে যায়, তবে সেই নারীর পক্ষে তাঁর গোত্রে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। এসব কারণে যদি কোন মেয়ে ধর্ষনের স্বীকার হয় তবে সে তা নিয়ে কখনোই কথা বলতে চায়না কারণ সে সবসময় সমাজে কলঙ্কের ভয় করে। তাই এই ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য পাওয়া খব কষ্টকর। [৭৬]

আদিবাসী বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত কেউই ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৯০ সালে রাঙ্গামাটি জেলায় একজন বৃদ্ধাকে সেনাবাহিনী ধর্ষণ করেছিল। আবার ১৯৯০ সালের অক্টোবরে রাঙ্গামাটি জেলাতেই ১৪ বছরের একটি মেয়েকে সেনাবাহিনীর একটি পেট্রোল ধর্ষণ করেছিল। মেয়েটি বিকালবেলা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছলি। যে অনুষ্ঠানে স্বয়ং জিওসি (GOC) উপস্থিত ছিলেন।

৭.২. কল্পনা চাকমা ঃ সামরিক সহিংসতার বলি

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীরা প্রতিনিয়ত যে অমর্যাদার সম্মুখীন হয়েছেন তার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়না কারণ অধিকাংশ সময়ই এগুলো অপ্রকাশিত থেকেছে। কিন্তু কিছু কিছু আদিবাসী নারী সাহস করে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বাইরের পৃথীবিকে জানানোর জন্য প্রকাশ করেছেন, যদিও সেগুলো বলা তাদের জন্য যথেষ্ঠ কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবে কল্পনা চাকমার অপহরণ বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে আলোচিত একটি ইস্যুতে পরিণত হয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোড়ন তোলে। এই ঘটনার দ্বারা পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীর অবস্থা যে কতটা ভঙ্গুর ও অসহায় সে সম্পর্কে জানা ও বোঝা যায়।

কল্পনা চাকমা ছিলেন একজন মানবাধিকার কর্মী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেন ফেডারেশনে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। ২৪ বছর বয়সী কল্পনা ছিলেন পাহাড়ি জনগণের অধিকার আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তা নিয়ে কথা বলার অন্যতম মুখপাত্র। এর প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৪ আগষ্ট ১৯৯৫ তারিখে ঢাকা ও লন্ডন থেকে একযোগে প্রকাশিত মাসিক *সমাজ চেতনা*'র সহকারী সম্পাদক প্রিসিলা রাজ-কে লেখা তার একটি চিঠি থেকে ঃ [৭৭]

[৭৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

[৭৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

[৭৭] প্রিসিলা রাজকে লেখা কল্পনা চাকমা'র চিঠি, দেখুন *সমাজ চেতনা*, জুলাই-আগস্ট যৌথ সংখ্যা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৮।

> "‥ পার্বত্য অঞ্চলের নির্যাতনের কথা সরকারী পত্রিকায় স্থানই পায় না। আর বিচার তো দুরের কথা। এমনি মুখেমুখে প্রচার হলেও আমাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দেয়া হয়। সে জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কামনা করি।'
>
> 'পরিশেষে এই অশান্ত এলাকার কথা আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারছি না। বর্তমান সরকারের হীন মুখোশ আবারো পরিলক্ষিত হচ্ছে নতুনভাবে। অতিসম্প্রতি ভারতের মিজোরাম হতে ভারতীয় মিজো (কুকী) গোপনভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাহাড়ীদেরকে ধ্বংশ করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক কুকী বাংলাদেশ সরকারের দেয়া অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা সাজেকের 'আমতলা' নামে একটি হাটে গোলাবর্ষণ করে; ১ জন পাহাড়ী মারা যায়। বর্তমানে সীমান্ত এলাকা সাজেক উত্তপ্ত অবস্থায়। আজ এই পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে জানতে চাইলে পরবর্তীতে জানাব।"

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ১২ জুন ১৯৯৬ রাতে সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি)-র সদস্য সালেহ আহমেদ ও নুরুল হক-সহ কতিপয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর থেকে তার আর কোন খোঁজ মেলেনি।[৭৮]

কল্পনা চাকমা অপহরণের বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত মাসিক *সমাজ চেতনা'* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক প্রিসিলা রাজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একটি সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লেখেন ঃ [৭৯]

> "রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম নিউ লাইল্যাঘোনা। ১১ জুন ১৯৯৬ দিবাগত গভীর রাতে যখন জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি ঠিক সেই মূহূর্তে দুর্বৃত্তরা ঘরের খিল কেটে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাঘাইছড়ির কাচালভ কলেজের ডিগ্রী শ্রেণীর ছাত্রী, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমাকে। সেই সাথে অপহৃত হলেন কল্পনার দুই ভাই, কালিন্দীকুমার চাকমা ও ক্ষুদিরাম চাকমা। পার্শ্ববর্তী খালে নিয়ে চোখ বেঁধে গুলির নির্দেশ দেওয়া হলে কালিন্দীকুমার ও ক্ষুদিরাম দু'জনেই খালে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচতে পারলেও কল্পনা পালাতে পারেন নি।'
>
> '৩ জুলাই রাতে বাঘাইছড়ি থানা সদরের চাকমা অধ্যুষিত বাবুপাড়ায় ক্ষুদিরাম চাকমার সাথে আমাদের কথা হয়। ক্ষুদিরাম আমাদের জানান, অপরাধীদের ৩ জনকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। আক্রমণকারীরা মুখের ওপর টর্চের আলো ফেললে ক্ষুদিরাম হাত দিয়ে চোখ আড়াল করার চেষ্টা করেন। প্রতিফলিত আলোয় তখন তিনি লেঃ ফেরদৌস, ভিডিপি সদস্য সালেহ আহমেদ ও নুরুল হককে চিনে ফেলেন। ফেরদৌসকে চিনতে অসুবিধা হয়নি, কারণ তিনি দাপটের সাথে এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন এবং মাঝে মাঝে গ্রামবাসীর সাথে ফুটবলও খেলতেন। তিনি জানান, ভিডিপি সদস্য দু'জনের বাড়ী তাদের পাশের গ্রাম উপলছড়িতে।'

---

[৭৮] Sushmita S. Preetha, 'For the Kalpana Chakma I know and the one I never will', *The Daily Star*, 12 June 2015.

[৭৯] প্রিসিলা রাজ, 'কল্পনা চাকমা ঃ ধারাবাহিক অপহরণের সর্বশেষ শিকার', সমাজ চেতনা, জুলাই-আগস্ট যৌথ সংখ্যা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৭-৯।

'অপহৃত বোনের শোকে মূহ্যমান এবং নিজেদের নিরাপত্তার চিন্তায় দিশেহারা ক্ষুদিরাম আরো জানান, তিনি যখন জবানবন্দী দিতে বাঘাইছড়ি থানায় যান তখন ওসি শহীদুল্লাহ, একই সাথে যিনি এই মামলার আইও, তাঁকে হুমকি দেন ফেরদৌসের নাম বলার অপরাধে ক্ষুদিরামকে সেনাবাহিনী দিয়ে মারপিট করা হবে। ক্ষুদিরামের বক্তব্য, 'আমি লেঃ ফেরদৌসকে স্পষ্টভাবে চিনেছি। তাকে ধরে চাপ দেয়া হলে কল্পনাকে অবশ্যই বের করা যাবে।'

'২ জুলাই আমরা রাঙ্গামাটির ডিসি ও এসপি'র মুখোমুখি হই। তাঁরা দু'জনেই জানালেন, 'জোর তদন্ত চলিতেছে।' কল্পনা উদ্ধারের সম্ভাবনা কতোটুকু এ প্রশ্নের জবাবে এসপি'র ভাষ্য, শতকরা একশো ভাগ।'

'অভিযুক্ত লেঃ ফেরদৌস, কল্পনার ভাই ক্ষুদিরাম যাকে স্পষ্টই চিনেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের ফলাফল 'তদন্তে'র স্বার্থে বলা যাবে না। লেঃ ফেরদৌস এখন কোথায়? তদন্তের স্বার্থে তাও বলা সম্ভব নয়। এসপি বললেন, আমরা শুধু একটি ইনফরমেশনের অপেক্ষা করছি। সেটা হলো, কল্পনা এখন কোথায় আছে। সেটা পেলেই আমরা তাকে উদ্ধার করে ফেলবো।'

'ইনফরমেশন কে দেবে- এ প্রশ্নের পর তার জবাব, 'যে কেউ- জনসাধারণ। আপনারাও হতে পারেন।'

'সে রাতে রাঙ্গামাটি বিগ্রেড কমান্ডার আধা ঘন্টারও ওপরে তার অফিসে বসিয়ে রেখে আমাদের সাথে দেখা করেননি। তার বদলে দেখা করেন মেজর এফ মাহবুবুর রহমান। এখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কল্পনার নাম এবং মূল অভিযুক্ত লেঃ ফেরদৌসকে নিয়ে কিছুক্ষণ হাস্যকর লুকোচুরির পর মেজর রহমান বলে ওঠেন, 'কল্পনা তো আপনাদের কল্পনাতেই রয়ে গেছে। তাকে আমি এ পর্যন্ত কখনো দেখিই নি।' এ কথা বলে মেজর কি বোঝাতে চাইলেন? কল্পনা নামে কোনো মেয়ে কি ছিল না? পুরো ঘটনাটি সাজানো?'

'মেজর অবশেষে জানালেন, সেনাবাহিনী তাদের নিজস্ব তদন্ত করেছে এবং তার রিপোর্ট ডিসি'র কাছে পাঠানো হয়েছে। যদিও ডিসি সেনা তদন্তের কোনো কথা আমাদের জানাননি। ইতিমধ্যে 'যায় যায় দিনে' প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস কল্পনা বিষয়ে সামরিক বাহিনী প্রধানকে প্রশ্ন করে উত্তর পান, 'বিষয়টি হৃদয়ঘটিত'! প্রশ্ন থেকে যায়, এই 'হৃদয়ঘটিত' বিষয়টির সাথে জড়িত কে? আরো প্রশ্ন থাকে যে, এক. বিষয়টি যদি হৃদয়ঘটিতই হবে, তাহলে এটা নিয়ে এতো ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন? লেঃ ফেরদৌস সেটি সরাসরি স্বীকার করলেন না কেন? অথচ ঘটনার পরদিন থেকে তাকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। বলা প্রয়োজন, কজইছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার হিসেবে এলাকায় উল্লেখিত লেঃ ফেরদৌস খুবই পরিচিত। দুই. কল্পনার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী কেন? প্রশাসনেরই বা মুখ খুলতে এতো সঙ্কোচ-স্ববিরোধিতা কেন?'

আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর এধরণের কর্মকান্ড একটি নয়, অসংখ্য গত ২০ বছর ধরে এটি তারা সেখানে অনুশীলন করে আসছে।"

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনাটি নিয়ে তার নিজের সংগঠন হিল উইমেন ফেডারেশন ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নারীবাদী সংস্থা এবং মানবাধিকার সংগঠন, যেমন সম্মিলিত নারী সমাজ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও নারীপক্ষ, সক্রীয় প্রতিবাদ করে। এজন্য তারা ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একাধিক সমাবেশ ও র‍্যালি করে। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কল্পনা চাকমার অপহরণ নিয়ে কোন ধরণের তদন্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলো। পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের নারী সংগঠনগুলো নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন করে যতো দ্রুত সম্ভব কল্পনা চাকমাকে খুঁজে বের করার জন্য। শেখ হাসিনা সরকারও এর দায়ভার নিতে চাচ্ছিল না এই অজুহাতে যে তারা সবে ক্ষমতায় এসেছে। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার কঠোর অবস্থানের মুখে এই ঘটনার প্রায় দেড়মাস পর চট্টগ্রামের ২৪ ডিভিশনের সেনাবাহিনী একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানায় যে, কল্পনা চাকমা শান্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত এবং সে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছে শুধুমাত্র সেনাবাহিনী ও তাদের কর্মকাণ্ডকে হেয় করার জন্য (to go in hiding to embarrass army)। কিন্তু সেনাবাহিনীর এই কথার সত্যতা এবং কিসের ভিত্তিতে তারা এই কথা বলছে তার কোন উৎস পাওয়া যায়নি। তৃতীয় একটি মত প্রচার করা হয়েছিল যে, ভারতের সহায়তায় শান্তিবাহিনী কল্পনা চাকমাকে অপহরন করেছে, কারণ ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। তবে এই অভিমতেরও কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা এবং বিবৃতিগুলো বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে আদিবাসী নারীর অবস্থানকেই প্রকাশ করে। কল্পনা চাকমা অপহরণের মতো ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে কোন বিচ্ছিন্ন বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই ঘটনাটি রাষ্ট্র কর্তৃক দীর্ঘসময় ধরে তার নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর উৎপীড়ন-এর বহিঃপ্রকাশ। [৮০]

৭.৩ জোরপূর্বক বিয়ে

ধর্ষণ ছাড়াও আদিবাসী নারীদের উৎপীড়নের আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হলো জোরপূর্বক বিয়ে। এর দ্বারা নারীকে একটি যন্ত্রের মতো ব্যাবহার করা হয়। আদিবাসী নারীকে জোরপূর্বক বাঙালিদের সাথে বিয়ে দিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনসংখ্যার একটি ভারসাম্য আসবে এই চিন্তা থেকেই মুলত আদিবাসী নারীদেরকে অপহরণ করে জোরপূর্বক বাঙালির সাথে বিয়ে দিয়ে তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত কমিশন ১৯৯১ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাতে দেখানো হয়েছে যে, ১৪জন ত্রিপুরা ১৪জন চাকমা এবং ১জন মারমা নারীকে অপহরণ করে জোরপুর্বক বিয়ে করিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। যেসব মুসলমান তাদের বিয়ে করেছিল তাদের নাম ও গ্রামের ঠিকানাও রিপোর্টে দেয়াছিল। কমিশন একজন নারীর কথা জানতে পেরেছিল যে, বিয়ে করতে অস্বীকার করায় তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। [৮১]

---

৮০ Lamia Karim, Contemporary South Asia, London: Routledge & Daily Star 12 july 1996, 25 july 1996 & Kalpana Apohoroner Ghotona Dharabahik Samprodayik Sangghorsher Angsho, Bhorer Kagoj, 26 August.

৮১ Life Is Not Ours, Chittagong Hill Tracts Commission, 1991, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে থাকা একজন আদিবাসী নারী ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে যে বর্ণনা দেন ঃ

"আমি আমার ৬ বছরের ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে কিছু শস্য বোনার জন্য রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন মানুষ আমার সামনে এসে আমার মুখে কাপড় গুজে দিয়ে বেঁধে তাঁর স্কুটারে তুলে নিয়ে গিয়েছিল...আমি তিনমাস সেখানে ছিলাম। আমাকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো এবং বিয়ে করতে বাধ্য করান হয়েছিল।"

অপর একজন নারী বলেন যে-

"আমাকে ১৯৮৬ সালে অপহরণ করা হয়ে ছিল ... ঐ ব্যক্তির সাথে আমার দুটি সন্তান ছিল। একদিন সে আমাকে তাঁর বাবার বাসায় পাঠিয়েছিল এবং একসময় যখন আমি দেখলাম যে আমার চারপাশে কেউ নেই তখন আমি পালিয়ে এসেছিলাম। আমি পালিয়ে গুচ্ছগ্রামে গিয়েছিলাম যেখানে আমি বাস করতাম কিন্তু আমি গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে কোন আদিবাসী নেই। সব মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। আমি ত্রিপুরা ক্যাম্পে ১৯৮৮ সালে পৌঁছাই।"

এরকম অনেক আদিবাসী নারীকে পাওয়া যাবে যাদেরকে জোর করে বিয়ে করা হয়েছিল। যেসব নারীকে বিয়ে করা হয় জোরপুর্বক পরবর্তীতে তারা অনেকেই পালিয়ে আসে। তবে পালিয়ে আসা নারীদেরকে তাদের সমাজ কখনই আর গ্রহণ করে না। যেসব নারী পালাতে পারেনা তারা বাঙালি সমাজে বাঙালিদের মতো করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাস করতে বাধ্য হয়। [৮২]

১৯৮৫ সালের জুলাই হতে ১৯৮৬ সালের ১মে পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি গ্রামগুলোতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিম্নোক্ত তারিখে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও মন্দির ধ্বংসের কাজে যুক্ত ছিল। [৮৩]

সারণি ১২ ঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড

ক্রমিক নং	ক্যাম্পের নাম	তারিখ
১	মহালছড়ি	১৯৮৫ সালের ১ ও ২১ জুলাই; ২, ১২ ও ১৬ আগষ্ট।
২	গুইমারা	১৯৮৫ সালের ১ জুলাই, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সালের ১৭ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ও ৬ মার্চ।
৩	দীঘিনালা	১৯৮৫ সালের ৬ জুলাই, ৯ ও ১৬ আগষ্ট।
৪	বাঘাইছড়ি	১৯৮৫ সালের ৯ জুলাই।

৮২ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

৮৩ দেখুন Bhumitra Chakma, 'Structural Roots of Violence in the Chittagong Hill Tracts', Economic and Political Weekly, March 20, 2010, vol. XLV No. 12, পৃষ্ঠা ঃ ১৯-২১।

৫	তিন টিলা	১৯৮৫ সালের ১৪ ও ২২ জুলাই, ১৯৮৬ সালের ২০ জানুয়ারি এবং ১৮ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি।
৬	দূরছড়ি	১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২৫ জুলাই।
৭	বড়ফুল পাড়া	১৯৮৫ সালের ১৭ জুলাই, ১৯৮৬ সালের ২০ জানুয়ারি ও ১৭ ফেব্রুয়ারি।
৮	যক্ষাবাজার	১৯৮৫ সালের ৩, ১০, ১৬ ও ১৭ আগষ্ট।
৯	তৈনদং	১৯৮৫ সালের ১০ আগষ্ট।
১০	পানছড়ি	১৯৮৫সালের ১৩ আগষ্ট, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালের ১২মার্চ, ২এপ্রিল ও ১ মে।
১১	তালছড়ি	১৯৮৫ সালের ১৪ আগষ্ট।
১২	বাঘাইছড়ি	১৯৮৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ১৯৮৬ সালের ৬ জানুয়ারি।
১৩	লংগদু	১৯৮৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ও ১৯৮৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।
১৪	ঘাগড়া	১৯৮৫ সালের ১৩ অক্টোবর।
১৫	দুদুক ছড়ি	১৯৮৫ সালের ১৩ অক্টোবর।
১৬	মাটিরাঙা	১৯৮৫ সালের ২০ নভেম্বর ও ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর।
১৭	লোগাঙ	১৯৮৫ সালের ২০ ও ২৫ নভেম্বর।
১৮	খাগড়াছড়ি	১৯৮৬ সালের ৮, ১০ ও ১৪ জানুয়ারি, ৪ মার্চ ও ১মে।
১৯	কীলবন	১৯৮৬ সালের ১৪ - ১৬ জানুয়ারি এবং ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি।
২০	বেতছড়ি	১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারি, ১৪ ও ২০ ফেব্রুয়ারি।
২১	কিয়াংঘাট, ছমনিঘাট	১৯৮৬ সালের ২১ ও ২৮ জানুয়ারি, ৪ ও ফেব্রুয়ারি এবং ৪ মার্চ।
২২	নুনছড়ি	১৯৮৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।
২৩	মধ্যপাড়া	১৯৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি।
২৪	ধনপাদা	১৯৮৬ সালের ১৯ এপ্রিল।
২৫	পান খাইয়াপাড়া	১৯৮৬ সালের ১মে।

সূত্রঃ Bhumitra Chakma, 'Structural Roots of Violence in the Chittagong Hill Tracts', Economic and Political Weekly, March 20, 2010, vol. XLV No. 12, পৃষ্ঠা ঃ ১৯-২১।

এ ছাড়াও সরকারী বাহিনী এবং নতুন বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে তান্ডব চালায়। হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডের শিকার হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসীরা। সংখ্যার বিচারে এই সহিংস ঘটনাগুলোর সংখ্যা শত শত। সবগুলো ঘটনা উল্লেখ না করে এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

৭.৪ গুচ্ছগ্রাম

বিদ্রোহী বা শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ ১৯৮৮ সালে গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি চালু করা হয়। গুচ্ছগ্রাম ধারণাটি ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে ব্রিটিশরা মালয়াতে প্রথম চালু করেছিল। গুচ্ছগ্রাম রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলাতে স্থাপন করা হয়েছিল বাঙালি এবং আদিবাসী উভয়ের জন্যই। দক্ষিণ অঞ্চলের গুচ্ছগ্রামগুলো শুধু আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত হয়। এগুলোকে ডাকা হয় 'দলবদ্ধ কেন্দ্র' (Grouping Centers) নামে।[৮৪] বান্দরবান জেলায় কোন গুচ্ছগ্রাম নেই। অপর দুটি জেলায় গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা নিম্নরূপ:[৮৫]

খাগড়াছড়ি জেলা

বাঙালি গুচ্ছগ্রাম	: ৩০,১২৮ পরিবার
আদিবাসী গুচ্ছগ্রাম	: ৬,৯৭৪ পরিবার

রাঙ্গামাটি জেলা

বাঙালি গুচ্ছগ্রাম	: ১,৪৯২ পরিবার
আদিবাসী গুচ্ছগ্রাম	: ৩,৬৭৬ পরিবার

পাহাড়িদের গুচ্ছগ্রামে বসবাসে বাধ্য করার এটি ছিল একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। গুচ্ছগ্রামগুলোতে সেনাবাহিনী এবং বাঙালিদের প্রাধান্য থাকায় সেখানে পাহাড়িদের পৌঁছে দিতে পারলে একদিকে যেমন শান্তিবাহিনী দমনে সুবিধা হয়, তেমনি পাহাড়িদের গ্রাম দখল করে নিজের প্রয়োজনে সে জমি ব্যবহার সহজে নিশ্চিত করা যায়। এ ছাড়াও উন্নয়নের নামেও নিজস্ব জমি থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৮৬]

সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন যে তথ্য পেয়েছিল তাতে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি জেলাতেই বাঙালিদের জন্য ছিল ১০৯টি গ্রাম। ত্রিপুরা এবং মারমাদের জন্য ৮০টি গ্রাম এবং ১৬টি চাকমাদের জন্য। গুচ্ছগ্রাম বলা হতো বাঙালি সেটলারদের গ্রামকে, চাকমাদের গ্রামকে বলা হতো শান্তিগ্রাম, মারমা এবং ত্রিপুরাদের গ্রামকে বলা হতো বড়গ্রাম বা আদর্শগ্রাম।[৮৭] জুরাইছড়ি, দীঘিনালা এবং খাগড়াছড়ির গুচ্ছগ্রামের বাঙালি সেটলারদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, শান্তিবাহিনীর অপারেশনের কারনেই তারা গুচ্ছগ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। কাজ করার জন্য মাঠে ফিরে যেতে তারা ভয় পাচ্ছে কারণ তাদেরকে আবার আক্রমণ করা হতে পারে। তারা আরও বলেছিল যে, শান্তিবাহিনীকে তারা কোনো ধরনের কর দিতে ইচ্ছুক নয়, তাই তারা সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করেছিল তাদের

---

[৮৪] Life Is Not Ours, Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪।

[৮৫] সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৭।

[৮৬] Rajkumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts,* Bangladesh, Published by: International Work Group for Indigenous Affairs, Denmark, 2000, পৃষ্ঠা ঃ ১২৫-১২৭।

[৮৭] Life Is Not Ours, The Chittagong Hill Tracts Commission, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪।

পুনর্বাসিত করার জন্য। পরবর্তীতে কমিশন এ কোন কোন ক্ষেত্রে এই তথ্যও পেয়েছে যে শান্তিবাহিনী আক্রমণ করেনি, তথাপি গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছিল যেন তারা গ্রাম ত্যাগ করে গুচ্ছগ্রামে যায়। যখন তারা সেটা করতে অস্বীকার করে তখন সেনাবাহিনী ও সেটলাররা একত্রে তাদের আক্রমণ করে। প্রত্যেকটি গুচ্ছগ্রাম সশস্ত্র বাঙালি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। তারা গ্রামগুলোর অধিবাসীদের প্রতিটি চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। একটি গুচ্ছগ্রামে ঢুকতে গিয়ে কমিশন দেখেছিল যে কিভাবে ভিতরে ঢুকতে এবং বের হতে পাহারা-চৌকি পার হতে হয়। গুচ্ছগ্রামের জনগণ সেনাবাহিনীর অনুমতি ছাড়া কখনো কোথাও যেতে পারে না। কিছু গ্রামে প্রতিরাতে আদিবাসীদের চাকুসহ কাজ করার অন্যান্য সকল হাতিয়ার রাতের বেলা সেনাবাহিনীর কাছে জমা রাখতে হয়। সকালবেলা অনুমতি সাপেক্ষে তারা সেগুলো সংগ্রহ করতে পারে। সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার দাবি করেছেন যে, অধিবাসীদেরকে শান্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতেই গুচ্ছগ্রামগুলো করা হয়েছে। [৮৮]

> "গুচ্ছগ্রামগুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো শান্তিবাহিনীর যোগানের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া এবং আদিবাসী এবং বাঙালিদেরকে আধুনিক জীবনে নিয়ে আসা।"[৮৯]

দক্ষিণে অবস্থিত গুচ্ছগ্রাম গুলো শুধুমাত্র আদিবাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী যে দাবি করছে তা যে কতটা যুক্তিহীন তার প্রমান তো এই গ্রামগুলো মূলতঃ মায়ানমার ও মিজোরাম-এর সীমান্ত সংলগ্ন যেখানে শান্তিবাহিনীর কার্যক্রম নেই বললেই চলে। গুচ্ছগ্রামগুলোকে এক কথায় 'সমাবেশ ক্যাম্প' (Concentration Camp) বলা যায়। একজন ব্যক্তি গুচ্ছগ্রামের সকল আদিবাসীর অনুভূতিকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন যে "গুচ্ছগ্রামে বসবাস এবং জেলখানায় বসবাস একই কথা।"[৯০] এসব গুচ্ছগ্রাম গঠনের ক্ষেত্রে কোনোরকম সুষ্ঠু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। যার ফলে এগুলো একেকটি বন্দিশালায় পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক পরিবারকে সপ্তাহে ২১ কেজি চাউল দেয়া হতো। তবে কর্মসংস্থানের তেমন কোন ব্যবস্থা এসব গুচ্ছগ্রামগুলোতে ছিলনা।

খাগড়াছড়ি জেলার ৭টি গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করে কমিশন জানতে পারে যে, একেকটি গ্রামের অবস্থা একেক রকম। সরকার কর্তৃক তাদেকে ৬ মাসের জন্য যে রেশনের ব্যবস্থা নিয়েছিল তা সকল গুচ্ছগ্রামে সঠিকভাবে বিতরণ করা হয়নি। কিছু গুচ্ছগ্রামের লোকজন ৩ থেকে ৪ মাস এই সরকারি সুবিধা পেয়েছিল বলে কমিশন জানতে পারে। কিছু গ্রামের অধিবাসীগণ অভিযোগ করে যে তাদের বসবাস এবং চাষের জন্য জমি পর্যাপ্ত ছিল না। যেটুকু ছিল সেগুলো তেমন উর্বর ছিল না। দুটো গ্রামের ক্ষীণতায় অধিবাসীরা জানান যে তাদের কোন জমি নাই এবং তারা প্রায় না খেয়ে দিনাতিপাত করছেন। [৯১]

---

[৮৮] ঐ।

[৮৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।

[৯০] ঐ।

[৯১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ নিপীড়ন ও সংগ্রাম* গ্রন্থে তিনি পার্বত্য অঞ্চলের গুচ্ছগ্রামকে ভিয়েতনামের গুচ্ছগ্রামের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ [৯২]

> "সে সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামেও চালু করেছিল গুচ্ছগ্রাম। এক এক এলাকার মানুষকে গুচ্ছগ্রামের নামে এক ধরনের সামরিক ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় রেখে তাদের চলাফেরা,গতিবিধি সতর্কতা ও তীক্ষ্নতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিলো 'গুচ্ছগ্রাম' গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রামের মুখে বানচাল হয়েছিলো, উচ্ছেদ হয়েছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত শত শত গুচ্ছগ্রাম। সেই গুচ্ছগ্রামের গণ্ডি ভেঙে ভিয়েতনামী জনগণ নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন এবং অর্জন করেছিলেন চূড়ান্ত বিজয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে শেখা গুচ্ছগ্রাম পদ্ধতি পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু যে পাহাড়িদের উপরই নিয়ন্ত্রণ রাখে তাই নয়। বাংলাদেশের সমতলভূমি থেকে যে হাজার হাজার দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমজীবীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়েছে তাদের একটা বড়ো অংশকেও বস্তুতপক্ষে আটক রাখা হয়েছে এই সব গুচ্ছগ্রামে। পাহাড়িরা এই গুচ্ছগ্রামের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে যেমন হাঁপিয়ে উঠেছেন তেমনি সমতলভূমির যে বাঙালি শরণার্থীরা গুচ্ছগ্রামে বাস করেছেন তাঁরাও অনেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন এই নিয়ন্ত্রণের বদ্ধ আবহাওয়ায়।

৮. আদিবাসী শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতমালার কারণে সৃষ্ট সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তৈরি হয় এবং তা পার্বত্য চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করে।

৮.১. পার্বত্য সংঘাতের কারণে সৃষ্ট শরণার্থী

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, **১৯৮১** সালে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিরাঙ্গা থানার বেলছড়ি, বনারায়বাড়িতে সংগঠিত জাতিগত দাঙ্গার কারণে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় **২** হাজার আদিবাসী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বাধীনতাত্তোর কালে এ ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী সমস্যার সূচনা হয়। [৯৩] রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই একের পর এক গণহত্যা সংঘটিত হতে থাকে, শত শত আদিবাসীকে হত্যা করা হয়। আদিবাসীদের ঘর-বাড়ি লুটপাট করে হাজার হাজার ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তাহীনতার কারণে আতঙ্কিত

---

[৯২] বদরুদ্দীন উমর, 'বাংলাদেশের মাইলাই : লোগাং হত্যাকাণ্ড', বদরুদ্দীন উমর (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম: নিপীড়ন ও সংগ্রাম*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ২৫।

[৯৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪২।

হয়ে হাজার হাজার আদিবাসী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এমনকি প্রাক্তন সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমাও ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ [৯৪]

> "জীবন রক্ষার্থে আমি নিজ্যে বাধ্য হয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিই। সাধ করে কেউ বাস্তুভিটা ছেড়ে, নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে, বিদেশে যেতে চায় না। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আমাদের বিদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।"

১৯৮৬ সালের ১৪ জুন দীঘিনালার প্রাচীন পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমে বাঙালিরা অগ্নিসংযোগ করে। ফলে আশ্রমটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং আশ্রমের প্রায় ৩০০টি শিশুর মধ্যে ২৫০টি শিশু পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ২৫০টি শিশুর মধ্যে ৭২টি শিশুকে ফ্রান্সের একজন মানবতাবাদী ব্যক্তির সহায়তায় ঐ সময়ে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের ফ্রান্সের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।[৯৫]

১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়কালই ছিল খুবই সংঘাতময় এবং হামলা ও পাল্টা হামলায় পানছড়ি, দীঘিনালা এবং মাটিরাঙ্গা উপজেলায় বসবাসরত প্রায় সব আদিবাসী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধারণা করা হয়, এ সময় ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৫০ হাজার।[৯৬] ১৯৮৮ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরণ সারণী- ১৩-এ অবলোকন করা যেতে পারে ঃ [৯৭]

সারণি ১৩ : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থী সংখ্যা সংক্রান্ত বিবরণ

শরণার্থী শিবিরের নাম	শরণার্থী পরিবার				সদস্য				মোট	
	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	সাঁওতাল	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	সাঁওতাল	পরিবার	সদস্য
কাঠালছড়ি	১১০	১,৩৪১	৯১১	-	৪০০	৫,৩৮৭	৩,৩১৫	-	২,৩৬২	৯,১০২
করবুক	১,১৯২	৬৪	২০০	৮	৫,৪৪৪	২২৫	৮৪৭	২৪	১,৪৬৪	৬,৫৪০
পঞ্চারামপাড়া	১,৯৩২	৭৬	১১৯	-	৮,১৯৮	২৭০	৪৭৫	-	২,১২৭	৮,৯৪৩
সিলাছড়ি	৮২১	৭৭	১০৪	-	৪,১৪১	৩৩০	৪৭০	-	১,০০২	৪,৯৪১
টাকুমবাড়ি	২,৯১১	৪০	৩৪৮	-	১৩,৭৯৪	১৬৫	১,৪৭২	-	৩,২৯৯	১৫,৪৩১
মোট	৬,৯৬৬	১,৫৯৮	১,৬৮২	৮	৩১,৯৭৭	৬,৩৭৭	৬,৫৭৯	২৪	১০,২৫৪	৪৪,৯৫৭

[৯৪] উপেন্দ্র লাল চাকমা, 'ভারত প্রত্যাগত উদ্বাস্তু', মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ও সম্ভাবনা*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC), ঢাকা, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫-৯৬।

[৯৫] মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

[৯৬] ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

[৯৭] ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তীকালে সরবরাহকৃত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৩ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ছয়টি শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত বাংলাদেশি আদিবাসী শরণার্থী পরিবার ও সদস্য ছিল যথাক্রমে ১০,৭৭২ ও ৫৩,৪১৮। শরণার্থী শিবিরগুলির সবকয়টি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের সারণীতে দেওয়া হলো ঃ [৯৮]

সারণি ১৪ : শরণার্থী শিবির

ক্রমিক	শরণার্থী শিবিরের নাম	শিবির স্থাপনের সময়	আদিবাসী জাতি	পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
১.	টাকুমবাড়ি অমরপুর মহকুমা	১৯৮৬	চাকমা ত্রিপুরা মারমা	২,৭০৩ ২৪৫ ১০	১৪,৫৬৯ ১,১৮৮ ৫০
২.	পঞ্চরামপাড়া	১৯৮৬	চাকমা ত্রিপুরা মারমা	১,৭৬০ ৪০ ৪০	৯,০৮৮ ১৮৭ ১৮০
৩.	করবুক অমরপুর মহকুমা	১৯৮৬	চাকমা ত্রিপুরা মারমা	১,৫৯৭ ১৫১ ৫১	৮,১৫৩ ৭৯১ ২৩৫
৪.	সিলাছড়ি অমরপুর মহকুমা	১৯৮৬	চাকমা ত্রিপুরা মারমা	৭৯১ ৭৬ ৩০	৪,০৪৬ ৪০৬ ৩৩২
৫.	কাঠালছড়ি সাবরুম মহকুমা	১৯৮৭	চাকমা ত্রিপুরা মারমা	৬৪৭ ৭৬৮ ১,০৯৩	২,৯১০ ৩,২২৫ ৪,৬০২
৬.	লেবাছড়া অমরপুর মহকুমা	১৯৮৯	চাকমা ত্রিপুরা মারমা	৭৬৩ ৬ ০১	৩৪২৪ ৩১ ০১
			মোট	১০,৭৭২	৫৩,৪১৮

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবাসন কার্যক্রম আরম্ভ হবার পূর্বে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী ১১,৮০৬টি পরিবারের ৫৬,৪৯৬ সদস্যের তালিকা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত তালিকা অনুসরণে প্রণীত থানাওয়ারী শরণার্থী পরিবার ও সদস্য সংখ্যা সারণী ১৪-তে পর্যবেক্ষণ করা যায় ঃ [৯৯]

সারণি ১৫ : থানাওয়ারী শরণার্থী পরিবার ও সদস্য সংখ্যা

জেলার নাম	থানার নাম	পরিবারের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা পানছড়ি	৩,৯১০ ৩,৯৫৫	১৯,৮৪৫ ১৮,৬৭৬

[৯৮] ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

[৯৯] ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৫৩।

	মাটিরাঙ্গা রামগড় খাগড়াছড়ি সদর মানিকছড়ি মহালছড়ি লক্ষ্মীছড়ি	১,২৭৫ ১,২৪১ ১,১৪১ ২১৫ ১২ ০৫	৬,২৬৫ ৫,১৭৫ ৫,৩৬৫ ৮৯৩ ৫৬ ১৬
রাঙ্গামাটি	-	৫১	২০৫
	মোট	১১,৮০৬	৫৬,৪৯৬

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া অধিকাংশ পরিবারই খাগড়াছড়ির সবকটি উপজেলা অর্থাৎ ৮টি উপজেলার অধিবাসী। রাঙ্গামাটি জেলার শরণার্থী পরিবার ছিল মাত্র ৫১টি। রাঙ্গামাটি জেলার শরণার্থী সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায়, উক্ত জেলার বরকল, বাঘাইছড়ি, লংগদু উপজেলার অনেক আদিবাসী পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ না করে নিজ জেলার অভ্যন্তরে গভীর বনাঞ্চলে বিশেষত সাজেক অঞ্চলে চলে যান বা অন্যত্র চলে গিয়ে অভ্যন্তরীণ শরণার্থীর জীবন বেছে নেন। তাদের ভারতে চলে না যাওয়ার দুটি সম্ভাব্য কারণ পাওয়া যায়। প্রথমত, এসব এলাকার সীমান্তবর্তী মিজোরামের মিজোদের সাথে বাংলাদেশী আদিবাসীদের বিশেষ করে চাকমাদের অপেক্ষাকৃত বৈরী সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত, অতীতে মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী আদিবাসীদের বলপূর্বক বাংলাদেশে প্রেরণের অনুরূপ তাদের আবারও দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে।[১০০]

৮.২ পার্বত্য সংঘাতের কারণে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সুধাসিন্ধু খিসা বলেন ঃ[১০১]

> "পার্বত্য চট্টগ্রামের (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ সময় ধরে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিজনিত কারণে যে সকল আদিবাসী নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর সেটা হচ্ছে স্বীয় গ্রাম হতে অন্য কোন গ্রামে যেয়ে বা গ্রাম স্থাপন করে যারা বসতি স্থাপন করেছেন, স্বীয় মৌজা হতে অন্য কোন মৌজায় চলে গেছেন অথবা যাদের সরকার যে সব আদিবাসীকে গুচ্ছগ্রামে যেতে বাধ্য করেছে।"

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী সহিংসতার কারণে নিরাপত্তাহীনতা, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে অনেক আদিবাসী উদ্বাস্তু দেশত্যাগ না করে অভ্যন্তরীণ শরণার্থীর জীবন বেছে নেন। রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলার অনেক আদিবাসী পরিবার যে দেশের অভ্যন্তরে অগম্য বনাঞ্চলে বিশেষ করে সাজেক অঞ্চলে বা অন্যত্র চলে গিয়ে

[১০০] মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪।

[১০১] সুধাসিন্ধু খিসা, 'অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যা', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল এবং শারমিন মৃধা (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সংকট ও সম্ভাবনা*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ১০১।

অভ্যন্তরীণ শরণার্থী বা উদ্বাস্তুর জীবন বেঁছে নিয়েছিলেন সেকথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। Norwegian Refugee Council / Global IPD Project-এর তথ্য মতে আগস্ট ১৯৭৫ সাল থেকে আগস্ট ১৯৯২-এর মধ্যে পাহাড়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিরি কারণে প্রায় ৬০ হাজার আদিবাসী অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।[১০২]

৮ এপ্রিল ১৯৯৭ সালে সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৮ সালের ২০ জানুয়ারি *পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক টাস্কফোর্স* গঠিত হয়। [১০৩] এই টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। [১০৪] ১৯৯৯ সালে এই টাস্কফোর্স তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ১,৫২,০০০ টি বলে উল্লেখ করেছিল, যার মধ্যে আদিবাসী উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ৮৩,৫২৫টি। ২০০০ সালে টাস্কফোর্স যে তালিকা প্রকাশ করে, তাতে তিন পার্বত্য জেলায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ১,২৮,৩৬৪ টি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, যার মধ্যে আদিবাসী উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল ৯০,২০৮ টি। তবে এই তালিকায় ১৯৭৯-১৯৮৪ সময়কালে আগত সেটলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং জুম্ম আদিবাসী কল্যাণ সংস্থা এটি প্রত্যাখ্যান করে।[১০৫]

১৯৯৮-৯৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ আদিবাসী উদ্বাস্তুদের দূরাবস্থার সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়, যেমন; সাজেক উপত্যকায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা জঙ্গলের বুনো আলু খেয়ে বেঁচেছিল। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে প্রায় ৩০ জন অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু খাদ্য এবং ঔষধের অভাবে মারা যায়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ ভয়াবহ খাদ্যাভাবে পতিত হয়েছিল। [১০৬]

৯. শান্তিবাহিনীর নানান প্রতিপক্ষ – ২

৯.১. রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের স্থানীয় সংবাদপত্র ঃ দৈনিক গিরিদর্পণ ও সাপ্তাহিক বনভূমি

স্থানীয় প্রচার মাধ্যম কিভাবে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শকে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে ভূমিকা রেখেছে তার নিদর্শন হতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক গিরিদর্পণ ও সাপ্তাহিক

---

[১০২] Norwegian Refugee Council / Global IPD Project, Profile of Internal Displacement : Bangladesh, 3 October 2001, দেখুন http://www.idpproject.org , পৃষ্ঠা ঃ ৭।

[১০৩] সুধাসিন্ধু খিসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০১।

[১০৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩।

[১০৫] Norwegian Refugee Council/Global IPD Project, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২১। .

[১০৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৫। আরও দেখুন Daily Star, 16 February 1999 ।

বনভূমি। আদিবাসী শরণার্থী ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে এই দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ কোন প্রেক্ষিতে বা প্রান্তিকে পৌঁছে শরণার্থী'র মতো অনিশ্চয়তার জীবন বেছে নিয়েছিল এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার ব্যাপারে পত্রিকা দুটির কোনো দায়বদ্ধতা ছিলনা, তারা বরং সাম্প্রদায়িক সরকার ও আগ্রাসী সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছে। শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পত্রিকা দুটি তার অবস্থান তাদের শিরোনামগুলিতেই স্পষ্ট করেছে। পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার অধিকাংশ খবর জনমানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। অবধারিতভাবেই সংবাদগুলো ছিল ধোয়াটে, খণ্ডিত এবং আংশিক। এরমধ্যে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে মূলধারার বাঙালি জনগণ ও রাষ্ট্রকে ক্ষেপিয়ে তোলার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিধৃত রয়েছে। কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা শরণার্থীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, এ ব্যাপারটি পত্রিকাগুলো এড়িয়ে গেছে, কিন্ত তাদের প্রতিবেদনগুলোতে নিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে যে শরণার্থীরা তাদের আশ্রয় শিবিরগুলোতে অত্যাচারিত হয়ে ও নানা সমস্যার কারণে ভারত থেকে পালিয়ে এসেছে; বলা হয়েছে শান্তিবাহিনীর আক্রমনের কথা, পাহাড়িদের বিপথে যাওয়ার কথা। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি খবর এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

সারণি ১৬ : দৈনিক গিরিদর্পণ ও সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ

দৈনিক গিরিদর্পণ [১০৭]		
তারিখ	**বিষয়**	**বিবরণ**
২৩ জুলাই ১৯৮০	শান্তিবাহিনীর গুলিতে কৃষক নিহত	গত ২২ জুলাই সকালে শান্তিবাহিনীর গুলিতে ২ জন কৃষক নিহত হয়েছে।
৫ মে ১৯৮৫	শান্তিবাহিনী সদস্যদের আত্মসমর্পণ	২৯ এপ্রিল দুপুর ১২টায় রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর ৫৫ জন অফিসারসহ ২৩৩ জন অস্ত্র ও গেলাবারুদ সমর্পণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে।
২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬	শান্তিবাহিনীর অস্বাভাবিক জীবন-যাপন নিস্প্রয়োজন	সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এম নুরুদ্দিন খান বলেন শান্তিবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের দাবিতে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল এইচ এম এরশাদ সে উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়ায় এখন আর তাদের সংগ্রাম বা অস্বাভাবিক জীবন-যাপন করার কোন প্রয়োজন নেই।
৪ মে ১৯৮৬	শান্তিবাহিনী কর্তৃক নির্মম হত্যাকাণ্ড	২৯ এপ্রিল রাতে ম্যাটিরাঙা ও পানছড়ি উপজেলার কয়েকটি স্থানে শান্তিবাহিনীর আক্রমণে অর্ধশতাধিক নিহত এবং প্রায় ১শ লোক আহত হয়েছে।
১৮ মে	শান্তিবাহিনীর হামলা	১৩ মে পানছড়ি উপজেলায় একটি পুরানো বাঙালি বসতি এলাকায় হামলা

[১০৭] দৈনিক গিরিদর্পণ, পুস্তক-সংবাদপত্র সংগ্রহ শাখা, যোজন সংখ্যা ১০৮৮, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, ঢাকা।

১৯৮৬		চালায়। হামলায় ১০জন বাঙালি নির্মমভাবে খুন হন।
১ জুন ১৯৮৬	শান্তিবাহিনী পিছনে ভারতের ইন্ধন	৩১ মে খাগড়াছড়ির রামগড়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ফ্ল্যাগ বৈঠকে শান্তিবাহিনীকে ইন্ধন না জোগানোর জন্য ভারতকে অনুরোধ করা হয়।
১৫ আগস্ট ১৯৮৮	নৌযানে শান্তিবাহিনীর গুলি ও ২ ব্যক্তিকে অপহরণ	১৩ আগস্ট রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার নিকটবর্তী পিচকিছড়ায় তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বরকলগামী একটি যান্ত্রিক নৌযানের উপর গুলি চালিয়ে ২ ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে।
২৮ আগস্ট ১৯৮৮	শান্তিবাহিনী কর্তৃক ৫ লাখ টাকা লুট	১১ আগস্ট খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় সংঘটিত ঘটনায় ভাসমান দোকানিরা মালামাল নিয়ে বাবুছড়া বাজারে যাবার পথে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা মালামাল বোঝাই ৩টি নৌকা আটক করে লুটতরাজেরা শেষে পালিয়ে যায়। মালামালের মধ্যে ছিলকাপড় সুটকী, বিড়ি, সিগারেট, তেল ও বিভিন্ন প্রকারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা।
১৯ অক্টোবর ১৯৮৮	জনসংহতি সমিতি বিনা শর্তে আলোচনায় সম্মত	নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে সরকারি প্রতিনিধিদল এবং শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোতে উভয়পক্ষের আলোচনায় অগ্রগতির মুখে ৫ম দফা বৈঠকে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক উত্থাপিত ৫দফা দাবিনামা সংশোধনে সমিতি নেতৃবৃন্দের অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন এবং বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সরকারি রূপরেখার উপর আলোচনায় অংশগ্রহনেতাদেও শর্তারোপ সরকারের পক্ষে অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় শান্তি আলোচনার ভবিষ্যত অনিশ্চিৎ হয়ে পড়ে। বর্তমান বিনা শর্তে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে শর্তহীনভাবে আলোচনায় অংশগ্রহনে সম্মতি প্রকাম করায় সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।
২৯ অক্টেবর ১৯৮৮	শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহৃত ৪ জনের মুক্তিলাভ	গত ৩ সেটেম্বর বাঘাইছড়ি উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান লক্ষীকুমার চাকমা, বিলাইছড়ি ইউনিয়নের চেযারম্যান উদয়রবি চাকমা, কাসালং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারিজাত কুসুম চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সেটেলমেন্ট অফিসার দয়ালচন্দ্র চাকমাকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। এবং ৪০ দিন পর গত ১৪ অক্টোবর লক্ষিছড়িতে তাদেরকে মুক্তি দেয়।
৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮	শান্তিবাহিনী কর্তৃক ফেরিওয়ালা অপহরণ	গত ৪ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার উলটাপারায় এক মুড়ি ফেরিওয়ালাকে অপহরণ করেছে শান্তিবাহিনী। এছাড়া ২৬ নভেম্বর এক বাদাম ফেরীওয়ালাকে অপহরণ করা হয়।
১২ ডিসেম্বর ১৯৮৮	শান্তিবাহিনীর কর্তৃক জেলে হত্যা	রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় বিকাল ৪ টার দিকে হ্রদ এলাকায় মাছ ধরার সময় শান্তিবাহিনী ৮ জন জেলেকে গুলি করে হত্যা করে। এসময় গুলিতে ১ জন আহত হয়।
১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৮	শান্তিবাহিনীর গুলিতে স্কুল শিক্ষিকা নিহত	রাঙ্গামাটি জেলাধিন কাউখালি উপজেলায় শান্তিবাহিনী ১ জন স্কুল শিক্ষিকাসহ মোট দুইজন মহিলাকে গুলি করে হত্যা করে।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৮	শান্তিবাহিনীর কর্তৃক মাঝি অপহরণ	১১ ডিসেম্বর জুরাছড়ি উপজেলার শিলছড়িতে শান্তিবাহিনীর লোকেরা একটি নৌকায় আগুন দেয় এবং তিনজন মাঝিকে অপহরণ করে।
৫ জানুয়ারি ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর নৃশংসতা	১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮ রাতে খাগড়াছড়ি শহরের গাছবান নামক স্থানে মন্ত্রী কুমার কার্বারী (৬৫) কে নৃশংসভাবে দা দিয়ে কোপানোর ফলে ২৯ ডিসেম্বর হাসপাতাকে তার মৃত্যু হয়।
১৩ জানুয়ারি ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী কর্তৃক যাত্রীবাহী বোটে হামলায় হতাহত ২	১১ জানুয়ারি ছোট হরিনা থেকে রাঙ্গামাটিগামী ইঞ্জিনবোট এমএল মাইনী বরকল ফরেস্ট অফিসের কাছে পৌছালে নিকটবর্তী পাহাড় থেকে ২৫-৩০ জনের শান্তিবাহিনীর একটি দল বোটের উপর গুলি বর্ষণ করে। অনিল মন্ডল নামের ৬৫ বছর বয়স্ক একজন যাত্রী ঘটনা স্থলে প্রাণ হারায়। বোটের চালক রফিকুল ইসলাম হাতে গুলিবিদ্ধ হয়।
২০ জানুয়ারি ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী সম্পর্কে উপেন্দ্র লাল চাকমার বিবৃতি	১৮ জানুয়ারি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা উপজেরায় পাহাড়ি জসকল্যাণ সমিতি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক উপেন্দ্র লাল চাকমা বলেন শান্তিবাহিনী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে ইতিহাস তাদেও ক্ষমা করবে না।
২০ জানুয়ারি ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী সকল সম্প্রদায়ের শত্রু	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন স্থানে অপহরণ ও হত্যার প্রতিবাদে ১৭ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি পৌরসভা মিলনায়তনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন শান্তিবাহিনী সকল সম্প্রদায়ের শত্রু। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের নির্মুল করতে হবে।
২৬ জানুয়ারি ১৯৮৯	আরো ১৬জন শরণার্থী মাটিরাঙ্গায় এসেছে	১লা জানুয়ারি থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় ভুখন্ডস্থ শরণার্থী শিবির থেকে ১৬জন শরণার্থী সিমান্ত এলাকার বিভিন্ন দুর্গম পথ ধরে শান্তিবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় ফিরে আসে। জানা যায় এরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কাঁঠালছড়ির শরণার্থী ক্যাম্প থেকে রাতের আঁধারে পালিয়ে এসেছে।
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯	জেলা পরিষদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান	৯ ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি টাউন হলে সরকারের সাথে আলোচনাকারী ২১ সদস্য বিশিষ্ট দলের দলনেতা এবং অন্যান্য সদস্যরা বলেন জেলা পরিষদ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।
১১ মার্চ ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর মিশ্র প্রতিক্রিয়া	তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের জন্য বাংলাদেশ সংসদে বিল পাশ হয়। প্রথম দিকে শান্তিবাহিনীর সম্মতি থাকলেও পরবর্তীতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
৩০ মার্চ ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী প্রতিরোধে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত	২৯ মার্চ খাগড়াছড়ি জোনের জোনাল কমান্ডার বলেন পাহাড়ি ও বাঙালিদের সমন্বয় বজায় রেখে শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে।
৬ জুলাই ১৯৮৯	হত্যার তালিকা সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির দায় অস্বীকার	ঢাকা কোরিয়ার ৫ম বর্ষ ৪৪তম সংখ্যায় সাংবাদিক হত্যার তালিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতিবাদ করেছে জনসংহতি সমতি। জনসংহতি সমতি বলেছে এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং সরকারি ষড়যন্ত্র।

৮ জুলাই ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান	৩ জুলাই ১৯৮৯ খাগড়াছড়ি পৌর মিলনায়তনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্যদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে স্বাভাবিক জীবনের ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান বিবেকানন্দ চাকমা চাই থঅং চৌধুরী, আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া ও ভুবন মোহন ত্রিপুরা।
২১ জুলাই ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিমিয়	১৯ জুলাই ভোর ৪-৫টা পর্যন্ত মাটিরাঙা উপজেলার নাইক্যাপাড়ায় শান্তিবাহিনী ও নিরাপত্তাবাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিমিয়ে শান্তিবাহিনীর ১জন আহত এবং ১জন নিহত হয়েছে।
২৩ জুলাই ১৯৮৯	পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ইউপি চেয়ারম্যানদের ভূমিকা।	২২ জুলাই সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে গৌতম দেওয়ান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
২৬ জুলাই ১৯৮৯	কে পি এমপ্লয়ীজ নেতৃবৃন্দের পাবর্ত্যাঞ্চলের অশান্তি দূর করার অঙ্গীকার	কে পি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অশান্তি দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।
২৭ জুলাই ১৯৮৯	যাত্রীবাহী বাসে শান্তিবাহিনীর গুলি চালনা	গত ২৫ জুলাই বেলা ১১টায় খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কের এক স্থানে শান্তিবাহিনী যাত্রীবাহী বাসে গুলি ছোড়ে। এতে ১জন নিহত এবং ২জন আহত হয়।
২৭ জুলাই ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর হামলা প্রতিহত	২৪ জুলাই খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ১ কিমি পূর্বে এবং ১ কিমি পশ্চিমে এবং আরও অন্যান্য স্থানসহ মোট ৪টি স্থানে শান্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়।
১৬ আগস্ট ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী কর্তৃক নিরীহ জনগণের উপর হামলা	ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুরে শান্তিবাহিনীর বেশকিছু লোকজন নিরীহ জনগণের উপর হামলা চালায়। জানা যায় চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য এই হামলা চালানো হয়। হামলায় ৬ জন আহত হন।
২২ আগস্ট ১৯৮৯	সপ্তাহব্যাপী শান্তিবাহিনীর আস্তানায় অভিযান	গত এক সপ্তাহে পানছড়ি ও মানিকছড়ি উপজেলার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শান্তিবাহিনীর আস্তানায় অভিযান চালায়। এতে ২ জন নিহত, ১ জন আহত এবং ৭ জন গ্রেফতার হয়েছে।
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯	খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর নেতা মিহিরের আত্মসমর্পন	২৫ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় সদস্য মিহির কুমার তালুকদার বেশকিছু দলিল পত্রসহ নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে।
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর ১৭জন সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে	২৩ আগস্ট সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর হতে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে শান্তিবাহিনীর ১৭জন সদস্য আত্মসমর্পণের খবর জানা গেছে। এছাড়াও সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ৫ শতাধিক উপজাতি খাগড়াছড়ি জেলাধীন বিভিন্ন সিমান্তবর্তি উপজেলা গুলিতে ত্রিপুরার আশ্রয় শিবির থেকে ফিরে এসেছে।
২৬ সেপ্টেম্বর	শান্তিবাহিনীর হাতে ৪	লংগদুতে (রাঙ্গামাটি) ৪জন নিখোঁজ কাঠুরে শান্তিবাহিনীর হাতে

১৯৮৯	জন কাঠুরিয়া নিহত	মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর এ ৪জন কাঠুরে মাহিল্লাতে কাঠ কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হয়।
৩০ অক্টোবর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর ৫জন সদস্য আটক: অস্ত্র ও বোমাসহ কাগজপত্র উদ্ধার	সেনাবাহিনীর খাগড়া জোনের জওয়ানরা এক প্রশংসনীয় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ শান্তিবাহিনীর ৫জন সদস্যকে আটক করে। ২২ অক্টোবর রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া থেকে আড়াই মাইল উত্তরে কালাকাজি নামক স্থানে একঘণ্টা সংঘর্ষের পর আহত অবস্থায় একজনসহ শান্তিবাহিনীর মোট ৫জন সদস্যকে আটক করা হয়।
৬ অক্টোবর ১৯৮৯	মানিকছড়িতে শান্তিবাহিনীর ৩জন সদস্য নিহত আহত ৫ জনকে আটক	খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় লেমুছড়াতে গত ৪ অক্টোবর নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শান্তিবাহিনীর ৩জন সদস্য নিহত হয়েছে। এবং আহত অবস্থায় ৫জনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া গোলাবারুদ ও কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
৭ অক্টোবর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর সদস্য হতে অস্ত্র উদ্ধার	কাউখালী উপজেলার কমলপাতি ইউনিয়নের সাড়িছড়া এলাকা হতে উপজাতীয় জনগণ শান্তিবাহিনীর নিকট থেকে একটি পাইপগান ও ২টি কার্তুজ উদ্ধার করেছে।
৭ অক্টোবর ১৯৮৯	পরিতোষ চাকমার আন্তসমর্পন	৩ সেপ্টেম্বর জেলা পরিষদের সদস্য চিরজ্যেতি চাকমার নিকট পরিতোষ চাকমা আত্মসমর্পন করে। জানা যায় পরিতোষ চাকমা ১৯৮২ তে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। শান্তিবাহিনীতে থাকাকালীন দীঘিনালা রিজিওনের করাখালী এলাকায় সন্ত্রাসমুলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল বলে সে জানায়।
২৩ অক্টোবর ১৯৮৯	যাত্রীবাহী নৌকায় শান্তিবাহিনীর চামলা	২১ অক্টোবর রাঙ্গামাটির লংঘদু সোমাই এলাকা হতে মাইনীমূখী বাজারে যাওয়ার পথে ইসলামাবাদ নামক স্থানে যাত্রীবাহী নৌকার উপর শান্তিবাহিনীর হামলার ফলে ১টি শিশু নিহত, ২ জন আহত ও ১জন নিখোজ হয়েছে।
২৯ অক্টোবর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর ২জন সদস্যদের আত্মসমর্পন	২৩ অক্টোবর পিচকীছড়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর নিকট বিমল চাকমা, মরমছড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মহিশ্বর চাকমা আত্মসমর্পণ করেছেন।
১লা নভেম্বর ১৯৮৯	যাত্রীবাহী কোচে সন্ত্রাসীদের রাখা বোমা বিস্ফোরণে নিহত ২, আহত ৪	২৯ অক্টোবর রাঙ্গামাটির পুরাতন বাসস্টান্ড এ চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি আগত যাত্রীবাহী একটি বিরতিহীন কোচে শান্তিবাহিনী সদস্যদের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হলে ২ জন ঘটনাস্থলে নিহত ও ৪ জন আহত হয়।
২নভেম্বর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর ২ জন সদস্য নিহত	রাঙ্গামাটির কাউখালী কালাগাজী এলাকার নিরাপত্তবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের এক সংঘর্ষে শান্তিবাহিনীর ২ জন সদস্য গুলিতে মারা যায়। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
৪ নভেম্বর ১৯৮৯	ইন্দ্রপুরীতে বিস্ফোরণ : ১জন আটক	৩০ নভেম্বর রাঙ্গামাটিতে ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে বিস্ফোরক পেতে রাখার অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শান্তিবাহিনীর ১জন সদস্যকে আটক করেছে।
১৫ নভেম্বর ১৯৮৯	জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ৯ ব্যক্তির	২ নভেম্বর ১৯৮৯ স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য দপ্তরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনসংহতি সমিতির নামধারী

	প্রাণদন্ড ঘোষণা	গোপন একটি সংগঠন স্বাধীনতার সংগ্রামে রত উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে মারাত্বকভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নয় ব্যক্তির প্রাণদন্ড ঘোষণা করেছে। এই নয়জন ব্যক্তির মধ্যে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের তিনজন চেয়ারম্যান, পাঁচজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও একজন মানবাধিকার কর্মী।
১৬ নভেম্বর ১৯৮৯	সাংবাদিক হত্যার তালিকা সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির দায় অস্বীকৃতি	সাংবাদিক হত্যার তালিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে জনসংহতি সমিতি একটি প্রতিবাদ লিপি পেশ করে, যেখানে সমিতির মুখপাত্র অমিতাভ চাকমা বলেন তাদের এধরণের তালিকা তৈরি বা হত্যার পরিকল্পনা নেই।
১৮ নভেম্বর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর বিদেশী প্রভুদের দাসত্ব	চট্টগ্রামের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম ১৯ নভেম্বর রাঙ্গামাটি পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্ত রাজনীতি শুরু হয়েছে। কিন্তু শান্তিবাহিনী এটা চায়না। তারা বিদেশি প্রভুদেও দাসত্ব সরুপ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে।
২৬ নভেম্বর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর ৩টি পৃথক হামলায় নিহত ৩, আহত ২	২৫ নভেম্বও খাগড়াছড়ির মহলছড়ি সড়কের শালবন নামক স্থানে শান্তিবাহিনীর গুলিবর্যন ও বোমাহামলায় ১ জন নিহত হয় ও ১জন আহত হয়। ২৪ নভেম্বও দীঘিনালা উপজেলায় পাটনাখালী এলাকায় শান্তিবাহিনীর গুলিতে ২ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা কওে এবং ৩টি গরুকে মেওে ফেলে। এই উপজেলায় একইদিনে বাবুছড়ায় শান্তিবাহিনীর গুলিতে ১ জন পথচারী আহত হয়।
২৬ নভেম্বর ১৯৮৯	পিস্তল ও গুলিসহ শান্তিবাহিনীর ১জন আটক	২২ নভেম্বও ১৯৮৯ তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ১জন সদস্যকে আটক এবং ২টি পিস্তল ও ১০ রাউন্ড গুলি সহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করেছে।
২৯ নভেম্বর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর ৯ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের হুমকি প্রদানে নিন্দা প্রকাশ	বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্তা, ঢাকা এর তথ্য সচিব স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর ৯ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের হুমকি প্রদানে উদ্বেগ ও নিন্দা জানানো হয়।
২ ডিসেম্বর ১৯৮৯	জনগণের জন্য শান্তিবাহিনী অমঙ্গলকর	২৩ নভেম্বও দিঘিনালা (খাগড়াছড়ি) উপজেলার বাবুছড়ায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ব্রিগেডিয়ার সালজার রহমান বলেন শান্তিবাহিনী জনগণের মঙ্গল চায়না।
১১ ডিসেম্বর ১৯৮৯	রামগড়ে শান্তিবাহিনীর ১জন সদস্যকে আটক	৭ ডিসেম্বও ভারতে তথ্য পাচারের অভিযোগে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ৪ ব্যাক্তিকে আটক করেছে। আটককৃতদেও মধ্যে ২জন সরকারি অফিসে কর্মরত এবং ২ জন ভারতে অবস্থানকারী উপজাতীয় শরণার্থী।
২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯	খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর ৩জন সদস্য গ্রেফতার	১১ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি থেকে শান্তিবাহিনী ৩জন সদস্যকে গেস্খফতার কওে। আটককৃত সদস্যরা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান ও অন্যন্য সদস্যকে হত্যা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে স্বীকার কওে।
৮ জুলাই ১৯৯০	ঢাকার পত্রপত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের খবর	সাংবাদিকদের একটি দল তিন পার্বত্যজেলা ঘুরে আসার পর ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে খবর বের করে।

	প্রকাশ	
১৯ জুলাই ১৯৯০	স্থানীয় সরকারের কাছে দাবি হস্তান্তর	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যন গৌতম দেওয়ান বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত দাবিসমূহের মৌলিক তিনটি দাবি সরকার স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর করায় প্রতিশ্রুত ২১টি দাবি হস্তান্তরে সরকার সদিচ্ছার প্রমাণ রেখেছে।
১৫ আগস্ট ১৯৯০	উপেন্দ্রলাল চাকমা দেশের শত্রু	বান্দরবান জেলার প্রবীণ উপজাতীয় নেতা হলা চিং মং বলেছেন উপেন্দ্রলাল চাকমা দেশের শত্রু। তিনি পালিয়ে যেয়ে চট্টগ্রাম সম্পর্কে যে বক্তব্য দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ মিত্যা এবং বানোয়াট।
২৫ আগস্ট ১৯৯০	শান্তিবাহিনীর অবর্তমানে এলাকায় শান্তির সুবাতাস	সাম্প্রতিককালে এক সময়কার বলিষ্ঠ নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়ার পর এলোপাথাড়ি কিছু বক্তব্য দেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য কেউ কানে নেয়নি। তাছাড়া স্থানীয় সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগণে শান্তি ফিরে এসেছে, এতে করে শান্তিবাহিনীর প্রপাগান্ডা আর বাজার পাচ্ছেনা। ফলে এলাকায় শান্তি বিরাজ করছে।
৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯০	সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিবাদ	২৭ আগস্ট কাপ্তাই উপজেলা হলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাঙ্গামাটি জেলার ইফনিট কমান্ডার শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানান। অন্যান্য বক্তারা উক্ত অপশক্তির সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাতের আহভান করেন।
২৪ অক্টোবর ১৯৯০	উপেন্দ্র লাল চাকমার নীতি ও আদর্শের সমালোচনা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরন দেওয়ান এক বিবৃতিতে বলেন স্বদেশত্যাগী উপেন্দ্রলাল চাকমা ভারতসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালিয়ে শান্তিকামী পার্বত্যবাসীর সম্মান বিনষ্ট করছে। গোটা উপজাতীয় সম্প্রদায়সহ দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করার হীন ষঢ়যন্ত্রে লিপ্ত উপেন্দ্রলাল চাকমাকে পার্বত্যবাসী ও দেশবাসী ক্ষমা করতে পারে না। মুক্ত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়ায় নিবেদিত সেই সময়ে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে সুবিধাবাদী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা উপজাতীয়দের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে উদেশ্য প্রণোদিত ও উস্তানীমূলক বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে ইসলামীকরণ, নারী নির্যাতন ইত্যকার বাস্তববর্জিত বিবৃতি দিয়ে গোটা উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ত্রিপুরার কথিত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়ের নামে অসহায় উপজাতীয়দের আটকে রাখার জন্যেও উপেন্দ্রলাল চাকমাকে দায়ী করেছেন সমীরন দেওয়ান।
৭ নভেম্বর ১৯৯০	জনসংহতি সমিতি কর্তৃক হুমকি রবং মৃত্যুদন্ড ঘোষণা	৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় পার্বত্য জনসংহতি সমিতির ৪ জন উপজাতীয় সদস্য এবং বাঙালি ৪ জন সহ মোট ৮ জন, সদরঘাট রোডস্থ দৈনিক গিরিদর্পণ এর অফিসে হুমকি দেয়। কেননা সাংবাদিকরা ”শান্তিবাহিনী” লেখার

		বদলে "সন্ত্রসীবাহিনী" লিখছে তাই। সংবাদে আরও বলা হয় ফেব্রুয়ারী মাসে এক চিঠিতে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদেও তিন চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সাংবাদিকদেও সাথে গিরিদর্পণ পত্রিকার সম্পাদককে মৃত্যুদন্ড দেয়ার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গুমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে ঝড় উঠলে জনসংহতি সমিতি ঘোষণার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।
২৬ নভেম্বর ১৯৯০	সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান	রাঙ্গামাটি সদও উপজেলাধীন সকল মৌজার হেডম্যান ও গ্রামের কর্মচারিদের এক সমাবেশে বক্তারা শান্তিবাহিনীর সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।
৮ ডিসেম্বর ১৯৯০	অস্ত্রের ভয়ে জনগণের সন্ত্রাসীদের সাহায্য	স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা ধর্মচন্দ্র ১৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে জানান সাধারণ জনগণ অস্ত্রের ভয়ে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করতে বাধ্য হচ্ছে।
	সাপ্তাহিক বনভূমি [১০৮]	
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান উদ্দেশ্যে নারী নির্যাতন ও বিলাসিতা	আত্মসমর্পণকারী সন্ত্রাসীদের অন্যতম নেতা মি. হিরন্ময় চাকমা ওরফে চেঙ্গিস খান বনভূমি সাক্ষাৎকারে বলেন যে, পাবত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীদের প্রধান উদ্দেশ্য হল নারী নির্যাতন ও বিলাসিতা।
১২ নভেম্বর ১৯৭৮	আত্মসমর্পণকারীদের পুনর্বাসন	পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসবাদী যারা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং জেলা প্রশাসকের নিকট আত্মসর্মপণ করেছেন তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী পুনর্বাসন করা হচ্ছে।
৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৮	বরকলে ২৫০ জনের আত্মসমর্পণ	২০ ডিসেম্বর ১৯৭৮ বরকল থানার ১৩৭জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও ১১৩জন সন্ত্রাসবাদী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার নিকট আত্মসমর্পন করেছে।
২ মার্চ ১৯৮০	বিপথগামী যুবকদের প্রতি প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহ্বান	২৩ ফেব্রুয়ারি বান্দরবানের জনসভায় প্রেসিডেন্ট জিয়া বিপথগামী যুবকদের প্রতি আত্মসমর্পনের আহ্বান জানান এবং বলেন বহু বিভ্রান্ত যুবক ফিরে এসে অস্ত্র জমা দেওয়ার পর তাদের ক্ষমা করা হয়েছে এবং পুনর্বাসনর করা হয়েছে।
৬ এপ্রিল ১৯৮০	কলমপতিতে শান্তিবাহিনীর অগ্নিসংযোগ	২৫ মার্চ সকাল নয়টায় শান্তিবাহিনী কলমপতি ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে মোট ৩০০ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং কিছু সংখ্যক বাঙালিকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
২০ জুলাই ১৯৮০	শান্তিবাহিনী কর্তৃক পুলিশ অফিসার অপহরণ।	১৪ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জুরাছড়ি থানার এস আই আক্তারুজ্জামান ও এ এস আই জনাব শফি উদ্দিন নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করতে একটি গ্রামের বাড়িতে যাবার সময় পথে শান্তিবাহিনীর সদস্যগণ তাদের অপহরণ করে।
৩ আগস্ট ১৯৮০	শান্তিবাহিনী কর্তৃক এস আই খুন	১৪ জুলাই জুরাছড়ি থানার এস আই আক্তারু জ্জামান ও এ এস আই সফিউদ্দীনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।
৩ আগস্ট ১৯৮০	শান্তিবাহিনী কর্তৃক খাদ্য ভর্তি নৌকা লুঠ।	২৩ জুলাই খাগড়াছড়ি মহকুমা হেডকোয়ার্টারের সরকারি খাদ্য বোঝাই নৌকা লুন্ঠন করেছে শান্তিবাহিনীরা।

[১০৮] সাপ্তাহিক বনভূমি, পুস্তক-সংবাদপত্র সংগ্রহ শাখা, যোজন সংখ্যা ১৩৭, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, ঢাকা।

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮০	শান্তিবাহিনীর হামলায় হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত	১৫ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেতবুনিয়া থানার কলমপতি ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রামে শান্তিবাহিনী হামলা চালায়, যাতে ১৬ জন নিহত, ২৫ জন আহত, ৫৫৪টি ঘরবাড়ি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সর্বমোট হাজারটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১	রাইফেলস ব্যাটালিয়ানের সাথে সংঘর্ষে শান্তিবাহিনীর সদস্য হতাহত	১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলায় রুপকারিতে বাংলাদেশ রাইফেলস ব্যাটালিয়ানের সাথে সংঘর্ষে শান্তিবাহিনীর ৬ জন সদস্য নিহত এবং ২ জন আহত হয়েছে।
২৮ জুন ১৯৮১	মাটিরাঙায় শান্তিবাহিনীর আক্রমণ	২৬ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে মাটিরাঙা থানার বান্দরছড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রে শান্তিবাহিনী আক্রমণ করে। এতে ১২ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়।
১৬ আগস্ট ১৯৮১	শান্তিবাহিনী একটি ব্যধির নাম	সাবেক সাংসদ বাবু চাংখোয়াই রোয়াজা ৫ আগস্ট মাটিরাঙায় এক বিশাল জনসভায় বলেন, শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ব্যধি। এই ব্যধি নির্মূল করতে হলে ট্রাইবেল কনভেনশনকে পুনরুজীবিত করা লাগবে।
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১	শান্তিবাহিনীর মধ্যে কোন্দল	শান্তিবাহিনীর মধ্যে মতপার্থক্য বিগত কয়েকমাস ধরে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।
৬ ডিসেম্বর ১৯৮১	শান্তিবাহিনী কর্তৃক বি ডি আর ক্যাম্প ধ্বংস	৩০ নভেম্বর সোমবার রাত ৪টার সময় শান্তিবাহিনীর প্রায় দুই থেকে আড়াইশ জনের একটি দল বাঘাইছড়ি থানার মরিশ্যাস্থ নবনির্মিত বি ডি আর ক্যাম্প বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে উড়িয়ে দেয়।
১০ জানুয়ারি ১৯৮২	শান্তিবাহিনী গুলিতে কন্ট্রাক্টর নিহত	১৯ ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় চন্দ্রঘোনা থানার চিতমরম গ্রামে শান্তিবাহিনী কামাল নামে এক কন্ট্রাক্টরকে গুলি করে হত্যা করে।
৬ মার্চ ১৯৮৩	পুলিশ ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর হামলা	১ মার্চ শান্তিবাহিনী মাছালং পুলিশ ক্যাম্প এবং মাছালংস্থ কে পি এম অফিসে আকস্মিক হামলা চালায়. এতে ২ জন নিহত এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে।
২৪ জুলাই ১৯৮৩	শান্তিবাহিনীর দুই পক্ষে সংঘর্ষ	১৪ জুন শান্তিবাহিনীর দুইদলের সংঘর্ষের ফলে বাতাসে লাশের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্য দিকে সাধারণ জনগণ মনে করছে, খুনোখুনি করে নিজেরা মরবে, জনগণকেও মারবে।
৭ আগস্ট ১৯৮৩	শান্তিবাহিনী এখন দুষ্কৃতিকারী	মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বাহিনী এখন দুষ্কৃতিকারী বলে জনশ্রুতি উঠেছে। লার্মা গ্রুপ প্রীতি গ্রুপকে ধবংসের পরিকল্পনা করেছে। শান্তিবাহিনী আগে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করত কিন্তু এখন দ্বিধাবিভক্তির পর শান্তিবাহিনী সন্ত্রাসীতে রূপান্তরিত হয়েছে।
২ অক্টোবর ১৯৮৩	শান্তিবাহিনীর দুই গ্রুপে তুমুল যুদ্ধ	১৯ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ৯টায় দীঘিনালা থানার অর্ন্তগত ৪ নম্বর জারুলছড়ি মৌজার দারিকানাথ হেডম্যানপাড়ার প্রীতি গ্রুপ ও লারমা গ্রুপে তুমুল সংঘর্ষে লারমা গ্রুপের একজন সদস্য ঘঁনাস্থলেই মারা গেছে। ২২ সেপ্টেম্বর দীঘিনালা থানার ছোট মেরুংপাড়া গ্রামে আবারও শান্তিবাহিনী দুগ্রুপের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। ২২ সেপ্টেম্বর

		দীঘিনালা থানার ৫/৬৯ মাইল উত্তরে রাঙ্গাপানি মৌজায় আবার লম্বা, বট্টি গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে।
২০ নভেম্বর ১৯৮৩	শান্তিবাহিনী প্রধান মানবেন্দ্র লারমা নিহত	প্রাক্তন সংসদ সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা গত ১০ নভেম্বর ভারতের ইশায়া গ্রামের বাঘমারা ক্যাম্প (শান্তিবাহিনী কথিত কল্যাণপুর) প্রীতিকুমার গ্রুপের সুইসাইডেল স্কোয়াড বাহিনীর সদস্যদের অতর্কিত হামলায় নিহত হয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সুত্র প্রকাশ পায় যে, এই আক্রমণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বড় ভাই ভুলু লারমা, সন্তু লারমার শ্যালক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মনিময় দেওয়ান, খাগড়াছড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অর্পন চরণ চাকমা, লে: রিপনসহ মোট ৮জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন।
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪	শান্তিবাহিনী সদস্যের আত্মসমর্পণ	রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের সাধারণ ক্ষমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পানিয়ার চরে, রাঙামাটিতে এবং বাঁশখালীতে মোট ৭৭ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে।
১ এপ্রিল ১৯৮৪	শান্তিবাহিনীর দুদলে সংঘর্ষ	প্রীতি গ্রুপের কোন্দলের ফলে দুদলে সংঘর্ষ দানা বাঁধে। সংঘর্ষের ফলে প্রীতি গ্রুপের ১০ জন এবং লার্মা গ্রুপের ৩ জন নিহত হয়।
২০ মে ১৯৮৪	জনসংহতি সমিতির আগরতলা ষড়যন্ত্র এবং বুকলেট প্রদান	১৮ মে সন্তু লারমা জনসংহতি সমিতির তিন নেতাকে আগরতলার কোন একটি বি এস এফ ক্যাম্পে নজরবন্দী করে রাখে। অন্যদিকে গত ২৩ শে জানুয়ারি সমিতির পক্ষ থেকে একটি বুকলেট বের করা হয়। বুকলেটে লার্মা গ্রুপের সাথে দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়।
৮ জুলাই ১৯৮৪	শান্তিবাহিনীর দুদলের আত্মঘাতী সংঘর্ষ	৭ জুলাই শান্তিবাহিনীর দুদলের এক আত্মঘাতী সংঘর্ষে লার্মা গ্রুপের কমপক্ষে ২০ জন নিহত, ১৮ জন আহত এবং ৭ জন আটক হয়।
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪	পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনীর অশুভ তৎপরতা	অখণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনী চাঁদা আদায়, অসহায় পুনর্বাসিতদের উপর আক্রমণ এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্টের মাধ্যমে তাদের অশুভ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।
৭ অক্টোবর ১৯৮৪	লার্মা গ্রুপের সদস্যদের মৃত্যুর আশঙ্কা	আটক বিদেশিদের মুক্তিপণে আদায়কৃত সোনা ভাগাভাগি নিয়ে শান্তিবাহিনীর লার্মা গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মেজর মিহির ও মেজর দেবাশীষসহ মোট ১৭ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়।
১৪ অক্টোবর ১৯৮৪	পার্বত্যাঞ্চলে শান্তিবাহিনীর ত্রাস	সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে সান্তিবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের বেশ কিছু স্থানে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালায় যাতে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।
২৮ অক্টোবর ১৯৮৪	শান্তিবাহিনীর দুই গ্রুপের মধ্যে আত্মঘাতী হামলা	১৯ অক্টোবর সকাল ৭টায় শান্তিবাহিনীর দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। এতে প্রীতি গ্রুপের ৫ জন আহত হন।
৩০ অক্টোবর ১৯৮৫	শান্তিবাহিনী সদস্যদের মুক্তিদান	রাঙ্গামাটি সাব জেল থেকে গত ১৪ অক্টোবর আরও ২৬ জন শান্তিবাহিনী সদস্যদের মুক্তি দেয়া হয়েছে।
১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫	চাকমাদের অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে সামনে রেখে	পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চাকমাদের অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে সামনে রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট লে:

	উদ্যোগ গ্রহণ	জেনারেল এইচ এম এরশাদ আলোচনায় বসে।
৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬	উপজাতীয়দের পুনর্ববাসন শুরু	ভারতে আশ্রয় নেয়া উপজাতীয়রা নিজ নিজ ভূমিতে পুনর্বাসন করতে শুরু করেছে। এছাড়া সরকারি ভাবেও ১১৯টি পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪ মে ১৯৮৬	শান্তিবাহিনীর অগ্নি সংযোগ	২৯ শে এপ্রিল রাতে সশস্ত্র শান্তিবাহিনী মরনকালের অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শিশু ও নারী সহ প্রায় ৫০ জনকে নিহত ও প্রায় ৭০ জনকে আহত করেছে। এয়াড়া ব্রাশ ফায়ারে পাঁচ শতাধিক ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হয়।
১৮ মে ১৯৮৬	শান্তিবাহিনীতে ভারতীয় উস্কানী রয়েছে।	বাংলাদেশে পাবর্ত্যঞ্চলে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতায় ভারতীয় ইন্দ্ধন রয়েছে বলে গতকাল অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ফ্ল্যাগ বৈঠকে বাংলাদেশের মুখপাত্র সুস্পষ্ট অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।
২৫ মে ১৯৮৬	বিপথগামী ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।	বিপথগামী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য ২৫ মে থেকে ২৫ জুন পযর্ন্ত পুনরায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।
১০ জানুয়ারি ১৯৮৭	জনসংহতি সমিতির প্রেরিত চিঠির পর্যালোচনা	১৩ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং পাহাড়ি বাঙালি নেতৃবৃন্দের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং জনসংহতি সমিতির চিঠি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতির সাথে শান্তিবাহিনীর আলোচনার জন্য জনসংহতি সমিতির নিকট চিঠি পাঠান হয়। প্রতিউত্তওে তারা বৈঠকে বসার ব্যাপাওে আগ্রহ জানায়।
৩ জানুয়ারি ১৯৮৮	সরাকারী-বেসরকারি যৌথ উদ্যেগে সমস্যা সমাধান সম্ভব	২২ ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর রাঙামাটি অঞ্চলের নবাগত রিচিয়ন কমান্ডার কর্নেল ইমামুজ্জামান বি বি পি এস সি বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরাকারী-বেসরকারি পর্যায়ে কাজ চারিয়ে যেতে হবে।
৮ মে ১৯৮৮	শান্তিবাহিনীর হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় মিছিল	পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড এবং ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনী নিধনের প্রতিবাদে খেলাফত আন্দোলন ঢাকা মহানগরী শাখা ৬ মে এক বিক্ষোভ মিছিল বের কওে। মিছিলের বিবৃতিতে বলা হয় সরকারের গাফিলতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলো দিন দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।
৮ মে ১৯৮৮	শান্তিবাহিনীর এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তগ্রেফতার	খাগড়াছড়ি শহর থেকে দুই মেইল দক্ষিণে কমলছড়ি গ্রামে আইন শৃঙ্খলাবাহিনী শান্তিবাহিনীর এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা রিপন চাকমাকে এশটি স্টেনগান, তিনটি ম্যাগাজিন ও ২০০ রাউন্ড গুলিসহ গ্রাফতার করে।
২৩ অক্টোবর ১৯৮৮	শান্তিবাহিনী কর্তৃক নারী ও শিশু প্রহৃত	রাঙ্গামাটি সদও উপজেলার মগবান ইউনিয়নের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারী উপজাতীয় পরিবারের নারী ও শিশু সহ মোট ২৩ জনকে শান্তিবাহীনি প্রহৃত করে। জানা যায় চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য ১২ অক্টোবর উক্ত ঘঁনাটি ঘটে।
৩০ অক্টোবর	শান্তিবাহিনীর কারণে	১০ অক্টোবর শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সীমান্ত অতিক্রম করানোর স্বার্থে

১৯৮৮	উপজাতীয়দের গৃহত্যাগ	রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি গ্রামের উপজাতোয়দেও জোরপূর্বক গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ফলে উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা সীমাহীন কষ্টে দিন কাটায়।
১৬ এপ্রিল ১৯৮৯	দীঘিনালায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অপহৃত	১১ এপ্রিল খাগড়াছড়ির দীঘিনালার বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনন্ত বিকাশ চাকমাকে ২ এপ্রিল শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করে। জানা গেছে চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ বিল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহিত কর্মসুচীর সাথে একাত্বতা ঘোষনা করায় তাকে আপহরন কওে।
১ মে ১৯৮৯	শান্তিবাহিনী কর্তৃক নিরীহ ব্যাক্তি নিহত	শান্তিবাহিনীর পৃথক পৃথক ৪টি হামলায় নিরীহ ২৪ জন ব্যাক্তি নিহত হয়।
৭ মে ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত	সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম বলেন বিদেশী প্রভুর পদলেহী দাস শান্তিবাহিনী ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছিল যা ১৯৮৯ সালেও অব্যাহত রেখেছে। শান্তিবাহিনী সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিগত সময়ে ৩০ হাজার মানুষকে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।
২১ মে ১৯৮৯	মার্মা জনকল্যাণ সংঘ প্রতিবাদ সভা	১৭ সেপ্টেম্বর শান্তিবাহিনীর কর্মকান্ডের প্রতিবাদে মার্মা জনকল্যাণ সংঘ একটি সভা ডাকে।
১২ নভেম্বর ১৯৮৯	খাগড়াছড়িতে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার স্মরন সভা	পার্বত্য গ্রন্থ সুহৃদ সমিতির উদ্যেগে উপজেলা চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে ১০ নভেম্বর খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমী মিলনায়তনে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত উপজাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার স্মরন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরীন কোন্দলের কারনে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর পার্টিনেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা মৃত্যবরন করেন। বক্তারা বলেন আধিপত্যবাদী ভারতের ষড়যন্ত্রের কারনে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নিহত হন।
১৯ নভেম্বর ১৯৮৯	লংগদুতে ১০২ উপজাতীয় পরিবার শান্তিবাহিনীর কব্জা থেকে পালিয়ে এসেছে	লংগদুতে ১০২ উপজাতীয় পরিবার শান্তিবাহিনীর কব্জা থেকে পালিয়ে এসেছে। এসব উপজাতীয় পরিবার তথাকথিত শান্তিবাহিনীর প্রতারনার শিকার হয়ে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছিল। ২ নভেম্বও পর্যন্ত ১০২ টি পরিবারের ৫৩৩ জন সদস্য ফিওে এসেছে।
৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯	শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপের নিন্দা প্রকাশ	১৮ নভেম্বর দিঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত এক সভায় শান্তিবাহিনীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপের নিন্দা জানানো হয়।
২১ মে ১৯৯৮	শান্তিবাহিনী প্রতিরোধে কমিটি গঠন	১৬ মে বেতবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় শান্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ১৫ সদস্যের ইউনিয়ন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়

এটা কৌতুহল-উদ্দীপক যে 'আবার তারা ফিরে আসছে' শিরোনামে ১৯৮১ সালের ১৩ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রামের 'সাপ্তাহিক বনভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে লেখা হয়েছে যে, শান্তিবাহিনী নামের দুস্কৃতিকারীদের ভয়ে পাহাড়ি উপজাতিরা নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বন-জঙ্গলে ও ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্তমানে তারা সরকার কর্তৃক আশ্বাস পেয়ে ফিরে আসতে শুরু করেছে ও নিরাপদে বসবাস করছে। 'শান্তিবাহিনী হাইকমান্ডের অভিযোগ – শরণার্থী শিবিরে অত্যাচার চলছে' এই শিরোনামে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর 'সাপ্তাহিক বনভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ৫ নভেম্বর শান্তিবাহিনীর সদর দফতর দীঘিনালা থেকে শান্তিবাহিনীর হাই কমান্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বাক্ষরিত এক লিফলেটে অভিযোগ করা হয় যে, "আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বর্তমান ত্রিপুরায় শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত পাহাড়ি ভাই বোনদের দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আশা করেছিলাম ত্রিপুরা সরকার আমার মা বোনদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন, কিন্তু আমি জানতে পারলাম ভারতীয় বিএসএফ এর জোয়ানরা শরণার্থী ক্যাম্পে আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে চলেছে। ওদের কাছ থেকে আমরা ভালো ব্যবহার আশা করেছিলাম। ক্যাম্পগুলোর আশেপাশে স্থানীয় টাউটরা পাহাড়ি শরণার্থীদের যেটুকু সহায় সম্বল ছিল তাও লুটপাট করে নিয়ে গেছে। এরা আজ নিঃস্ব। আমি এখন বিবেকের জ্বালায় বলতে চাই, ওদের এই দুর্দশার জন্য আমিই দায়ী।" এরকম বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারি মদদপুষ্ট পত্রিকা জনমতকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছে। 'উপজাতীয় মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদীর কাছে জাতি মাথা নত করতে পারেনা' এই শিরোনামে ১৯৮৮ সালে ৮ মে 'সাপ্তাহিক বনভূমি' পত্রিকার খবরে প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন এরশাদের তথ্যমন্ত্রী মাহবুবুর রহমানের বক্তব্যের পরপরই দেখা যাচ্ছে যে প্রশাসনিকভাবে সমঝোতার তৎপরতা শুরু হয়েছে। 'সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত – বিক্ষুব্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল বিরোধের অবসান জাতীয় জীবনে স্বস্তি' ঃ ১৯৮৮ সালে ১৩ নভেম্বর 'সাপ্তাহিক বনভূমি' পত্রিকার খবরে প্রকাশিত হয়েছে, খবরটি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে সম্পদক স্বীকার করে নিয়েছেন 'শান্তিবাহিনী নামক দুস্কৃতিকারীদের' সাথে সমঝোতা হলে জাতীয় জীবনে স্বস্তি আসবে।

সাপ্তাহিক বনভূমি ও দৈনিক গিরিদর্পণ স্থানীয় পত্রিকাগুলো পাহাড়ের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনকে 'বিছিন্নতাবাদী সহিংস রাজনৈতিক তৎপরতা' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টায় নিবেদিত ছিল। বিশেষ করে পত্রিকাগুলো সেটলার বাঙালি পূর্নবাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টায় ছিল বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য মতে, 'শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের হাতে ২৫ হাজার বাঙালি নিহত হয়েছে। বাঙালি ছাড়াও অসংখ্য উপজাতিকে তারা হত্যা করেছে'। শান্তিবাহিনীর

আক্রমনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল পার্বত্যঞ্চলে বাঙালি অনুপ্রবেশ সেটি পত্রিকায় অনুপস্থিত থেকেছে বরারবই। তথ্যের বিশ্লেষনে নিরপেক্ষ শব্দটি যথারীতি অনুপস্থিত।

স্থানীয় পত্রিকাগুলোর আরেকটি মোটিভ ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে 'বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া চক্রান্ত' বলে প্রচার করা। ১৯৯৭-এ শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হবার আগ পর্যন্ত জাতীয় দৈনিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের খরব প্রকাশের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হতো। স্থানীয় সঠিক খবর পাওয়ার সুযোগ ছিলনা, এমনকি মিথ্যা খবরের প্রতিবাদ করারও তেমন কোনো সুযোগ ছিলনা।

পাহাড়িদের স্বায়ত্বশাসন-এর অধিকার দিলে 'পাবর্ত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন জুম্মল্যান্ড হয়ে বাংলাদেশ থেকে পৃথক হয়ে যাবে' এমন ভিত্তিহীন অভিমতকে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয়েছে। ফলে যে আদিবাসীদের ব্যাপারে যে বিভ্রান্তি জনমানসে তৈরি হয়েছে তার জন্য এ ধরণের সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা কম নয়।

৯.২. মুরংদের 'গরম বাহিনী'

পার্বত্য জেলার বান্দরবনে ষাটের দশকে Mro (ম্রো) নামে একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এ সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন উবা মারমা, জলহর মারমা, সাজেক মারমা। [১০৯] সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় বান্দরবান এলাকার আলিকদম, থানচিএবং নাইক্ষ্যংছড়িতে এ বাহিনীর উত্থান ঘটে। তাদের সাথে শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছিল। [১১০] এই প্রসঙ্গে হানাচরণ ত্রিপুরা বলেন,

> "মুরং বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন কমনম মুরুং ও দুখাও মুরং নামে বামা'র দুজন যুবক। তখনকার প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনী মুরংদের পাড়ায় আগুন দিয়ে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। অনেক সময় মুরংদের বিনা কারণে শারীরিক নির্যাতন করা হতো। এর প্রতিবাদে উক্ত দুজন মুরং যুবক এই বাহিনী গঠন করে"। [১১১]

বান্দরবানের মুরং জাতির অনেকে ১৯৮৩-৮৪ সালে শান্তিবাহিনীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে এম. এন. লারমার আকস্মিক মৃত্যুতে পার্বত্য এলাকার অন্য প্রান্ত অর্থাৎ উত্তোরাঞ্চল থেকে আগত কর্মীরা অনেকেই নিজনিজ এলাকায় ফিরে যায়। হঠাৎ শান্তিবাহিনীর শুন্যতা মুরংদেও বিচলিত করে। ফলে বিকল্প ব্যবস্থা স্বরূপ পরিস্থিতি

[১০৯] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।
[১১০] ঐ।
[১১১] ঐ।

মোকাবেলা করার জন্য শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। [১১২]এ প্রেক্ষাপটে কমনম মুরং এবং দুখাও মুরং নামে দুই যুবক নিজস্ব নেতৃত্বে মুরং সংগঠন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে হানা চরণ ত্রিপুরা এ সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, যদিও ইতোপূর্বে তিনি শান্তিবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ সংগঠনে থানচি, লামা, বান্দরবান, আলীকদম, নাইক্ষ্যাংছড়ি থেকে মোট তিনশত পঁচাত্তর জন সদস্য ছিল। শান্তিবাহিনীর বিপক্ষে মুরং বাহিনীর অবস্থানকে তৎকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র মুরংদের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে সরকার এ সংগঠনের সদস্যদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকারের 'গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির' (VDP) আওতায় সদস্য-প্রতি মাসিক ৪৫০ টাকা এবং প্রতি সেকশন কমান্ডারের জন্য ৬২২ টাকা বেতন হিসেবে নির্ধারণ করে। এটিও ছিল সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তকরণ কর্মসূচির একটি অংশ। মুরং সংগঠনে হানাচরণ ত্রিপুরার ভূমিকা তাকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে মুরং বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত করায়। হানাচরণ ত্রিপুরা এরিয়া কমান্ডার ছিলেন। তিনি বান্দরবান এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তার সহযোগী ছিলেন মেনলে মুরং। [১১৩]

থানচি এবং আলিকদমের মাঝামাঝি একটা স্থানে মুরং বাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। [১১৪] শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে মেনলে মুরং পঙ্গু হয়ে যান এবং হানাচরণ কোনরকমে প্রাণে বেঁচে যান। [১১৫] মুরং বাহিনী প্রসঙ্গে সন্তু লারমা বলেন ঃ [১১৬]

> "বান্দরবানে বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করেন। প্রথমদিকে জনসংহতি সমিতি এখানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এই সংগঠনে জনগণের জোরালো অংশগ্রহণ ছিল। তবে গৃহযুদ্ধের পর মুরংদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কারণ তারা লেখাপড়া জানে না, রাজনৈতিকভাবেও সচেতন নয়। ৪ নং সেক্টরের বিভেদপন্থীদের সাথে মিশে তারা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়েছে। কারণ এই এলাকা জুড়ে লামা, আলিকদম, রুমার কিছু অংশ ছিল বিভেদপন্থীদের ঘাঁটি। বিভেদপন্থীরা অনগ্রসর মুরং জাতিকে ব্যবহার করেছে।"

১০. সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত

১০.১ নিরাপত্তাবাহিনীর নেতৃত্বে সংঘাত

শান্তিবাহিনীর নানা প্রতিপক্ষ ছিল যাদের সাথে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আন্দোলন করতে অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। শান্তিবাহিনীর সবচেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলো বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনে শান্তিবাহিনীর বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

---

[১১২] ঐ।
[১১৩] ঐ।
[১১৪] ঐ।
[১১৫] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।
[১১৬] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২৫/০৭/২০০৩।

সারণি ১৭ ঃ নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনে আহত, নিহত ও গ্রেফতারকৃত শান্তিবাহিনীর সদস্য তালিকা [১১৭]

উৎসর	নিহত	আহত	গ্রেফতারকৃত
১৯৭৯ পর্যন্ত	৫২	০৪	-
১৯৮০	২৩	১৫	-
১৯৮১	০৮	০৫	-
১৯৮২	০৮	০৭	-
১৯৮৩	০৩	-	-
১৯৮৪	২১	১০	-
১৯৮৫	১১	০৫	-
১৯৮৬	০৫	০২	২৯৯
১৯৮৭	১০	০৮	২৫৪
১৯৮৮	০৯	০২	৩০১
১৯৮৯	২৯	০৫	৩৯০
১৯৯০	৮০	০৮	৩৫৫
১৯৯১ (৩০ নভেম্বর পর্যন্ত)	১৭	১৩	২৯৩
মোট	২৩৬	৮৪	১৮৯২

শান্তিবাহিনীর নিকট থেকে অনেক গোলাবারুদ ও অস্ত্র উদ্ধার হয় নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১৮ ঃ শান্তিবাহিনীর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা [১১৮]

বৎসর	এলএমজি	এসএমজি	রাইফেল	পিস্তল	এসবিবিএল/সিভিল বন্দুক	গ্রেনেড	মর্টার	অ্যামুনিশন	মাইন
১৯৭৮	০১	০৪	৩৭	০৪	০৬	০৪	-	১৯৯৯	-
১৯৭৯	০২	০৪	০৮	-	১১	০৬	-	৮৯৮	-
১৯৮০	-	০৬	২১	০৪	২৪	১১	-	২৮০৮	-
১৯৮১	০৩	০২	২৪	-	১৩	০৩	-	২৫২০	-
১৯৮২	-	০৬	১৭	০১	১১	০২	-	১৮৩৮	-
১৯৮৩	-	০৫	২৪	-	২৮	০৬	-	১৬২৬২৩	-

[১১৭] মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ১২৯। সরকারী রেকর্ডের বরাত দিয়ে তিনি এ সমস্ত তথ্য দিয়েছেন।

[১১৮] ঐ।

১৯৮৪	০৫	৩০	৪৩	০২	২৩	১৬	০১	৩৩২১১	-
১৯৮৫	২০	৪২	১৩৪	০৩	৮৫	৯৯	০২	১৪৮১৮	-
১৯৮৬	-	০৫	০৫	০১	৩৭	৫৭	-	৩৯১২৭	-
১৯৮৭	-	০৯	০৮	-	১৯	০৪	-	১৭০৫	-
১৯৮৮	০১	১১	০৪	-	২৬	১০	-	১৯৫৮	-
১৯৮৯	০২	১৪	২১	১০	৬৫	১৪	০৭	২৯১৩৬	-
১৯৯০	-	১১	২৭	০৭	৯৮	১৭	-	৩৪৩৫	০২
১৯৯১ নভেম্বর পর্যন্ত	-	১৬	১৯	০৫	৬২	৪৯	৫৪	৩০৩০	০১
মোট	৩৪	১৬৫	৩৯২	৩৭	৫০৮	২৯৮	৬৪	২৯৯১০৬	০৩

১০.২. শান্তিবাহিনীর অপারেশন

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনে শান্তিবাহিনীর যেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তেমনি শান্তিবাহিনীও বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি সেটলারদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। নিম্নে শান্তিবাহিনীর উল্লেখযোগ্য অপারেশনসমূহের উল্লেখ করা হলো।

(ক) খাগড়াছড়ি অঞ্চল[১১৯]

১৭ জুলাই ১৯৭৮- খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি থানার ডাইনছড়িতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা বাঙালি গ্রামে হামলা ও লুটপাট করে একজন বাঙালিকে হত্যা করে।

২৭ জুন ১৯৭৯ - শান্তিবাহিনী কাটাছড়ি বাঙালি গ্রামে হামলা করে একজন বাঙালিকে হত্যা এবং একজনকে অপহরণ করে।

৬ জুলাই ১৯৭৯ - বড়াদম আদর্শ গ্রামে শান্তিবাহিনী চারজন বাঙালিকে হত্যা করে।

১৪ অক্টোবর ১৯৭৯ - ১৪ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি টহল দল শান্তিবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে ৫জন নিহত এবং ১২জন আহত হয়।

৫ ডিসেম্বর ১৯৭৯ - প্রায় ১০০জন শান্তিবাহিনী সদস্য খেদারছড়া এবং ধল্যা গ্রামে বাঙালিদের বাড়ি-ঘর লুট করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

১১৯ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১০-১১৫।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ - শান্তিবাহিনীর সদস্যরা রঙ্গীপাড়া বাঙালি শরণার্থী ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ২জনকে হত্যা এবং অনেককে আহত করে। বাঙালিদের প্রায় ৪০০ ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯ - শান্তিবাহিনীর প্রায় ৪০জনের একটি দল সরকারি জরিপ কাজে নিয়োজিত একটি দলের উপর হামলা করে তাদের তাবু, বাইনোকুলার, ব্যারোমিটার, গ্রাউন্ড শীট, বিদেশিদের পাসপোর্ট, টাকা-পয়সাসহ সককিছু লুট করে এবং ৫জন বিদেশী ও ৯জন বাঙালিকে অপহরণ করে।

২ জানুয়ারি ১৯৮০ - শান্তিবাহির্নী বেলছড়ি গ্রামের ৫জন বাঙালিকে হত্যা ও ১২জন বাঙালিকে অপহরণ করে এবং ১৪০টি ঘর জ্বালিয়ে দেয়।

২৩ জানুয়ারি ১৯৮০ - শান্তিবাহিনী খাগড়াছড়ি জেলার পশ্চিমে তানাক্কাপাড়া বিওপি-তে হামলা করে। এতে ৩জন নিহত এবং ৬জন আহত হয়।

২৬ জানুয়ারি ১৯৮০ - পোংপাড়া বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনী আক্রমণ করে ১জনকে হত্যা ও ৬৯জনকে আহত করে এবং ৭৮টি বসত ঘর, ২টি দোকান এবং ১টি মাদ্রাসা পুড়িয়ে দেয়।

৪ আগষ্ট ১৯৮৪ - শান্তিবাহিনী পুজগাং ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য সূর্যসেন চাকমাকে হত্যা করে এবং কামিনী কুমার পাড়া হতে ৪জন আদিবাসীকে অপহরণ করে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫- শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণকৃত সদস্য বৃহৎ চাকমা, তার স্ত্রী ও ২ সন্তানকে শান্তিবাহিনী হত্যা করে।

৪ মার্চ ১৯৮৫ - নন্দরাম নামক শ্রমিকদের অস্থায়ী ছাউনীতে শান্তিবাহিনী হামলা করে। এতে ৬জন বাঙালি শ্রমিক নিহত এবং ১৫জন আহত হয়।

২৯ এপ্রিল ১৯৮৬ - শান্তিবাহিনীর ৪টি পৃথক দল খাগড়াছড়ি জেলার তাইনডং, আসালং, শনটিলা এবং তানাক্কাপাড়া নামক স্থানেএকযোগে হামলা করে ৩৮জন বাঙালিকে হত্যা ও ২৬জনকে আহত করে এবং দুইশত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

১৩ মে ১৯৮৬ - পানছড়ি থানার ফাতিমানগর নামক বাঙালি বসতির উপর শান্তিবাহিনী হামলা করে ১০জন বাঙালিকে হত্যা এবং ৭জনকে আহত করে।

১৮ মে ১৯৮৬ - দীঘিনালা থানার কোবাখালীতে শান্তিবাহিনী ৮জন বাঙালিকে নিহত ও ৫জনকে আহত করে এবং ৩২টি বাঙালি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

১ জুলাই ১৯৮৬ - ওসমান পল্লী বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৯জন বাঙালি নিহত, ৪জন আহত এবং ৯টি ঘর-বাড়ি পুড়ে যায়।

১৩ জুলাই ১৯৮৬ - রামগড় থানাধীন এক বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনী গুলি করে ৭জনকে হত্যা ও দুই জনকে আহত করে এবং ১২টি বাড়িতে আগুন দেয়।

১৯ জুলাই ১৯৮৬ - দিঘীনালা থানাধীন ৪১ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি পিকআপ টহল দানের সময় শান্তিবাহিনীর অ্যাম্বুশের শিকার হলে ১জন নিহত ও ৭জন আহত হয়।

২২ জুলাই ১৯৮৬ - পানছড়ি বাজার থেকে ফেরার পথে ৬জন উপজাতি অপহৃত হয় এবং পরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

২০ আগষ্ট ১৯৮৬ - পানছড়ি থানাধীন বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৫জন নিহত এবং ৯জন আহত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ - পানছড়ি থানার নলাকাটা গ্রামের নিকট বিডিআর-এর জিপের উপর শান্তিবাহিনী গুলি চালালে পিডিপির ১ প্রকৌশলী ও ১জন বাঙালি নিহত এবং ২জন আহত হয়।

৩ অক্টোবর ১৯৮৬ - রামগড়ের উত্তরে লক্ষীছড়ি বিওপি ও নিকটস্থ অভয়ছড়া গ্রামে শান্তিবাহিনীর গুলিতে ৭জন পুরুষ ও ৩জন মহিলা নিহত হয়।

১৬ নভেম্বর ১৯৮৬ - ৩২জন বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের শ্রমিক ছিদ্দিকছড়ি হতে বাঘাইহাটে যাওয়ার পথে শান্তিবাহিনী দ্বারা অপহৃত হয়। তার দুই দিন পর ২৪জনের মৃতদেহ ও ১জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬ - রামগড় থানার হাজাছড়া গ্রামে শান্তিবাহিনীর হামায় ১০জন বাঙালি নিহত এবং ৪জন আহত হয়।

১৭ ডিসেম্বর১৯৮৬ - রামগড় থানাধীন বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৪জন বাঙালি নিহত হয়। একই দিনে মারিশ্যা এলাকার ছোটমেরুং-এ ক্ষেতে কাজ করার সময় শান্তিবাহিনীর গুলিতে ৫জন বাঙালি নিহত হয়।

২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬ - শান্তিবাহিনী রামগড় বাজার, কাজীবাড়ি, সোনাইছড়ি ইত্যাদি স্থান ও গ্রামে হামলা করে ১৯জন বাঙালিকে হত্যা ও ৪০জনকে আহত করে এবং ৫০টি ঘরবাড়ি ও দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬ - শান্তিবাহিনী সড়ক মেরামতের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে ৫জন শ্রমিক নিহত, ২জন শ্রমিক আহত ও একজন নিখোঁজ হয়।

১২ জানুয়ারি ১৯৮৭ - শান্তিবাহিনীর ছোড়া হাত বোমায় খাগড়াছড়ি সিনেমা হলে ২জন বাঙালি নিহত ও ৯জন আহত হয়। একই দিনে খাগড়াছড়ি শহরের নিকটবর্তী পেয়ারাছড়া গ্রামে ৩জন বাঙালিকে হত্যা করে।

৪ মে ১৯৮৭ - মানিকছড়ি সড়কের উভয় পাশে বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনী বেপরোয়া গুলি চালায় এতে ৭জন বাঙালি নিহত ও ১জন আহত হয়।

১ জুন ১৯৮৭ - খাগড়াছড়ির যতিন মেম্বার পাড়ায় শান্তিবাহিনীর হামলায় ৬জন বাঙালি নিহত ও ২জন আহত হয় এবং ১০টি বাড়ি ভস্মীভূত হয়। একই দিনে নোলংছড়ায় শান্তিবাহিনী ৫জন বাঙালিকে হত্যা, ১জনকে আহত এবং ১৯টি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

২৪ জুন ১৯৮৭ - শান্তিবাহিনী পানছড়ি থানার বাগাপাড়া প্রাইমারি স্কুল জ্বালিয়ে দেয়।

৪ জুলাই ১৯৮৭ - শান্তিবাহিনীর গুলিতে মাটিরাংগা থানার বর্ণাল গ্রামের ৪জন বাঙালি নিহত ও ১জন আহত হয়।

২৩ অক্টোবর ১৯৮৭ - গুইমারার নিকটে কইতরপাড়া বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৮জন বাঙালি নিহত এবং ৩টি বাড়ি ভস্মীভূত হয়।

১১ জানুয়ারি ১৯৮৮ - খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি থানার মঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৮জন বাঙালি নিহত ও একজন আহত হয়।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ - গুইমারা জোনের রসুলপুরে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৪জন বাঙালি নিহত, ৩জন আহত, ৭টি বাড়ি ও ২টি গরু ভস্মীভূত হয়।

২৪ এপ্রিল, ১৯৮৮ - শান্তিবাহিনীর হামলায় খাগড়াছড়ি শহরের অনতিদূরে কুমিল্লাটিলা গ্রামে ৭জন বাঙালি নিহত এবং ৬জন আহত হয়।

২৬ এপ্রিল ১৯৮৮ - খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাংগা থানার দেওয়ানবাড়ি ও সওদাগরপাড়ায় শান্তিবাহিনী গুলিবর্ষণ করলে ৫জন বাঙালি নিহত ও ১জন আহত হয়। তারা প্রায় ৫০টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং এতে ৩০টির বেশি গরুবাছুর আগুনে পুড়ে মারা যায়।

২মে ১৯৮৮ - মানিকছড়ি থানার মলঙ্গিপাড়া বাঙালি গ্রামে শান্তিবাহিনী হামলা চালিয়ে ৮জনকে নিহত এবং ১০জনকে আহত করে।

৮ মে ১৯৮৮ - গুইমারার নিকটে উলুকছড়ি এলাকায় শান্তিবাহিনী ৩জন বাঙালিকে হত্যা ও ১জনকে আহত করে এবং ৪টি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

২১ মে ১৯৮৮ - গুইমারার নিকটবর্তী রাঙাপানিতে শান্তিবাহিনী ৫জন বাঙালিকে হত্যা ও ১জনকে আহত করে।

১৩ জুলাই ১৯৮৮ - মাটিরাঙা থানার মুসলিমপাড়ায় শান্তিবাহিনীর গুলিতে ৪জন বাঙালি নিহত ও ৭জন আহত হয় এবং ৩৬টি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

(খ) কাপ্তাই অঞ্চল[১২০]

১০ অক্টোবর, ১৯৭৭ - ফারুয়া থেকে রেংক্ষিয়ং খাল অতিক্রম করার সময় শান্তিবাহিনী একটি যাত্রীবাহী লঞ্চের উপর অ্যামবুশ করে। শান্তিবাহিনী পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন যে, এই লঞ্চে মহালছড়ি থানার আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ান এর অধিনায়ক যাচ্ছেন। অ্যামবুশের ফলে ৪জন পুলিশ ও ৫জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত এবং ১০জন পুলিশ ও ৪জন বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়। শান্তিবাহিনী ২টি নয় মি.মি এসএমজি, ৯টি ৩০৩ রাইফেল ও প্রায় ১, ০০০ গুলি লুট করে।

৫ জুলাই ১৯৭৯ - শান্তিবাহিনী নতুন বাজার গ্রাম হতে ১০জন স্থানীয় হেডম্যান ও কার্বারী এবং ২জন আনসারকে অপহরণ করে ও পরে তাদের হত্যা করে।

১৮ জুলাই ১৯৭৯ - ৬০/৭০জনের শান্তিবাহিনীর একটি দল ধোপারমুখ নামক স্থান হতে ৭জন অধিবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাদের ৫জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

১ মার্চ ১৯৮০ - ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি থাচি হতে বন্দুকছড়ি ফেরত আসার পথে ঘন্টিছড়া নামক স্থানে শান্তিবাহিনীর অ্যামবুশের শিকার হয়ে মেজর মহসিন, ১জন জেসিও এবং আরও ২০জন নিহত হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ - শান্তিবাহিনী কাউখালী অঞ্চলের বেতছড়ি, মিটিয়াছড়ি, ছোটলুডু, বড়লুডু, মইগান, বুয়াপাড়া ও রাঙিয়াপাড়া গ্রামের লোকজনের উপর গুলি চালায় এবং বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে ১৭জন বাঙালি নিহত, ১৮জন আহত এবং ৫০০টি ঘরবাড়ি পুড়ে যায়।

---

[১২০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫-১১৬।

২১ জুন ১৯৮৭ - বিলাইছড়ি থানা সদরের নিকটবর্তী লুইছং ঘাট থেকে নারাইছড়ি ক্যাম্পে ফেরার পথে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শান্তিবাহিনীর অ্যামবুশের শিকার হয়। এতে ৩জন শান্তিবাহিনীর সদস্য নিহত এবং ১জন গুলিবিদ্ধ হয়।

বান্দরবান অঞ্চল[১২১]

৬ মে ১৯৭৭ - বান্দরবান হতে রুমা যাওয়ার পথে ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দল সাঙ্গু নদীতে শান্তিবাহিনীর অ্যামবুশের শিকার হয়ে ৫জন নিহত হয়।

২৫ অক্টোবর ১৯৭৭ - ৩১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি টহল দল আলীকদম হতে ২২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি স্থানে শান্তিবাহিনীর অ্যামবুশের শিকার হলে ৬জন নিহত হয়।

১১ জানুয়ারি ১৯৮০ - রাঙাছড়া গ্রামে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের উপর শান্তিবাহিনী গুলি চালায় এতে ২জন নিহত হয়। এসময়তারা ৩৭টি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

২১ এপ্রিল ১৯৮০ - ১১ রাইফেল ব্যাটালিয়নের একটি দল ফালাডাউং পারা নামক স্থানে শান্তিবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়। এতে ২০জন সৈন্য নিহত ও ২জন সৈন্য আহত হয়। সেইসাথে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ খোয়া যায়।

১৮ আগষ্ট ১৯৮০ - লালামুখ নামক বাঙালি পাড়ায় শান্তিবাহিনীর হামলায় ৩জন নিহত এবং মহিলাসহ ৭জন আহত হয়। শান্তিবাহিনীর লাগানো আগুনে ১৫টি ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। একই সময় শান্তিবাহিনীর অপর একটি দল বড়পাড়া নামক বাঙালি গ্রামে হামলা করে। এতে ৭জন নিহত, ৭জন আহত ও ১৪টি ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ - শান্তিবাহিনীর একটি দল মাস্টারপাড়া, মেনসারপাড়া, মেনপাড়া এবং আঙ্গারপাড়া মুরং গ্রামে হামলা করে গ্রামগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে কয়েকজন মুরং নিহত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০ মে ১৯৮৯ - থানচি থানা সদরে টিএন্ডটি অফিসে শান্তিবাহিনীর একটি দলের গুলিবর্ষণে ৩জন আহত হয়। এই সংবাদ পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে পৌঁছার পূর্বেই শান্তিবাহিনী ১১জনকে অপহরণ করে এবং প্রসিং পাড়া নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক বলছেন যে, ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শতাধিক আদিবাসীসহ ২,০০০ বাঙালি নিহত হয়েছে শান্তিবাহিনীর হাতে। এছাড়াও এ সময়ের মধ্যে গুলিবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ ও বোমা হামলায় আহত হয় আরও ৪,০০০ এবং অপহৃত হয় ১২০০ জন। [১২২]

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যেকোন ঘটনার জন্য শান্তিবাহিনীকে সব সময় দায়ী করে এসেছে। সেনাবাহিনী সব সময় বলেছে যে, শান্তিবাহিনী প্রথমে আক্রমণ করে পরবর্তীতে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ

---

[১২১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬-১১৮।

[১২২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫-১১৮।

তাদেরকে ধরতে বা আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা অভিযান চালায়। ১৯৯০ সালের ১৩ জানুয়ারি লংগদুতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে ১২জন বিডিআর শান্তিবাহিনী কর্তৃক নিহত হয়। এছাড়াও সেনাবাহিনী সেটলার এবং আদিবাসী উভয় জনগণের উপর শান্তিবাহিনীর আক্রমণের অনেক উদাহরণ দেয় যাতে অনেক নিরীহ জনগণ নিহত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট-এ Handout on CHT নামে একটি পুস্তিকা দেয়া হয়েছিল যার মধ্যে "Casualty – Civilian (Insurgent Atrocities)" শিরোনামে একটি তালিকা ছিল। ঐ তালিকায় ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত, তাদের ভাষায়, সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীর সাম্প্রতিক আক্রমণের হিসাব ছিল এবং একই সাথে এই আক্রমণে নিহত, আহত ও অপহরণের একটি পরিসংখ্যান ছিলো। এই তালিকাতে নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখ থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচয় এমনকি তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। তাই তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করা অসম্ভব।[১২৩]

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাঙালি ও পাহাড়ি ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা এবং ঘটনার জন্য দায়ীদের উল্লেখ ক'রে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানটি তৈরি করেছে। এই পরিসংখ্যানে সেনাবাহিনীর প্রদত্ত Handout on CHT-এ উল্লিখিত সংখ্যাগুলো ব্রাকেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১৯ ঃ বাঙালি ও আদিবাসী নিহত, আহত ও অপহরণ তালিকা

সময়কাল	ঘটনার সংখ্যা	নিহত বাঙালির সংখ্যা	আহত বাঙালির সংখ্যা	নিহত আদিবাসীর সংখ্যা	আহত আদিবাসীর সংখ্যা	
১৬.১২.১৯৭৯ - ২৯.১২.১৯৮৫	৫২	১৮৩ (২৭২)	২২১ (১৯৪)	৪৪ (৩৮)	৮ (২৬)	বিদ্রোহী
১৯৮৬	৫৬	২৪৭ (২৪৮)	- ১১৮	২০ (৩৩)	- ১৬	বিদ্রোহী
	২	১	-	১৬	-	বাঙালি
	১	৭	-	-	-	আদিবাসী
	১	-	-	১	-	ক্রসফায়ার
	১	১	-	-	-	গাছ পড়ে
১৯৮৭	৫৪	১০৩ (১১৭)	২০ (৬৭)	১৭ (১৯)	১ (৯)	বিদ্রোহী
১৯৮৮	৮৫	১১৩ (১২৮)	৪৯ (৬৫)	১৪ (১৬)	৯ (১৪)	শান্তি বাহিনী
	৩	-	-	৩	৯	বাঙালি
	৪	২	-	৯	-	সিকিউরিটি

[১২৩] Life is not Ours : The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, 1991, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

						ফোর্স
	১৩	-	-	-	-	নিরুদ্দেশ
	১	-	-	১	-	মৃতদেহ পাওয়া যায়
১৯৮৯	৭৬	৬৩ (৭২)	৯১ (১৩৮)	২৬ (৪৭)	৩১ ৫৭	বিদ্রোহী
	০৪	-	-	৩৬	-	বাঙালি
	৮	-	-	৪	৬	সিকিউরিটি ফোর্স (আনসার ও ভি.ডি.পি)
	১	১	-	-	-	বার্মার সিকিউরিটি ফোর্স
	১	-	-	১	-	দুর্বৃত্ত
	২	-	২	১	-	মিলিটারি দুর্ঘটনা
	১	-	-	২	২	ক্রসফায়ার
	১২	১১	৫১	১২	৩৩	বিস্ফোরণ
	১	৭	-	-	-	নৌকা অপহরণ
১৯৯০ (৯.৯. নাগাদ)	২৮	৫৩	১৮	১১	২	বিদ্রোহী
২২.৯ নাগাদ		(৪৭)	(১৩৮)	(১৬)	(৩৮)	
	১	-	-	১	-	সিকিউরিটি ফোর্স
	৬	-	১৭	৩	৪	বিস্ফোরণ
	১	১	-	-	-	দুর্ঘটনা
	১	২	-	-	-	অপহরণ
	৩	-	-	৪	১	ক্রসফায়ার
	১	১	-	-	-	ম্যালেরিয়া

সময়কাল	বাঙালি অপহরণের সংখ্যা	আদিবাসী অপহরণের সংখ্যা
৬.১২.১৯৭৯ ৯.১২.১৯৮৫	(১৬৯)	(৮৪)

১৯৮৬	(৩৩) অপহরণ/ নিরুদ্দেশ	(৪) অপহরণ/ নিরুদ্দেশ
১৯৮৭	৪/১ (১৭)	- (৮)
১৯৮৮	৪২/ (১৩১) ১ ১/৬২	১১ (২৭) ৮
১৯৮৯	১১/৩ (২২) ১/	৩৫ (২৮) -
১৯৯০(৯.৯ নাগাদ)	১৩/১	৩
২২.৯ নাগাদ)	(১৮)	(২২)

উৎস ঃ Life Is Not Ours, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭।

উপরের এই তালিকায় আহত, নিহত বা ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন প্রদত্ত সংখ্যা ও সেনাবাহিনীর দেয়া সংখ্যার মাঝে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় রিপোর্টেই ১৯৮৬ সাল থেকে বাঙালিদেরকে এবং ১৯৮৮ সাল থেকে সিকিউরিটি ফোর্সকে বিভিন্ন ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

শান্তিবাহিনী কর্তৃক সেটলার বাঙালিদের উপর আক্রমণ এবং তার ফলে বেশ কিছু বাঙালি হতাহতের ঘটনা বিভিন্ন সূত্র থেকে সমর্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন প্রত্যক্ষদর্শী এবং ক্ষতিগ্রস্তদের নিজস্ব জবানবন্দি এবং বর্ণনা থেকে এর সত্যতা পেয়েছিল। মানিকছড়িতে বসবাসরত বাঙালি সেটলাররা কমিশনকে বলেছিল কিভাবে শান্তিবাহিনী ১৯৮৮ সালে তাদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে মেরে ফেলেছিল। তারা তাদের শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাগুলোও দেখিয়েছিলেন।[১২৪] একজন সেট্‌লার নারী বলেছিলেন ঃ [১২৫]

> "আমাকে সাতটি গুলি করা হয়েছিল। বুলেট হাড় ভেদ করে আমার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার দেড় বছরের শিশুকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং স্বামী-সহ বাকী অন্য চারজন পরিবারের সদস্যকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল।

কিছু আর্মি অফিসার পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনকে বলেছিল যে, ১৯৮৮ সালের পর থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নয়ন ঘটেছে, তবে অন্যরা কমিশনকে একটি ভিডিওটেপ দেখিয়েছিল যাতে দেখা যাচ্ছিল যে, ১৯৮৯ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের সময়কালে শান্তিবাহিনী সেটলার বাঙালিদের আক্রমণ করে কিভাবে তাদের জ্বালিয়ে মেরেছিল। আহত সেনাসদস্যদের ভাষ্যমতে, শান্তিবাহিনী এই সময় থেকেই বোমা ব্যবহার করা শুরু করে। কমিশন আরও

[১২৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।
[১২৫] ঐ।

শুনেছিল যে, শান্তিবাহিনী শুধু বাঙালিদেরকে অপহরণ করে হত্যাই করেনি, তারা আদিবাসী জনগণকে বাধ্য করেছিল নির্বাচনের আগে নিজ বাসস্থান ছেড়ে পালিয়ে যেতে; কিন্তু এই অভিযোগের কোন সত্যতা কমিশন খুঁজে পায়নি। যেসব আদিবাসী ত্রিপুরা উল্লিখিত একটি বসবাস করছেন তারা কমিশনের কাছে এ ধরণের কোন অভিযোগ করেননি। কমিশন মনে করেছে যে যেসব আদিবাসী অভিযোগ করেছেন যে তারা বা তাদের পরিবারের কেউ শান্তিবাহিনীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, অপহৃত বা নিহত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীদের সহযোগী। এর মধ্যে কিছু আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর কর্মীও ছিলো। [১২৬]

১০.৩. কর সংগ্রহ ঃ

কর সংগ্রহ এবং মুক্তিপণের জন্য অপহরণ হলো শান্তিবাহিনীর উপার্জনের অন্যতম দুটি উৎস। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন শুনেছিল যে, আদিবাসী জনগণ এবং বাঙালিদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কর সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন জনগণ উদাহরণ দিয়ে বলেছিল যে, কর না দেবার কারনেও অপহরণ করা হতো। একজন আদিবাসী নারী কমিশনকে বলেছিলেন ঃ [১২৭]

> "আমার স্বামীকে শান্তিবাহিনী ৪ঠা বৈশাখে হত্যা করেছিল (১৭ এপ্রিল ১৯৯০)। চারজন সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্য আমাদের ঘরে ঢুকেছিল এবং তাকে অপহরণ করেছিল। তারা বলেছিল, 'আমরা মাসিক চাঁদা চেয়েছি এবং কেন তুমি তা দাওনি।' তারা চার বা পাঁচ মাস আগে একবার এসেছিল এবং তখন আমরা তাদের ৩০ টাকা দিয়েছিলাম। বৈশাখ মাসে আবার আসলে আমার স্বামী বলেছিল 'আমি গরিব মানুষ, আমি দিতে পারব না।' তারপর তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, চাঁদা দিতে না পারায় তাকে মেরে ফেলেছিল।"

সামরিক বাহিনী একজন নারীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই নারী কমিশনকে বলেছিলেন ঃ [১২৮]

> "১৯৯০ সালের ১৯ মার্চ আমার স্বামীকে অপহরণ করেছিল। তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং উপজেলা কাউন্সিলর পদের প্রার্থী ছিলেন। .. শান্তিবাহিনী তাকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল।"

ঐ মহিলাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কীভাবে তিনি ঝুঝলেন যে অপহরণকারীরা শান্তিবাহিনীর লোক ছিল; উত্তরে তিনি জানান ঃ [১২৯]

> "তারা সশস্ত্র ছিলো, তারা ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। তারপর তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি মুক্তিপণ হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম, গ্রামের মানুষ আমাকে এই টাকাটা দিয়েছিল।"

এর সাথে সামরিক বাহিনীর এক অফিসার আরেকটি ঘটনার কথা যোগ করেন ঃ [১৩০]

---

[১২৬] ঐ।
[১২৭] ঐ।
[১২৮] ঐ।
[১২৯] ঐ।

"দিব্যছড়িতে সম্প্রতি একটি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর তিনজন সদস্য গ্রামে এসেছিল উপজাতি আর বাঙালী গ্রামবাসীর উপর তাদের আরোপিত বেআইনী কর আদায় করতে। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছিল যে, তারা আর কোন ধরনের কর দিতে রাজী নয়। সকল গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে যখন চাঁদা দিতে অস্বীকার করলো তখন তারা পালিয়ে যেতে শুরু করে। দুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও একজনকে গ্রামবাসী ধরে স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিল। এর প্রতিশোধ স্বরূপ শান্তিবাহিনী দুজন উপজাতিকে অপহরণ করে যাদের একজন ছিলেন হেডম্যান। পরবর্তীতে তারা একজনকে ছেড়ে দিয়ে হেডম্যানকে আটকে রেখে দাবি করে যে, শান্তিবাহিনীর আটককৃত লোককে ছেড়ে দিলে তারা হেডম্যানকে ছেড়ে দিবে। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে সেটি সম্ভব না, তখন তারা হেডম্যানকে ছেড়ে দিয়েছিল।"

প্রথম দুটি ঘটনা পাহাড়ি লোকজন বলেছিলেন সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে। কিন্তু ঘটনাগুলো বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করলে অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়ছিল। তবে অনেক আদিবাসী কর না দেয়ার ফলে বিভিন্ন শাস্তির কথা বলেছিলেন। তবে শান্তিবাহিনীর কথা সেনাবাহিনী বার বার বলছিল। তারা চাইছিল সাধারণ জনগণ যেন সেনাবাহিনীর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং গুচ্ছগ্রামগুলোতে বসতি স্থাপন করে। [১৩১]

সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আদিবাসীদের কাছে শুনেছিল যে, শান্তিবাহিনী বিভিন্ন জনের আয় অনুযায়ী খাজনা/কর নির্ধারণ করেছিল। যদি প্রয়োজন হতো তবে বন্দুকের মুখে তারা কর আদায় করতো। তবে যদি কেউ কর দিতে না পারত তবে শান্তিবাহিনী তাদের ক্ষতি করত না। যেসব লোক সরকারী বাহিনীকে খবরাখবর দিতো বা প্রকাশ্যভাবে শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধাচারণ করত, শান্তিবাহিনী শুধু তাদেরকেই অপহরণ করত বা মেরে ফেলতো। আরেকজন আদিবাসী বলেছিলেন, সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধ্যতামূলক শ্রমের চেয়ে শান্তিবাহিনীকে কর দিয়ে মুক্তভাবে কাজ করা অনেক শান্তির। [১৩২] আরেকজন বলেছিলেন যে ঃ [১৩৩]

"শান্তিবাহিনীর সদস্যরা গ্রামের বাইরে থাকত। তারা যখন আসত আমরা তাদের খেতে দিতাম। তারা আদিবাসীদের স্বাধীনতা চাইতেন – তারা চাইতেন বাঙালী কর্তৃক আর কোন ধরনের শোষণ নয়। আর তিন জেলায় বিভক্তি নয়। কারণ এগুলো শুধুমাত্র বাঙালীর সংখ্যাই বাড়াচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাঙালীদের এই অঞ্চলে বৈধ অধিকার জন্মেছিল কারণ জেলা পরিষদে তাদের আসন ছিলো। এই অধিকার পূর্বে বাঙালিদের ছিলনা।"

---

[১৩০] ঐ।
[১৩১] ঐ।
[১৩২] ঐ।
[১৩৩] ঐ।

শান্তিবাহিনী কর্তৃক কর আদায়ের ব্যাপারটি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আদিবাসীদের মধ্যে দু ধরণের বক্তব্য পায়। কেউ কেউ এটাকে বাড়তি বোঝা মনে করছিলেন, আবার কেউ কেউ এটি স্বেচ্ছায় দিতে রাজী ছিলেন কেননা কারণ তারা শান্তিবাহিনীর লক্ষ্য ও কার্যক্রমকে সমর্থন করছিলেন। [১৩৪]

১১. সমঝোতা উদ্যোগ ঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র মৃত্যু-উত্তরকালে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর দলীয় প্রতিপক্ষ প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হবার পর সমঝোতা উদ্যোগ কিছুকাল বন্ধ ছিল। ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন সদস্য সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ট্রাইবাল কনভেনশন কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত হবার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে; এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১৬ মে। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ এবং অনুরোধ করেন।[১৩৫]

১১.১. পুনর্গঠিত ট্রাইবাল কনভেনশনে'র সমঝোতা উদ্যোগ

পুনর্গঠিত ট্রাইবাল কনভেনশনে'র নেতৃবৃন্দ অনুরোধে জেনারেল এরশাদ ইতিবাচক সাড়া দিলে ট্রাইবাল কনভেনশন কেন্দ্রীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির কাছ থেকে দাবি-দাওয়া জানার বিষয়ে ১৯৮২ সালে গঠিত যোগাযোগ উপ-কমিটিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে। এই পুনরুজ্জীবিত যোগাযোগ কমিটি সরকার এবং জনসংহতি সমিতিকে আলোচনায় বসানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং উপেন্দ্রলাল চাকমার ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর পানছড়ি উপজেলার পুঁজগাং এলাকায় জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম আলোচনায় জনসংহতি সমিতির পক্ষে প্রতিনিধি দলে ছিলেন শান্তিবাহিনীর স্পেশাল স্কোয়াডের গেরিলা কমান্ডার রূপায়ন দেওয়ান, নীতিশ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, রঞ্জন বিকাশ চাকমা, স্নেহ কুমার চাকমা এবং বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল ফারুক। এ বৈঠকে সরকার পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে জাতীয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যা সমাধানে সম্মত হয়। ১৯৮৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বৈঠকের দিন ধার্য্য থাকলেও তা সম্ভব হয়ে উঠেনি।[১৩৬]

---

১৩৪ ঐ।

১৩৫ জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, স্থানীয় সরকার পরিষদ ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৭১।

১৩৬ গোলাম মোর্তোজা, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৪।

১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রায় পুরো বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি এবং বাঙালি জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ চলতে থাকে। সেটলার পাঠানো এবং আদিবাসীর জমি দখল অব্যাহত থাকায় শান্তি বাহিনী পুনর্বাসিত বাঙালি ও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করে। পুনর্বাসিত বাঙালি ও সামরিক বাহিনীর লোকেরাও পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে হত্যা, শত শত বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে। এরূপ আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার পাহাড়ি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সরকারীভাবে বাঙালিদের পুনর্বাসনের ফলে পাহাড়িদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মেরুদণ্ড বিপর্যস্ত হয়। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট বাঙালি পুনর্বাসনের প্রতিবাদ জানিয়েও ব্যর্থ হয়। বাঙালি পুনর্বাসন নিয়ে সরকার ও পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মন কষাকষি ছাড়াও স্থানীয় পাহাড়ি ও পুনর্বাসিত বাঙালিদের মধ্যে জমিজমা নিয়ে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়।[১৩৭]

এ দূরাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ট্রাইবাল কনভেনশনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে এবং কখনও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে ঘনঘন বৈঠক করতে থাকে। ১৯৮৬ সালের ২৩ আগস্ট তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বি. কে দেওয়ানের সাথে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের নিকট তুলে ধরার জন্য বি. কে দেওয়ানের নেতৃত্বে একটি পাহাড়ি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত অপর একটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন বি. কে দেওয়ান এবং সদস্য ছিলেন চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ান, রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমা, প্রাক্তন সংসদ সদস্য চাইথোয়াই রোয়াজা, ট্রাইবাল কনভেনশনের সভাপতি জনাব শান্তিময় দেওয়ান, নানিয়ারচর উপজেলার চেয়ারম্যান তিলকচন্দ্র চাকমা এবং রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান।[১৩৮]

এই প্রতিনিধি দল ১৯৮৬ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে এবং ১৭ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ ক'রে এর সমাধানের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে পূনরায় সংলাপ শুরু করার অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষাপটে জনসংহতি সমিতি উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে যোগাযোগ কমিটি গঠনের মাধ্যমে আলোচনায় বসতে সম্মতি জানালে উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে যোগাযোগ কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৩৯]

[১৩৭] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১।
[১৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১-১৫২।
[১৩৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫২-১৫৩।

১৯৮৭ সালের ২১ মার্চ ট্রাইবাল কনভেনশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ পুনর্গঠিত যোগাযোগ কমিটিকে জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে মর্মে ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি-কে অবগত করেন। এ পর্যায়ে কোন অজানা কারণে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে বাইরে রেখে তৃতীয় পক্ষের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে আগ্রহী হ'য়ে উঠে এবং বিভিন্ন মন্ত্রী ও সচিবগণ জনসংহতি সমিতি বা যোগাযোগ কমিটি নয় বরং পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে সরকারের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিতে থাকেন। এ প্রস্তাবে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ এইমর্মে মতপ্রকাশ করেন যে, জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতিতে একটি প্রধান পক্ষ। সে ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতিকে উপেক্ষা ক'রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবেনা।[১৪০]

১১.২. জাতীয় কমিটি গঠন

জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তুতিস্বরূপ আলোচনাকালে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ কমিটির সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চট্টগ্রাম সফরকালে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি নেতাদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা জাতীয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে তা সমাধানের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি জাতীয় কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন।[১৪১] ১৯৮৭ সালে প্রথমবার এবং ২৮ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার তিন জেলার পাহাড়ি নেতাদের সাথে যখন জাতীয় কমিটির সদস্যগণ পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধান কল্পে আলোচনায় বসেন, একই সময়ে ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল আবদুস সালাম সরকারের সাথে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন।[১৪২]

যোগাযোগ কমিটির প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালের ১৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলায়। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি সর্বপ্রথম ৫ দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করে। এর মধ্যে প্রধান দাবিগুলো হলো ঃ [১৪৩]

ক. পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা,

খ. পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মতামত ব্যতিরেকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনিক মর্যাদা যেন পরিবর্তন করা না যায় সে বিষয়ে সাংবিধানিক বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা রাখা,

---

[১৪০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৩-১৫৪।

[১৪১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৪।

[১৪২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫।

[১৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ২১২-২১৭।

গ. ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্টের পর পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া,

ঘ. পার্বত্য অঞ্চলের উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া এবং

ঙ. পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এ দাবিগুলোর সাথে আরও পঁচিশটি সংশ্লিষ্ট দাবি সংযুক্ত করা হয়েছিল। সরকার পক্ষ এই দাবিগুলো নিয়ে আলোচনায় বসতে অপারগতা প্রকাশ করে। কারণ হিসেবে বলা হয় সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এককেন্দ্রীক হওয়ায় বিশেষ এলাকার জন্য প্রদেশিক মর্যাদাসহ স্বায়ত্তশাসন প্রদান সংবিধান পরিপন্থী। সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পুনরায় দাবি পেশ করার অনুরোধ জানায়।[১৪৪]

১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করেন ঃ [১৪৫]

ক. জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আইনজ্ঞ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের আলোচনার ব্যবস্থা করা,

খ. জনসংহতি সমিতি থেকে এমন একজনকে মনোনীত করা যিনি মন্ত্রীসভার সদস্য হবেন,

গ. পাঁচ দফা দাবিনামা সরাসরি প্রেসিডেন্ট অথবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি-র কাছে পেশ করা এবং

ঘ. জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ দফার বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের উপরি-উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান।

অতপরঃ জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের পক্ষের চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ১৭ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি। এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি পূনরায় বাংলাদেশের এককেন্দ্রীক (ইউনিটারি) বৈশিষ্ট্য ভেঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলকে একটি প্রদেশের মর্যাদায় স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানালে সরকার পক্ষ থেকে এ দাবিনামার উপর আলোচনা করতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সংবিধানের আওতায় সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাখ্যাসহ ৯টি প্রস্তাব বিশিষ্ট একটি রূপরেখা জনসংহতি সমিতির কাছে পেশ করে। তবে জনসংহতি সমিতি এ রূপরেখাকে অগণতান্ত্রিক, অবাস্তব, স্ববিরোধী এবং ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে এর উপর আলোচনা করতে অসম্মতি জানায়।[১৪৬]

---

[১৪৪] ঐ।

[১৪৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৭।

[১৪৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৭-১৫৮; আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ২১৯-২২৫।

সরকারী প্রতিনিধি দলের সাথে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বৈঠক এক মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলেও ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়। এ অবস্থায় ১৯৮৮ সালের ৯ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পাহাড়ি নেতাদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ জাতীয় কমিটির কাছে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানান।[১৪৭]

১৯৮৮ সালের ১৯ শে জুন বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদাসহ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাব দেয়। এতে সরকার পক্ষ আবারও অসম্মতি জানালে জনসংহতি সমিতি স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত আলোচনা অর্থহীন ব'লে মত প্রকাশ করে। ফলে এই বৈঠকেও কোন সমঝোতা সম্ভব হয়নি এবং সরকারও আলোচনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় সরকার পক্ষ থেকে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বিকল্প কোন সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসতে; কারণ পাহাড়ি নেতৃবৃন্দই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সরকারকে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও সরকার পক্ষ মনে করেনপ্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে আলোচনা করার কোন অবকাশ সরকারের নাই। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ এক মাস সময় নেয় জনসংহতি সমিতিকে বুঝানোর জন্য। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়।[১৪৮]

জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হ'য়ে পড়লে ১৯৮৮ সালের ২১ জুলাই রাঙ্গামাটি জেলার পাহাড়ি নেতাদের সাথে এক বৈঠকে ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল সালাম জনসংহতি সমিতিকে বাদ দিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ ১৯৮৮ সালের ৩১ জুলাই এক বৈঠকে মিলিত হ'য়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিন পার্বত্য জেলার নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে জাতীয় কমিটির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং তারা তাদের এ সিদ্ধান্ত জিওসি জেনারেল সালামকে জানিয়ে দেন। ১০ আগস্ট পাহাড়ি এবং বাঙালিদের এক সমাবেশে জেনারেল সালাম তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি নেতাদের সাথে যৌথ বৈঠক বা আলোচনায় বসার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং তিনি জাতীয় কমিটির সাথে তিন জেলার নেতৃবৃন্দকে পৃথকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ১১ আগস্ট থেকে এরূপ পৃথক আলোচনার প্রস্তুতি শুরু হয় এবং এ আলোচনার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারিত হয় জনসংহতি সমিতির কাছে সরকার পক্ষ থেকে পেশকৃত ৯টি প্রস্তাব সম্বলিত রূপরেখা। এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় রাঙ্গামাটি নেতাদের সাথে জিওসি জেনারেল সালামের আলোচনাকালে নেতৃবৃন্দ তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে প্রবেশকারী সকল বাঙালি প্রত্যাহার করার

[১৪৭] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮-১৫৯।

[১৪৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯। আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন মেজর জেনারেল (অব:) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৬-২৬৪।

দাবি জানান। জেনারেল সালাম বাঙালি প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে জানান, তবে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিষয়টি তিনি সরকারের কাছে উপস্থাপন করবেন মর্মে আশ্বাস দেন।[১৪৯]

১১.৩. জাতীয় কমিটির সাথে পাহাড়ি নেতাদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক ঃ

পুনর্বাসিত বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রত্যাহারের দাবি নাকচ হওয়া সত্ত্বেও আলোচক দল বৃহত্তর স্বার্থে স্থানীয় সরকারের রূপরেখার উপর আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ১৯৮৮ সালের ২৯ আগস্ট চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি জেলার আলোচক দলের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ঃ [১৫০]

এক. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকার কতৃক প্রদত্ত রূপরেখা,

দুই. আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবি, এবং

তিন. পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙালি বিশেষত ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সালে সরকারী উদ্যোগে প্রবেশকারীদের সরিয়ে নেওয়ার দাবি।

পুনর্বাসিত বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহারের দাবি জাতীয় কমিটি মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার অজুহাতে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। পাহাড়ি আলোচক দলের অন্যতম সদস্য চারু বিকাশ চাকমা কর্তৃক পেশকৃত পার্বত্য অঞ্চলের কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাঙালিদের পুনর্বাসিত করার প্রস্তাবও জাতীয় কমিটি সরাসরি নাকচ করে দেন।[১৫১]

জাতীয় কমিটি এবং রাঙ্গামাটি আলোচক দলের মধ্যে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। শান্তিময় দেওয়ানের নেতৃত্বে আলোচক দল আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের রূপরেখা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের আলোচক দলের সাথে জাতীয় কমিটির তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে উক্ত দুই জেলার আলোচকবৃন্দ আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। সুতরাং এ দাবি শুধুমাত্র এক জেলার আলোচকদের প্রস্তাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি আলোচক দলের নেতৃত্বে রাজা দেবাশীষ রায় থাকলেও জাতীয় কমিটির সাথে মতপার্থক্য সৃষ্টির কারণে তিনি এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি। আলোচক দলের অনেকেই আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থানে অটল থাকেন। এ অবস্থায় জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি জেলাকে একটি বিশেষ এলাকা হিসেবে ঘোষণার দ্বারা জেলার সকল পাহাড়ি-বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি জেলা পরিষদ গঠন করে উক্ত জেলা পরিষদের উপর ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা প্রদানের

[১৪৯] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬২-১৬৩।

[১৫০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৬।

[১৫১] ঐ।

প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ প্রস্তাব আলোচক দল গ্রহণ করেন এবং একই দিনে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ আইন প্রনয়ণের ব্যাপারে সমঝোতা হওয়ার পর জনসংহতি সমিতিকে পুনরায় সরকারের সাথে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচক দল জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়।[১৫২]

জাতীয় কমিটির সাথে ১৯৮৮ সালের ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভায় প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের কাঠামো, মোট সদস্য সংখ্যা, পাহাড়ি বিভিন্ন জাতি এবং বাঙালির সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় নির্ধারিত হয় এবং প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রণয়নপূর্বক তা পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা এবং অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৫৩]

১৯৮৮ সালের ১৭ ও ১৮ অক্টোবর জাতীয় কমিটির সাথে রাঙ্গামাটি জেলা আলোচকবৃন্দের চতূর্থ এবং শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বিচারপতি আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী প্রস্তাবিত জেলা পরিষদ আইনের খসড়া উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করেন। দুইদিন আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর 'স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (জেলা পরিষদ)'-এর খসড়া রাঙ্গামাটি জেলা আলোচক দল অনুমোদন করে।[১৫৪]

ইতোমধ্যে জনসংহতি সমিতি পুনরায় (৬ষ্ঠ বৈঠক) সরকারের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব করে। জনসংহতি সমিতির এ প্রস্তাবের বিষয়ে সরকার পক্ষ তিন জেলার পাহাড়ি নেতাদের মতামত গ্রহণ করলে তিন জেলার আলোচক দলই জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের আলোচনার পক্ষে মত দেন। কারণ আলোচনার শুরু থেকে সকল পর্যায়ে সকল পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ একই মত পোষণ করেছেন যে, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য সকল স্তরের পাহাড়ি জনগণ বিশেষতঃ জনসংহতি সমিতির প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে একদিকে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের আলোচনার প্রস্তুতি চলার পাশাপাশি প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার পরিষদ (খসড়া) আইনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে তিন জেলার পাহাড়ি নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করতে থাকে।[১৫৫]

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির রেস্ট হাউজে। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি পক্ষ থেকে ইতোপূর্বে উপস্থাপিত ৫ দফা দাবির প্রথম দাবিটির 'প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের' পরিবর্তে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' উল্লেখ পূর্বক সংশোধিত রূপ উপস্থাপন করা হয়। সরকার পক্ষ তিন পার্বত্য জেলার নেতাদের সাথে ইতোপূর্বে সম্পাদিত স্থানীয় পরিষদ আইন বিষয়ে সমঝোতার কথা জনসংহতি সমিতিকে অবগত করতে চান এবং এই সমঝোতার সাথে জনসংহতি সমিতির দাবিনামার সমন্বয় করার পরামর্শ দেন।

---

[১৫২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭।

[১৫৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭-১৬৮।

[১৫৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।

[১৫৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮-১৬৯।

এতে জনসংহতি সমিতি আপত্তি জানালে এ আলোচনা সেই দিন আর অগ্রসর হতে পারেনি। উক্ত বৈঠক ভেঙে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে রাঙ্গামাটি আলোচক দলের নেতা শান্তিময় দেওয়ান আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি স্পষ্টভাষী ছিলেন বিধায় সরকারী দলের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে বলে পাহাড়িদের অনেকে ধারণা করেন।[১৫৬]

১৯৮৯ সালের ৩১ জানুয়ারি বা ১ ফেব্রুয়ারি সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে বা বিলম্বিত হ'তে থাকে এবং ১৯৮৯ সালের শীতকালীন সংসদ অধিবেশনেও স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে উপস্থাপিত না হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে তিন পার্বত্য জেলার তিনটি আলোচক দলের সদস্যবৃন্দ এবং তিন জেলার সকল চেয়ারম্যানদের এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে উত্থাপনের জোর দাবি জানানো হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারির বৈঠকের ঘোষণার প্রেক্ষিতে সেই দিন সন্ধ্যায় সরকার তিন জেলার 'স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯ সংসদে উত্থাপন করে, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ তারিখে সংসদে পাশ হয়।[১৫৭]

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে পরিষদের চেয়ারম্যান অবশ্যই পাহাড়ি হবেন এবং চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এমন বিধান রাখা হয়। নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের ভার অর্পিত হয় পরিষদের চেয়ারম্যানের হাতে। এই আইনের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রায় সকল প্রধান এবং ছোট-ছোট সরকারী সংস্থা/ বিভাগ মিলে মোট ২২টি বিষয় ও সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত করার বিধান রয়েছে।[১৫৮] সরকারি সংস্থার জমি ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলের সকল জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের ক্ষমতা পরিষদের হাতে থাকার নিয়ম রাখা হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইউএসএফ, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি, সমবায়, পুলিশ, সামাজিক আইন, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বানিজ্য, হাট-বাজার ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। জনসংহতি সমিতি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনকে অপ্রতুল বিবেচনায় প্রত্যাখান করে।[১৫৯] তবে ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিন পার্বত্য জেলার তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। [১৬০]

১২. আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন

এম. এন. লারমা দেশের ভিতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। মানবাধিকার সংগঠনের সাথেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তবে কোন সাড়া পাননি। এই জন্য প্রচারের কাজটা

[১৫৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯-১৭০।

[১৫৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০-১৭১।

[১৫৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২।

[১৫৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২-১৭৩।

[১৬০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২।

দেশের বাইরে থেকে শুরু করেছিলেন এম. এন. লারমা নিজ উদ্যোগে। অন্যান্য নেতাকর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক কাজগুলো করতেন।[১৬১] এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ[১৬২]

> "সরকার যেহেতু উদার ছিল না। দেশে গণতন্ত্র ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই পার্বত্য অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শত শত সমতলবাসী বাঙালী। জমি ও গ্রাম দখল চলছিল। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক প্রচারের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমেও চেষ্টা চলছিল তবে তাদেরও সীমাবদ্ধতা ছিল। দেশের ভিতরে যেহেতু ক্যাম্পেনটা সম্ভব ছিল না তাই বিভিন্ন উপায়ে বাইরে প্রচার চালাতে হয়েছিল। প্রথমে লন্ডন থেকে প্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে বিদেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন সাপোর্ট গ্রুপগুলোর মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল।"

রূপায়ন দেওয়ান আরও বলেন ঃ[১৬৩]

> "International Linkage Building থেকে শুরু করে দেশের মধ্যকার Linkage Building-গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন সংবাদ তখন প্রচার করতো না। এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন 'এখানে আমাদের কথাই কেউ ছাপায় না। আপনাদের কথা কে ছাপাবে?' তিনি বিলেত যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন বিলেত এমন একটি জায়গা যেখান থেকে প্রচার সম্ভব। পরবর্তীতে বিলেত থেকে প্রচারের কাজটা বিভিন্নভাবে পরিচালিত হয়েছিল।"

প্রথমে রামেন্দু শেখর দেওয়ান ক্যাম্পেইন শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ[১৬৪]

> "১৯৭৬-এ আর এস দেওয়ান নিজ উদ্যোগে Applied Chemistry বিষয়ে পড়াশুনা ও গবেষণার জন্য লন্ডনে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি দরখাস্ত করেছিলেন পাউন্ডের জন্য। ডিলিং এ্যাসিস্টেন্ট তার দরখাস্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। একটা টাকাও নিয়ে যেতে দেয়নি। রামেন্দু শেখর দেওয়ান বুঝতে পেরেছিলেন তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই বৈরি পরিস্থিতি থেকে বাঁচার উপায় হল আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন। তিনি নিজ উদ্যোগে সমমনা লোকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্যাম্পেইনটা করেছিলেন। বাংলাদেশে যারা জনসংহতি'র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। ৭০ দশকের শেষ দিকে তিনি চাকুরী ছেড়ে পুরোপুরি প্রচার কাজে নিয়োজিত হন। তিনি যে সামান্য টাকা পেতেন তার থেকে কৃচ্ছতা সাধন করে এই ক্যাম্পেইনটা করেছিলেন। শান্তিবাহিনী লন্ডন থেকে

[১৬১] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১১/০৫/২০০৪।

[১৬২] ঐ।

[১৬৩] ঐ।

[১৬৪] ঐ।

যে সব অর্গানাইজেশনের সাপোর্ট পেয়েছিল তার সবগুলোই রামেন্দু শেখর দেওয়ানের মাধ্যমে। ইউরোপে প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। লন্ডনে "সাইমালটেনিয়াস গ্রুপ" এবং ক্যামব্রিজ বেইসড্ ড. মনন গাঙ্গুলী দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সেই সাথে তিনি ছিলেন পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক ক্যাম্পেইনার।"

১৯৭২ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের কথা উল্লেখ ক'রে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগিতা কামনা করা হয়েছিল।[১৬৫]

১৯৮০ সালের ৯ আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য প্রায় ৩০০ জন বৌদ্ধ আগরতলায় বাংলাদেশ ভিসা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ভিসা অফিসারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের দাবি জানায় এবং স্মারকলিপি প্রদান করে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন স্নেহ কুমার চাকমা। ১৯৮৬ সালের ১১ অক্টোবর হল্যান্ডের রাজধানী আমষ্টারডামে 'Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh'-এর উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় ঃ [১৬৬]

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীসমূহকে প্রত্যাহার করতে হবে।
২. অ-আদিবাসীদের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে এসে বসত গড়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
৩. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য ভূমিতে যেসব বাঙালিকে পুনর্বাসন করা হয়েছে তাদের অপসারণ করতে হবে এবং সেই জমি প্রকৃত আদিবাসীদের কাছে প্রত্যর্পণ করতে হবে।
৪. মানবিক সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাসমূহ, সাংবাদিকগণ ও অন্যান্য স্বাধীন পর্যবেক্ষকদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে অবাধ চলাচলের অনুমতি দিতে হবে।
৫. আদিবাসী যেসব শরনার্থী ইতোমধ্যে দেশে ফিরেছেন কিন্তু জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত হয়নি, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৬. বৈদেশিক সাহায্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আদিবাসী জনগণের বিপক্ষে ব্যবহার করা যাবেনা।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারিতে নেপালে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে বাংলাদেশের শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী বৌদ্ধদের নির্যাতনের অভিযোগ করেন। 'Amnesty International' ও 'Anti-Slavery Society' প্রভৃতি সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন ও গ্রন্থে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরাম ও জাতিসংঘে অভিযোগ উত্থাপন করেন। 'Anti-Slavery Society' পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সমীপে একটি চিঠিও প্রদান করে। পার্বত্য চট্রগ্রম বিষয়ক এতো সব প্রচার বা বিশ্বজনমতকে ভিন্নখাতে প্রবাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য

---

[১৬৫] প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৬৬।
[১৬৬] ঐ।

চট্টগ্রাম সম্পর্কে বর্হিবিশ্বে জানানোর জন্য জাতিসংঘে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এই দলে জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. নীরুকুমার চাকমাকে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত বিবৃতি দেওয়ার কথা বললে তিনি নিরব থাকেন। এতে হলরুমে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।[১৬৭]

১৯৯১ সালের ২৩ মে Chittagong Hill Tracts Commission তাদের প্রণীত Life is Not ours :Land and Human Rights in the Chittagong Hill Trects, Bangladesh শীর্ষক রিপোর্ট লন্ডনের 'হাউস অব লর্ডস'-এর নিকট প্রেরণ করে। এ রিপোর্টের উপসংহারে উল্লেখ করা হয়ঃ [১৬৮]

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম সামরিক বাহিনীর অধীনস্ত।
২. বাঙালি বসতকারী এবং সামরিক বাহিনী দ্বারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর যে হামলা হয়েছে তা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনী এবং সরকারের বারবার বিবৃতির মাধ্যমে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।
৩. তাদের নিজেদের উপর নিপীড়নমূলক অবস্থা যার মধ্যে তারা বসবাস করছে... তদন্তকারীরা যারা সামরিক বাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ওই অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের অথবা সেটলারদের যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তা বিশ্বাসযোগ্য বা তাৎপর্যপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত এসব সাক্ষাৎকারগুলো বেসরকারিভাবে গ্রহণ করা হবে।
৪. পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সম্পদের/সম্পত্তির অধিকারের উপর বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা সেটলাররা ব্যাপকহারে অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার জন্য দায়ী।
৫. পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এবং সেটলারদের জন্য তৈরি গুচ্ছগ্রামগুলোর দ্রুত বৃদ্ধির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে জনসংখ্যার পুনঃসংগঠন বা ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা একেবারেই পরিষ্কার যে, এই জোরপূর্বক এবং অবৈধ কর্মসূচির কারণে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত নিজস্ব ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।
৬. সেটলার সামরিক বাহিনী এবং সরকারের দ্বারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ক্রমাগত কালিমালেপন ঘটছে।
৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশগত মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্নরকম দুষ্কর্মে সহযোগিতা বা অবৈধ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। পাবত্যভূমির ধারণক্ষমতা পরিষ্কারভাবেই বলা যায় সীমিত এবং তা কমছে।
৮. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপকহারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে।

[১৬৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭।
[১৬৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮।

১৯৯১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার হয় জার্মানির হামবুর্গ শহরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, সাহায্য ও মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে চারদিনব্যাপী এ সেমিনার চলে। এতে বিভিন্ন দেশের বক্তারা হলেন ড. ভোলফ্ গাং মে (জার্মানি), উইলফ্রেড টেলক্যাম্পার, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট (বেলজিয়াম), রাশেদ খান মেনন (বাংলাদেশ), অধ্যাপক সৈয়দ হাশেমী (বাংলাদেশ), ড. আদিত্যকুমার দেওয়ান (কানাডা), প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু (ভারত), চন্দ্রদাস চাকমা (ভারত), সুহাস চাকমা (ভারত), গৌতম চাকমা (ভারত), সুবিমল বিকাশ চাকমা (ভারত), জেরেমি কুপার (বৃটেন), ডিয়েটার রাইনহার্ড (জার্মানি), ফ্রান্সিস রোল্ট (বৃটেন) এবং উইলিয়াম ফন স্যান্ডাল (জার্মানি)।[১৬৯]

১৯৯২ সালের এপ্রিলে প্যারিসে সাহায্যদাতা দেশসমূহের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আলোচনা হয়। প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারকে শর্তারোপ ক'রে বলা হয় যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য এইড্ গ্রুপ সদস্যদের জ্ঞাত করতে হবে।' [১৭০]

১৯৯২ সালের ২৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোর কারিওকাতে আফ্রিকা, আমেরিকা, ওশেনিয়া, ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে অংশগ্রহণকারী সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের বিশ্ব সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।[১৭১]

১. জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া;
২. বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন বিবেচনা করা;
৩. ১৯৯১ সালের মে মাসের একটি আন্তর্জাতিক সত্যানুসন্ধানী কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিক শাসনাধীন হিসেবে স্বীকার করা;
৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসনের জন্য সৃষ্ট পরিস্থিতির অবনতিকে স্বীকার করা;
৫. জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া।

১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের যুগ্ম সভাপতি ডগলাস স্যান্ডার্স্ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন ঃ [১৭২]

1. There must be a demilitarization of the Chittagong Hill Tracts. The government must be serious about the stated goal of a political, not a military solution. As an obvious first steep, non military function, such as economic development, should be turned over to non-military authorities.

[১৬৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯।
[১৭০] সাপ্তাহিক একতা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
[১৭১] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯।
[১৭২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭০।

2. The issue of land titles in the CHT must be addressed by an expert and impartial body. Refugee will not return to Hill Tracts from india unless they can re-establish themselves on their traditional lands. Bengali settlers will be displaced in this process, for many families are living on stolen land. Foreign assistance should be available for the rehabilitation of those settler families, to enable these problems to be solved.
3. The CHT must have sufficient autonomy within Bangladesh. There is a dispute whether that should involve one or three Hill Councils. But there can be no dispute that autonomy requires greater powers than have been envisaged for the Hill Councils so far.
4. There needs to be international monitoring of the situation. We call again for special rapporteur to monitor the situation in the Chittagong Hill Tracts.

রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকারে আরো জানিয়েছেন যে, জার্মানীতে হাং বোন ক্যাম্পেইন করেছিলেন। লন্ডনের ড. এন্ড্রু গ্রে ছিলেন একজন এনথ্রোপোলজিষ্ট, তিনিও প্রচারের ব্যাপারে খুব সক্রিয় ছিলেন। "এ্যান্টি স্লেভারি সোসাইটি" নামক সংগঠনটিও খুব সক্রিয় ছিল। নেদারল্যান্ডের অধিবাসী কেরেঞ্জ-এর নেতৃত্বে সিএইচটি গ্রূপ নেদারল্যান্ডে ক্যাম্পেইন করেছিল। মোট কথা, বিভিন্ন বিদেশী সংগঠন এবং লন্ডনে অনেক বাঙালি শান্তিবাহিনীর পক্ষে প্রচারের কাজ করেছেন। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন। কুমার মুরশিদ ছিলেন লন্ডনে লেবার পার্টির নেতা। তিনি অনেক আগে থেকেই পার্বত্য চট্রগ্রাম-এর পাহাড়িদের পক্ষে কাজ করছিলেন। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আইয়ুব করম আলী প্রচারের কাজে ছিলেন। শান্তিবাহিনীর সাপোর্ট গ্রুপ *জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক* গড়ে তুলেছিল *বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ গ্রুপ*। এই সংগঠনে বাঙালীদের কর্তৃত্ব বেশি ছিল এবং তারা শান্তিবাহিনীকে অকুন্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে গড়ে উঠেছিল United Nations Unrepresented Peoples Organization (UNO)। ওখানে রূপায়ন দেওয়ানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকজন ছিলেন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বেনদুয়াল ভেন্ট্রঠশ, যিনি নিজেও খুব তৎপর ছিলেন। বেনদুয়াল ভেন্ট্রঠশ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কয়েকবার পার্বত্যাঞ্চলে এসেছিলেন। নরওয়েতে ক্যাম্পেনার ছিলেন উইলিয়াম সেনসেডাল। এছাড়াও সক্রিয় ছিলেন সামিল লয়ার, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ইউরোপিয়ান কমিশন পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডগলাস সেনডাস, ড.এন্ড্রু গ্রে, জেনেকা এ্যারেন্স, ইনকোয়ারি কমিশনের পূর্নাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিলেন

এবং জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠক করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বল্প সময়ের স্বল্পতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[১৭৩]

আমেরিকাতেও শান্তিবাহিনীর সমর্থক ছিলেন। তবে ইউরোপ থেকে তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশ ফোকাস-এর চেয়ারম্যান এবং কংগ্রেসম্যান, সিনেটরেরা শান্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ করেছেন। তারা জয়েন্ট স্বাক্ষর দিয়ে ১৯৮০-র দশকে সরকারের কাছে পিটিশন দিয়েছিলেন। প্রায় ৭/৮ জন কংগ্রেসম্যান জনসংহতি সমিতির পক্ষে ওয়াশিংটনে পাহাড়ী আদিবাসীদের প্রতি সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং এর উপর ভিত্তি ক'রে হিয়ারিংও হয়েছিল। ইউ.এন. বডিদের সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের যোগাযোগ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়ি ও মাটিরাঙায় গণহত্যা হয়েছিল – তার উপরে রামেন্দু শেখর দেওয়ান বিলেত থেকে বিশেষ রিপোর্ট ও পাবলিকেশন প্রকাশ করেছিলেন।[১৭৪]

যুক্তরাজ্যের 'গার্ডিয়ান', 'ডেইলি টেলিগ্রাফ', ভারতের 'The Sunday Statesman', 'দেশ', ত্রিপুরা রাজ্যের 'দৈনিক সংবাদ', 'চিনিকক', হংকং-এর 'ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে খবর ও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও 'বিবিসি', 'আকাশবাণী', 'ভয়েস অব আমেরিকা', 'রেডিও ভেরিতাস', 'ডয়েৎসে ভেলে' প্রভৃতি বেতার মাধ্যম সারা বিশ্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে খবর ও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।[১৭৫]

১২.১ ইনভেস্টিগেশন টিম-এর আগমন

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের উপর বাংলাদেশ সরকার যে মানবাধিকার বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব'লে প্রচার হচ্ছিল তার সঠিকতা ও গভীরতা নিরুপনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গঠিত হয়। এটি একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী কমিশন। এই কমিশন ১৯৮৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে গঠিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, নরওয়ে, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড, সুইডেন ও ডেনমার্কের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, সাংবাদিক, সাংবাদিক, ও গবেষকদের নিয়ে এই কমিশন সমস্বয়ে গঠিত হয়েছিল। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, অর্থনৈতিক অবরোধ, বে-আইনি অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, সামরিক সন্ত্রাস প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা আলোচনা অনুষ্ঠান, বুলেটিন ও সেমিনারের মাধ্যমে বিশ্বকে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি জানাতে থাকে। বেশকিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয়

[১৭৩] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১১/০৫/২০০৪।

[১৭৪] ঐ।

[১৭৫] প্রদীপ্ত খীসা, *পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ*, পৃষ্ঠা ঃ ৭১।

সংস্থা এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেমন International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), বিশ্ব আদিবাসী কাউন্সিল (WCIP), বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থা (WFB), নির্যাতিত জনগণের প্রতিষ্ঠান (RIOP), মানবিক সুরক্ষা ফোরাম (HPF), বুদ্ধিষ্ট পীস ফেলোশীপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল ও এ্যান্টি-স্লেভারী সোসাইটি।[১৭৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার বিষয় নিয়ে ১৯৮৬ সালে আর্মষ্টারডামে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল “পার্বত্য চট্টগ্রামে বে-আইনি হত্যা ও অত্যাচার” নামে মানবাধিকার লংঘনের রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৯-৯০ সালে এই সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে মাননবাধিকার লংঘনের উপর তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের দাবি করে বাংলাদেশ সরকারের নিকট। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের নিকট বার বার কৈফিয়ত চেয়েও ব্যর্থ হয়। শেষে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে গেলে তাকে সামরিক কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে জুম্ম জনগণের সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০৭ নম্বর চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি উপজাতি ও আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা করে। চুক্তিতে বর্ণিত ঘোষণাসমূহ লংঘনের কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে মানবাধিকার লংঘনকারী হিসাবে ঘোষণা করে। এছাড়া জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মৌলিক অধিকার লংঘনের জন্য বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ১৯৯১ সালের ২৩শে মে Life Is Not Ours : Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts এই শিরোনামে লণ্ডনের হাউস অব লর্ডস ভবনে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে । ১২৭ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে ৮টি অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বৃটিশ এমপি, বৃটেন-বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সদস্য ও বৃটিশ শরনার্থী পরিষদের মিঃ আলফ ডাব্বস। বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের চুড়ান্ত রিপোর্টটি বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা, সরকার, ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রিপোর্টটি বাংলাদেশ সরকার সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। [১৭৭]

সংখ্যালঘু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা International Work Group for Indigenous Affairs-এর প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট প্রদান করেন।[১৭৮]

---

[১৭৬] শ্রী জগদীশ, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বেদখল’, *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন* (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র), বুলেটিন নং ৫, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ৩০-৩৫।

[১৭৭] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩০।

[১৭৮] প্রদীপ্ত খীসা, *পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ*, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭।

১৯৯১-এর প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেনেকি এরেন্স কর্তৃক গঠিত Life Is Not Ours নামক একটি ইনকোয়ারি কমিশন থেকে 'ইনভেস্টিগেশন টিম'-এর কর্মীরা এসেছিল। এক ধরণের আবেগ এবং থিম নিয়ে এটি গঠিত হয়েছিল। এর সদস্য হিসেবে ছিলেন কানাডিয়ান ডগলাস সেন্ডাস, যিনি ছিলেন পেশায় একজন শিক্ষক এবং একইসাথে আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষজ্ঞ। আরো ছিলেন ইউরোপিয়ান কমিশনের পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট (জার্মানির ফ্রেইবার্ক এর বাসিন্দা), ড. এন্ড্রু গ্রে এবং নরওয়ের একজন ভদ্রমহিলা। তাদের গ্রুপটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একদল গিয়েছিলেন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে, এবং আরেক দল এসেছিলেন বাংলাদেশে। তারা সাথে কথা বলেছেন। Humanity Protection Forum ত্রিপুরার শরণার্থীদের সমর্থন দিয়েছিলেন। ইউরোপে আইফোর নামে একটা অর্গানাইজেশন Independent Commission হিসেবে শান্তিবাহিনীর পক্ষে ভাল ক্যাম্পেইন করেছিল। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় যে Atrocity, Military Rule চলছে, সমতল এলাকার জনগণের অন্যায় অনুপ্রবেশ চলছে, জমি দখলের প্রক্রিয়া চলছে এই বিষয়ে তারা জনমত সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপিয়ান সরকারের কাছে বিভিন্ন ফোরামে বিষয়গুলো তুলে ধরেছিল।[১৭৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচন্ডভাবে মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে রূপায়ন দেওয়ান বলেন ঃ [১৮০]

> "বিদেশে বাংলাদেশের ডিপ্লোম্যাটরা চাপের মুখে থাকতেন, তারা ওখানে স্বীকার করতেন না যে, পার্বত্য অঞ্চলে Human rights abused হচ্ছে। ঐ কমিশনে আমরা বলেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লংঘনের তথ্যের ব্যাপারে আমাদের কাছে পেপার আছে। তখন তারা বলেছিল যেWe are ready to visit Chittagong Hill Tracts.যখন কমিশনের ডিপ্লোম্যাটরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য রাজি হয়, তখন বাংলাদেশ হাইকমিশন তাদের বলেছিল 'Hill Tracts-এ গিয়ে তোমরা কি করবে? ওখানে বাঘ, ভালুক, হাতি আছে, বিপদে পড়বে'। বহু তর্কবিতর্কের পর ইউরোপে ক্যাম্পেইনটা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে, সাংবাদিকদের চাপের মুখে সরকার অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের Human Rights Commission-এর চেয়ারপার্সন লর্ড এনাল্সের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন আসার কথা ছিল। তার মৃত্যুর কারণে সেটা স্থগিত হয়ে যায় ।'
>
> 'আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে IWGIA থেকে বাংলাদেশ সরকারের অবগতি সহকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শণ করেছে। IWGIA পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মানবাধিকারের উপর ইয়েন্সডাল নামক একটা Year Book প্রত্যেক বছর জুলাই মাসে disseminate করে থাকে।'

---

[১৭৯] রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১১/০৫/২০০৪।

[১৮০] ঐ।

'সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল ও বিশেষ করে Human Protection Forum (HPF)-এর সাথে আর. এস. দেওয়ানের যোগাযোগ হয়েছিল। ১৯৮২ সালে সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনালের এক রিপোর্টে সেনাবাহিনীর গণহত্যা এবং মিজোরামে প্রায় ৫০০ চাকমা পরিবারের আশ্রয় গ্রহণের তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। রিপোর্টের মাধ্যমে এটা জানার পর HPF-এর ডিরেক্টর সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।"

১৩. উনিশশ নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হ'লে তৎকালীন বিরোধী দলগুলির আহবানে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ রাজনৈতিক পরিবর্তন দেশে যেমন কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসে তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর মনেও নতুন আশা সঞ্চালিত হয়। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬৪জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বাতিল, ভারত থেকে শরণার্থী ফিরিয়ে আনাসহ কতিপয় দাবি তুলে ধরেন। এরশাদ সরকারের পতনের পর চট্টগ্রাম ও ঢাকার পাহাড়ি ছাত্ররা স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়া তারাও ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি জানায়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি সফরে গিয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে বলে ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, এরশাদ সরকারের পতনের পরপরই তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের বাকী ৬১টি জেলা পরিষদ বাতিল করা হয়।[১৮১]

১৩.১ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র শাসনামল

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ২০ মার্চ সরকার গঠন করে এবং খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। একই বছর ১৪ এপ্রিল সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের এখতিয়ার সম্পন্ন কাউন্সিল কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ কমিটি গঠিত হয়েছিল মূলত ঃ জেনারেল এরশাদ আমলে, যা অস্থায়ী সরকারের আমলে পুনর্গঠিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সাতজন মন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র

[১৮১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৫-১৭৬; প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭২।

সচিববৃন্দ। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এরশাদ সরকারের আমলে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।[১৮২]

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর ১৩ই মে খাগড়াছড়িতে এক ভাষণে সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। ১৯৯১ সালের ৯ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে দ্রুততার সাথে ২২টি বিভাগের মধ্যে ১৯টি বিভাগ তথা ১৯টি বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষমতা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদেরসমূহের নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমর্থকরা খুশি হলেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বড় অংশই ক্ষুব্ধ হন। সরকারের এ উদ্যোগের পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির সাথেও আলোচনার প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির আলোচনার জন্য পুনরায় একটি যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন ঃ [১৮৩]

আহ্বায়ক – হংসধ্বজ চাকমা

সদস্য – অনন্তবিহারী খীসা (খাগড়াছড়ি),

– নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা (রামগড়),

– মথুরালাল চাকমা (রাঙ্গামাটি),

– ক্যসু অং (বান্দরবান) ও

– মোঃ শফি (পানছড়ি)।

একই সাথে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের নিকট প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্থান্তর এবং জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৯২ সালের ৮ জুলাই স্থানীয় সরকার পরিষদদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সরকার সংসদে বিল উত্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ সাংসদরা সংসদে স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের দাবি জানালে কণ্ঠ ভোটে হেরে যায়। পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হলে ১০ জুলাই পার্বত্য অঞ্চলের সংসদ সদস্যবৃন্দ তাদেরকে বাদ দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায়। তাদের দাবির মুখে সরকার খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করে। শান্তিবাহিনী ১৯৯২ সালের ১ আগষ্ট থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত একতরফাভাবে অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে এবং 'রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে'র সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।[১৮৪] পরবর্তীতে বিশেষ কমিটি

---

[১৮২] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৩।

[১৮৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪।

[১৮৪] জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯।

তিন পার্বত্য জেলা সফর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পাহাড়ি ও অপাহাড়িদের সাথে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মতবিনিময় করে।[১৮৫]

এ পর্যায়ে ১৯৯১ সালের ২২ অক্টোবর চট্টগ্রাম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান শান্তিবাহিনীর প্রতি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাসসহ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এটি ছিল সরকারের পক্ষে পঞ্চমতম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। এ প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মেজর মিহির ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে রাজনৈতিক প্রতারণা হিসেবে উল্লেখ ক'রে সরকারের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেন। জনসংহতি সমিতিও একইভাবে এ ঘোষণাকে চলমান শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করে। অভিযোগ রয়েছে যে, ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তীত হওয়ার পরেও জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে এবং বিশেষ একটি মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনার পরিবেশ বিঘ্নিত করার বিষয়ে তৎপরতা চালিয়েছে।[১৮৬]

যোগাযোগ কমিটির চেষ্টায় ১৯৯২ সালের ৫ই নভেম্বর খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে জনসংহতি সমিতি ও বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে পাহাড়িদের মধ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে বিশেষ কমিটির বৈঠকগুলো কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১৮৭] ১৯৯১ সালের নভেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পক্ষ থেকে যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে একজন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি গঠনের দাবি জানানো হলেও ডিসেম্বর মাসে সরকার ব্রিগেড কমান্ডার শরীফ আজিজকে প্রধান ক'রে ৮ সদস্যের একটি টীম গঠন করে। এতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকলেও জনসংহতি সমিতি এ কমিটি প্রত্যাখ্যান করে পূনরায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি জানায়।

১৯৯২ সালের ১৭ জুন বাংলাদেশের ৫টি রাজনৈতিক দল এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কতিপয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। ১৯৯২ সালের ১১ জুলাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্টজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সভা থেকে ব্যরিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহানকে আহ্বায়ক এবং আনু মুহাম্মদ, মোস্তফা ফারুক এবং প্রশান্ত ত্রিপুরাকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৭৭ সদস্যবিশিষ্ট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং এ কমিটি তার কাজের ভিত্তি হিসেবে ৬টি দাবি সরকারের নিকট পেশ করে।[১৮৮]

[১৮৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২১২-২১৪।
[১৮৬] দৈনিক পূর্বকোন, ১৯ নভেম্বর ১৯৯১। আরও দেখুন প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫।
[১৮৭] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫।
[১৮৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৭৯।

১৯৯২ সালের ৩০ জুলাই চট্টগ্রামের ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে মত প্রকাশ করেন যে, পার্বত্য এলাকায় মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনী দ্বারা নিরীহ ও নিরস্ত্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নির্যাতন বা গ্রেফতারের শিকার হবেনা। সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে জিওসির এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে তিনমাসের অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে।[১৮৯]

পুনরায় সরকারের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৯২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের সাথে বৈঠকের দিন ২১ অক্টোবর নির্ধারিত হলেও ১৯৯২ সালের ১৩ অক্টোবর দীঘিনালায় সংঘটিত সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। অতপর ঃ দীর্ঘ চার বছর পর সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির নবপর্যায়ে ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর। এ বৈঠকে সরকারী কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমেদের নেতৃত্বে ৬জন সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ ছয় ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ১৯৯২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র-বিরতি বহাল রাখা ছাড়া অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়নি।[১৯০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারের কমিটি ও জনসংহাত সমিতির সাথে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর। এ বৈঠকে স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন এক বছর পেছানো, বিরোধীয় ভূমিতে ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে স্থগিত রাখার বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঐক্যমত গঠিত হয়। এ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি বহুল আলোচিত সংশোধিত ৫ দফা দাবি সরকারের নিকট পেশ করলেও এটি নিয়ে সে বৈঠকে আলোচনা হয়নি, তবে এ বৈঠকে পূর্বে নির্ধারিত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ১৯৯৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এ দ্বিতীয় বৈঠকের পর ১৯৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর সরকারের সাথে আলোচনা এবং দাবি-দাওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে জনসংহতি সমিতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সন্তু লারমা দীর্ঘ এক যুগ পর সাংবাদিকদের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ৫ দফা দাবি সম্পর্কে জানান যে, জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পূর্বে প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়েছিল। এটিকে সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধান পরিপন্থী মর্মে উল্লেখ করায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদসহ সংশোধিত ৫ দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯ বছরের আন্দোলনে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সমিতির নেতৃবৃন্দ নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেন।[১৯১]

[১৮৯] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮০-৮১।
[১৯০] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮১-৮২।
[১৯১] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮২-৮৩।

খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ১৯৯৩ সালের ২২ মে সরকারের বিশেষ কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে গতানুগতিকভাবে ১৯৯৩ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির সময় বর্ধিত করা ছাড়া ৫ দফা দাবির কোন বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি সম্পন্ন হয়নি।[১৯২]

সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ১৪ জুলাই। এ বৈঠকে মূলত ঃ ভারত থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে সরকার ১৯৯২ সালের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও পাহাড়ি শরণার্থীদের সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কিত ঘোষণা লিখিতভাবে জনসংহতি সমিতির কাছে হস্তান্তর করে। এ ঘোষণাপত্রে শরণার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ পূর্বক সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।[১৯৩]

১৯৯৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারী বিশেষ কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির সাথে ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সরকার পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতি পেশকৃত সংশোধিত ৫ দফা দাবিস স্পর্কে আট পৃষ্ঠা লিখিত জবাব জনসংহতি সমিতির কাছে হস্তান্তর করে। যুক্তি-পাল্টাযুক্তি, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে এ বৈঠক শেষ হয় এবং জনসংহতি সমিতি এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের এ জবাব প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের বিশেষ কমিটির প্রধান অলি আহমেদ এ আলোচনাকে পরিস্থিতির উন্নতি বলে উল্লেখ করলেও সরকারী কমিটির অন্যতম সদস্য রাশেদ খান মেনন ৫ দফা সংক্রান্ত মতামতকে কমিটির নয়, বরং তা সরকারের মতামত হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এ মতামতগুলোকে কমিটি বিবেচনা করবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।[১৯৪]

১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতীত কোন মৌলিক অগ্রগতি ছাড়াই ১৯৯৩ সালের ২৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সরকারী কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির ৬ষ্ঠ বৈঠক শেষ হয়। যদিও এ বৈঠকের পূর্বেই জনসংহতি সমিতি যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ বৈঠকে আলোচনার জন্য ৫ দফার অনুকূলে ২৯ পৃষ্ঠা লিখিত মতামত কমিটির সদস্যদের নিকট পৌঁছায়। [১৯৫] ১৯৯৩ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখের দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় জনাব ফারুক ইকবাল লিখেছিলেন, "জনসংহতি সমিতির সর্বশেষ মতামত বা প্রস্তাবে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের আগ্রহ পরোক্ষ প্রকাশ পায়।"[১৯৬]

১৩.২ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীদের প্রতি প্রলোভন

রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য যখন একদিকে আলোচনা চলছে তখন, অন্যদিকে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মীদের প্রশাসন প্রচুর চাপের মধ্যে রাখতো, মানসিকভাবে হয়রানি করত। ডিফেন্স ফোর্সেস ইন্টিলিজেন্ট (DFI), ইন্টিলিজেন্ট

[১৯২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪।
[১৯৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪-৮৫।
[১৯৪] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫-৮৬।
[১৯৫] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬-৮৭।
[১৯৬] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

ব্রাঞ্চ (আইবি)-র লোকজন এসে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কর্মীদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখাতো। এই প্রসঙ্গে অং থোয়াই চিং মারমা বলেন ঃ [১৯৭]

> ''১৯৯৫ সালের ঘটনা। আমাকে একবার ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি তাদের বলেছি, সাহেব আমরা তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করি প্রয়োজনে মরবো, না হয় জেলে যাবো। পাহাড়িদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে। জোন কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট ইকবাল। তিনি নানা রকম প্রলোভন দেখালেন। তিনি ছাত্র নেতৃবৃন্দের নিক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিতে শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আড়াই লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। এই সুযোগ গ্রহণের শর্ত ছিল কর্মিদেও পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া। পদত্যাগপত্র দেওয়ার পর ছাগল পালন প্রকল্প থেকে অর্থ দেওয়া হতো। এটাকে বলা হতো শান্তকরণ কর্মসূচি। আমাদের সভাপতি লালমুটিয়াং বম আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাকে এই প্রকল্পের আওতায় ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তাকে রূপালী ব্যাংকের Second Manager করা হয়। এভাবে ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও মোটা অংকের টাকা দেওয়ার প্রলোভন দিয়েছিল। বলেছিল আমাদের বড় বড় গাড়ি আছে ক্যাম্পে, তুমি গাড়িতে করে মালামাল এনে ব্যবসা করতে পারো, কোন চার্জ দিতে হবে না। তবে তোমাকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি থেকে পদত্যাগপত্র দিতে হবে। আমি বলেছি, 'আমাদের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি আমাকে নির্বাচিত করেছে। আমি পদত্যাগ পত্র জমা দিলে সংগঠন শেষ হয়ে যাবে এটা মনে করলে আপনার ভুল হবে। আমি পদত্যাগ করলে আমার চেয়ে ভালো দশজন ছেলে আগামীকাল সংগঠনে যোগ দিবে।' শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে না পেরে চাকমা এবং শান্তিবাহিনীকে গালিগালাজ করে আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম একদিন অবশ্যই এর প্রতিক্রিয়া হবে। আপনি তো মার্মাদের সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানেন। আপনার কথা আমি একশতভাগ সমর্থন করি, কিন্তু গ্রহণ করতে পারবো না। এরপর আর কোন যোগাযোগ রাখিনি।''

১৯৯৬ সালের ৩০শে মার্চ খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে খালেদা জিয়ার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। খালেদা জিয়ার শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ সফল না হওয়ার অন্যতম কারণ সাম্প্রদায়িক শক্তি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি এবং পূর্ববর্তী সরকারের এ সংক্রান্ত নীতির পুরোপুরি অনুসরণ।[১৯৮]

১৪. আওয়ামী লীগের শাসনকাল ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের নির্বাচন মেনিফেস্টো অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে দেশে বিরাজমান অন্যতম একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন।

---

[১৯৭] অংথোয়াই চিং মারমা'র সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩।

[১৯৮] প্রদীপ্ত খীসা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬-২৮।

১৪.১ ২৮ কাঠুরিয়া হত্যা

বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী দ্বারা চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ২৮জন বাঙালি কাঠুরের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি রাঙ্গামাটি জেলার বিচ্ছিন্ন একটি অংশে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সংঘঠিত হয়, যেখানে ২৮জন নিহত হয়। আক্রান্ত দুজন পালিয়ে আসতে সক্ষম হন যারা পরবর্তীতে তাদের উপর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করেন। মৃতদেহগুলো খুঁজে পাবার আগে বাংলাদেশী সৈন্যরা এই ঘটনায় নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে। একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন, বাঙালিদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধ হিসেবে আরও বড় গণহত্যার ঘটনা ঘটাতে পারে, এ নিয়ে আমরা শংকিত। বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের আক্রমণের ঘটনাকে শান্তি বাহিনীর বিদ্রোহের পিছনের যে সমস্যা তা সুরাহার জন্য বাংলাদেশের নির্বাচিত নতুন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস বলে অভিহিত করেন। শান্তি বাহিনী, যার অধিকাংশ চাকমা জাতি হতে আগত, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চায় এবং তারা তাদের ঐতিহ্যগত ভূমিতে বাঙালির অনুপ্রবেশে শঙ্কিত।[১৯৯] ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত Anne's Defense Weekly-তে কাঠুরিয়া নিহতের ঘটনাকে তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করা হয় নিম্নলিখিতভাবে ঃ [২০০]

> "১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া সামরিক যুদ্ধবিরতি এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে, যদিও শান্তি আলোচনা প্রায় দু বছরের মত বন্ধ ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কলহের কারণে; অবশ্য ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচন ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিজয়ের মাধ্যমে এই কলহের পরিসমাপ্তি ঘটে। ২৮ কাঠুরিয়া নিহতের ঘটনায় সরকারকে এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।"

১৪.২ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের শান্তি উদ্যোগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালের ২৩ শে জুন ক্ষমতা গ্রহণের পর দুই মাস পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। ১১ই সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি থেকে ৪৫ কিলোমিটার উত্তরে পাহাড়ের খাদে ২৮জন বাঙালি কাঠুরিয়ার লাশ পাওয়ার ঘটনার পর বিভিন্ন মহল সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চায়। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন আওয়ামী লীগ নেতা ও চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, খাগড়াছড়ির কল্পরঞ্জন চাকমা, রাঙ্গামাটির দীপংকর তালুকদার ও বান্দরবানের বীর বাহাদুর, জাতীয় পার্টির সাংসদ এডভোকেট ফজলে রাব্বী, বিএনপির আমির খসরু মাহমুদ, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং চট্টগ্রামের সাবেক

---

[১৯৯] Anne's Defense Weekly, USA, 09-25-1996, পৃষ্ঠা ঃ ২২। এরা উল্লেখ করেছিলেন যে, শান্তিবাহিনীর হাতে প্রায় ৩০ জন নিহিত হয়েছিল এবং নিখোঁজ ছিল ৫জন।

[200] ঐ।

বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান। অবশ্য বিএনপির সাংসদেরা কমিটির কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন। আবুল হাসনাতের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর প্রথম শান্তিবাহিনীর সাথে খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে বৈঠক করে। বৈঠক ২৪ তারিখ পর্যন্ত দু দফায় অব্যাহত থাকে। আলোচনায় জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সন্তু লারমার সাথে সাধারণত রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা, ডাঃ বাবুল চাকমা ও রক্ত উৎপল ত্রিপুরার উপস্থিতি অধিক ছিল। যোগাযোগ কমিটির তরফ থেকে নকুলচন্দ্র ত্রিপুরা, কে শৈ অং মারমা, মধুরা লাল চাকমা, বিশ্বজিৎ চাকমা, মোহাম্মদ শফি ও হংস ধ্বজ চাকমা উপস্থিত থাকতেন। সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সালের ২৫ জানুয়ারি সরকারের সাথে আলোচনার জন্য প্রথম ঢাকায় আসেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় বৈঠক এটি। বৈঠক ২৫ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন চলে। ইতিমধ্যে ১১ সদস্যের জাতীয় কমিটির প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় গমন করেন শরণার্থী নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য। ১৯৯৭ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির দুদিন ব্যাপী তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত চার দিন ধরে ঢাকায় উভয় পক্ষের পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ বৈঠক ফলপ্রসূ হওয়ার দাবিকরেন। এই চতুর্থ বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জনসংহতি সমিতির ২২ পৃষ্ঠার ৪৪টি উপদাবি সম্বলিত পাঁচ দফা দাবিনামা। এই আলোচনার উল্লেখযোগ্যবিষয় ছিল ভূমির অধিকার এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়। জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটির পঞ্চম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জুলাই থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। ঢাকায় ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। এ বৈঠকের পর ১৭ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমা ঘোষণা দেন, জনসংহতি সমিতি ও জাতীয় কমিটি একটি খসড়া শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরু হয় ১৯৯৭ সালের ২৬ নভেম্বর। ৩০ নভেম্বর মধ্যরাতে উভয় পক্ষ চুক্তির সকল বিষয়ে একমত হতে সম্মত হয়।[২০১]

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত হিসাবে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা বাংলাদেশ সরকারের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে। চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়েছে। এই শান্তি স্থাপন কিন্তু একদিনে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দুই দশকের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, উভয় পক্ষে যোগাযোগ ও বৈঠকের পর বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শান্তিবাহিনী অস্ত্র ফেলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিচুক্তি পাহাড়ি-বাঙালি, সরকারী-বেসরকারী, সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন অবস্থানের ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।[২০২]

[২০১] মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩১-৩৩৫।

[২০২] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৪।

১৪.৩ চুক্তি পরবর্তী আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

১৯৯৮ সালের ২৪ মে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন (১২ নং আইন) পাশ হয় এবং বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা পৃষ্ঠা ৬১৮ তে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ গেজেটে, ১৯৮৯ সালের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনকে সংশোধন করে পাশ করা ১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন, খাগড়াছড়িপার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনকে সংশোধন করে পাশ করা ১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন এবং ১৯৮৯ সালের বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনকে সংশোধন করে পাশ করা ১৯৯৮ সনের ১১ নং আইন প্রকাশ করা হয়। [২০৩]

১৪.৪. অস্ত্র সমর্পণ

১৯৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সরকার শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সন্তু লারমার নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ে শান্তিবাহিনীর একটি দল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আত্মসমর্পণ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সন্তু লারমা অস্ত্র তুলে দেন এবং শেখ হাসিনা সন্তু লারমার হাতে সাদা গোলাপ তুলে দেন। ১১ তারিখেও অস্ত্রসমর্পণ চলে। ৪৬৫টি আধুনিক অস্ত্র নিয়ে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯জন সদস্য এই দুই দিনে আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি ৫৪৫জন শান্তিবাহিনীর সদস্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে বাঘাইছড়ি হাইস্কুল মাঠে আত্মসমর্পণ করে। তৃতীয় পর্যায়ে ৪৪৩জন শান্তিবাহিনী সদস্য ২২ ফেব্রুয়ারি চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লার উপস্থিতিতে দীঘিনালা থানার বড়দাম দীঘির নিকটবর্তী মাঠে ১০৯টি অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। [২০৪]

১৪.৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির তাৎপর্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে থেকে দেশে বিরাজ করছে। যদিও স্বাধীনতার আগেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল আর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বাঙালি-ভিন্ন অন্যান্য জাতিসমূহের সমমর্যাদা বিধান ও সমনাধিকার নিশ্চিত না করায় তা জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্র সামরিকায়নের পথ ধরে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। তাতে সমস্যার সমাধান তো হয়ইনি, বরং সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়ে সংকটে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয় শান্তি চুক্তি।

[২০৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৬।

[২০৪] ঐ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলাদেশের জন্ম হবার আগে থেকেই যে সমস্যাটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল বাস্তব সম্মতভাবে সেই সমস্যাটা নিষ্পত্তির দিকে এগোনোর একটা পথ এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। যে যুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই শুরু হয়েছিল এবং যা ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে আরও তীব্রতর হয়েছিল, সেই যুদ্ধের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ এই চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। সেদিক থেকে এ চুক্তি প্রায় ২২-২৩ বছরের সশস্ত্র সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পাহাড়িদের "উপজাতি" হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জাতিগুলো বাস করে তারা জাতি। বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি বলে জাতি, আর তারা কম বলে তারা উপজাতি!

বাঙালিদের যে কর্তৃত্ব তার এক ধরনের পরোক্ষ ঘোষণা এর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়। পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাদের অভিমত ছিল– সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি তথা ভারতীয় উপমহাদেশ পরিস্থিতির বিবেচনায় এবং আমাদের দেশের পরিস্থিতির বিবেচনায়, লড়াই-এর যে পর্যায়ে তারা উপনীত হয়েছে, তাতে এমন চুক্তিতে আসাটাই সর্বোত্তম। দেশের জন্যও মঙ্গল। শুধু জাতি বলা হলো না উপজাতি বলা হলো, এ নিয়ে বিতর্কে তারা চুক্তি করা থেকে বিরত থাকতে চায় নি। এটা প্রজ্ঞার ব্যাপারই মনে হয়েছে। এছাড়া, সাংবিধানিক গ্যারান্টি দরকার যেটা ১৯৭২ সালের সংবিধানে আসে নি এবং যেটা নিয়ে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অত্যন্ত জোরের সাথে সংগ্রাম করেছিলেন এবং যেটা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং তখনকার যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন তাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, সেই সাংবিধানিক গুরুত্ব এখন পর্যন্ত তৈরি হয় নি। তবে এই চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয়েছে এটা এক ধরনের পরোক্ষ গ্যারান্টি নিয়েই তৈরি হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সাংবিধানিক গ্যারান্টি দরকার। আমাদের এই দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বলে দেশের যে বহুজাতিক চরিত্র, বাংলাদেশে যে বহুজাতের মানুষ আছেন এ বাস্তবতাটা অন্যরা কিছুকালের জন্য ভুলে গিয়েছিল। এদেশে অন্যান্য জাতির মানুষের যেরূপ অবস্থান রয়েছে এবং এদেশের নাগরিক হিসেবে সমান মর্যাদায় বাস করার যে অধিকার রয়েছে তার একটা প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি এই চুক্তি। কাজেই সেদিক থেকেও এই চুক্তির একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে।

আরেকটি দিক বিবেচনায়ও এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। যেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদ। জনগণের ক্ষমতায়নের যে কথা আমরা বলি, তার পথ হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। এই প্রথমবারের মতো আমরা দেখছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে স্থানীয় পরিষদ আংশিকভাবে হলেও ক্ষমতা অর্জন করেছে। এটা পথ দেখাবে দেশের বাকি অংশকে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নের দিকে। সচিবালয়ের যে অনতিক্রান্ত বৃত্ত যেটা অমরা কলোনিয়াল হেরিটেজ হিসেবে পেয়েছি সেটাকে ভেঙ্গে গণতন্ত্রায়নের দিকে আমাদের দেশকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যারা স্বাক্ষর করেছেন তারা সবাই নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন, রাজনীতিগতভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষ মনে করেন সংগ্রামেরই একটা অংশ হচ্ছে চুক্তি। আলোচনা বা চুক্তিকে যারা দীর্ঘ ২৫ বছরের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন, খণ্ডিতভাবে শুধু শান্তিচুক্তিকে দেখেন, তারা খুবই ভুল করেন। এই প্রসঙ্গে প্যালেস্টাইনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও অসলো চুক্তির কথা আলোচিত হতে পারে। ইয়াসির আরাফাত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, জীবনের ২৬ বছর কখনো তিনি একই শয্যায় পর পর দু'রাত ঘুমাননি নিরাপত্তার প্রয়োজনে। সেই মানুষটি যখন অসলো চুক্তি করেছেন, তখন কেউ কেউ বলেছেন ইয়াসির আরাফাত দেউলিয়া হয়ে গেছেন, দালাল হয়ে গেছেন, সিআইএ-র এজেন্ট হয়ে গেছেন। কিন্তু ইয়াসির আরাফাত এই চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ক তৎকালে চলমান ধারায় প্রত্যক্ষ পরিবর্তন এনেছেন। ফলে যে আমেরিকা ইয়াসির আরাফাতকে প্রধান সন্ত্রাসবাদী হিসেবে একদা আখ্যায়িত করেছিল, সেই আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তীতে হোয়াইট হাউসে ইয়াসির আরাফাতকে রিসিভ করেছেন। ইয়াসির আরাফাত নিপুণ কূটনৈতিক দক্ষতায় গোটা সম্পর্কের চেহারাটাকে পাল্টে দিয়েছেন। কাজেই ইয়াসির আরাফাতকে যদি তাঁর গোটা সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়, তাহলে ভুল করা হবে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের যে লড়াই, সেই লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে দেখা হয় এবং তাকে যদি খণ্ডিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে ভুল করা হবে।

সারা বিশ্বে শান্তির অন্বেষায় মানুষের বিরামহীন প্রয়াস চলছে। ছোট বা বড় যেমনই হোক সেই প্রয়াসে সকলেরই অংশগ্রহণ করা উচিত। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মানুষের রক্ষার জন্য শান্তির সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সকলকে অবদান রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রক্তক্ষয়ী হানাহানি বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের সরকারগুলো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে থেকে যে পথ অনুসরণ করে আসছিল সেই পথ থেকে তারা যে সরে এসেছে, তারা যে ভুল বুঝতে পেরেছে সে জন্য তারা ধন্যবাদ পেতে পারে। এর মাধ্যমে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রধান জায়গাটি সরকার তৈরি করেছেন। চুক্তি করার মাধ্যমে দেশের সংহতি রক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তাদের আন্তরিকতার যে প্রমাণ রেখেছেন সেজন্য তারাও সাধুবাদ পেতে পারেন। কাজেই এই চুক্তির তাৎপর্য ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং সারাদেশের সংহতি রক্ষা ও মানুষের মুক্তির আকাঙ্খাকে এই চুক্তি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১৫. উপসংহার

সপ্তম অধ্যায়ে সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি'র পুনর্গঠন ও পরবর্তী বিষয়সমূহ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের সাথে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির শান্তি আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার সময়েও (১৯৯১-১৯৯৬) আলোচনা অব্যাহত ছিল। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের নির্বাচন মেনিফেস্টো

অনুযায়ী পার্বত্য চট্রগ্রামের সমস্যাকে দেশে বিরাজমান অন্যতম একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) আলোচনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুইযুগের অধিক সময় ধরে চলা সহিংসতার অবসান ঘটে। সৃষ্টি হয় শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুকূল বাতাবরণ।

অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন বাঙালি-আদিবাসী সকলে মিলে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর আদিবাসীদের সমানাধিকারের ন্যায্য দাবিকে ব্যাহত করার জন্য সেই পাকিস্তানী কায়দায় আদিবাসীদের উপরে যে নির্মমতা চালানো হয়েছিল তার খানিকটা বিবরণ, অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে, এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধের অন্যান্য উপাদানের মতই পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ সংঘাতে হত্যা ও নির্যাতনের গতি-প্রকৃতি ছিল একই রকম। সেনাবাহিনী ও সেটলারবাহিনী দলবদ্ধভাবে পাহাড়ি আদিবাসীদের টার্গেট ক'রে নির্যাতন, লুট, অগ্নিসংযোগ আর হত্যাকান্ড চালিয়েছে, আর ধর্ষণ দিয়ে সম্পূর্ণ করেছে তাদের অপারেশন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮-৯ বছর শিশুকন্যা থেকে শুরু করে ৭০ বছর বৃদ্ধাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়েছে। দীর্ঘ ২২ বছরের সংগ্রামে যারা নিবেদিত ছিলেন তাদের সংগ্রামী মনোভূমি নির্মাণে এই অন্যায় এবং নিপিড়ন ও নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট ট্রমা সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল। ফলে, অনিবার্যভাবে, পাহাড়ের আদিবাসীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গেছেন। অভিসন্দর্ভে আলোচিত সময়কালে আদিবাসী জীবনের যে যন্ত্রণা, যে বেদনা, যে Trauma, তার খানিকটা প্রতিফলন পাওয়া যায় সুদীপ্ত চাকমা মিকাডো'র কবিতা Unspoken Words-এ ঃ [২০৫]

> æWhere is our home, mom?
> This is our home, son.
> There, that hill and beyond it,
> your forefathers used to do their digging there.
> Ah, there is this army camp –
> How can I tell you the truth?
> They came here back in 1986
> to set up their camp
> but day by day
> their land was taken.
> Selim and Abdul stole ours,

---

[২০৫] Sudipta Chakma Mikado, 'Identity', published as *Two Poems from the Chakma* in the periodical *World Litereture Today*, vol. 87, Issue 3, May-June 2013, p-53, printed in http:// connection. ebscohost. com/ poems/87118989/two-poems-from-chakma. Translation from Chakma into Bangla by the author and from Bangla into English By Quamrul Hassan with David Shook.

but not just ours,
the land that belonged to all of us.
They came in the dead of night
and we had to hide in the jungle.
We even crossed the border and
stayed in Indian refugee camps.
We lived there twelve years,
until in 1997
the government said our lands would be returned
if we came home.
But back home, it's a story of deception and agony.
The country has given them the right
to usurp the indigenous.
Still – if I am asked
I would choose to be born here again
in this wonderful world
with my friends: we would have done the digging."

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করবে এই দীর্ঘ শান্তি প্রক্রিয়ার সাফল্য এবং সেক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের এক প্রাক্তন আমলার নিম্নোক্ত অভিমত থেকে ঃ [২০৬]

> æI thought things would simmer down after the signing of the peace accord. I thought that our political leaders who were opposed to this accord would finally come to realise the value of preserving and promoting amity between the majority population and our ethnic minorities. To my sadness, however, I find that in the name of national solidarity and sovereignty these so-called leaders seem bent on fomenting suspicion and sowing the seeds of division in the hill tracts. Instead of allaying fears of subjugation, destruction of culture, and forced assimilation of the minorities, they are encouraging the reappearance of the same ideological forces that led to the predicament in the hill tracts."

[২০৬] Ziauddin Choudhury, 'Broken Promises', *The Daily Star*, April 8, 2010।

অষ্টম অধ্যায়

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতাদর্শিক অবস্থান ও ব্যক্তিত্বের অবয়ব

১. সূচনা

অভিসন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতাদর্শিক অবস্থান ও ব্যক্তিত্বের অবয়ব আলোচিত হয়েছে। তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পাহাড়ী বা বাঙালি নির্বিশেষে সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রাম ও নারী-অধিকার বিষয়ে তার সচেতনতার উপর এখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে তার উদ্যোগে পাহাড়ে শিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, পরিবেশ ভাবনা, শিল্পচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহের কথাও আলোচিত হয়েছে।

২. জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ

এম. এন. লারমার দেশপ্রেম প্রসঙ্গে জ্যোতিপ্রভা লারমা বলেন, “কাপ্তাই বাঁধের দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে বাঁধের পানি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে নেয়। আমাদের প্রিয় গ্রামটিও ডুবে যাবে। সবার মধ্যে এক ধরনের উৎকণ্ঠা ও শোক। ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ির দিকে আসছে পানি। ঠিক এমনি সময়ে মঞ্জু আমাদের বাড়ির দেয়াল থেকে এক খণ্ড মাটি আর উঠান থেকে আরেক খণ্ড মাটি নিয়ে কাগজে মুড়িয়ে আমার হাতে দিল। আর আমাকে বলছিল এই জিনিসগুলি প্রাণের চেয়ে সযতনে রেখে দিতে। তখন আমি তার মূল্য বুঝতে পারিনি। মঞ্জুকে প্রশ্ন করলে সে উত্তরে বলেছিল ‘এই মাটি অমূল্য জিনিস’। সযতনে তা রেখে দিলাম ট্রাঙ্কে। তার সেদিনকার সেই মাটির খণ্ডগুলোর প্রতি এমন মায়া-মমতা, শ্রদ্ধাবোধ বুঝতে পারিনি। আজ এই শেষ বয়সে তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি, সেই মাটি মানুষের কতটুকু প্রয়োজন ! আজ বুঝতে পারছি মঞ্জু নিজের মাতৃভূমি ও বাস্তুভিটাকে কত গভীরভাবে অনুভব করেছিল, ভালোবেসে ছিল !”[১]

রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র অবস্থায় ইসলামের ইতিহাসের উপর পাঠদানের সময় জনৈক শিক্ষক জুম্ম জাতির ইতিহাস নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট কথা বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। পরে শিক্ষক তা সংশোধন করে নেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি জুম্ম সমাজের জন্য কাজ করেছেন।[২]

---

[১] জ্যোতিপ্রভা লারমা, ‘মঞ্জু’র কিছু স্মৃতি কিছু কথা’, *এম. এন. লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ২০১৪ স্মরণিকা*, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি, ২০১৪, পৃষ্ঠা ঃ১১।

[২] শ্রী হিমাদ্রী, ‘মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী’, ১০ নভেম্বর ‘৮৩ স্মরণে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ১৭।

৩. অসাম্প্রদায়িক চেতনা

এম. এন. লারমা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। পাহাড়ি বা বাঙালি, সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদে কথা বলেছেন। অসংখ্য বাঙালি বন্ধুর সংগে তাঁর সখ্যতা ছিল। কাপ্তাই বাঁধের বিরোধিতার কারণে কারাভোগের পর ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ মুক্তি পেলে চট্টগ্রামের জেএম সেন হলে বাঙালি বন্ধুরা তাঁর সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করে।[৩]

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ অধিবেশন আরম্ভকালে পবিত্র কোরআন থেকে সুরা পাঠ এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়। এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধেও এম. এন. লারমা প্রতিবাদ জানান। পরবর্তীতে ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] তিনি সংসদে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠায়ও সচেষ্ট ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল সংসদে তিনি বলেন ঃ

> "মাননীয় স্পীকার, শপথ গ্রহণের আগে আমাদের দিনের কর্মসূচি যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন পবিত্র কোরান থেকে 'সুরা' পাঠ এবং গীতা থেকে 'শ্লোক' পাঠ করা হয়েছে। এখন আপনার মাধ্যমে এই পরিষদের নিকট আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই পরিষদে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রতিনিধিত্ব করছি। বাংলাদেশে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক নাই- বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকও আছেন। মাননীয় স্পীকার এখন আমার প্রশ্ন হলো যে, কেবল পবিত্র কোরান ও গীতা পাঠ করা হবে, না বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল থেকেও পাঠের প্রয়োজন আছে?"[৫]

লারমার এই প্রশ্নের পর আইনমন্ত্রী নীতিগতভাবে তাঁর যুক্তি স্বীকার করে পরবর্তীতে ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকে পাঠের আশ্বাস দেন। ১৯৭৩ সালের জুনে সংসদ অধিবেশনে ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ না করা হলে তিনি পূর্বের বিষয়টি উত্থাপন করেন। ১৯৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি সংসদ অধিবেশনে বাইবেল বাদ দিয়ে কোরান, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হলে পুনরায় তিনি বলেন, 'আজকে এই মহান জাতীয় সংসদে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, গীতা পাঠ এবং ত্রিপিটক পাঠ হলো বটে কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল পাঠ করা কেন হলোনা? খ্রীষ্টানরা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের খ্রীষ্টান নাগরিকদের জাতীয় সংসদে ধর্মীয় অধিকার রয়েছে।' পরবর্তীতে বাইবেল পাঠও শুরু হয়। যেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে।[৬]

---

[৩] সজীব চাকমা, 'মহান নেতা এম এন লারমা : তাঁর চিন্তা ও কর্ম', ১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ঃ ০৭।

[৪] শ্রী উদয়ন, 'এম. এন. লারমার সংসদীয় জীবন ও চিন্তা', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং-২৩, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ০৭-০৯।

[৫] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বৈধতার প্রশ্ন বিষয়ক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিতর্ক, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩।

[৬] সজীব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ১০-১১।

৪. শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান বিল উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষ ও পাহাড়ি জনগণের অধিকার সংবিধানে ঠাঁই পায়নি। জনগণকে সাংবিধানিকভাবে বাঙালি জাতিতে পরিণত করা হলো – যদিও গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। তাই গণপরিষদের একমাত্র নির্দলীয় সদস্য এম. এন. লারমা গণ পরিষদে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্যে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা তুলে ধরেনঃ[৭]

> "মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের দেশের জন্য যে সংবিধান আমরা রচনা করতে যাচ্ছি, আপনার মাধ্যমে আজকে এই মহান গণপরিষদে দাঁড়িয়ে সেই সংবিধানের উপর আমি কিছু আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যারা কারাগারে তিল তিল করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল, যারা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসককে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসিমুখে হাতকড়া পড়েছিলেন, হাসিমুখে ফাঁসি কাষ্ঠকে বরণ করেছিলেন তাদেরকে। ১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এই দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্য যে কৃত্রিম স্বাধীনতা হয়েছিল সেই কৃত্রিম স্বাধীনতার পর থেকে যে সব বীর, যে সব দেশ প্রেমিক নিজের জীবন তিলে তিলে চার দেওয়ালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীকার আদায়ের জন্য। যারা নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে স্বাধীকার আদায়ের পথে গিয়েছিলেন তাদের কথা আজকে আমি স্মরণ করছি, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে এখানে যারা সমবেত হয়েছেন, যে মাননীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ রয়েছেন তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তারপর আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গত এপ্রিল মাসে যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটির সদস্য বন্ধুদের। সর্বশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জননেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।"
>
> "আজকে আমরা এই গণপরিষদ ভবনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছি। এই ইতিহাসের পেছনে রয়েছে কত করুণ কাহিনী, কত মানুষের অঝোর ধারায় কান্নার কাহিনী। বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের করুন আর্তনাদ। তাই আজকে আমরা সেসব মানুষের কথা স্মরণ করে যদি বিবেকের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যাই, তাহলে এই কথাই আমরা বলবো, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যে পবিত্র শপথ আমরা নিয়েছি সেই পবিত্র শপথ নিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য যে পবিত্র দলিল আমরা দিতে যাচ্ছি, সেই পবিত্র দলিলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কিনা। ... অর্থাৎ তারা যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়, সে কথা এই সংবিধানে ব্যক্ত হয়েছে কিনা।"
>
> 'তাই আমি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য বন্ধুদের বলছি যে, ... বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে নাই। যদি ...থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্নফুলী,

[৭] বাংলাদেশ গণ পরিষদে সংবিধান বিলের উপরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাধারণ আলোচনা, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২।

যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, ... মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন তাদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি আজকে যারা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন তাদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। '

'আজকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আপনারা বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের কথা সমাজতন্ত্রের নামে, গণতন্ত্রের নামে বলে চলেছেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার সে রকম নাই। তবু আমার বিবেক বলছে এই সংবিধানের কোথায় যেন গলদ রয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যারা কল-কারখানার চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাদের রক্ত চুঁইয়ে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ প্রতিটি জিনিস তৈরি হচ্ছে সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের মনের কথা এখানে নাই। '

'...এই সংবিধানের মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করে আমি বলব যে, ইতিহাস কাউকে কোনদিন ক্ষমা করেনি, করবেও না – ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। আমরা দেখেছি ১৯৫৬ সালের সংবিধান যে সংবিধানকে আইয়ুব খানের মতো একজন সৈনিক লাথি মেরে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাকিস্তানের বুকে স্বৈরাচারী সরকার গঠন করেছিল। তারপর ১৯৬২ সালে তার মনের মতো একটি সংবিধান রচনা করে সেটাকে দেশের বুকে চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছিল যে, তার এই সংবিধান দেশের মানুষ গ্রহণ করবে। কিন্তু এ দেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেনি। এই সংবিধানও যদি সে ধরনের হয়ে যায় তাহলে ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে ? তাই ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মত, ১৯৬২ সালের সংবিধানের মত এই সংবিধানকেও কি আমরা হতে দিব। আমার বিবেক বলছে, আমরা এমন সংবিধান চাইনা। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সেরকম সংবিধানই আমরা চাই। '

'... মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আমরা যদি সেই সন্দেহের অবসান না করি, পরিষদে আমরা যদি তার নিরসন না করি তাহলে আর কে করবে ? আমাদের পর যারা আসবেন তাদের সেই এইই করুণ অবস্থা হবে- যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক আমরা তা চাই না। '

'... সংবিধানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনের কথা যদি সত্যিকারভাবে লিপিবদ্ধ হত তাহলে আজকে নির্দলীয় সদস্য হিসেবে এই সংবিধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পারতাম। অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে না পারার অনেক কারণের মধ্যে এক কারণ হলো, এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার এই দলিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এক হাতে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্যহাতে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

এম. এন. লারমা কর্মীদের সব সময় সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতেন। তিনি বলতেন,

'পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে যারা নিপীড়িত শ্রেণী, তারাও আমাদের বন্ধু। নিপীড়িত শ্রেণী ও নিপীড়িত জাতির মধ্যে কোন বৈরিতা নাই। কাজেই আমরা কোন বাঙালির বিরুদ্ধে কিছু করছি না। আমাদের উপরে যে

অন্যায়, উৎপীড়ন, শোষণ ও নিপীড়ন চলছে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা একা নই, আমাদের সাথে প্রগতিশীল বাঙালিরা আছে। পৃথিবীতে সকল নিপীড়িত শ্রেণির জন্য আমাদের কথা বলতে হবে।'

ত্রিপুরাদের গ্রামের দুরঅবস্থা দেখে তিনি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে বলেছিলেন, 'তাদের জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে। তা না হলে তারা হারিয়ে যাবে। আস আমরা সবাই মিলে তাদের জন্য কিছু করি।'[৮]

৫. নারী অধিকারের প্রবক্তা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সমমর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংসদ বক্তৃতায় তিনি সমগ্র নারী সমাজের অধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। সমগ্র নারীসমাজ উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করলেও উৎপাদন শক্তির উপর অধিকার নাই। সামান্য ভুল-ভ্রান্তিতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হত। নারীদের এই করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হতেন।[৯] তিনি নারীদের সমানভাবে মূল্যায়ন করতেন। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য আন্দোলনে তিনি নারীদের সংযুক্ত করেছিলেন।[১০] এম. এন. লারমা গণ পরিষদে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্যে গোটা দেশের অবহেলিত নারী সমাজ প্রসঙ্গে বলেন ঃ[১১]

"... তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ। ... আজ পল্লীর আনাচে কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা বোনকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। এই সংবিধানে সেই মা বোনদের জীবনের কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি। যদি এটা আদর্শ সংবিধান হত, যদি এটা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হতো তাহলে ... তাদের কথা লেখা হত। তাদেরকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আনার কথা থাকত। কিন্তু তাদের মনের অভিব্যাক্তি প্রকাশের কথা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা এই সংবিধানে নাই।"

৬. সমতলের আদিবাসী সম্পর্কে সচেতনতা

বাংলাদেশের সমতলের আদিবাসীদের সম্পর্কেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সচেতন ছিলেন এবং তাদের ভূমি অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে প্রণীত পূর্ববঙ্গীয় জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং তাতে অন্তর্ভূক্ত আদিবাসীদের নামের তালিকার সাথে বাদপড়াদের মধ্যে থেকে একটিকে সংযুক্তির জন্য ১৯৭৪ সালে আনীত বিলের কথা উল্লেখ করে তিনি

---

[৮] যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[৯] শ্রীমতি পল্লবী, 'নারী মুক্তি প্রসঙ্গে এম. এন. লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী নির্যাতন', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং -২৩, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

[১০] সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০৩।

[১১] বাংলাদেশ গণ পরিষদে সংবিধান বিলের উপরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পূর্বে উল্লিখিত আলোচনা, ২৫ অক্টোবর ১৯৭২।

বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের অস্তিত্বের কথা ও তাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা জাতীয় সংসদে তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন। 'বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতি এবং সেটি বাঙালি' – একজন সংসদ সদস্যের এরকম বক্তব্যের সূত্র ধরে প্রত্যুত্তরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন ঃ [১২]

> "মাননীয় সদস্যের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। তাঁকে শুধু জানাচ্ছি যে, সরকারের আইন-কানুনগুলো একটু কষ্ট করে পড়ে দেখার জন্য। এই অধিবেশনে আনীত একটি বিলেও একটি 'উপজাতি'র জমি সংক্রান্ত অধিকার বিষয়ে লেখা আছে। ভূমি প্রশাসন বিভাগের মন্ত্রী কর্তৃক আনীত The Estate Acquisition and Tenancy (Amendment) Bill, 1974-এ ময়মনসিংহের বানাই উপজাতিদের জমি সংক্রান্ত অধিকার সম্বন্ধে Aim and Object-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে æTribe" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ
>
> > 'The Bill seeks to include æBanais", an aboriginal tribe inhabiting certain areas in the district of Mymensingh, in the list of aboriginal so that they may derive the benefit of special provisions relating to the transfer of property by aboriginals by amending section 97 of the said Act i.e. the State Acquisition and Tenancy Act, 1950.'
>
> 'সুতরাং এটা খুব পরিষ্কার। এই নিয়ে গণপরিষদে সংবিধান তৈরির সময় তর্কাতর্কি হয়েছিল। আমরা উপজাতীয়রা বাঙালি নই, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক – আমরা বাংলাদেশী।"

৭. শিক্ষা-আন্দোলন সংগঠক

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন একাধারে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এম. এন. লারমার উদ্যোগে পাহাড়ে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। দিঘিনালা হাইস্কুলে শিক্ষকতাকালে নিজের বেতনের টাকা দিয়ে বিশেষত ঃ গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের কাগজ-কলম-কালি, স্কুলের বেতন, খাওয়া-দাওয়ার খরচ দিতেন যাতে করে তাদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে।[১৩] পরবর্তীতে শান্তি বাহিনী কর্মীদের তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে রাজনীতিতে সচেতন করেছেন।[১৪]

ছাত্ররা উপলব্ধি করেছিল তিনি শুধু শিক্ষক নন, একজন নেতা। উল্লেখ্য ১৯৬৮ সালে এম. এন. লারমা দিঘীনালা স্কুলের শিক্ষক হোস্টেলে থাকতেন। স্কুলে আসার পথে একটি ব্রিজে বাঙালি শ্রমিকরা নির্মাণ কাজ করছিলেন। নদী পারাপারের জন্য একটা ডাইভারসন ছিল। কয়েকজন পাহাড়ি ছাত্র নির্মাণাধীন ব্রীজের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়েছিলেন। এতে শ্রমিকরা ক্ষেপে তাদের আটক করে থানাতে খবর দেয়। খবরটা জানার সঙ্গে সঙ্গে এম. এন. লারমা

---

[১২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, বাজেটের উপরে সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য, ৫ জুলাই ১৯৭৪।

[১৩] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[১৪] শ্রী রেণী, 'আমার চোখে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙামাটি, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

প্রায় ৪০জন ছাত্র নিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনেন।[১৫] আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল যার জন্য তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।[১৬]

পৃথিবীকে জানার জন্য সকলকে বই পড়তে উৎসাহ দিতেন।[১৭] ইংরেজী, বাংলা, অংক, ভূগোল, সকল বিষয়ে আগ্রহ ছিল এবং ছাত্রদের সহজ করে বোঝাতেন।[১৮] পড়ানোর মধ্যে দিয়েই সচেতনতা, সংগ্রামী চেতনার শিক্ষা দিতেন। এই প্রসঙ্গে বিজয়কেতন চাকমা বলেন,

> ''এম. এন. লারমা সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলতেন রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত কোন অধিকারই টিকে থাকতে পারেনা। তাই প্রথমেই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে। অন্য কিছু দ্বারা মানুষের নিকট হতে অতি সহজেই সস্তা বাহবা পেতে পার; কিন্তু এর দ্বারা মানুষের তেমন উপকার হবে না"। [১৯]

তিনি উদাহরণ দিতেন "যেমন এখন যদি এই নৌকার মাঝিকে মাত্র পঞ্চাশ পয়সার বদলে দশটা টাকা দাও সবাই তোমার প্রশংসা করবে। কিন্তু এর দ্বারা সকল নৌকা মাঝির তুমি উপকার করতে পার না। মানুষের উপকার করতে হলে সৎ নীতি, আদর্শ পালন করতে হবে।" [২০]

সংগ্রামের কৌশল হিসেবে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যেতেন।[২১] ভান্তে'র সভায় যেয়ে জনগণের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন।[২২] সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে সভা-সমাবেশ করলে গোয়েন্দারা রিপোর্ট করতো।[২৩] কমলছড়ি বৌদ্ধ বিহারে আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের বলেছিলেন, 'যত দিন বিপ্লবের রক্ত শিরায় শিরায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত না হচ্ছে, ততদিন বিপ্লবের কোন স্বার্থকতা থাকবেনা।' [২৪] বক্তব্যে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতেন।

---

[১৫] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[১৬] শ্রীমতি দিবা, 'চেতনার মৃত্যু নেই', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪।

[১৭] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[১৮] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[১৯] বিজয়কেতন চাকমা, স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ, *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙামাটি, ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

[২০] ঐ।

[২১] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[২২] ঐ।

[২৩] ঐ।

[২৪] শ্রী বকুল, 'স্মৃতি তর্পণ', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৫১।

৮. রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

এম. এন. লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল গভীর, যে কারণে তিনি ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণ করে গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারতেন।[২৫]এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মিপ্রসাদ চাকমা বলেন ঃ[২৬]

> ''১৯৭৪ সালের ৬ জানুয়ারি শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বলেছিলেন, সংগ্রামী সাথীরা, আমরা খুব ভাগ্যাহত জাতি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অন্য সকল জাতি সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে আর ঠিক একই সময়ে আমরা বিলুপ্তির পথে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভাল না; যে-কোনো সময়ে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। রাষ্ট্রের চারটি মুলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি দৃঢ়ভাবে হাত বাড়াননি, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের কথা বলায় তার পার্টির নেতৃত্বের একটা অংশ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরাগভাজন হয়েছে। এমতাবস্থায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল এবং দেশে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বাংলাদেশে কিছুদিনের মধ্যে সম্ভবত আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। সাথীরা, তোমরা সতর্ক থেকো, আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে আমরা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে প্রতারিত হচ্ছি।"

এর সাত মাস পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যা ঘটেছিল তাতে এম এন লারমার মূল্যায়ন নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৮১ সালে অসুস্থাবস্থায় কর্মীদের বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কষ্ট করে টিকে থাকতে পারলে জুম্ম জাতি আর ধ্বংস হবে না'। ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন উৎখাত হয়। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিস্পত্তির লক্ষ্যে আলোচনা এগিয়ে চলে। শেষাবধি, পাহাড়িদের সংগ্রামের ফসল হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এম. এন. লারমা যে একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন এই বিষয়টি তা প্রমাণ করে।

৯. কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক

কর্মীদের সংগে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন। কর্মীরাও তাকে খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন।[২৭] সহকর্মীদের অসুখের সময় সেবাযত্ন দিয়ে সুস্থ্য করেছেন। কর্মীদের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের বিপদ-আপদে খোঁজ খবর রাখতেন। [২৮] এই প্রসঙ্গে উষাতন তালুকদার বলেন ঃ[২৯]

---

[২৫] ঐ, ২১/০৫/২০০৩।

[২৬] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমার সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২।

[২৭] ম্রাও মাষ্টারের সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[২৮] শ্রী রেণী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ৫০-৫৩।

[২৯] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

> ''গৃহযুদ্ধ চলাকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি খুব দুর্যোগপূর্ণ ছিল। তবুও তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে কর্মীদের দেখতে যেতেন। দলের লোকদের অনেক সময় অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে দেখলে তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করতেন।"

গ্রামের মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উষাতন তালুকদার ও শ্রী রেণী দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন ঃ[৩০]

> একবার জুমের একটা ঘরে, বাচ্চাদের কান্নাকাটি শুনে লারমা সেখানে থামলেন এবং কর্মীদের বললেন 'দেখ তো ঐ ঘরে কেন কান্নাকাটি হচ্ছে?' খবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, ওরা সেদিন উপোস আছে। তিনি বললেন 'আমাদের যতটুকু চাল আছে তাদেরকে দিয়ে দাও, আমরা না হয় আজকে উপোস থাকবো'।

> সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশার কথা জানলে ব্যবস্থা নিতেন। পথে একদিন এম. এন. লারমা দেখলেন গায়ে কালিমাখা নেংটি পরা একজন ত্রিপুরা লোক জুমে কাজ করছে। তার বুকের হাড় পর্যন্ত গোনা যায়। তিনি সহকর্মীকে বললেন, 'ভাতের অভাবে মনে হয় এমন দেখাচ্ছে'। তিনি রুকসেক থেকে ৩০০ টাকা সহকর্মীকে দিয়ে বলেন, 'তাকে দিয়ে বলে আসো, প্রয়োজনে লোকটি যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করে'। [৩১]

কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এম. এন. লারমার ভূমিকা প্রসঙ্গে হানাচরণ ত্রিপুরা বলেন,

> ''সর্বহারা পার্টির অস্ত্রসহ একজনকে জীবিত অবস্থায় আটক করে আনলে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে হানাচরণ ত্রিপুরাকে বলেছিলেন, "কখনো এভাবে শত্রুর কাছাকাছি যাবে না। বিপ্লব করা মানে অকারণে নিজেকে উৎসর্গ করা নয়। বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে। নিজের হাতে শত্রুকে ধরে সাহসের পরিচয় দিয়েছো, কিন্তু যদি তুমি মারা যেতে। তাহলে সমস্ত গ্রুপটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতো, অস্ত্রগুলো হারাতে হতো"[৩২]

আদিবাসীরা খুবই ঘরমুখো। স্বাধিকার আন্দোলনে যেয়ে অনেকে এক বছরের বেশি টিকতে পারেননি ঘরে ফেরার টানে। দুই/তিন মাস পর পর বাড়িতে যেতে চায় কর্মীরা। এম. এন. লারমা উদাহরণ সৃষ্টির জন্য এক নাগাড়ে আড়াই বছর পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখেননি। এইভাবে সংগঠনকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য তিনি কাজ করেছেন। [৩৩]

সামন্ততন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এম. এন. লারমা নেতৃত্ব দিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত, যুব সমিতি, ছাত্র সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি জুম্ম সমাজকে ঐকবদ্ধ করেছেন। আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ডিসি, এসপি, পুলিশ, দারোগার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। [৩৪] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু যেমন ম্রো বা চাক

---

[৩০] ঐ।

[৩১] শ্রী রেণী, প্রাগুক্ত, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ৫০-৫২।

[৩২] হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩।

[৩৩] উষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[৩৪] শ্রী জীবন, '১০ই নভেম্বর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং-২৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩।

জনগোষ্ঠী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা জাতির মানুষদের সংঘবদ্ধ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাঙালি বাসিন্দাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন। সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঐক্যের পক্ষে। [৩৫]

এই প্রসঙ্গে পি বি কার্বারি তার স্মৃতিচারণে বলেন ঃ[৩৬]

> "পারিবারিকভাবে তারা প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক (কৃষ্ণকিশোর, হরিকিশোর, চিত্তকিশোর প্রমুখ) তাই তার প্রতি আমার একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল। তখন আমি রাঙ্গামাটি কলেজে অধ্যাপনা করি। প্রফেসর মং শানু চৌধুরী, প্রফেসর যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে নিয়ে আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম। তখন তিনি আমার সাথে তাঁর রাজনীতির রূপরেখা ব্যাখ্যা করেন। স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নীতি-কৌশলের কথাও বলেন। তাঁর কথায় ছিল আশাবাদ, ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা। তিনি উগ্র বৃহৎ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত আদিবাসীদের মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আদিবাসী উৎখাত (Ethnic Cleansing) থেকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এই উদেশ্যে আদিবাসী জাতিসত্তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন।"

যে-কোনো ব্যাপারে তার ধারণা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[৩৭] সরকার পুরোনো একটা প্রজ্ঞাপন জারী করে ১৯৭৪ সালে চারু বিকাশ চাকমাকে মামলায় জড়িয়ে জেলে দিয়েছিল। এম. এন. লারমা তার পক্ষে বাদী হয়ে মামলায় লড়ে তাকে মুক্ত করে এনেছিলেন।[৩৮]

১০. পরিবেশ ভাবনা ও জীবে প্রেম

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতেন। প্রকৃতির প্রতি সহজাত প্রেম ছিল সেইজন্য প্রকৃতিকে ব্যবহারেও তার পরিমিতিবোধ ছিল। আজকে সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবেশ ভাবনার বিষয়টি এসে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি, কীট পতঙ্গ, মৎস, বৃক্ষ ইত্যাদির অবলুপ্তি ঘটছে। ঝরণা শুকিয়ে গেছে। অথচ ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক ও জীববৈচিত্র্যে ভরা পরিবেশ ছিল। এম. এন. লারমা বলতেন, 'এসব আমাদের জাতীয় সম্পদ। গাছ, বাঁশ প্রকৃতির শোভা যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা করে।'[৩৯] পাহাড়িদের অভ্যাস চলার পথে হাতে একটা দা রাখবে, রাস্তায় যেতে বামে-ডানে কোপ দেবে। এম. এন. লারমা কষ্ট পেতেন বলতেন, কোন গাছ কাটবে না।[৪০]

[৩৫] গৌতম কুমার চাকমা, এম. এন. লারমার স্মরণে শোক সভা, ১০/১১/২০০২।

[৩৬] পি বি কার্বারী 'এম.এন. লারমা আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং মুক্তির প্রতীক', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং -৩৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র মুখপত্র, ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ২০।

[৩৭] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[৩৮] ঐ।

[৩৯] সজীব চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ১১।

[৪০] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

১৯৬৬ সালে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী নীলধ্বজ চাকমা, সহকারী শিক্ষক এম. এন. লারমা এবং ছাত্রাবাসের তত্বাবধায়ক প্রিয়দর্শী খীসা ছাত্রাবাস সংলগ্ন এক ঘরে থাকতেন। বোয়ালখালী বাজার থেকে ৫কেজি সোল ও মাগুর মাছ নিয়ে আসেন। রাতের খাবারের জন্য রেখে বাকি মাছ পানি দিয়ে মাটির পাত্রে জিইয়ে রাখেন। পানি পেয়ে মাছগুলি ছলাৎ ছলাৎ শব্দে লাফাতে লাগল। তিনি টর্চ নিয়ে কয়েকবার মাছগুলো দেখলেন। এক সময় বললেন, 'মাছগুলো কি অসহায় ও চাউনিও কত করুন।' পরদিন ভোরে মাছগুলোকে মাইনীতে ছেড়ে দিয়ে আসলেন। বড় পানিতে ছাড়া পেয়ে মাছগুলোর আনন্দ-র বিষয়টি জানাতে ভুললেন না সহকর্মীদের।' আরেকটি ঘটনা কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে দুপুরে খাবারের পর উল্লেখিত তিনজন আলাপ করছিলেন। চৌকির নিচে একটা কুকুর ছিল। তার কান পচেঁ দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। লারমা হাসপাতাল থেকে ঔষধ এনে গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে প্রতিদিন দুই বার ঘা পরিস্কার করে দেন। এভাবে ২০-২৫ দিন পর কুকুরটি সুস্থ হয়।[৪১]

এম. এন. লারমা জীব পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রক্ষার নীতি মেনে চলতেন। ১৯৭৫ সালে হেডকোয়ার্টারের নির্দেশাবলী জোন ও সেক্টরের মাধ্যমে সকল কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে জানিয়ে দেন। ধনেশ পাখি, বিরল প্রজাতির পাখি,বাঘ, ভল্লুক, গয়াল, হাতি, মাদী হরিণ, অজগর, কোবরা, জংলী কুকুর, বানর, শক্‌জোড়, কচ্ছপ, ইয়ো হরিণ, বনরুই ইত্যাদি পশু-পাখিদের শিকার নিষিদ্ধ। এদের সংরক্ষণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। নিয়ম ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটির উপর। শুকর জমির ফসল নষ্ট করে এবং বংশবৃদ্ধির হার বেশি বিধায় শুকর শিকারের উপর বিধি-নিষেধ ছিল না।[৪২]

জুম চাষের জমি তৈরির জন্য পাহাড়িরা প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জঙ্গলে আগুন দেয়। এতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে এবং শত একর বনভূমি আগুনে পুড়ে যায়। এম. এন. লারমা উপলদ্ধি করেছিলেন, প্রকৃতির উপর এমন অবিচার ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই ১৯৭৫ সালে বনজঙ্গল পোড়ার উপর বিধি-নিষেধ জারী করেছিলেন এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'জুম চাষীরা প্রত্যেক বছর জুম চাষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় জুম কাটবে এবং বাতাসের গতি দেখে সকলে একসঙ্গে জুম পোড়াবে। জুম চাষের বাইরে আগুন ছড়ালে সকলে একসঙ্গে আগুন নেভাবে'। ফলে বনজঙ্গল পোড়ানো নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অচিরে জনগণ তার সুফল পেতে থাকে।[৪৩]

এম. এন. লারমা বন্য পশু হত্যা করতে নিষেধ করতেন।[৪৪] এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো,[৪৫]

> "গভীর অরণ্যে এম. এন. লারমার ব্যারাকের বিছানার নিচে একদিন এক বিষাক্ত সাপকে কর্মীরা মারতে চাইলেবাধা দিয়ে বলেছিলেন, "সাপকে আঘাত না করলে সাপ সহজে কাউকে কাটে না। নিজেই চলে যাবে।" তাই হয়েছিল।

[৪১] প্রিয়দর্শী খীসা, 'কছু স্মৃতি', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, বুলেটিন নং -৩৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র, ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ১৭-১৮।

[৪২] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা, "মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর পরিবেশ ভাবনা", *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র, বুলেটিন নং-৩৭, ১৬ বর্ষ, রাঙামাটি, ২০০৬, পৃষ্ঠা ঃ ৬।

[৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬-৭।

[৪৪] ঊষাতন তালুকদারের সাক্ষাৎকার, ০৩/০১/২০০৩।

[৪৫] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা, 'প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

জীবজন্তুর প্রতি এম. এন. লারমার মমতা সম্পর্কে শ্রী রেণী বলেন,

> "একটি পাখি এক রুকসেক হতে আর এক রুকসেকে থাকত। সন্ধ্যায় পাখিটি তার জায়গায় চলে যেত। তিনি পাখিটিকে প্রতিদিন খাবার দিতেন। আমরা পাখিটিকে ধরার চেষ্টা করলে তিনি বারন করতেন। শুধু পশুপক্ষী নয় কীট পতঙ্গের প্রতিও তিনি দয়ালু ছিলেন। কোন কীট পতঙ্গ যদি অসহায় হয়ে পড়ে থাকে তাহলে তিনি সেটা তুলে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে দিতেন। শুধু তাই নয় ব্যারাকের ঘাটে যেসব কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ থাকতো, সেগুলোকে তিনি খাবার দিতেন এবং না মারার জন্য বলতেন।"[৪৬]

কয়েকটি ঘটনায় তাঁর প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। রাতের বেলা খাদ্যের সন্ধানে কাঁকড়া গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। কর্মিরা সেগুলো ধরে দাঁড়গুলো ভেঙ্গে আগুনে পুড়ে খেত। এম. এন. লারমা নিষেধ করতেন, "তোমাদের হাতগুলো কেটে নিলে তোমরা কীভাবে আহার করবে।" একদিন বড় একটা বিরল প্রজাতির বড় কাছিম ব্যারাকের পাশে পাওয়া যায়। এম. এন. লারমা সবাইকে বলেন, এইগুলো বিরল প্রজাতির। এদের সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য।" এরপর সেটা ছড়ায় ছেড়ে দেওয়া হলো। [৪৭]লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা শান্তিবাহিনীর মানুষ এবং প্রকৃতির সহাবস্থান সম্পর্কে বলেন,

> "দুটো মথুরা পাখি মাটি আঁচড়ে খাদ্য খাচ্ছে। গাছের উপরে নানা রঙের পাখীর কিচির মিচিরের ডাকে বনের নিস্তদ্ধতার ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। বুনো মোরগ-মুরগি, মথুরাগুলো চরতে চরতে ব্যারাকে মাচার নিচে পর্যন্ত চলে আসছে। গাছের উপর হরেক রকম ছোট বড় পাখি সারাটা দিন যাওয়া আসা করছে। তাদের মধ্যে ধনেশ পাখি অন্যতম। বানরের দল ব্যারাকের কাছে-পিছে ঘুরে-ফিরে গাছের কচি পাতা খাচ্ছে। হরিণ-হরিনীরা স্বভাবজাতভাবে ডেকে উঠছে ব্যারাকের ১৫/২০ হাত দূরে। শীতের গভীর রাতে বাঘের ডাক শোনা যায়। সকালে দেখা যায় বড় হরিণ ও বাঘের পায়ের ছাপ; ব্যারাকের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছড়ার পাড়ে পাড়ে। যেন শান্তিবাহিনী, পশু-পাখির জড়াজড়ি, গাছ-বাঁশের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান। হেটকোয়ার্টার স্থাপন করে বিভিন্ন প্রাণীর সাথে সহাবস্থান করার বিষয়ে ক্লাস নেন এম. এন. লারমা। ক্লাসে বনের মধ্যে অবস্থান করার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে তা পালন করার নির্দেশ দেন। পাহাড়-ছড়া-ঝর্ণা, গাছ-বাঁশ, পশু-পাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা সকল সদস্যের কর্তব্য। তিনি বলতেন যে, "সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলাদি না মানলে যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ সৈন্যদলের আত্মরক্ষা করা যায়না, তেমনি প্রকৃতির নিয়ম-কানুন না মানলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। বন হচ্ছে পশু-পাখিদের আবাসভূমি। আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্বের লড়াই করতে পশু-পাখিদের আবাসভূমিতে আশ্রয় নিয়েছি। কাজেই পশু-পাখিদের নিধন করা যাবেনা। অপ্রয়োজনে গাছ-বাঁশ কাটা যাবেনা। তাদেরকে নিয়েই এক সাথে থাকতে হবে।" তিনি বন্যপ্রাণীদের সুবিধার জন্য চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য বলতেন।[৪৮]

---

[৪৬] শ্রী রেণী, 'প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

[৪৭] লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা, 'প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬।

[৪৮] ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫।

## ১১.	সাধারণ সংযমী জীবন এবং শিল্পচর্চা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ

এম. এন. লারমা মিতব্যয়ীতা প্রসঙ্গে বিজয়কেতন চাকমা বলেন, ''১৯৭০-৭১ সালে সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে রাঙ্গামাটির কন্ট্রাক্টর পাড়ায় বাঁশের বেড়া, শনের ছাউনি দিয়ে তৈরি সাধারণ মাটির ঘরে সপরিবারে থাকতেন। যারা আসতেন ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে বসতে দিতেন এবং পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।" [৪৯] পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল সাধারণ। দুটো শার্ট ও দুটো প্যান্ট, একজোড়া স্যান্ডেল, একজোড়া জুতো, একটা ব্যাগ ও একটা বেডিং ছিল। নিজেই কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করতেন। [৫০] বাঁশের তৈরি বিছানার কম্বল বিছিয়ে বিভিন্ন কাপড় ভাঁজ করে বালিশ বানিয়ে ঘুমাতেন।[৫১] পার্টির দলিল পত্র নিজেই লিখতেন।[৫২] পাহাড়িরা সারা বছর কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করতো কিন্তু জুয়া খেলে, মদ খেয়ে তা অপচয় করতো। এম. এন. লারমা এই ধরনের লোকদের মিতব্যয়ী হওয়ার শিক্ষা দিতেন।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইন, রং লিখে রাখতেন। সেই সাথে মুদ্রা ও ডাকটিকেট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন।[৫৩] নিয়মিত রেডিও শুনতেন।[৫৪] প্রিয় গান ছিল "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা"। তিনি বাঁশি বাজাতেন।[৫৫] ফুটবল, ভলিবল খেলতেন। ছাত্রদের নিয়মিত ড্রিল করাতেন এবং বলতেন খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রশান্তি হয় এবং অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। [৫৬]

## ১২.	উপসংহার

অষ্টম অধ্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতাদর্শিক অবস্থান ও ব্যক্তিত্বের অবয়ব উল্লিখিত হয়েছে। নেতা ও মানুষ হিসেবে তিনি যে সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তার কিছু বিবরণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে জন্মভূমির প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ, অসম্প্রদায়িক চেতনা, নারী-অধিকারের প্রতি সম্মান, পরিবেশ চেতনা, সমতলের আদিবাসী সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। তিনি কাজ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং আদিবাসী-বাঙালি নির্বিশেষে দেশের সকল বঞ্চিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। এ পথ পরিক্রমায় সংসদ সদস্য ও জাতীয় নেতা হিসেবে সংসদের ভেতরে এবং জননেতা হিসেবে সংসদের বাইরে তার সংগ্রামের কথা এখানে স্থান পেয়েছে।

---

[৪৯] বিজয়কেতন চাকমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

[৫০] অমিয় প্রসাদ চাকমা, 'মহান নেতা এম. এন. লারমার আত্মসংযম', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙামাটি, ২০০১, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

[৫১] শ্রী রেণী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩।

[৫২] শ্রী অনুপ, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা' *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙামাটি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩০-৩১।

[৫৩] জ্যোতিপ্রভা লারমা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১০।

[৫৪] গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২।

[৫৫] ঐ।

[৫৬] ঐ।

নবম অধ্যায়

পরিশেষ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের বৃহত্তম আদিবাসী অঞ্চল এবং এর ১১টি জাতির রয়েছে পৃথক ভাষা ও সংস্কৃতি; বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে সম্মিলিতভাবে এই আদিবাসীরা পরিচিত হয়েছেন "জুম্ম" নামে। স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, বর্ণমালা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, মনন, আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও জীবনধারায় বাংলাদেশে সংখ্যায় ব্যাপক গরিষ্ঠ বাঙালি জাতির সাথে এই আদিবাসী জাতিসমূহের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনামলে এরা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। পাকিস্তান কালপর্বে কাপ্তাই বাঁধ-উত্তর সময়কাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমৃত্যু জাতিগত বৈষম্য দূর করা এবং সকল জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আর এই উদ্দেশ্যে জুম চাষের উত্তরাধিকার বহনকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেন এবং এই ঐক্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নির্মাণ করেন 'জুম্ম জাতীয়তাবাদে'র ধারণা। মূলত তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সার্বিকভাবে জুম উৎপাদন পদ্ধতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উদ্ভাসিত। বাংলাদেশের সমতল অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পার্বত্য জনপদের এই স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি আদায় এবং বাংলাদেশের সকল জাতির সমানাধিকার অর্জনে তাকে লড়তে হয়েছে বাঙালি ও বাংলাদেশী "জাতীয়তাবাদ"-এর সাথে।

প্রাথমিক পর্যায়ে পার্বত্য অঞ্চলের এই আদিবাসীরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জর্জরিত ছিলেন, যদিও পরবর্তীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শিক্ষিত, সমাজ-সংস্কারক পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের কারণে এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। তবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমর্থিত ভাবাদর্শের দ্বারা আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন এবং জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি সেটলার সরকারি প্রশাসনের ছত্রছায়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল করে বসতি স্থাপন করেছেন। এতে পাহাড়িরা নিজভূমে পরবাসীর মত জীবন যাপন করছেন। তাই পার্বত্য আদিবাসীদের বিচ্ছিন্নতার মূল শিকড় বাঙালি উচ্চবর্গ সৃষ্ট জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে নিহিত এবং তাদের উগ্র-জাতীয়তাবাদের রাজনীতিই পাহাড়িদের সশস্ত্র পথে নিয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা রাষ্ট্রের কাছে বিভিন্ন সময়ে স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছেন। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে নয়, বরং সাংবিধানিকভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বিশেষভাবে স্বীকৃত। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার। যে সমস্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে সংখ্যালঘু অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তারমধ্যে ১৯৮৯ সালের

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক গৃহীত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে আদিবাসী ও জনজাতি সংক্রান্ত কনভেনশনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার ও স্বকীয়তা রক্ষা হচ্ছিল না বলেই জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং "Declaration of the Rights of Indigenous Peoples" নামক একটি খসড়া ঘোষণাপত্র তৈরি করে, যা ১৯৯২ সাল থেকে প্রক্রিয়াধীন থেকে ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহিত হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৯৫-২০০৪ সালকে প্রথম দফায় এবং ২০০৫-২০১৪ সালকে দ্বিতীয় দফায় আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতকগুলি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আদিবাসী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০৭ নং কনভেনশন, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি, জীববৈচিত্র্য চুক্তি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি। স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে আদিবাসীদের ভূমিকাকে উল্লেখযোগ্য বলা হয়েছে জোহানেসবার্গ ঘোষণায় এবং বাংলাদেশ সরকার এই ঘোষণাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই দেশজ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছে ***মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম*** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি। এই গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদের একটি আদর্শ তৈরি ক'রে তাতে সেইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যা ঐ সময়ে প্রধান জনগোষ্ঠীর শাসকবর্গের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত – ফলে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ ঐ মতাদর্শের মধ্যে কখনও নিজ স্বার্থের প্রতিফলন পায়না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে নিজেদের খুঁজে পাননা, কেননা জন্মাবধি বাংলাদেশের নেতারা পুরো বাংলাদেশকে প্রথমে বাঙালিকরণের এবং পরবর্তীতে বাঙালিকরণ ও ইসলামীকরণের চেষ্টা করেছেন। ফলে আদিবাসীদের জাতিসত্তা, ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুরোপুরি হুমকির মুখে পড়েছে। জাতীয়তা, পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসকদের মত একইভাবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও একটি রাজনৈতিক কৌশল যা সমস্ত স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে একীভূত করার উপর জোর দেয়। বাংলাদেশে যে বাঙালি ছাড়া অন্য কোন জাতি আছে তা সম্ভ্রান্ত বাঙালি নেতাদের কাছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিলনা এবং তা আজ অবধি যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়নি। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আদিবাসীর অস্তিত্ব ও জীবনকে অস্বীকার করেছে প্রায় একই সুরে। প্রত্যেক শাসকই চেয়েছেন অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করতে; ফলে তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগণ জাতিগত স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু সাংবিধানিক অস্বীকৃতির কারণে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন ক্রমাগতভাবে তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। উপরন্তু, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে বাঙালি বসতি স্থাপনের কারণে সেখানকার আদিবাসীরা ভূমির অধিকার হারাতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে পাহাড়িদের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ভূমি সমস্যা। ফলে তারা দাবি আদায়ে, অর্থাৎ নিজস্ব জাতিসত্তার পরিচয় ও ভূমিস্বত্ব

বজায় রাখতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। বাংলাদেশ সরকার পাহাড়িদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন আরো জোরদার করে। সেটলার বাঙালি ও রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী পাহাড়ি অদিবাসীদের উপর বিভিন্ন ধরনের দমন-নির্যাতন চালায়। আর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারকে পড়তে হয়েছে জবাবদিহিতায়। অন্যদিকে, প্রথম পর্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার এবং ১৯৮৩ সালে তার মৃত্যুর পর তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ও অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার সর্বাধিনায়কত্বে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর তরফ থেকেও রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীকে উত্তরোত্তর চ্যালেঞ্জ করা হয়; তবে শান্তিবাহিনীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সফল হওয়ার। আবার রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি শান্তিবাহিনীকে নির্মূল করা। তবে, কার্যতঃ, পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সংঘাত একটি ‘Low Intensity Warfare’-এ সীমিত থাকে। তবু উভয় তরফেই প্রয়োজন পড়ে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি শান্তি স্থাপনে একমত হয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এভাবেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও ইসলামিকরণ, এবং তার বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম – এই ইতিবৃত্তের মধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকাকে অনুধাবন ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যাকে নিষ্পত্তির জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তবে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ দূর করার জন্য অন্যান্য পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং এ উপলব্ধি থেকে তিনি ট্রাইবাল কনভেনশন সৃষ্টি করেন। ট্রাইবাল কনভেনশন গঠনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল সরকার এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর মধ্যে একটি সমঝোতামূলক মধ্যস্থতা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে শেষাবধি সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা ট্রাইবাল কনভেশনের পক্ষে সম্ভব না হলেও এ কথা বললে ভুল হয়না যে, এ সংগঠনটি অনেকটা সিভিল সোসাইটির ভূমিকা পালন করতে উদ্যোগী হয়। ট্রাইবাল কনভেনশন জনসংহতি সমিতির তথা শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আন্দোলনের পরিবর্তে সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে এবং একই সাথে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ঐ সময়ে (১৯৭০ দশকের শেষপাদে) গ্রেপ্তার থাকা জনসংহতি সমিতির অন্যতম নেতা সন্তু লারমাকে মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তথা জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার পথ প্রশস্ত করার বিষয়ে। কারণ ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ কখনই চাননি জনসংহতি সমিতিকে পাশ কাটিয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত পোঁছাতে বা কোন সমঝোতায় অবতীর্ণ হ'তে। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাগণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং সরকারীভাবে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালির অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবিতে শুরু থেকেই একাট্টা ছিলেন। কিন্তু এ দুটি দাবিতে সরকারের উদাসীনতা ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাদের বাধ্য করে তাদের ভূমিকা থেকে নিষ্ক্রিয় হ'তে। ট্রাইবাল কনভেশনের এরূপ ভূমিকা সত্ত্বেও এ সংগঠনকে সিভিল সোসাইটি বা সিভিল সংগঠন বলা যায় কিনা তা নিয়ে একটা

Dhaka University Institutional Repository

সংশয় থেকে যায়। কারণ ট্রাইবাল কনভেনশন ছিল মূলত সরকার সৃষ্ট একটি সংগঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের নিজস্ব মতামতের কোনরূপ প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়নি। ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতাগণ প্রথম পর্যায়ে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহারের পক্ষে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে প্রেষণা যোগানোর চেষ্টা করলেও তারা এটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, জনসংহতি সমিতি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একমাত্র রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম, যাকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তবিক প্রেক্ষাপট পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান নয়, এবং এরূপ অবস্থান গ্রহণের কোন অভিপ্রায়ও এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকার সাথে জনসংহতি সমিতির দাবির অনৈক্যের ফলেই ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত তাদের ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ান।

১৯৭৮ সালে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম আদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি হয়, ১৯৮২ সালে ২৪ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে এ বিরোধ প্রকাশ্য রূপ পায় এবং আদর্শগত ও কৌশলগত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জনসংহতি সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে দলের অধিকাংশ সদস্য মূলতঃ নিজ শক্তির উপর নির্ভর ক'রে "দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গণযুদ্ধে"র মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জন করার পথকে সমর্থন করেন; তার বিপরীতে প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বে দলের একটি ক্ষুদ্র অংশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার "দ্রুত নিস্পত্তি"র পথকে বেছে নিতে চান। এর পরিণতি হিসেবে ১৯৮৩ সালে ১৪ জুন ও পরবর্তীতে আরো কয়েক দফা জনসংহতি সমিতির দুই পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এর জের ধরেই ১৯৮৩ সালের ৩ নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আটজন সহযোগীসহ প্রীতি গ্রুপের হামলায় নিহত হন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ হারায় দেশের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রধান প্রতিনিধি এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রধান ধারক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি পুনর্গঠিত হয় এবং পাহাড়ের মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে চলে।

এই অভিসন্দর্ভে বিশেষভাবে উঠে এসেছে রাষ্ট্রের 'বাঙালিকরণ' ও 'ইসলামীকরণ'-এর বিষয়টি যার বিরুদ্ধে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাষ্ট্রের অন্যান্য জেলার ন্যায় সাধারণ জেলার মর্যাদা দানে উদ্যোগী হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত সর্বশেষ ডেপুটি কমিশনার নিব্লেট, চাকমা রাজা ও অন্যান্যদের সমন্বিত শক্তি দ্ধারা তা প্রতিহত করা হয়। ফলে ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে এ অঞ্চলকে 'সম্পূর্ণ বহিঃর্ভূত এলাকা হিসেবে যে বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তা ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে ঐ সংবিধানের ১৫(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী অন্যান্যদের মতই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হন, কেননা ঐ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে

কোন অমুসলিম নাগরিকের নিযুক্তকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, নির্দেশনা প্রদানসহ স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্রী'ও সার্কেল অফিসারদের উপর যাদের সকলেই অবধারিতভাবে বাঙালি ছিলেন। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সরকার সকল আদিবাসী কর্মচারীকে অন্যান্য এলাকায় বদলি করে পার্বত্য এলাকার শিক্ষাসহ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় বাঙালি কর্মকর্তাদের উপর। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদা 'শাসন-বহির্ভূত এলাকা' (Excluded Area) পরিবর্তন ক'রে 'উপজাতি এলাকা' (Tribal Area) হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের একজন বাঙালি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ক'রে সংবিধানে সংশোধনী আনেন, যা স্থানীয় নেতৃবৃন্দের চরম বিরোধিতার মুখে সেই সময় কার্যকর হওয়া সম্ভব না হলেও ১৯৬৪ সালে সম্ভব হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলে ৫১ বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারকে অ-পাহাড়ি ব্যক্তিকে ঐ অঞ্চল থেকে বহিঃষ্কার করার যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল সে ক্ষমতার প্রয়োগ 'রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনগণের স্বাধীন চলাচল বিষয়ক মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী' মর্মে ঢাকায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। এ ছাড়াও ম্যানুয়েলের ৩৪ বিধিকে সংশোধন ক'রে অ-পাহাড়ি মানুষের একাধারে ১৫ বছরের অবস্থান দ্বারা ঐ অঞ্চলে সম্পত্তির অধিকার অর্জনের বিধান করা হয়। উপরন্তু, কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বাঙালিদের অনুপ্রবেশ, অভিবাসন ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এরূপ একাধিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মনে উদিত দূরত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়, যার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ি জাতিসমূহ নিজ নিজ জাতি-ভাষা-ঐতিহ্য রক্ষায় রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার তাগিদ বোধ করতে থাকেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল বিলুপ্ত না হওয়ায় এ অঞ্চল Non–Regulated মর্যাদা কার্যকর থাকার কারণে প্রকাশ্য রাজনীতিক দল করা নিষিদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল, ১৯০০-এর বিধিবিধান শাসক শ্রেণির স্বার্থে কখনো বাস্তবায়িত হ'ত আবার কখনো তা অবমাননাও করা হত।[১] মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলনের ফলে পাহাড়ি জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষতঃ চাকমাদের মধ্যে ক্রমাগত শিক্ষার বিস্তার তাদেরকে অধিকার সচেতন ক'রে তোলে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অনুপ্রেরণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও ১৯৭০ সালে তারই উদ্যোগে রাঙ্গামাটি কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক বাস্তবতার অধিকতর উপলব্ধি থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কমিউনিষ্ট পার্টির ভাবনা থেকে সরে আসেন এবং জুম্ম-জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গড়ে তোলেন, তবে তার নিজের ও সন্তু লারমা-সহ জনসংহতি সমিতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃবৃন্দের ভাবনায় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১৯৭২ সালে গণপরিষদে দেয়া এবং ১৯৭৩-১৯৭৫ পর্বে প্রথম জাতীয় সংসদে দেয়া বক্তৃতাসমূহ, প্রশ্নাবলী ও আলোচনা এর সাক্ষ্য বহন করে।

---

১ Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism, The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, 2002, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫-৪৭।

পাকিস্তান শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয় মূলতঃ দু'ধরণের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে। প্রথমত স্থানীয় বাঙালি আমলাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং একই সাথে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ-বিরুদ্ধ সংবিধান সংশোধণী গৃহিত হয় বাঙালি ফজলুল কাদের চৌধুরী র কর্তৃত্বে ও খেয়াল-খুশী মত। এ পদক্ষেপকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদেরকে বাঙালি সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত করার প্রয়াস মনে করেন। এ আশংকা বাঙালিদের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। দ্বিতীয়ত ঃ পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণী তাদের সামাজিক ও প্রশাসনিক ঐতিহ্যগত কাঠামো স্থায়ীকরণের প্রয়াসে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তার সাথেও সাধারণ জনগোষ্ঠী সর্বাত্মক সমর্থন দিতে পারেনি। এ কারণে সার্কেল চীফগণ তাদের পদমর্যাদা হরণ করে এমন কোন রাজনৈতিক মতের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। এই প্রেক্ষিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উদ্যোগে পাহাড়ে রাজনৈতিক দল গঠনের পূর্ববর্তী স্থর হিসেবে একাধিক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম ও বিকাশ।

ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সুবিস্তর ভিন্নতা বাঙালি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টির অপর অন্যতম কারণ। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও বাঙালির পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির রাজনৈতিক ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবিভক্ত ভারতে জাতিগত পরিচয় ও ঐতিহ্যের দিক থেকে বাঙালি হিন্দুরা যেমন অতীত হিন্দু-ভারতের ধারাবাহিকতার দাবিদার ছিলেন তেমনি বাঙালি মুসলমানরাও অতীত ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার ধারাবাহিক উত্তরাধিকার দাবি করতেন। হিন্দুয়ানী প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ইসলামিকরণ প্রক্রিয়াও সেইকালে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ছিল। এই প্রক্রিয়ায় মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি পরিচয় অপেক্ষা মুসলমান জাতিত্বের পরিচয় অগ্রাধিকার পায়। এই প্রেক্ষাপট থেকেই মুসলমান বাঙালিরা মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের ধারণার সাথে একাত্ম হয়। মুসলমান বাঙালিদের ধারণা ছিল ধর্মীয় ঐক্য নিয়ে জাতীয় স্বার্থে সমতাভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। [২] কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ হিসেবে ইসলামকে কর্তৃত্বের একটি হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করা শুরু হলে বাঙালি তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যে লালিত সমন্বয়বাদী চেতনার আলোকে এর বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবে তার ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় একতাবদ্ধ হয়।[৩] পাহাড়ি জনগণও তাদের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ থেকে এর অংশীদার হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্চ ১৯৬৯ সাল থেকে ডিসেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত তার নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার সকল বিভাগ, জেলা ও মহকুমা শহরসহ ৪০০ থানায় যোগাযোগকালে বারংবার উপস্থাপন করেছিলেন 'বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক নির্যাতন' চালানোর তথ্য ও উপাত্ত। শেখ মুজিবুর রহমান কখনোই গণসংযোগের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেননি বা পাহাড়ি জাতিসমূহের নির্যাতনের

---

[২] Ahmed Kamal, *State Against the Nation, The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54,* The University Press Limited, Dhaka, 2009, পৃষ্ঠা ঃ ২৫১।

[৩] Asim Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* Princeton University Press, Princeton, 1983, পৃষ্ঠা ঃ ২৫১।

বিষয়েও কোন কথা বলেননি। এর মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালি রাজনীতিবিদদের মনোভাব উপলদ্ধি করা যায়। সুতরাং পাহাড়ি জনগন কখনোই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে একাত্ব হতে পারেননি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতি পূর্ব বাংলার অ-বাঙালি জনগোষ্ঠীকে সর্বদায় বিচ্ছিন্ন রাখে। [৪] তবে নিম্নতর নেতৃত্বের হাতে বিষয়টি জটিলতর হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণায় "People of Bangladesh" [৫] বলেছিলেন, কিন্তু একই দিনে চট্টগ্রাম জেলার আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর উক্ত ঘোষণা পাঠকালে এর তথ্যগত বিষয়বস্তু ঠিক থাকলেও কিছু মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। এ সময় 'People of Bangladesh'-এর পরিবর্তে 'Bangalis' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। [৬] পরবর্তীতে যুদ্ধকালীন সময়ে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে থাকা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ও কথায় একই সুর স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ তার প্রথম বক্তৃতায় "a new Bengali nation"-এর কথা বলেছিলেন, বাঙালি ভিন্ন বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিসত্তার কথা উল্লেখ করেননি। [৭]

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের যে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ প্রায় দেয়া হয়নি সেকথা এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, অনেক আদিবাসী উদ্যমী যুবক আওয়ামী লীগের এই নীতির ফলে মুক্তিবাহিনীতে অংশ নিতে পারেননি। তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার উদ্যোগে ৫০০-র বেশী আদিবাসী যুবক প্রাথমিক প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণের পরেও আদিবাসীদের না জানিয়ে বাঙালি নেতৃবৃন্দ রাঙ্গামাটি ত্যাগ করে ভারত চলে যান। অনেক আদিবাসী প্রশিক্ষণ গ্রহন করার পরও জাতি-বৈষম্যের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ফিরে আসতে বাধ্য হন। পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে এ অঞ্চলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক মিজোদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৯৭১-এ বিভিন্ন অপারেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মত একই চেহারার ভারতীয় মিজো বিদ্রোহীদের ব্যবহারের ঘটনা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে 'পাকিস্তানপন্থী' হিসেবে আখ্যায়িত করার পথ তৈরি করেছে, যদিও এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগনের কোন সম্পর্ক ছিলনা। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ধারণা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে পাহাড়ি জনগণের কোন স্থান নাই, সুতরাং তাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে পাকিস্তানকে সমর্থন দেওয়াই উত্তম। তার পাকিস্তান বাহিনীকে সমর্থন পাহাড়ি জাতিসমূহকে পাকিস্তানপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করতে ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু মং সার্কেলের রাজা ম প্রু সেইন যে মুক্তিযুদ্ধে খুব সক্রীয়ভাবে অংশ নেন সে কথা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকরা মনে রাখেননি। মুক্তিযুদ্ধকালে ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানকে সমর্থন

---

[৪] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২-৫৩।

[৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ খন্ড ৩, তথ্য মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১।

[৬] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪।

[৭] ঐ।

ও স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানে অবস্থান পাহাড়ি জাতিসমূহকে বাঙালির বিপক্ষপন্থী হিসেবে বিবেচনা করতে উগ্রবাদী "বাঙালি" ও "বাংলাদেশী'-দের রসদ যুগিয়েছে।

১৯৭৫ সালের শেষের দিক থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মুসলমান পরিচিতি নতুনভাবে প্রকাশ পায়। শিক্ষা এবং গণমাধ্যমে ইসলামের উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবর্তন আনা হয়। শেখ মুজিবের শাসনামলে রেডিও ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শেষে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রচলন রাখা হয়নি। কিন্তু এ সময়ে এসে রেডিও এবং টেলিভিশনে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা শুরু হয়। জিয়াউর রহমান ইসলামের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'একজন মুসলমান জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামকে অনুসরণ করবে'। শিক্ষা ক্ষেত্রেও জিয়াউর রহমান জোর দেন ইসলামের উপর। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সকল মুসলিম ছাত্রদের প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয় এবং নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়। তিনি সকল মুসলিম দেশকে একটি বিশেষ নামে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭ সালে এক আদেশে সংবিধানের শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" করা হয়। ৮ নং অনুচ্ছেদের ১ নং ধারায় æThe principles of absolute trust and faith in the Almighty Allah" যুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২১ মে বাংলাদেশে দ্বিতীয় সংসদ অধিবেশনে কেবলমাত্র মুসলমানদের কোরআন থেকে পাঠ করা হয়। জিয়াউর রহমান বাঙালি শব্দ এবং স্লোগানকে নিরুৎসাহিত করেন। বাঙালির স্লোগান "জয় বাংলা"-র পরিবর্তে "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" ব্যবহার করতে থাকেন। 'জিন্দাবাদ' উর্দু শব্দ যার অর্থ দীর্ঘজীবী হও। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বাঙালিদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বলেন, 'আমাদের নিজস্ব পথ ইসলামিক পথ'। [৮]

জিয়াউর রহমানের পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার বাংলাদেশে ইসলামের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৮০ সাালে তিনি ঘোষণা করেন, শহীদ মিনারে আলপনা আঁকা ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের দুই দফা নীতির একটি হলো মসজিদকেন্দ্রীক সমাজ এবং অন্যটি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তিনি ১৯৮৬ সালে মসজিদকেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থা ঘোষণা এবং মসজিদের জন্য অনুদান প্রদান করেন। পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মসজিদের সংখ্যা ২০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯২-এ পৌঁছে। এ বিষয়গুলি পাহাড়ি জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইসলামের মাধ্যমে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। ১৯৮৮ সালের ২ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়। ইসলামকে ভবিষ্যৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরশাদ সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামকে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সালে ইসলামিয়াত এবং আরবী ভাষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিরোধী দল ও ছাত্রদের বাধার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষার

[৮] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯-৭০।

সাথে সাধারণ শিক্ষার বিষয়গুলি সমন্বয় করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে তিনি ইমামদের জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইসলামের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের ফলে পাহাড়িরা নিজেদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে।[৯]

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পারস্পারিক আস্থার অভাবের কারণে দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রশ্নে দরকষাকষির মধ্যে দিয়ে সমঝোতার আলোচনা এগিয়ে চলে। লক্ষণীয় যে, ১৯৮৮ সালের শেষে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তাদের ৫ দফা দাবির প্রথম দাবি 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'-এর পরিবর্তে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' উল্লেখপূর্বক সংশোধিত দাবিনামা পুনঃউপস্থাপন করার পূর্ব পর্যন্ত সরকার বা জনসংহতি সমিতি কোন পক্ষই প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়নি। তবে ট্রাইবাল কনভেনশন, পরবর্তী পর্যায়ের তিন জেলার নেতৃবৃন্দ নিয়ে গঠিত জেলাভিত্তিক ট্রাইবাল কনভেনশন, যোগাযোগ উপ-কমিটি, ৭৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়া 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি', এমনকি ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারি কমিটির সদস্যগণও সচেষ্ট থেকেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের পুরোধা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের একটি ইতিবাচক সমঝোতা, যা প্রাণহানি আর ধ্বংসযজ্ঞ এড়িয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের পথকে প্রশস্ত করবে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর সরকারি কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির এক দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে অনিবার্য দুটি পক্ষ, সরকার এবং জনসংহতি সমিতি'র, সরাসরি আলোচনা শুরু হয় এবং তার সফল পরিসমাপ্তি হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সাক্ষরের মধ্যে দিয়ে।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এখনো একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। জাতিসংঘের Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)-এর ২০০১ সালে বাংলাদেশের পাঁচটি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে, এগুলো হল– ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ২০০০ সালের। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে এই রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করে CERD অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া CERD শান্তিচুক্তির চার বছরে এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করেছে এবং এই চুক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশকিছু ইতিবাচক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে, যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (CHT Regional Council) এবং ভূমি কমিশন (Land Commission) গঠন। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে ধীর গতি, কমিটি তার প্রতি সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এছাড়াও কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কার্যকরকরণের বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছে যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো আঞ্চলিক পরিষদ শক্তিশালী করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম

[৯] Amena Mohsin, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭১-৭২।

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন পুনর্গঠন, প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বাঙালি সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করা।[১০]

সমকালীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে বিকল্প দর্শন উপস্থাপনকারী রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কর্মপরিধি অতিক্রম করেছে তার জীবনকালকে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিগত বৈষম্য দূর করা এবং সকল জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই ঐক্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে তিনি নির্মাণ করেছিলেন 'জুম্ম জাতীয়তাবাদে'র ধারণা। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশের বৃহত্তম জাতি বাঙালিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ফলে বাঙালিকরণ ও ইসলামিকরণের আগ্রাসন পাহাড়ি জনজীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ বয়ে এনেছে। তাদের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানকে উপেক্ষা করে সামরিক সমাধানের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাহাড়িদের জীবনকে এক সময় ঠেলে দিয়েছে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সংগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি আদিবাসী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কালোত্তীর্ণ ভূমিকাকে অনুধাবন ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

---

১০ উল্লেখ করেছেন Tone Bleie, *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenge: The Adivasis of Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, 2006, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩।

জাতিসংঘের Committee on Human Rights (CHR) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা যেমন বাস্তবায়ন করে, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)-ও প্রায় একই ধরনের বিষয় পর্যালোচনা করে থাকে। CERD-এর একটি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কাঠামো রয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে Convention on the Elimination of Racial Discrimination-এ বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে। যেসব দেশ এই Convention স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করেছে, তাদের CERD-এর কাছে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়। একই সাথে এ সম্পর্কিত রূপায়ণ কার্যক্রমও অবহিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সরকারী প্রকাশনা ও নথিপত্র

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Population and Housing Census-2011*, Community Report : Bandarban Zila, BBS, Dhaka, 2012.

BBS, *Population and Housing Census-2011*, Community Report : Khagrachhari Zila, BBS, Dhaka, 2012.

BBS, *Population and Housing Census-2011*, Community Report : Rangamati Zila, BBS, Dhaka, 2012.

BBS, *Bangladesh Population Census-2001;* Community Series, Zila : Rangmati, BBS, Dhaka, 2005.

BBS, *Bangladesh Population Census-2001;* Community Serries, Zila : Khagrachhari, BBS, Dhaka, August 2005.

BBS, *Bangladesh Population Census-2001;* Community Serries, Zila: Bandarban, BBS, Dhaka, 2007.

Government of India Act, 1935. Chapter V. page 60-61,

Government of India (Excluded and Partially Excluded Areas) Order, 1936, No.166.

Hunter, W W, *A Statistical Account of Bengal*, Volume VI, Trubner & Co, London, 1876 (First Reprinted in India, New Delhi, 1971).

Hutchinson, R.H. Sneyd*, Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Chittagong Hill Tracts*, Allahabad, The Pioneer Press, 1909.

Ishaq, Mohammed (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Chittagong Hill Tracts*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1971.

Thornton, Eadward, *A Gazetteer of the Territories Under the Government of the East-India Company*, Neerag Publishing House, Delhi, 1858.

২. ইংরেজি গ্রন্থ

Adnan, Shapan, *Migration Land Alienation and Ethnic Conflict : Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Research & Advisory Services, Dhaka, 2004.

Barkat, Abul; Sadeka Halim, Asmar Osman, Md. Ismail Hossain, and Manzuma Ahsan, *Status and Dynamics of Land Rights, Land Use and Population in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Human Development Research Centre, Dhaka, 2010.

Bessaignet, Pierre, *Tribesmen of The Chittagong Hill Tracts*, Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1958.

Bleie, Tone, *Tribal Peoples, Nationalism and the Human Rights Challenge : The Adivasis of Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka, 2006.

Kamal, Ahmed *, State Against the Nation, The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54,* The University Press Limited, Dhaka, 2009.

Keith, Berriedale (ed), *Speeches and Documents on Indian Policy, 1750-1921*, Vol.II, Humphrey Milford, Oxford University Press, London.

Kamal, Mesbah; Zahidul Islam & Sugata Chakma (ed), *Indigenous Communities: Cultural Survey of Bangladesh, Vol.5*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2007.

Lewin, H, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein; With Comparative Vocabularies of the Hill Dialects*, Bengal Printing Company Limited, Calcutta, 1869.

Loncheu, Nathan, *The Bawmzo*, Hope Multimedia, Dhaka, 2012.

Majumdar, Pannalal, *The Chakmas of Tripura*, Tripura State Tribal Cultural Research Institute & Museum, Agartala, 1997.

Mey, Wolfgang (ed.), *Genocide on the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : They are Now Burning Village After Village,* International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhegen, 1984.

Mohsin, Amena, *The Politics of Nationalism*, The University Press Limited, Dhaka, 2002.

Rahman, Atiqur, *They are not Indigenous : The Tribes Residing in Chittagong Hill Tracts*, Parbat Prokasoni, Rangamati/Dhaka/Sylhet, 2013.

Rahman, Md. Mashiur, *Struggling Against Exclusion : Adibasi in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*, MS Thesis, Department of Sociology, Lund University, Sweden, 2011.

Roy, Asim, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal,* Princeton University Press, Princeton, 1983.

Roy, Rajkumari Chandra, *Land Rights of the Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*, Published by: International Work Group for Indigenous Affairs, Denmark, 2000.

Roy, Raja Devasish & Pratikar Chakma, *The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900*, Association for Land Reform and Development (ALRD), Dhaka, 2010.

Schendel, Willem van, Wolfgang Mey and Aditya Kumar Dewan, *The Chittagong Hill Tracts : Living in a Borderland*, White Lotus Press, Bangkok, 2000.

Abul Barkat, Sadeka Halim, Avijit Poddar & et.al., *Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tracts,* Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF), UNDP, Dhaka, 2009.

৩. ইংরেজি প্রবন্ধ

Baten, Mohammad Abdul, 'Khumi', in Mesbah Kamal, Zahidul Islam & Sugata Chakma (ed) *Indigenous Communities : Cultural Survey of Bangladesh, Vol. 5*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2007.

Baten, Mohammed Abdul, 'Mro', in Mesbah Kamal & et.al.(ed), 2007.

Bangladesh Group Netherland, 'The Road to Repression : Aspects of Bengali Encroachment on the Chittagong Hill Tracts 1860-1983', published in Wolfgang Mey (ed), *Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : They are Now Burning Village After Village,* International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhegen, 1984.

Bawm, Zing Alh, 'Bawm' in Mesbah Kamal & et.al.(ed), 2007.

Chakma, A. B., 'Look Back from Exile : A Chakma Experience', in Wolfgang Mey (ed), 1984.

Khan, Hafiz Rashid, 'Pangkhoa' in Mesbah Kamal & et.al.(ed), 2007.

Khyang, Thoisafure, 'Khyang', in Mesbah Kamal & et.al.(ed), 2007.

Lushai, Johny 'Lushai' in Mesbah Kamal & et.al.(ed), 2007.

J. P. Mills and the Chittagong Hill Tracts, 1926/27, Tour Diary, Reports, Photographs, Annotated and Commented Edition, Wolfgang Mey, 2009.

Mey, Wolfgang, 'Soil Use and Land Rights in the Chittagong Hill Tracts', in Wolfgang Mey (ed), 1984.

Nau, U Saw, 'Marma', in Mesbah Kamal & et.al. (ed), 2007.

Roy, Rakhi, 'Chak', in Mesbah Kamal & et.al. (ed), 2007.

Tanchanga, Dinonath, 'Tanchanga', in Mesbah Kamal & et.al. (ed), 2007.

Tripura, Probhangshu, 'Tripura', in Mesbah Kamal & et.al. (ed), 2007.

৪. ইংরেজি পত্রিকা

The Daily Star, 12 June 2015.

৫. ইংরেজি কবিতা

Sudipta Chakma Mikado, '*Identity'*, published as 'Two Poems from the Chakma' in the periodical *World Litereture Today*, vol. 87, Issue 3, May-June 2013.

Sudipta Chakma Mikado, 'Unspoken Words', in *World Litereture Today*, May-June 2013.

৬. অনলাইন

http://pcjsscht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=68

Norwegian Refugee Council / Global IPD Project, Profile of Internal Displacement: Bangladesh, 3 October 2001, দেখুন http://www.idpproject.org

৭. বাংলা গ্রন্থ

আজাদ, হুমায়ুন, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা*, আগামী প্রকাশনী, ২০১০।

ইবরাহিম, মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ, বীরপ্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১।

কামাল, মেসবাহ; জাহিদুল ইসলাম ও সুগত চাকমা (সম্পাদিত), *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

কামাল, মেসবাহ ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, *অশ্রু-সাগরে মিলিত প্রাণ ঃ মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ও চা-জনগোষ্ঠী*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮।

কামাল, মেসবাহ ও শারমিন মৃধা (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সংকট ও সম্ভাবনা*, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা, ২০০১।

খান, হাফিজ রশিদ, *আদিবাসী জীবন আদিবাসী সংস্কৃতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯।

খান, লেঃ কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী, *মং রাজার মুক্তিযুদ্ধ*, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।

খীসা, প্রদীপ্ত, *'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা'*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬।

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র, *চাকমা জাতির জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত*, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০ (শ্রীসারদাচরণ ঘোষ, কলিকাতা, ১৯১০)।

চাকমা, বিপ্লব, *পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭।

চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী ঃ এথনোগ্রাফিয় গবেষণা (১ম খণ্ড)*, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০।

চাকমা, মঙ্গল কুমার (সম্পাদিত), *স্মারক গ্রন্থ, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ জীবন ও সংগ্রাম*, এম. এন. লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, ২০০৯।

চাকমা, শরদিন্দু শেখর, *বঙ্গবন্ধু ও পার্বত্য চট্টগ্রাম*, বিভাস, ঢাকা, ২০১১।

চৌধুরী, অরুণ, *আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৩।

চৌধুরী, কুমুদ কুন্ডু, *ত্রিপুরার ভাষাচর্যাঃ বাংলা ও ককবরক*, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৬।

ছফা, আহমদ, *শান্তিচুক্তি ও নির্বচিত নিবন্ধ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৮।

ত্রিপুরা, নব বিক্রম কিশোর (সম্পাদিত), *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ বন-পাহাড়ের সাত-সতের*, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৪।

দেওয়ান, কামিনী মোহন, *পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী*, দেওয়ান ব্রাদার্স, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৭০।

দোহা, এম. এস., *বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের ইতিবৃত্ত*, অর্কিড, ঢাকা, ২০০৫।

পারভেজ, মাহফুজ, *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

বাতেন, মোহাম্মদ আব্দুল, *বাংলাদেশের ম্রো উপজাতির জীবনধারা*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০০৩।

মজিদ, মুস্তাফা (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫।

মজিদ, মুস্তাফা (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯।

মোর্তোজা, গোলাম, *শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।

রহমান, হাবিবুর, *বিভ্রান্তির বেড়াজালে পার্বত্য চট্টগ্রাম*, টর্চ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৪।

রহমান, আতিকুর, *পর্বত প্রকাশ (অনুসন্ধান)*, পর্বত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

রহমান, মোঃ শহীদুর, *আদি বাংলার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ইন্টারন্যাশনাল হিষ্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা, ২০১২।

রায়, রাজা দেবাশীষ, *আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৭৫ (নং-১০৭) এবং বাংলাদেশের আইনসমূহ ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা*, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ঢাকা, ২০১০।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৩।

লারমা, চিত্তকিশোর, *চাকমা জাতির জীবন স্মৃতি*, জুম্ম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

সরকার, ড. বিভূতি ভূষণ, *উপজাতি কৃষ্টি ও কৃষি*, উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

সাগর, খুরশিদ আলম, *বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা*, পত্রপুট, ঢাকা, ২০০৮।

হারুন, আলীমুজ্জামান, *সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী*, প্রকাশক জাকিয়া জামান, ঢাকা, ১৯৯২।

৮. বাংলা প্রবন্ধ

কামাল, মেসবাহ ও জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, 'মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীর ভূমিকা', প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২।

খিয়াং, থয়সা প্রু, 'খিয়াং', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম ও সুগত চাকমা সম্পাদিত, *আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঃ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

খিয়াং, বাছা, 'খিয়াং', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী ঃ এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, প্রথম খণ্ড, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০।

খুমী, লেলুং 'খুমী', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

চাক, অং খ্যাইন, 'চাকদের ধর্ম ও সংস্কৃতি', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯ ।

চাক, পাই থুই, 'কামাঙ চয়েত্ ঠুঙঃচাকদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯ ।

চাক, মংমং ও চিংহ্লামং চাক, 'চাক', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

চাকমা, ব্রজেন্দু শেখর, 'চাকমা জাতি ও তার সংস্কৃতি', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫।

চাকমা, বুদ্ধজ্যোতি, 'পার্বত্য জনপদের নববর্ষ বৈসাবি', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, ২০০৫।

চাকমা, মঙ্গল কুমার ও পল্লব চাকমা, 'বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সার্বিক অবস্থা', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

চাকমা, লক্ষ্মীপ্রসাদ, 'পরিবেশবাদী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও কিছু স্মৃতি কথা', মঙ্গল কুমার চাকমা সম্পাদিত, *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ জীবন ও সংগ্রাম*, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২০০৯।

চাকমা, সুগত, 'চাকমা', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, ২০০৭।

চাকমা, সজীব, 'চাকমা', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

চাকমা, হিরন মিত্র, মংসিংঞো মারমা, 'পটভূমিকা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

তন্চংগ্যা, দীননাথ, 'তঞ্চঙ্গা', মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, ২০০৭।

তঞ্চঙ্গ্যা, বীর কুমার, 'তঞ্চঙ্গ্যা', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

ত্রিপুরা, শক্তিপদ ও সন্তোষ বিকাশ ত্রিপুরা, 'ত্রিপুরা', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

ত্রিপুরা, শোভা, 'ত্রিপুরা জাতিসত্তা', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, ২০০৫।

নু, উ চ, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা ঃ উপজাতীয় নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, ২০০৫।

পাংখোয়া, লাল ছোয়াক লিয়ানা, 'পাংখোয়া', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

বাতেন, মুহাম্মদ আবদুল, 'খুমী', প্রকাশিত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*, ২০০৭।

বল, কুমার প্রীতীশ, 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি ঃ আগে-পরের কথা', প্রকাশিত হয়েছে শফি আহমেদ এবং রাশেদা কে. চৌধুরী (সম্পাদিত), *নিজভূমে পরবাসী ঃ বাংলাদেশের আদিবাসী*, গণসাক্ষরতা অভিযান, ঢাকা, ২০১৪।

মজিদ, মুস্তাফা, 'মারমা জাতিসত্তা', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *মঙ্গোলীয় আদিবাসী*, ২০০৫।

মজিদ, ড. মুস্তাফা, 'বম জাতিসত্ত্বার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, ২০০৯।

মজিদ, ড. মুস্তাফা, 'মঙ্গোলীয় আদিবাসী চাক', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, ২০০৯।

ম্যা, মং চান শৈ এবং খিয়াং, চাই থোয়াই প্রু, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, ২০০৯।

মারমা, মংসিংঞো, 'মারমা', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

মালেক, আবদুল ও মশিউর রহমান, 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী 'বম' ঃ আর্থ-সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮২, জুন ২০০৫/আষাঢ় ১৪১২, ঢাকা।

মুরং, সিং ইয়ং, 'খুমীদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত', মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদিত), *আদিবাসী সংস্কৃতি*, ২০০৯।

ম্রো, সিং ইয়ং, 'ম্রো', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

রনো, হায়দার আকবর খান, 'আদিবাসী সমস্যা ও সমাধানের কিছু ইঙ্গিত', *সংহতি*, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০৪।

লুসাই, জনি, 'লুসাই', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

সাহু, জির কুং, 'বম', মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আদিবাসী*, ২০১০।

হানাফী, জাফর আহমাদ, *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৯. Pamphlates

An Urgent Statement of Jana Samhati Samati on the Parbattya Zilla Parishad Election (Hill District Council Election) and Declaration of General Amnesty by Bangladesh Government, Department of Information and Publicity of Parbattya Chattagram Jana Samhati Samati (United Peoples' Party), Chittagong Hill Tracts, Bangladesh

১০. জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

উদয়ন, শ্রী, 'এম. এন. লারমার সংসদীয় জীবন ও চিন্তা', *জুম্ম সংবাদ বুলেটিন* (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র মুখপত্র), বুলেটিন নং ২৩, ১৯৯৫।

উদয়ন, শ্রী, 'প্রসঙ্গ ঃ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার', বুলেটিন নং ০৫, ১৯৯১।

কার্বারী, পি বি, 'এম. এন. লারমা আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং মুক্তির প্রতীক', বুলেটিন নং ৩৭, ২০০৬।

খীসা, প্রিয়দর্শী, 'কিছু স্মৃতি', বুলেটিন নং ৩৭, ২০০৬।

চাকমা, আশাপূর্ণ, 'গৃহযুদ্ধ ও প্রয়াত নেতার স্মরণে', বুলেটিন নং ৩৪, ২০০৪।

চাকমা, জরিতা, 'সুভাষিণী দেওয়ান ঃ একজন আদর্শ মাতার নাম', বুলেটিন নং ৩৪, ২০০৪।

চাকমা, ধীর কুমার, 'এম. এন. লারমা ঃ কিছু স্মৃতি কিছু অভিব্যক্তি', বুলেটিন নং ৩৪, ২০০৪।

চাকমা, লক্ষ্মীপ্রসাদ, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর পরিবেশ ভাবনা', বুলেটিন নং ৩৭, ২০০৬।

জগদীশ, শ্রী, 'অনুপ্রবেশ', বুলেটিন নং ২৭, ১৯৯৬।

জগদীশ, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া', বুলেটিন নং ৫, ১৯৯১।

জগদীশ, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বেদখল', বুলেটিন নং ৫, ১৯৯১।

জীবন, শ্রী, '১০ই নভেম্বর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী', বুলেটিন নং ২৭, ১৯৯৬।

দেবাশীষ, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী দল, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং মানবতাবাদী সংস্থাসমূহের ভূমিকা', বুলেটিন নং ৫, ১৯৯১।

নিটো, শ্রী, 'আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের কিছু কথা', বুলেটিন নং ২৩, ১৯৯৫।

পল্লবী, শ্রীমতি, 'নারী মুক্তি প্রসঙ্গে এম. এন. লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী নির্যাতন', বুলেটিন নং ২৩, ১৯৮৩।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ঃ প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', বুলেটিন নং ৩৬, ২০০৬।

পেলে, শ্রী, 'জাতিসত্বা সমস্যা সম্পর্কে সরকারি মনোভাব', *বুলেটিন* নং ১৯, ১৯৯৫।

পেলে, শ্রী, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ঐতিহাসিক অবদান', বুলেটিন নং ৫, ১৯৯১।

পেলে, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুপ্রবেশকারীরা কি নিরীহ, বুলেটিন নং ২৭, ১৯৯১।

লারমা, জ্যোতি প্রভা, 'মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা', বুলেটিং নং ৩৭, ২০০৬।

১১. স্মরণিকা ঃ *১০ নভেম্বর' ৮৩ স্মরণে*

অনুপ, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা ও মানবেন্দ্র নরারয়ণ লারমা', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৪।

অশোক, শ্রী, 'গৃহযুদ্ধ-আন্দোলন প্রতিরোধের ষড়যন্ত্র', *১০ নভেম্বর' ৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

উত্তরণ, শ্রী, 'জাতীয় উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমিকা', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

চাকমা, বিজয় কেতন, 'স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ২০০২।

চাকমা, সজীব, 'মহান নেতা এম. এন. লারমা ঃ তাঁর চিন্তা ও কর্ম', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, ২০০৯।

চাকমা, উদয়ন, 'জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন, বিভেদপন্থী চক্রান্ত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ২০০১।

চাকমা, অমিয় প্রসাদ, 'মহান নেতা এম. এন. লারমার আত্মসংযম', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ২০০১।

জিমি, শ্রী, 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি', ১০ নভেম্বর-'৮৩ স্মরণে, ১৯৮৪।

জিমি, শ্রী 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের রূপরেখা', '১০ নভেম্বর' ৮৩ স্মরণে', ১৯৮৫।

জীবন, শ্রী '১০ ই নভেম্বর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি', *১০ নভেম্বর'৮৩ স্মরণে*, ১৯৯৬।

জ্যোতিপ্রভা চাকমা, 'মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা', এম. এন. লারমার মৃত্যুবার্ষিকী ২০১৪ স্মরণিকা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবাষির্কী পালন জাতীয় কমিটি, ঢাকা, ২০১৪।

তঞ্চঙ্গ্যা, বীর কুমার, 'বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনাদর্শ', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ২০০১।

তঞ্চঙ্গ্যা, বীর কুমার, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঃ একজন ক্ষনজন্মা পুরুষ', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৩।

দিবা, শ্রীমতি, 'চেতনার মৃত্যু নেই', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

দেওয়ান, তনয়, 'গ্রামীণ সমাজের গণতন্ত্রায়নে গ্রাম পঞ্চায়েত', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

দ্রং, সঞ্জীব, 'বাংলাদেশের আদিবাসী ঃ নিরন্তর সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি নেই', সংহতি, বাংলাদেশ আদবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০৪।

পেলে, শ্রী, 'রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

বকুল, শ্রী, 'স্মৃতি তর্পণ', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

রবি, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়', *১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

রবি, শ্রী, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়', *১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৪।

রেণী, শ্রী, 'আমার চোখে মানবেন্দ্র লারমা', *১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে*, ১৯৮৫।

হিমাদ্রী , শ্রী, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী', ১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে, ১৯৮৪।

১২. বাংলা পত্রিকা

প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৫।

সমাজ চেতনা, জুলাই-আগস্ট যৌথ সংখ্যা, ১৯৯৬।

১৩. সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার ২০০০

সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার ২২/০৭/২০০০

সাক্ষাৎকার ২০০২

উষাতন তালুকদার এর সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২

গৌতম কুমার চাকমার সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২, ১২/১১/২০০২

জলি মং মারমা'র সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২

নুরুল হকের সাক্ষাৎকার, ১২/১১/২০০২

যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২২/০৭/২০০২, ১১/১১/২০০২

লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা'র সাক্ষাৎকার, ১০/১১/২০০২

হানাচরন ত্রিপুরা'র সাক্ষাৎকার, ১১/১১/২০০২

সন্তু লারমা'র সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০২, ২/০৭/২০০২, ২২/০৭/২০০২, ১০/০৮/২০০২, ১৩/০৮/২০০২, ১৮/০৮/২০০২

সাক্ষাৎকার ২০০৩

অংথোয়াই চিং মারমা'র সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩, ১৭/০৭/২০০৩

অং খোয়াইছিং মার্মা'র সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩

উষাতন তালুকদার এর সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩, ০৩/০১/২০০৩

কে.এস. মঙ এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭ ২০০৩

থাংকু খুমি-র সাক্ষাৎকার, ১৭/০৭/২০০৩

দোনুক প্রু মারমা ১৭/০৭/২০০৩

বিক্রম ত্রিপুরা সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩, ৩১/০১/২০০৩

ভা চিং মারমার সাক্ষাৎকার ২৫/১০/২০০৩

মং শৈ প্রু খিয়াংয়ের সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩, ১৭/০৭/২০০৩

ম্রাও মাস্টার এর সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩

রূপায়ণ দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ০৫/০২/২০০৩, ১২/০৮/২০০৩, ১৭/০৭/২০০৩

রামথন ব্যোম এর সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩

রামথম বোম এর সাক্ষাৎকার, ১৫/০৭/ ২০০৩

লয়েল ডেভিড বম সাক্ষাৎকার, ১৪/০৭/২০০৩, ১৫/০৭/২০০৩, ১০/০৭/২০০৩

লাল্লিয়াং থাংগার সাক্ষাৎকার, ১৬/০৭/২০০৩

হানাচরণ ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৫/১০/২০০৩

সুধাসিন্ধু খীসা সাক্ষাৎকার, ২৯/০১/২০০৩, ৩০/০১/২০০৩

সন্তু লারমা'র সাক্ষাৎকার, ২১/০৫/২০০৩, ২২/০৭/২০০৩, ২৫/০৭/২০০৩, ১০/০৮/২০০৩, ১৮/০৮/২০০৩

সাক্ষাৎকার ২০০৪

রূপায়ন দেওয়ানের সাক্ষাৎকার, ১১/০৫/২০০৪

সাক্ষাৎকার ২০০৯

রণবিক্রম ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২৩/০২/২০০৯

হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ২২/০২/২০০৯।

সাক্ষাৎকার ২০১০

কং জরি মগের সাক্ষাৎকার, ১১/০৪/২০১০

সাক্ষাৎকার ২০১৫

যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাক্ষাৎকার, ১২/০৫/২০১৫

১৪. বক্তৃতামালা

গৌতম কুমার চাকমা, এম. এন. লারমা স্মরণে শোকসভা, ১০/১১/২০০২।

মনোসা প্রু কারবারী, এম. এন. লারমা স্মরণে শোকসভা, ১০/১১/২০০২।

কমরেড মনুরুল আহসান খান, এম. এন. লারমা'র স্মরণে শোক সভা, ১০/১১/২০০২।

জলি মং মারমা, এম. এন. লারমা স্মরণে শোকসভা, ১০/১১/২০০২।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য, এম. এন. লারমা'র স্মরণে শোকসভা, ১০/১১/২০০২।

১৫. সংশোধিত সংবিধান

অনুচ্ছেদ ২৩ক, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

Excerpt from Sneha Kumar Chakma's Memorandum
to CHADIGANG CONFERERNCE , Amsterdam, 10 - 11 October, 1986

When World War II virtually ended in favour of the allies, the British government decided to abdicate sovereignty of India with a pledge to give the Muslims a home land - Pakistan. Lord Wavell sat in conference at Simla to accord an Interim Government - July, 1945.

Finding independence and partition of India inevitable, the Chittagong Hill Tracts Peoples Association (Parbattya Chattagram Jana Samity - PCJS) of which I was General Secretary, sent me to the Wavell conference to meet the Congress high command and other leaders with a memorandum. I held long discussions with Pandit Jawaharlal Nehru and Maulana Abul Kalam Azad on CHT.

A memorandum containing political demands of CHT was again sent out on 15 Feb. 1947.

Myself (Sneha Kumar Chakma) was co-opted in the All India Excluded Areas Sub-Committee of the Constituent Assembly of India for CHT (vide No.CA/38/Com/47) dated 20.3.1947 and I sat in committee at Rangamati on 3rd April, 1947.

When crucial and decisive moments were fast approaching and the PCJS demanded bold and vigorous actions to meet all contingencies, our president, Kamini Mohan Dewan showed physical as well as mental depression and therefore the organisation contracted in May 1947, into an Action Committee with Pratual Chandra Dewan as chairman and Ghanasyam Dewan as field commander.

Bengal Boundary Commission was announced by the Governor General on 30th June, 1947 with erroneous and ambiguous terms of reference. I, as General Secretary, PCJS, and representative in the Indian Constituent Assembly, was sent to do the needful.

1. I consulted Pandit Nehru who said that the Commission had no jurisdiction over CHT.
2. On 14th July, 1947 I submitted a memorandum to the Bengal Boundary Commission.
3. Bengal Boundary Commission held hearings on 16th July, 1947 and onwards without its Chairman, Sir Cyrill Radcliffe. The CHT memorandum had a roaring hearing of 91 minutes on 19th July, 1947.

I was terribly apprehensive of the Commission's trespassing into CHT on the following grounds :

1. The trump card, Sir Radcliffe, was not there to listen to the arguments of CHT.
2. The Congress and Hindu Mahasabha Memoranda did not talk a word on CHT.

3. The two Muslim members of the Commission and the Muslim League lawyer fought tooth and nail with the non-Muslim members of the Commission and my lawyer.

So I ran to Delhi and reported my despair to Pandit Nehru who reiterated his old conviction, and to Sardar Ballavbhai Patel who swore to write strongly to the Chairman Sir Radcliffe.

In the meantime, the Indian Independence Act of 18 July, 1947 came to my hand and also the rumours that Sir Cyrill Radcliffe had squashed the seven-page arguments of Justice Bijan Mukherjee and Justice Charu Biswas (non-Muslim members of the Bengal Boundary Commission) and that the honourable chairman of the commission had crumpled Sardar Patel's letter on CHT and threw it down to the bin in gigantic wrath.

I hastened to Sardar Patel one dark morning and swore - "I am flying back to CHT to declare it INDIA AND RESIST if it happens otherwise! Will you stand behind me, Sir?"

"Certainly, I will be with you, behind CHT! Go back, hurry back"! Sardar Patel was truly a Sardar!

I arrived back to Rangamati and on 4th August, 1947 alerted Shri A.V. Thakkar, chairman of my sub-committee regarding CHT.

At 00.00 hours between 14th and 15th August, 1947, the Action Committee with a gathering of 10000 people led me to the Deputy Commissioner's bungalow. Col. G.L. Hyde, the D.C., came out and received us.

"Sir, is not India independent now"?

"Yes, you are independent now and on".

"Is not, Sir, CHT a part of India under the Independence Act of India"?

"Yes, according to the Independence Act of India 1947 Chittagong Hill Tracts is a territory of Indian dominion".

"So, should we not hoist our national flag"?

"Yes, but we the British people generally hoist flags at sunrise. Please come at dawn and hoist the Indian national flag publicly in the football ground, and I will go and salute it. Thereafter I shall flourish the Indian flag in my office and residence where I invite you all. Please come here to attend my flag hoisting ceremony."

Our veteran leader, Kamini Mohan Dewan, declining all our requests to do the job, the Action Committee forced me to hoist our national flag at sunrise on 15th August 1947. We followed the D.C. in procession and attended the government flag hoisting ceremony.

Messages were sent out everywhere.

Little did I know that while I was hoisting Indian flags in Rangamati, CHT, Pandit Nehru was sending a crucial note of B.N. Raw to Sardar Patel, on CHT.

In the evening on 17th August 1947 the Radcliffe Award dated 12th August 1947, was heard over the radio implying CHT within East Bengal Boundary. Early next morning the Action Committee summoned an emergency meeting to be held on 19th August 1947 in the Deputy Commissioner's residence. Chakma Raja and all dignitaries were invited. Chakma Raja attended, Kamini Mohan Dewan attended and many others. Everybody subscribed to the resolutions -

1. CHT shall not abide by the Radcliffe Award.
2. Resistance be put up and resistance squads be immediately set up with indigenous weapons.
3. Sneha Kumar Chakma shall immediately set out in quest of arms and support from India. He must avoid immediate arrest.

After dispatching the news to relevant quarters, at 3 p.m. on 19th August, 1947, I left Rangamati to cross the borders of CHT, on foot track, towards Ramgarh-Sobroom (CHT-Tripura) with Indramoni Chakma (colleague) and an armed bodyguard of seven captained by Girish Dewan. I crossed to Sabroom on 20th August, 1947 and was at Agartala on 21st August, 1947.

I went to Shillong and reached Calcutta on 25th August, 1947 and touched Sardar Patel by wire

Within a few days I was talking to Sardar Patel. "We are resisting. I am sent to you for arms & ammunition".

"Only arms & ammunition"?

"Yes. Only arms & ammunition. People of CHT are ready to fight out their own field. They can adopt to all weapons necessary at present."

"I am quite ready to supply arms & ammunition. But you know I am a deputy? Have I not a 'Prime'?"

"Do you not push me to Pandit Nehru"?

"Yes. You must meet him first".

"Then am I to see you again"?

"Come and report".

It took me about 50 days to engage myself to the Prime Minister in his office. "I am fighting Pakistan to bring back CHT to India. Will you kindly supply me only arms & ammunition"?

Pandit Nehru, the great Prime Minister of India, jumped up from the Prime Ministerial Chair and thundered - "Do you propose to bring India again under foreign rule"?

I dared not embarrass the Sardar with a 'report' and returned to my Calcutta camp to tap private resources. On 24th January, 1948 - I sent a cable to the U.N.O., I sent a telegram to-

1. Mahatma Gandhi
2. Hon'ble Pandit Jawaharlal Nehru
3. Hon'ble Sardar Patel
4. Hon'ble Dr. Shyamaprasad Mukherjee
5. Editor, Associated Press of India NEW DELHI

On 29th January, 1948, I confirmed the cable and the telegram in (1) & (2) above (Annexure-10b) and sent a memorandum to the United Nation's' Organisation.

Probably during the last week of August and first week of September, 1947, the two non-Muslim members of the Bengal Boundary Commission (Justice Bijan Mukherjee and Justice Charu Biswas) sojourned New Delhi with Indian leaders trying revision of Radcliffe Award in respect of CHT. But they must have heard as I did from Nehruji, My lawyer in the commission, Shri Apurbadhan Mukhopadhyaya, also visited Delhi with the same mission but Ghandhiji plucked out the word "CHT" from his lips.

With Sardar Patel and many others, the people of CHT thought the Government of India had locus stand to rectify the injustice upon CHT. And I brought the same again to the notice of India.

1. On 19th November, 1949
2. In 1981, in the National Convention of Buddhists New Delhi

In order to facilitate a juridical study of the documents that pushed CHT to problem, I beg to enclose copy of the following:-

1. Bengal Boundary Commission & Radcliffe Award.
2. Indian Independence Act 1947.

The Muslim homeland of Pakistan naturally held CHT as a Muslim homeland with an alien pro-Indian population. By steadily infiltrating Muslims of the plains and evicting indigenous

people, i.e. through the Kaptai Hydro Project, colonization steadily grew as a matter of administrative device.

The Sovereign H.Q.s were oceans apart from CHT and neighbourly hatred was not too sharp. It was a slow poison, a long term policy. Even General Ayub had occasion to declare CHT a 'Tribal Area'.

Source: Mr. Sneha Kumar Chakma's Memorandum to CHADIGAN CONFERENCE - Amsterdam Oct 10–11, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
LEGISLATIVE DEPARTMENT
East Pakistan Regulation No. 1 of 1958
THE CHITTAGONG HILL TRACTS (LAND ACQUISITION) REGULATION, 1958

A Regulation to provide for the acquisition of land in the Chittagong Hill Tracts

Whereas by Proclamation dated the 25th day of June, 1958, under Article 193 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, The President has assumed to himself all the powers vested in, or exercisable by the Governor of East Pakistan;

And whereas the President has, in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the said proclamation, been pleased to direct by Notification No. 22/11/58-Pol. (I), dated the 4th July, 1958, publish in the Extraordinary Gazette of Pakistan, dated the 4th July, 1958, that the power vested in, or exercisable by, the Governor under the constitution shall be exercised by the Governor;

AND whereas it is expedient to provide for the acquisition of land in the Chittagong Hill Tracts;

AND whereas by clause (3) of Article 103 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Governor is empowered to make Regulation for the peace and good government of the excluded area in his Province;

NOW, therefore, the Governor of East Pakistan, in exercise of the said powers and all other powers enabling him in this behalf, in pleased to make the following Regulation namely: -

Short title and commencement. 1. (1) This Regulation may be called the CHTs (Land Acquisition) Regulation, 1958.

(2) It shall come into force at once.

Definitions. 2. In this Regulation, unless there is anything repugnant in the subject of context,

a) “Deputy Commissioner” means the Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts and includes any officer specially appointed by the Provincial Govt. to perform all or any of the functions of the Deputy Commissioner under this Regulation;

b) “Land” includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

c) “Person interested” includes all persons claiming an interest in the compensation to be paid on account of the acquisition of land under this Regulation.

Acquisition. 3. (1) When any land held on valid title, which is not resumable under the Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regu. I of 1900) or the rules made thereunder, is required for any public purpose, the Deputy Commissioner may acquire such land by an order in writing.

(2) When an order is made under sub-section (1), the Deputy Commissioner shall serve a copy of such order on the person or persons interested:

Provided that if the Deputy Commissioner is of the opinion that the service of the copy of such order on each such person will cause delay in taking possession of the land, he may dispense with such service and cause a public notice of such order to be given at convenient places in the locality.

(3) On and from the date of service of a copy of the order or publication of a notice under sub-section (2), the land so acquired shall vest absolutely in the Provincial Government free from all incumbrances and the Deputy Commissioner may take possession of such land by using such force as may be necessary.

Compensation. 4. (1) When any land is acquired under sec. 3, the Provincial Government shall pay compensation therefore as may be determined by the Deputy Commissioner and in determining the amount of such compensation, the Deputy Commissioner shall take into consideration, -

Firstly, the market value of the land on the date of the order of acquisition, but he shall not take into consideration the changes in the value of the land resulting from the project to which the acquisition relates;

Secondly, the damage sustained by the person interested by reason of the taking of any structures, bamboos, trees or standing crops which may be on the land at the time of the Deputy Commissioner's taking possession therefore;

Thirdly, the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the Deputy Commissioner's taking possession of the land by reason of serving such land from his other land;

Fourthly, the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the Deputy Commissioner's taking possession of land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, movable or immovable, in any other manner, or his earnings;

Fifthly, if in consequence of the acquisition of the land by the Deputy Commissioner the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change; and

Sixthly, the damage, if any, bona fide resulting from diminution of the profits of the land between the time of the service of a copy of the order or publication of the notice under sub-section (2) of section 3 and the time of the Deputy Commissioner's taking possession of the land.

(2) In addition of the market value of the land, as above provided, the Deputy Commissioner shall, in every case, award a sum of fifteen per centum on such market value, in consideration of the compulsory nature of the acquisition.

Appeal. 5. (1) An appeal against an order made by the Deputy Commissioner determining the compensation under sec. 4 shall, if presented within thirty days of the date of service of the notice of such determination, lie to the Commissioner of Chittagong Division.

(2) The Board of Revenue may, either on its own motion or on application, revise any order passed by the Commissioner under sub-section (1).

Power to make rules. 6. The Provincial Government may make rules for carrying out the purposes of this Regulation.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৩

Public Disclosure Authorized

T.O. 76
RESTRICTED

FILE COPY

This report is restricted to use within the Bank.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

MEMORANDUM ON KARNAFULI HYDROELECTRIC PROJECT

PAKISTAN

Public Disclosure Authorized

February 7, 1955

Department of Technical Operations

MEMORANDUM ON KARNAFULI HYDROELECTRIC PROJECT

I. INTRODUCTION

Studies were started on the hydroelectric development of the Karnafuli River in East Pakistan before World War II. These studies have been continued since Partition and various schemes were proposed for the development of the river. A site was selected in 1951 and construction has been under way since mid 1952. The equivalent of approximately $8.3 million is reported to have been spent on the project with relatively little progress.

East Pakistan could have developed faster if sufficient power had been available. In the summer of 1953, the Pakistan Government discussed this situation with the Bank. The Bank expressed the view that a competent engineering firm should make a detailed survey of the power situation in East Pakistan to determine (1) the present and future demand for power, (2) the best method of meeting such requirements, and (3) to make a preliminary engineering study of the Karnufuli project. The services of the International Engineering Company of San Francisco were retained in March 1954 for this purpose. The consultants submitted a report in August 1954 which was confined largely to the Karnafuli project and which recommended an initial development of 120,000 kW at an estimated cost equivalent to $92 million, of which $49 million was in foreign exchange.

In September 1954 the Bank informed the Pakistan Minister of Finance that it was not prepared to consider financing the Karnafuli Hydroelectric project at this time. The Minister then requested the Bank to review the consultant's report, give him an opinion on the proposals contained in it, and if the project appeared to be feasible, support his request to the US and Canadian Governments for grant funds. The Bank agreed to this request and the staff studied the report and questioned the projected power requirements. Detailed discussions with the consultants were held after which they submitted a revised report in December 1954 recommending an initial development of the Karnafuli River of 80,000 kW at a cost equivalent to $77 million of which $34 is in foreign exchange.

This memorandum summarizes the Bank's analysis of the Karnafuli Project on the basis of information supplied by the consultants and the Pakistan Government. The Bank has not made a field investigation.

II. THE POWER MARKET

In the revised project, power will be supplied initially only to the Districts of Dacca, Tippera and Chittagong. These three districts, out of a total of 16 in East Pakistan, account at present for 70% of all of the installed capacity in East Pakistan, and are the areas in which major

Dhaka University Institutional Repository

industrial development is occurring and in which it is expected to continue. Estimated power requirements in the remaining districts will not reach a level which would permit economic extension of the transmission system from the Karnafuli project in time to justify inclusions in the first stage of development.

The consultants have restudied available data on power requirements and now forecast the demand for electric power in the area to be served by the Karnafuli project as follows:

Year	Peak Demand kW
1955	27,400
1960	56,300
1965	77,600
1970	106,000

The forecasts of load and energy requirements through 1970 is given in more detail in Annexes I and II.

In projecting the load and energy requirements for the area, Government and private companies' plans for industrial development have been taken into account. Only the power requirements of those plants which have been completed and are under construction plus firm projects on which definite decisions have been made have been included in the load projection through 1958. Load development after 1958 is based on experience in other areas under similar conditions. Allowances have been made for expansion of requirements in the townships surrounding the new plants. Industrial development in this area consists of the expansion of jute and cotton mills, along with smaller industries, such as tanneries, match factories, brick and tile plants, chemicals, and pharmaceutical products, food processing and cottage industries. The power requirements of the paper industry are not included in the estimate since paper mills require process steam and generate their own power at a relatively low cost.

The forecast of power requirements provided by the Government to the consultants indicated a much larger demand for power in East Pakistan than has been finally adopted. The essential differences between the two estimates result from a reduction in the area to be served by the project and the elimination of certain anticipated requirements, such as steel processing plants, power for irrigation and drainage schemes, rayon plants, and the use of electric power for drying tea. Some of these loads may develop between 1960 and 1970, but their aggregate amounts will not significantly alter the conclusions reached regarding power requirements as shown in Annexes I and II. This basis for forecasting load and energy requirements is considered to be realistic.

In the projections finally adopted, power demand is estimated to increase at a rate of 19% per year during the period 1955 through 1958, and 7% per year thereafter. In order to realize these projections, substantial investment must be made in industrial development. The investment required through 1958 appears to be assured since many plants have been completed or are under construction. No definite plans are available covering industrial development after that time.

Dhaka University Institutional Repository

When the diesel plants planned at Dacca and Chittagong are completed which could be in late 1955, the installed capacity in the area to be served by the Karnafuli project will be about 54,600 kW. This does not include a 30,000 kW steam plant planned at Dacca, which should not be built if the Karnafuli project is to be executed, but includes about 23,900 kW of installations which are considered to be obsolete and uneconomic, and which are assumed to be retired over a period of five years, starting in 1959. Assuming that such retirements would occur, the relationship between forecasted demand and new capacity required for the next 15 years is estimated as follows:

DACCA-CHITTAGONG-COMILLA AREAS

Year	Forecasted Demand kW	Available from Existing and Delivered Plants kW ∅	Forecasted Requirements for new Capacity kW
1955	27,400	54,625	0
1956	35,500	54,625	0
1958	48,400	54,625	0
1960	56,300	45,080	11,220
1962	64,000	35,530	28,470
1964	72,800	30,757	42,043
1966	84,400	30,757	51,643
1968	93,400	30,757	62,643
1970	106,000	30,757	75,243

∅ Not including 30,000 kW steam plant for Dacca whose status is indeterminate and not including the power plant capacity at the Karnafuli Paper Mill.

If it is necessary to postpone or slow down construction of new capacity, it is probable that retirement of the older installations could be postponed. In this case, new capacity would not be required until 1962.

III. DESCRIPTION OF THE PROJECT

The project consists of an earth-fill dam on the Karnafuli River upstream from the village of Koptai with a spillway, navigation locks and powerhouse with intake structure. The powerhouse is designed for the ultimate installation of three 40,000 kW units, two of which will be initially installed. A suitable site exists in the area of the navigation locks where additional capacity may be added later. On the basis of existing water records, it is estimated that this site has a potential of 110,000 kW of firm power.

A 165 KV transmission line will be constructed connecting Karnafuli, Chittagong and Dacca. Double-circuit steel towers will be used, but only one circuit will be initially installed. Three receiving step-down substations will be installed at Dacca, Chittagong and Comilla. Additional distribution

Dhaka University Institutional Repository

works include about 84 miles of 33 KV line with 7 substations, and about 40 miles of secondary low voltage lines. These facilities will be required to meet the estimated increased demand on the system in these areas.

The consultants recommend in the first stage that 15,000 kW of thermal capacity be retained to be operated during outages of hydro equipment and transmission lines. This will release about 16,000 kW of usable diesel capacity for installation in other locations. The initial installation of 80,000 kW at Karnafuli plus this thermal support should take care of requirements until 1967, at which time a third hydro unit of 40,000 kW should be ready for operation. The proposed construction schedule of 3½-4 years seems appropriate. This schedule could probably be extended by as much as two years if necessary.

Foundation conditions at the dam site chosen for this project are bad and require the services of engineers and contractors qualified by experience under similar conditions for the proper execution of the job. The work on this project is now being carried out departmentally by the Government of East Pakistan, and the results achieved to date indicate that outside assistance in the form of both an engineering firm for handling the design and supervision of the project and an experienced prime contractor must be provided if the project is to be properly executed and completed on a reasonable schedule and at a reasonable cost.

IV. ESTIMATED COST OF THE PROJECT

The total cost of the Karnafuli project, as estimated by the consultants on the basis of an initial installation of two units, is as follows:

Item	Cost in Millions of Dollars Equivalen: Local Currency	Foreign Currency	Total
1. Expenditures to date	8.30 1/	-	8.30
2. Land compensation and highway relocation	4.55	-	4.55
3. Main dam and saddle dam; Diversion and outlet tunnels; Spillway; Navigation locks; Power plant and switchyard	22.34	21.46	43.80
4. Design, Engineering, Field Inspection	0.75	0.50	1.25
5. Transmission lines and receiving station	3.27	6.68	9.95
6. Distribution system	0.74	1.22	1.96
Sub-total	39.95	29.86	69.81

1/ Includes some foreign exchange expenditures for construction equipment and materials.

Dhaka University Institutional Repository

Item , Cont'd.	Cost in Millions of Dollars Equivalent Local Currency	Foreign Currency	Total
7. Less salvage value of equipment	0.75	-	0.75
Total cost	39.20	29.86	69.06
8. Interest during construction	4.56	3.63	8.19
Grand Total	43.76	33.49	77.25

The above costs include $4.4 million equivalent in local currency for import duties and taxes. The consultants advise that an allowance of 5% for contingencies has been added to the estimates for individual items and that in most cases, liberal estimates have been used for unit quantities and equipment. The total allowance for contingencies cannot be determined from the information now available to the Bank. In reviewing this estimate before a final decision is reached to proceed with the project, special attention should be given to this point to see that total contingencies of 15 - 20% are provided. Of the foreign currency requirement it is estimated that about 50% will be in dollars and 50% in soft currencies.

Interest during construction has been computed on the basis of 3-1/2 year construction period with 5% interest on foreign currency expenditures and 3-1/2% on local currency requirements.

The expenditures to date, amounting to approximately $8.3 million equivalent, include the construction equipment for the job purchased in the United Kingdom at a cost equivalent to about $3 million. The remainder has been spent in local currency. Much of the investment has been lost, however, due to inadequate engineering and planning as well as losses due to flood damage.

V. COST OF POWER

The annual cost of generation estimated for the Karnafuli project on the basis of the consultants' estimates of construction costs with two units installed is as follows:

	Dollar equivalent in: Foreign Currency	Local Currency
Interest	1,760,500	1,530,800
Depreciation	482,400	417,200
Operation and Maintenance	188,500	490,500
Fuel for Stand-by Plant	254,600	115,000
Total	2,686,000	2,553,500
Grand Total	5,239,500	

Dhaka University Institutional Repository

In the above calculations provision has been made for running the stand-by thermal capacity to the extent of 2,000 hours per year to compensate for outages on equipment and transmission lines. This is considered to be a conservative estimate.

The sinking fund principle has been used in the calculation of depreciation, taking interest at 5% on foreign currency and 3-1/2% on local currency. Depreciation rates are conventional for equipment and structures of the types involved. The costs of operation, administration and maintenance are those normally used in the U. S. by the Federal Power Commission.

Based upon the annual costs given above with a production of about 295 million kWh in 1959, the cost of power would be equivalent to about 1.77¢ per kWh. The cost would reduce to 1.66¢ per kWh in 1960, and 1.21¢ per kWh in 1965, based on sales of 315 million and 432 million kWh respectively.

Assuming that all funds required for the execution of the project are borrowed, the depreciation rates adopted for the estimates on the Karnafuli project will not provide sufficient funds to cover amortization payments. To make the project self liquidating, revenues equivalent to about $6 million per year exclusive of taxes and profit would be required. This results in increasing the cost of power to about 2.03¢/kWh in 1958, 1.90¢/kWh in 1960 and 1.39¢/kWh in 1965.

If equivalent steam capacity were to be provided as an alternative to the Karnafuli project it is estimated that 90,000 kW would need to be gradually installed up to 1967 in order to meet the projected load to 1970. This would represent an investment of about $23.3 million, of which $18.5 million would be in foreign exchange. If the costs of additional distribution facilities and interest during construction are included, the foreign exchange requirements for a thermal system would amount to about $22 million and the total investment would be equivalent to about $29 million. Thus it is evident that the installation of thermal equipment in preference to the Karnafuli system would result in a substantially lower cost of the project, both in terms of total cost and foreign exchange requirements.

Assuming a complete thermal system having an efficiency comparable to modern plants and a useful life of 20 years, the cost of thermal power is estimated to be about $6 million in 1960, giving an average cost per kWh equivalent to 1.90¢. If the plant is added gradually this cost will not change appreciably during the period under consideration. This cost is substantially higher than would be obtained in later years as the load builds up on Karnafuli.

Existing rates in East Pakistan average about 6¢ per kWh for industry and 10-12¢/kWh for residential service. The margin between costs and existing rates provided by either Karnafuli or expanded thermal capacity could result in attractive profits for the operating agency, permit substantial retention of earnings for reinvestment and still permit a reduction in rates below the present level.

Dhaka University Institutional Repository

VI. BENEFITS OF THE PROJECT

The Karnafuli project will provide sufficient firm capacity in its initial development to meet the forecasted power requirements of the area which it will serve for at least eight years after completion. A third unit can be added to the project along with sufficient thermal support to meet the power demand for at least an additional eight years.

The project is multipurpose. While its primary purpose will be the generation of power, other benefits will be realized, including flood control, improvement of navigation, pump irrigation and development of the fishing and forestry industries. The value of the additional benefits cannot be accurately appraised, however, and in the analysis which has been made by the consultants the full cost of the Karnafuli project has been charged to power production.

When compared with the alternative of providing all future power requirements by thermal generation, the Karnafuli project will provide substantial foreign exchange savings through a reduction in fuel imports. Foreign exchange expenditures required for operation and debt service for the period 1957 through 1970 are estimated at about $37 million for the Karnafuli project. This corresponds to about $53 million for an equivalent thermal installation. Approximate annual savings for the period are given in Annex III. These calculations show that the savings depend upon the load on the system, reaching an amount of about $2.7 million in 1970. It is likely that the annual saving will amount to at least $3 million when Karnafuli is fully loaded.

The total investment required in the Karnafuli project is estimated as equivalent to about $77 million, as compared with $29 million in equivalent thermal capacity. Foreign exchange expenditures amount to $33.5 million and $22 million respectively. Estimates of foreign exchange savings resulting from the availability of hydro power indicate that the differential in foreign exchange costs between the two schemes should be recovered in about ten years, and that the savings realized over a period of 21 years should exceed the foreign exchange components and the cost of construction. The project therefore appears to be justified from the standpoint of foreign exchange savings, assuming that the load will develop substantially as forecasted.

The alternatives for supplying power to East Pakistan are Karnafuli or thermal plants. The total investment in the Karnafuli project is about 2.6 times that which would be required in equivalent thermal capacity. The justification for making this substantially greater investment lies in the foreign exchange savings discussed above and in the prospects for obtaining power at a cost of 35 to 40% less than can be expected from thermal installations. This is a normal situation which arises in connection with the execution of large hydroelectric schemes and in general such schemes should be carried forward if sufficient funds are available without jeopardizing the position of projects having equal or higher priority.

Dhaka University Institutional Repository

Execution of the Karnafuli project would release about 16,000 kW of existing diesel capacity for service in other areas. This represents a saving equivalent to an investment of about $3 million in new capacity which would otherwise be required.

In order to realize these benefits, it is essential that a very large investment be made in industrial projects, housing and other items necessary to utilize the power to be produced by the project on a schedule which is in line with the forecasts of power consumption. This investment will probably amount to at least 10 times that required for the project and will include substantial foreign exchange expenditures. Before proceeding with the execution of the Karnafuli project, the availability of funds of this magnitude on the required schedule should be carefully studied.

The justification of the Karnafuli project is based largely on a future reduction in fuel imports. If domestic fuel supplies become adequate to meet requirements, this justification would no longer exist.

VII. CONCLUSIONS

Based upon the investigations completed by the International Engineering Company, this project appears to be feasible from an engineering standpoint. Foundation conditions are bad, but the site can be utilized if suitable designs and construction methods are adopted.

The Karnafuli project presents difficult engineering problems and will require the services of engineers and contractors qualified by experience under similar conditions for proper execution of the job. Outside assistance in the form of both an engineering firm for handling the design and supervision of the project and an experienced prime contractor must be provided.

The success of the project will depend to a large extent upon the rate of development of the power market. The estimated development will require heavy investment in new industrial undertakings in the area to be served. The availability of the necessary funds should be carefully studied before proceeding with the execution of the project.

The proposed 30,000 kW steam station at Dacca should be abandoned if Karnafuli is to be executed.

ANNEX I

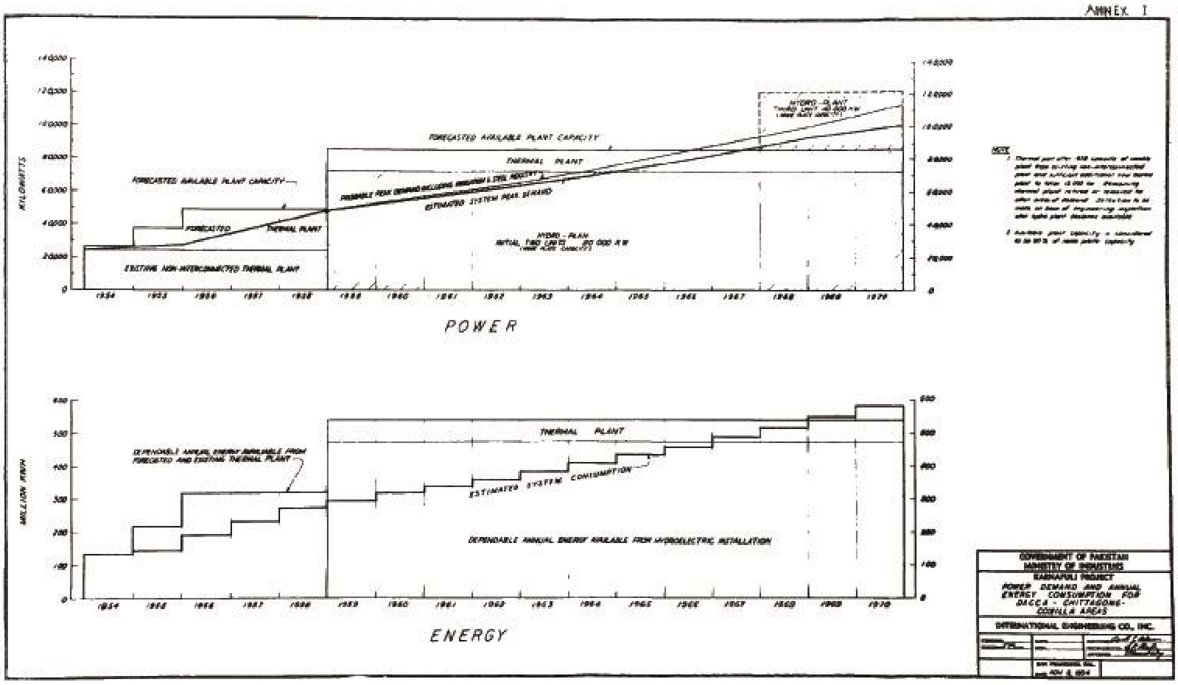
KILOWATTS
FORECASTED AVAILABLE PLANT CAPACITY
THERMAL PLANT
ESTIMATED SYSTEM PEAK DEMAND
FORECASTED
EXISTING NON-INTERCONNECTED THERMAL PLANT
POWER
MILLION KWH
THERMAL PLANT
ESTIMATED SYSTEM CONSUMPTION
DEPENDABLE ANNUAL ENERGY AVAILABLE FROM HYDROELECTRIC INSTALLATION
ENERGY
GOVERNMENT OF PAKISTAN
MINISTRY OF INDUSTRIES
KARNAFULI PROJECT
POWER DEMAND AND ANNUAL ENERGY CONSUMPTION FOR DACCA - CHITTAGONG - COMILLA AREAS
INTERNATIONAL ENGINEERING CO., INC.

Dhaka University Institutional Repository

FORECAST OF DEMAND FOR ELECTRIC ENERGY
DACCA, CHITTAGONG AND COMILLA AREA

ANNEX II

	1955		1958		1960		1962		1964		1966		1968		1970	
INDUSTRY	kw	Millions	kw	kwh Millions	kw	kwh Millions	kw	kwh Millions	kw	kwh Millions	kw	kwh Millions	kw	kwh Millions	kw	kwh Millions
Jute Processing	13,436	59.35	36,423	161.03	42,851	189.42)	62,360	268.59	70,070	301.79	78,110	336.36	87,160	375.19	97,320	418.83
Cotton Textile	7,314	28.71	11,347	44.55	12,648	49.62)										
Utility System	9,691	29.71	11,304	34.65	13,185	40.42)	29,120	89.23	33,960	104.07	39,610	121.38	46,200	141.58	53,880	165.15
Other Industry	8,653	26.52	10,093	30.94	11,773	36.09)										
Total Connected Load	39,094		69,167		80,457		91,480		104,030		117,720		133,360		151,200	
Total Energy Required		144.29		271.17		315.55		357.82		405.86		457.74		516.77		583.98
Diversified Demand DF - 0.70	27,400		48,400		56,300		64,000		72,800		82,400		93,400		106,000	
POSSIBLE ADDITIONAL DEMAND																
Steel Processing					1,000	4.38	1,000	4.38	3,000	13.14	5,000	21.90	5,000	21.90	5,000	21.90
Irrigation and Drainage Pumping					1,000	2.63	1,500	3.94	2,500	6.57	3,700	9.74	4,500	11.82	5,000	13.14
Additional Connected Load					2,000		2,500		5,500		8,700		9,500		10,000	
Total Connected Load					82,457		93,980		109,530		126,420		142,860		161,200	
Total Energy Required						322.56		366.14		425.57		489.38		550.49		619.02
Diversified Demand DF = 0.70					57,700		65,800		76,700		88,500		100,000		113,000	

পরিশিষ্ট ৪

বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবির আবেদনপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভাবী শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনতান্ত্রিক অধিকার যাতে গৃহীত হয়, তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ ইংরেজি তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এই স্মারকলিপিখানি মনেপ্রাণে সমর্থন করি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে "নবজীবনের প্রতীক্ষায়" রয়েছি। স্মারকলিপি নিম্নলিখিত "চারটি বিষয়" উত্থাপন করা হয়েছে–

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।
২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য "১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির" ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।
৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধানব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

স্মারকলিপিতে বর্ণিত "চারটি বিষয়" যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি, তজ্জন্য আমরা আমাদের সমর্থ অনুযায়ী আমাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। এককথায় বলতে গেলে "চারটি বিষয়" হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চাবিকাঠি। নিজস্ব আইন পরিষদসহ একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিণত করার জন্য আমরা আমাদের দাবি উত্থাপন করছি। বছরকে বছর ধরে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ আমলের দিন থেকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ধ্বংসের দিন পর্যন্ত আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা খুবই দুর্বিষহ জীবনযাপন করছি, যার ফলে আমাদের মেরুদ- ভেঙ্গে গেছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল (Excluded Area)। কিন্তু ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশে "উপজাতীয় জনগণের আবাসভূমি" হিসেবে স্বীকৃতি হয়েছিল তথাপি বাস্তবে ইহা মিথ্যা এবং প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলরূপে রাখার জন্য শাসনের সুবিধার্থে আইন প্রয়োগের জন্য ১৯০০ সালে ব্রিটিশ সরকার "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি" ঘোষণা করেন। এই শাসনবিধি পুরোপুরি ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসনবিধি একটি অগণতান্ত্রিক শাসনবিধি। এই শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। বাংলাদেশের গভর্ণরের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে এই শাসনবিধি দ্বারা। গভর্ণর খুবই শক্তিশালী। তিনি যে কোন সময়ে যখন মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ও শান্তির পক্ষে ইহা প্রয়োজন, উপযোগী এবং উপযুক্ত, তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন প্রয়োগ করেন, নতুন রুলস ও রেগুলেশন বাতিল করেন। তিনি এতোই শক্তিশালী যে স্বেচ্ছামূলকভাবে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন। গভর্ণর হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন পরিষদ। গভর্ণর

আইন প্রণয়ন করেন এবং তার জেলা প্রশাসন ইহা কার্যকরী করেন। ফলে পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সর্বক্ষেত্রে আগের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পিছিয়ে পড়ে থাকলো। ব্রিটিশ সরকার আমাদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগা জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। জনগণের কণ্ঠ স্তব্দ করে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটি অদ্ভুত অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তন করে। জনগণ গভর্ণর ও তার প্রশাসনের দয়ার উপর নির্ভর করে বাস করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত করে ব্রিটিশ সরকার বাইরের মানুষকে প্রশাসন বিভাগে নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে কালক্রমে বহিরাগতদের প্রভাব জেলা প্রশাসনে প্রাধান্য লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ বাজার, নদী-বন্দর প্রভৃতি সমস্ত ব্যবসায়ী কেন্দ্রসমূহ বহিরাগতদের হাতে চলে যায়। এইরূপে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জেলা প্রশাসসন হতে চ্যুত হয় এবং দূরে সরে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় পাকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগা জনগণকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। বরঞ্চ পক্ষান্তরে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে লুপ্ত করে দিবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। অন্যায় অবিচার সমগ্র জেলায় চরম নৈরাশ্য ও ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯ হাজার ৯ শত ৭৭জন মানুষ ১৯৬০ সালে গৃহহারা, জমিহারা হয়ে যায়। সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেন নি। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই না করে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে মুছিয়ে দেবার জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের অগনতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রতিবাদ করতে পারে নি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে জন্মভূমি চিরতরে ত্যাগ করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ১৯৬৪ সালে ভারতে আশ্রয় পাওয়ার আশায় সীমান্ত পাড়ি দেয়।

বেআইনী অনুপ্রবেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ৯৪.৪৭%, অমুসলমান ২.৫৯% এবং মুসলমান ২.৯৪%। মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার কিছু অংশ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে অদিম বসিন্দা আর বাদ বাকি অংশ ছিল বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু গত চব্বিশ বছরে বহিরাগতের সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বার বার পাকিস্তান সরকারকে এই বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। বহিরাগতের দ্বারা বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখল তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। "'১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি" অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন রকমের বন্দোবস্তী বহিরাগতদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গভর্ণর এবং তার জেলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন এই শাসনবিধিকে কার্যকর করে নি। পক্ষান্তরে গভর্ণর এবং তার জেলা প্রশাসন বহিরাগতদেরকে বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখলের পর নীরবে খুলে দেয়। "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি" বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারে নি, পারে নি বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও বেআইনী জমি বেদখল বন্ধ করে দিতে। এই শাসনবিধি অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা জনগণের যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে পড়ে থাকার অবস্থার কোন পরিবর্তন এনে দিতে পারে নি। কালক্রমে এই পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের নিকট অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

জনগণের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা যথেষ্ট নয়। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারে নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা যাবে না। এই জন্য আমরা চারটি বিষয় উত্থাপন করি নিজস্ব আইন সম্বলিত একটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেছি। সুতরাং–

ক) আমার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই।

খ) আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে এই রকম শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।

গ) আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই।

ঘ) আমাদের জমিস্বত্ব-জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমি স্বত্ব সংরক্ষিত হয় এমন শাসনব্যবস্থা আমার পেতে চাই।

ঙ) বাংলাদেশ অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন চাই।

আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।

ভারত তার বিভিন্ন জাতিসমূহ সমস্যাসমূহ সমাধান করেছে। ভারতের জাতিসমূহ বড় বা ছোট সকলে শাসনতান্ত্রিক অধিকার পাচ্ছে। ভারতের জাতিসমূহ ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য পর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জাতিসমূহের সমস্যা সমাধান করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল জাতিরসমূহকে শাসনতান্ত্রিক মর্যদা দিয়েছে এবং গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইউনিয়ন রিপাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, স্বায়িত্তশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় অঞ্চলে বিভক্ত করে জাতি সমূহের সমস্যার সমাধান করেছে।

পাকিস্তান সরকার আমাদিগকে নির্মমভাবে নিপীড়ন করে। গত চব্বিশ বছর আমরা সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা আগের মতো পিছিয়ে রয়েছি। এখনও আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অর্ধনগ্ন পরিবেশে বাস করছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ আদিম যুগের পরিবেশে বাস করছে।

এখন নিপীড়নকারী স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের দিন আর নেই। আমরা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সর্ব রকমের সর্বরকমের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছি। আমাদের বাংলাদেশ এখন মুক্ত। উপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ চারটি মূলনীতি-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়বাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে উজ্জ্বল ভবিষ্য নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ যুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষনের অধিকার দেবেন।

তারিখ: রাঙ্গামাটি

২৪ এপ্রিল ১৯৭২ সন

জয় বাংলা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
গণ পরিষদ সদস্য
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ এবং
আহবায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৫

বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক ঃ সংবিধান বিলের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য- ১৯৭২

খণ্ড ২ সংখ্যা ৯

বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক

বুধবার, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭২

বিষয় : সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা

(খসড়া সংবিধানের উপর সামগ্রিক আলোচনা)

....

শ্রী লারমা : জনাব স্পিকার সাহেব, আমি বলবার জন্য সবার আগে দাঁড়িয়েছিলাম। মাত্র এক মিনিট সময় চেয়েছিলাম একটি কথা বলার জন্য।

এই পরিষদে প্রারম্ভেই মাননীয় বন্ধু আসাদুজ্জামান সাহেব সংবিধান সম্বন্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোচনা করে যেভাবে এই বিলকে সার্থক করে তুলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

সেইভাবে এই আলোচনায় যাতে বাইরের জনসাধারণের মধ্যে পুরোপুরি পক্ষে-বিপক্ষে মত সৃষ্টি হতে পারে, সেই জন্য আমি আশা করি, অর্থপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে আমার বন্ধুরা আলোচনা করবেন, যেন এই পরিষদে বিল আলোচনার উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

...(বাধা প্রদান ও বলবার জন্য একসঙ্গে কয়েকজন সদস্য দণ্ডায়মান)...

জনাব ডেপুটি স্পিকার : ... এখন মানবেন্দ্র নাথ লারমা বলবেন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আপনি আমাকে যে নাম ধরে বার বার ডাকছেন, আমার নাম তা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদের দেশের জন্য যে সংবিধান আমরা রচনা করতে যাচ্ছি, আপনার মাধ্যমে আজকে এই মহান গণ-পরিষদে দাঁড়িয়ে সেই সংবিধানের উপর আমি কিছু আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে। আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যারা কারাগারে তিল তিল করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যারা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসককে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসিমুখে হাতকড়া পরেছিলেন, হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠ বরণ করেছিলেন, তাদেরকে।

১৯৪৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এইদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্য যে কৃত্রিম স্বাধীনতা হয়েছিল, সেই কৃত্রিম স্বাধীনতার পর থেকে যেসব বীর, যেসব দেশপ্রেমিক নিজের জীবন তিলে তিলে চার দেওয়ালের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীকার আদায়ের জন্য, যারা নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে স্বাধীকার আদায়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের কথা আজকে আমি স্মরণ করছি, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজকে এখানে যারা সমবেত হয়েছেন, যে মাননীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ রয়েছেন, তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

তারপর, আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গত এপ্রিল মাসে যে খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির সদস্য বন্ধুদের।

সর্বশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জননেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

আজকে আমার এই গণ-পরিষদ ভবনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছি। এই ইতিহাসের পেছনে রয়েছে কত করুণ কাহিনী, কত মানুষের অঝোর ধারায় কান্নার কাহিনী, বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ। তাই আজকে আমরা সে সব মানুষের কথা স্মরণ করে যদি বিবেকের প্রতি এতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যাই, তাহলে এই কথাই আমরা বলবো, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যে পবিত্র শপথ আমরা নিয়েছি, সেই পবিত্র শপথ নিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য যে পবিত্র দলিল আমরা দিতে যাচ্ছি, সেই পবিত্র দলিলে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কিনা, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা অর্থাৎ তাঁরা যে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চায়, সে কথা এই সংবিধানে ব্যক্ত হয়েছে কিনা।

তাই মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে যে কথা তুলতে যাচ্ছি, তাতে যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে, তাহলে আমি তা শুধরে নিতে চাই কিন্তু আমি মনে করি, আমি আমার বিবেক থেকেই এসব কথা বলছি। আমি কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কিছুই বলতে যাচ্ছি না। যেহেতু আমি একজন নির্দলীয় সদস্য, যেহেতু আমি এই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষেরই একজন হয়ে আজকে গণ-পরিষদ ভবনে আমার মতামত প্রকাশ করতে যাচ্ছি, সাড়ে সাত কোটি মানুষের নিকট প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তাই সংবিধানের উপর আমার কোন চুলচেরা ব্যাখ্যা নেই। আমার যে ব্যাখ্যা, আমার যে মত, আমার যে বক্তব্য, তার সবই দেশের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যেভাবে আমার দেশকে ভালোবেসেছি, আমার জন্মভূমিকে ভালোবেসেছি, যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আমার দেশকে, আমার জন্মভূমিকে, এদেশের কোটি কোটি মানুষকে দেখেছি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি খসড়া সংবিধানকে দেখতে যাচ্ছি।

তাই আমি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য বন্ধুদের বলছি যে, খসড়া সংবিধান তারা গত জুন মাসে দিতে পারেননি যদিও গত জুন মাসের ১০ তারিখে দেওয়ার কথা ছিল। আজকে এই অক্টোবর মাসে আমাদের এই খসড়া সংবিধান তারা দিয়েছেন। এই খসড়া সংবিধান আমরা জুন মাসে পাইনি, সেজন্য দুঃখিত নই। অক্টোবর আর জুন মাসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েকটি মাসের। সেজন্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এখানে আমার আপত্তি হচ্ছে এই যে, যে কমিটিকে আমরা এ দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ভার দিয়েছিলাম, সেই কমিটি-প্রদত্ত সংবিধান আজকে আমাদের হুবহু গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এই পরিষদের সামনে আমার বক্তব্য হল, আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।

আজকে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আপনারা বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের কথা সমাজতন্ত্রের নামে, গণতন্ত্রের নামে বলে চলেছেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সংসদীয় অভিজ্ঞতা আমার সে রকম নাই। তবু আমার বিবেক বলছে, এই সংবিধানের কোথায় যেন গলদ রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আজকে যারা কল-কারখানার চাকা, রেলের চাকা ঘুরাচ্ছেন, যাঁদের রক্ত চুইয়ে আজকে আমাদের কাপড়, কাগজ, প্রতিটি জিনিস তৈরি হচ্ছে, সেই লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের মনের কথা এখানে নাই।

তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।

....

শ্রী লারমা : জনাব স্পিকার সাহেব, আমি মাননীয় সদস্যার যুক্তি খণ্ডন করতে চাই না। তবে আমি যা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এই যে, আজ পল্লীর আনাচে-কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা-বোনকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। এই সংবিধানে সেই মা-বোনদের জীবনের কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি। যদি এটা আদর্শ সংবিধান হতো, যদি এটা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হতো, তাহলে আজকে যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে নিজেদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে, তাদের কথা লেখা হত, তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্ত করে আনার কথা থাকত। কিন্তু তাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের কথা, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা এই সংবিধানে নাই।

এই সংবিধানে মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করে আমি বলব যে, ইতিহাস কাউকে কোন দিন ক্ষমা করেনি, করবেও না। ...ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর।

আমরা দেখেছি ১৯৫৬ সালের সংবিধান, যে সংবিধানকে আইয়ুব খানের মতো একজন সৈনিক লাথি মেরে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাকিস্তানের বুকে স্বৈরাচারী সরকার গঠন করেছিল। তারপর ১৯৬২ সালে তার মনের মত একটি সংবিধান রচনা করে সেটাকে দেশের বুকে চাপিয়ে দিয়ে ভেবেছিল যে, তার এই সংবিধান এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে। কিন্তু এদেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেনি।

এই সংবিধানও যদি সে ধরনের হয়ে যায়, তাহলে ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে? তাই ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মত, ১৯৬২ সালের সংবিধানের মত এই সংবিধানকেও কি আমরা হতে দেব? আমার বিবেক বলছে, আমরা এমন সংবিধান চাই না। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সেরকম সংবিধানই আমরা চাই। আমার যা মনে কথা, তা আমি ব্যক্ত করলাম।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমার একটু পানি লাগবে। .... (হাস্য)

জনাব ডেপুটি স্পিকার : আপনি আপনার বক্তব্য বলতে থাকুন, আপনি পানি পাবেন।

....

শ্রী লারমা : (জল পানের পর) মাননীয় স্পিকার সাহেব, আজকে যে পবিত্র দলিল আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, সেটা যেন ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের দলিলের মত না হয় এবং সেদিনের মত করুণ অবস্থা যেন আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না হয়।

....

জনাব ডেপুটি স্পিকার : .... দয়া করে সকলে বসে পড়ুন। কেবল লারমা কথা বলবেন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আমরা যদি সেই সন্দেহের অবসান না করি। পরিষদে আমরা যদি তার নিরসন না করি, তাহলে আর কে করবে? আমাদের পর যারা আসবেন, তাদেরও সেই একই

Dhaka University Institutional Repository

করুণ অবস্থা হবে—যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক, আমরা তা চাই না। একটা দেশের করুণ কাহিনী, একটা দেশের অত্যাচারের ইতিহাসের .....

....

জনাব ডেপুটি স্পিকার : আপনি নিজেকে সংশোধন করে কথা বলুন। নতুন দেশের কথা বলুন। বর্তমান যুগের কথা বলুন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমরা অতীতকে ভুলতে পারি না। অতীত যত তিক্তই হোক—তাকে টেনে আনতেই হবে। অতীতকে যদি আমরা টেনে না আনি, তার থেকে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ না করি সেই অতীতের গ্লানিকে যদি আমরা মুছে ফেলার চেষ্টা না করি, তাহলে কেমন করে আমরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব, কেমন করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব, ভুলের মাশুল আমরা অনেক দিয়েছি, আর দিতে চাই না। আবার কেন ভুল হবে? ভুলের মাশুল আবার কেন দিতে হবে? অতীতের নেতৃবৃন্দ যেসব ভুল করেছেন, সেই ভুল আমরা যেন পুনর্বার না করি।

আমি বলছি না যে, অতীতকে আমি ধরে থাকব। অতীতের কথা আমি বলছি, তার অর্থ এই নয় যে, অতীতকে আমি ধরে থাকতে চাই। বরং ভবিষ্যতকে কলুষমুক্ত করার জন্যই আমি অতীতের কথা স্মরণ করছি। অন্যথায়, অতীতের কথা বলবার আমার অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই।

সংবিধানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনের কথা যদি সত্যিকারভাবে লিপিবদ্ধ হত, তাহলে আজকে নির্দলীয় সদস্য হিসেবে আমি এই সংবিধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পারতাম। অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে না পারার অনেক কারণের মধ্যে এক কারণ হল : এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

মাননীয় স্পিকার, এই দলিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এক হাতে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্য হাতে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"১০। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" এবং

Dhaka University Institutional Repository

"২০। কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"

মাননীয় স্পিকার, আজকে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন-যন্ত্র ও উৎপাদন-ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতা বলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।

........(বাধা প্রদান)........

মাননীয় স্পিকার, তাই এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।

তারা যদি আজ জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করতে যাচ্ছ—তোমরা তাতে আমাদের কথা কিছু লিখেছ?" এই প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দেব?

যে মেথররা দেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, আজ আমরা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তাদেরকে কি আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছি? তাদের অভিশপ্ত জীবনকে সুখী করে তোলার মতো কতটুকু আমরা দিয়েছি, এই সংবিধানে কি প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি? কিছুই না।

আমাকে আজ বলতে হচ্ছে, বাংলাদেশের যারা সত্যিকারের শোষিত, নিপীড়িত তাদের কথা এই সংবিধানে নাই। হ্যাঁ তাদের কথা এই সংবিধানে আছে, যারা শোষিত নয়, নির্যাতিত নয়, নিপীড়িত নয়।

........(বাধা প্রদান)........

মাননীয় স্পিকার, তাই আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না হয়, তাহলে আমরা দেশকে

Dhaka University Institutional Repository

কেমন করে গড়ে তুলব, দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যতে সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করব?

........(বাধা প্রদান)........

মাননীয় স্পিকার, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে বাধা দিচ্ছেন। যার ফলে আমি আমার ...

জনাব ডেপুটি স্পিকার : আপনাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই। ...আপনি মন খুলে বলে যান আপনার বক্তব্য।

শ্রী লারমা : এরপর, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই।

আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে বৃটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সব সময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা—পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার কাছে বিস্ময়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এই এলাকার সেই সব ইতিহাসের কথা, আইনের কথা এই সংবিধানে কোথাও কিছু নাই।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে একজন সরল মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমাদের এলাকাটা একটা উপজাতি এলাকা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষদের কথা আমি বলতে চাই।

এই উপজাতি মানুষদের কথা বৃটিশ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিল। পাকিস্তানের মতো স্বৈরাচারী গভর্নমেন্ট আমাদের অধিকার ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করে নিয়েছিল। জানি না, আজকে যেখানে গণতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সমাজতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সেখানে কেন আপনারা আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন?

পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাজতন্ত্র হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নেও উপজাতিদের অধিকার আছে। পৃথিবীর আর একটি

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত—আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র—আমরা সেখানে দেখি, তাদের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। জানি না, আমরা কি অপরাধ করেছি?

আমি যতদুর বুঝতে পারি, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি, আমি একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই জাতির প্রতিনিধি আমি। আমার বুকের ভিতর কি জ্বালা, তা আমি বুঝাতে পারব না। সেই জ্বালা আর কারোর ভিতর নাই। সেই জ্বালার কথা কেউই চিন্তা করেননি।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, ১৯৪৭ সালে কেউ কি চিন্তা করেছিলেন যে, পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে? জনাব মো. আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, "Pakistan has come to stay"। নিয়তি অদৃষ্ট থেকে সেদিন নিশ্চয় উপহাস করে হেসেছিলেন। সেই পাকিস্তান অধিকারহারা বঞ্চিত মানুষের বুকের জ্বালায়, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

জনাব নূরুল হক : মাননীয় সদস্য বলেছেন, সংবিধানে উপজাতিদের অধিকারের কোন কথা নাই। আপনার মাধ্যমে তার দৃষ্টি আর্কষণ করে বলতে চাই, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জাতির, কৃষক শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তি দানের কথা আছে। মাননীয় সদস্য ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রী লারমা : আমরা করুণার পাত্র হিসেবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসেবে। তাই মানুষ হিসেবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।

মিসেস সাজেদা চৌধুরী : বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পিকার সাহেব, শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতে চেয়েছেন যে, এই সংবিধানে তাদের উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমি বলব, তারাও আজকে স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সঙ্গে তাদেরও একটা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?

শ্রী লারমা : আমি আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমি একজন নির্যাতিত অধিকার হারা মানুষ। পাকিস্তানের সময় দীর্ঘ ২৪ বৎসর পর্যন্ত একটি কথাও আমরা বলতে পারিনি। আমাদের অধিকারকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই অধিকার আমরা পেতে চাই এবং এই চাওয়া অন্যায় নয়। সেই অধিকার এই সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মত যাতে

Dhaka University Institutional Repository

সেই অধিকার আমরাও পেতে পারি, সেই কথাই আজকে আপনার মাধ্যমে পরিষদের নিকট নিবেদন করতে চাচ্ছি। সেই অধিকারের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়নি—যেমন দেওয়া হয়নি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষকে।

তাই আমি আমার কথা যদি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য-সদস্যাদের, ভাই-বোনদের কাছে পৌছিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমি মনে করব, আমার অভিব্যক্তি সার্থক হয়েছে। কারণ আমার যে দাবি, সেই দাবি আজকের নয়। এই দাবি করেছি স্বৈরাচারী আইয়ুব ও স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার সময়ও।

আমরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে রয়েছি। অগ্রসর জাতির মত শক্তিশালী দল গঠন করে দাবি আদায় করতে পারছি না। কারণ এতে যতটা রাজনৈতিক সচেতনতার দরকার, ততটা রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে উপজাতিদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আজকে তাই কথা প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বদৌলতে আজকে এই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে জল বিদ্যুতের বদৌলতে কল-কারখানা চলছে।

অথচ সেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে যারা দেশকে গড়েছে, পাকিস্তানের শাসকরা তাদেরকে মানুষের মত বাঁচার অধিকার দেয়নি।

আমার বক্তব্য হল, আজকে আমরা এই সংবিধানে কিছুই পাইনি। আমি আমার বক্তব্য হয়তো সঠিকভাবে বলতে পারছি না; কিন্তু আমার বক্তব্যের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই নাই।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আমাদের জাতির পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে যুক্ত স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এই স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেছিলাম, আমাদের উপজাতিদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছিলাম। জানি না, ...

.......(বাধা প্রদান).......

জনৈক সদস্য : মি. লারমা একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত এলাকার দাবি জানাচ্ছেন। এইভাবে একদিক দিয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী লারমা : এই সংবিধানে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা বঞ্চিত মানব। আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই সংবিধানের বাইরে কোন কথা আমি বলতে চাচ্ছি না। আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা সংবিধানে বলা হয়নি।

এই জন্য এই কথা বলছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা ইতিহাস। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি জানি না, আমাদের কথা তারা কেমন করে ভুলে গেলেন? আমরাও যে বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত হয়ে গণ বাংলার সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই, সে কথা তারা কি ভুলে গেছেন?

আমাদের এই সংবিধানের খসড়া তৈরি করার সময় তাঁরা অন্যান্য দেশের সংবিধান দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস। তাঁরা দেখেছেন বাংলাদেশের এক কোণায় রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কিসের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি?

আমরা জানি, ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না। কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? কেন আমরা অভিশপ্ত জীবন-যাপন করবো? পাকিস্তানের সময়ে ছিল আমাদের অভিশপ্ত জীবন। আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র হতে চলেছে। আমাদের অধিকার তুলে ধরতে হবে এই সংবিধানে। কিন্তু তুলে ধরা হয়নি। যদি আমাদের কথা ভুলে যেতে চান, যদি ইতিহাসের কথা ভুলে যেতে চান, তাহলে তা আপনারা পারেন। কিন্তু আমি পারি না।

উপজাতিরা কি চায়? তারা চায় স্বাধীন গণপরিষদের অধিবেশনে তাদের সত্যিকারের অধিকারের নিশ্চয়তা।

.......(বাধা প্রদান).......

....

শ্রী লারমা : মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। সেই বঞ্চিত মানুষের একজন হয়ে আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নির্যাতিত সেই বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে, সেই পাকিস্তান আমলের যে নির্যাতন ভোগ করেছি, সেই নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে চাই। আমরা চাই মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে।

এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। তাই আজকে আমি বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে কি অপরাধ করেছে, তা আমি জানি না।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।

জনাব এনায়েত হোসেন খান এডভোকেট (বাখেরগঞ্জ-৯) : ...এটা একটা আইন সভা নয়, এটা একটা গণপরিষদ, সুতরাং এখানে কোন এলাকা ভিত্তিক আলোচনা চলতে পারে কিনা। এ সম্বন্ধে আপনার কাছে রুলিং চাই এবং এ সম্পর্কেও রুলিং চাই যে, আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের সদস্য আপনার মাধ্যমে যে বলেছেন, আজকে এই খসড়া শাসনতন্ত্রে একটা এলাকার ইতিহাস সংযোজিত হয় নাই। ঠিক অনুরূপ তাকে বলা যায় যে, অন্যান্য এলাকা কথা তাতে সংযোজিত হয়েছে কি?

....

জনাব ডেপুটি স্পিকার : আপনি দু'এক মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমার বক্তব্য দু'এক মিনিটের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। আপনি অনুমতি দিলে আমি বলতে পারব এবং আপনি অনুমতি না দিলে আমি বলতে পারব না।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি বলতে চাই যে, মানুষের কথা এই সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। যদি মানুষের কথা এই সংবিধানে না থাকে, তাহলে এই সংবিধান দিয়ে কি হবে?

জনাব ডেপুটি স্পিকার : আপনার বক্তৃতার প্রায় কথাই পুনরুক্তি।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমার বক্তৃতার কথাগুলি যদি পুনরুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমার দোষ নয়। আমার কথার মাঝখানে অন্য কেউ বক্তৃতা দিতে শুরু করলে আমার বক্তৃতার খেই হারিয়ে যায়। মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি যে কথা একবার শেষ করতে চাচ্ছি, সেই কথা বলার মাঝখানে যদি বাধা পড়ে, তাহলে নিশ্চয় পুনরুক্তি হবে।

আমার কথা হল, বঞ্চিত মানুষের কথা থাকতে হবে, এবং সেই বঞ্চিত মানুষের মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে কেন এই সংবিধানে সংযোজিত করা হল না? যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে এই সংবিধান তাদের কি কাজে লাগবে। আমি একজন মানুষ যেখানে

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগ্রহণ করেছি, যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত পালিত হয়েছি, সেই জন্মভূমির জন্য আমার যে কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না পারি, যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে পাই না, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে।

তাই আমার কথা শেষ করার আগে আমার কথাগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই। এই সংবিধানে মানুষের মনের কথা লেখা হয়নি। কৃষক, শ্রমিক, মেথর, কামার, কুমার, মাঝি-মাল্লার জন্য কোন অধিকার রাখা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের অধিকারের কথাও সংবিধানে লেখা হয়নি।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আপনার মাধ্যমে পরিষদের ভাই-বোনদের কাছে একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খণ্ড ২ সংখ্যা ১৩

বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক
মঙ্গলবার, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭২

বিষয় : সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ)

(৬ অনুচ্ছেদ : নাগরিকত্বের উপর সংশোধনী প্রস্তাব)

....

জনাব আঃ রাজ্জাক ভূঁইয়া : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :

"৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

....

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেন।

মাননীয় স্পিকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল, সংবিধান বিলে আছে, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।" এর সঙ্গে সুস্পষ্ট করে বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙালি বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য- ১৯৭৪

খণ্ড ২ সংখ্যা ২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক
শুক্রবার, ৫ জুলাই, ১৯৭৪

বিষয়: বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি আলোচনায় যোগ দিতে চাই।

জনাব স্পিকার : পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করুন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার, স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট সম্বন্ধে আমার যে মতামত তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে যাব। এই বাজেট আমাদের দেশে উন্নয়ন কাজে কতটুকু সার্থকতা বহন করে এনেছে, তাই আজ বিবেচনার বিষয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট দেশের মঙ্গলের জন্য সংসদে উপস্থাপন করেছেন, সে বাজেটের প্রতি কটাক্ষ করে বলব না। শুধু একটা কথা তাঁর কাছে তথা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করতে চাই যে, শত শত কোটি টাকা সম্বলিত যে বাজেট জনগণ বহন করবে, সে বাজেট সত্যিকারভাবে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কতটুকু উপকার করবে, তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে সংসদে উপস্থাপন করা হল কেন?

মাননীয় স্পিকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালে বাজেট মঞ্জুরী ও ব্যয় নির্দিষ্টকরণের সর্বমোট দাবি এনেছেন ১৬০১.২৪ কোটি টাকার। এই টাকা বহন করবে সত্য। কিন্তু এর প্রতিদানে জনগণ কি পাচ্ছে? দেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ জনসাধারণ আজ যে দ্রব্য মূল্যের চাপে পড়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করে চলেছে, তার উপর আবার জনগণের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা কেন চাপান হয়েছে, সেটা আমাদের বোধগম্য হয় না। প্রতি বৎসর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে বাজেট নিয়ে আসতে হয় এবং কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়ভাব বহন করতে হয় জনগণকে। এই ব্যয়ভার বহন করেও জনগণের শুধু একটিই দাবি যে দাবি হল খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার দাবি, সে দাবি পূরণ করবে সরকার। সরকার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। কত সরকার আসে যায়। যে সরকার আসে, তাকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখতে হবে কি করে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা যায়, সেটা দেখাশুনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের।

মাননীয় স্পিকার, স্যার, বাজেট আয় আর ব্যয়ের হিসাব মাত্র। এই আয় কাদের জন্য হচ্ছে, আর ব্যয় কাদের জন্য হচ্ছে, তা যদি আমরা বিচার করে দেখি, তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে পাই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য 'স্টেট মিশিনারি'র খরচ বহন করতেই বাজেটের 'লায়ন শেয়ার' চলে যাচ্ছে। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা নিয়োজিত তাদের মনেও সুখ নাই, আর সাধারণ মানুষ যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় ভার বহন করে যাচ্ছে, তাদের মনেও সুখ নাই। এটা আজ গোপন কথা নয়। এই অবস্থা পর্যালোচনা করে, পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নিয়োজিত যারা, তাদের মনেও যাতে অশান্তি না থাকে, আর দেশের জনগণের মনেও যাতে অশান্তি না থাকে, তা দেখার ভার সম্পূর্ণভাবে সরকারের। সুতরাং আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার তার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এই আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়েছে, তবু আমি জানি না কেন এই সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। আমি কারো প্রতি কতাক্ষ করছি না। আজ আমরা সবাই ভুক্তভোগী। সেই দুঃখ, সেই যন্ত্রণা আজ প্রত্যেককে বিদ্ধ করছে। তাই আজ আমি এইসব কথা উল্লেখ করে বাজেটকে খাট করতে চাই না।

কিন্তু এই বাজেটকে এখানে আমি একটু স্বতন্ত্রভাবে দেখতে চাই। এই বাজেটে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য টাকার প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা কেন করা হয়? রাষ্ট্রে কে থাকে? রাষ্ট্রের মধ্যে যারা থাকে তারা মানুষ। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র গঠিত হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের জন্যই রাষ্ট্র গঠন হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষের অর্থেই রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র চলে। এই যন্ত্র যাতে বিকল না হয়, তার দায়িত্ব সরকারেরই। সরকার যদি পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে দোষ তাদেরই। একটা রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে থেকে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতা করেছেন; তিনি বাজেটের উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। তিনি শত শত কোটি টাকার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। কিন্তু সত্যিই কাদের প্রয়োজনে, কার উদ্দেশ্যে একথা বলেছেন আমি তা জানি না।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার শেষ দিকে সুকৌশলে সরকারের ত্যাগের দ্বারা উন্নয়নের কার্যক্রম সংসদে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কোন কিছু বাস্তবায়ন কব্বার ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। যদি বিভিন্ন রকম অভাব থেকেই যায়, তবে প্রশ্ন দেখা দিবে যাদের হতে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, তারা সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাদের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজ দেশের যে অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, সেই ভিত্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর। উৎপাদন যন্ত্রে সমস্ত উৎপাদন যদি বাস্তবায়িত না হয়, নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে যদি নিচে নেমে যায় তবে সেটা ঠিক হবে না। কতিপয় বিষয়ে অর্থমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শ্রমিক ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপক উভয় পক্ষকেই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং পূর্বোক্ত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।" আজ নির্দিষ্ট মালিকানা, সম্পদের মালিকানার ভিত্তি কি হবে আমাদের সংবিধানে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হবে :

.....(এই পর্যায়ে জনাব স্পিকার লালবাতি জ্বালান).....

মাননীয় স্পিকার, আমার বক্তব্য শেষ হয়নি। আমাকে আরো সময় দিতে হবে।

জনাব স্পিকার : আপনার নেক্সট পয়েন্ট বলুন। আপনি আর দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার, আমি যেকথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হল, দেশের সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট নির্দেশনামা সমন্বয় করে দিতে হবে। তা যদি না করা হয়, তবে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, দুরবস্থার সৃষ্টি হবে।

মাননীয় স্পিকার, সংবিধানের নির্দেশনামা সরকার যদি ঠিকভাবে কার্যকর করতেন, তা হলে সরকারি নির্দেশনামা ও সংবিধানের নির্দেশনামার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকত। বারবার যে ব্যবধান এবং অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হচ্ছে তা হতো না। আজকে শাসনতন্ত্রের ভিতরে সংবিধানের ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। সংবিধানে ১০নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে :

"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

সরকার এটাকে বাস্তবায়িত করবেন, এটা তাঁদের দায়িত্ব। কিন্তু সরকার যদি এটাকে বাস্তবায়িত না করেন, তাহলে সংবিধানে কোন মূল্য থাকে না। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা শাসনতন্ত্রের ১০নং বিধিতে বলিষ্ঠভাবে বলা থাকা সত্ত্বেও আজকে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় যাই না কেন, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে বুঝতে পারি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশ সংবিধানে নিহিত করা হয়েছে, সেটাকে ভুলে যাওয়া হয়েছে। যেখানেই যাই দেখতে পাই হাজার হাজার ভিখারী, হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। এটাই বাস্তব কথা। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি বলে সংবিধানের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

করতে হলে আজকে সরকারকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সম্পদ বন্টনের সুষম নীতি নির্ধারণ করে দিতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, ১৯৭২-৭৩ সাল চলে গেল, ১৯৭৪ সালেরও অর্ধেক চলে গেছে। কিন্তু যেভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত ছিল, সেভাবে করা হয় নাই। দেখা যাচ্ছে, ১, ২, ৩, ৪, ৫ বছরেও হবে না। কার্যক্রম গ্রহণ করার সে মানসিকতা কোথায়? যদি সে মানসিকতা থাকত, তাহলে ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে যেত।

বাংলাদেশের ৮৫% লোক কৃষক। আজকে যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে ফসল ফলাচ্ছে, তাদের ভাগ্য আগে যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থায় রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। কৃষকরা ভাঙ্গা ঘরে বাস করে। বর্ষা এসে গেলে বৃষ্টির পানিতে তাদের বিছানাপত্র ভিজে যায়। যে শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে কলের চাকা ঘোরাচ্ছে, তাদের অবস্থার কি করা হয়েছে? এই কৃষক আর শ্রমিক আমাদের দেশের মূল শ্রমশক্তি। খাদ্য উৎপাদন এবং কল-কারখানা থেকে আমাদের যেসব জিনিসপত্রের প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রয়োজন পূরণ করার ভার কৃষক আর শ্রমিকের উপর। কৃষক এবং শ্রমিকের মুক্তি আনতে হবে। মাননীয় স্পিকার, স্যার, সংবিধানে ১৪নং অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা।"

জনাব স্পিকার : আপনি সমাপ্ত করুন। যাঁরা বলবেন তাঁদের সবার প্রতি Justice করুন। Please conclude.

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমার বক্তৃতা বেশি লম্বা হবে না। আমার বিনীত নিবেদন আমাকে কিছু বেশি সময় দিন।

জনাব স্পিকার : সময় দিয়েছি, সমাপ্ত করুন।

শ্রী লারমা : কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার অসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ হবে না।

জনাব স্পিকার : কয় মিনিট সময় চান?

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার, স্যার, ৩০ মিনিট সময় যদি দেন ভালো হয়।

জনাব মো. আব্দুল্লাহ সরকার : জনাব স্পিকার, ৩০ মিনিট সময় দেওয়া বেশি কিছু নয়।

অধ্যক্ষ মো. হুমায়ুন খলিদ : জনাব স্পিকার সাহেব, লাল বাতির সিগন্যাল সামনে রেখে বক্তৃতায় অসুবিধা আছে। তিনি আর কতক্ষণ এই লাল সিগন্যাল-এর সম্মুখীন হয়ে বক্তৃতা করবেন?

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন : বিরোধী দলীয় সদস্য হিসেবে শ্রী লারমাকে আছরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত সময় দেওয়া যেতে পারে।

জনাব স্পিকার : Recess না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারেন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার, স্যার, আমি বলছিলাম সংবিধানের নির্দেশনামার সাথে সরকারের কার্যকলাপের কোন সম্পর্ক নাই।

আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের খাদ্য ঘাটতিই তার কারণ। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কেন হয়েছে, তা সরকার জানেন। কিন্তু যে কারণ নির্মূল করার চেষ্টা তাঁরা করেন না। মাননীয় স্পিকার, স্যার, কি কি কারণে দেশে বিভিন্ন সমস্যা উদ্ভব হয়েছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার ব্যাখ্যা দেননি, পরিষ্কার করে বলেননি। মাননীয় স্পিকার, স্যার, ১৯৭৩-৭৪ সালে এবং বর্তমান অর্থ বৎসরে দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার স্বীকৃতি রয়েছে। Planning Commission-এর The First Five Years Plan, (1973-74) এবং The Annual Plan, (1973-74) বই দুইটি থেকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি। The Annual Plan (1973-74) এর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

"No official index is, however, available which measures the overall rise in the price level."

এরপর আর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

"The two most important reason for low industrial output are:

(a) inadequacy of management; and

(b) inability to motivate labour for disciplined and efficient work. In a sense the two reasons are inter-mingled."

সুতরাং, মাননীয় স্পিকার সাহেব, আর একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি factor-এর মধ্যে একটা কথা বলা হয়েছে :

"Utilization of commercial licences has also been very unsatisfactory. The absence of established importers among Bangladesh citizen was a cause for this. Moreover, licences were issued at small amounts of taka 1,000-20,000 (later Taka 5,000-20,000) to a very large number of new importers with little experience. This has given rise to trading of licences, i. e. sale of licence at a premium by the small holders to bigger businessmen."

আবার The First Five Years Plan, (1973-74)-এ বলা হচ্ছে :

Dhaka University Institutional Repository

"The abnormal rise in prices is the most striking feature of the current economic situation in Bangladesh."

অথচ মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর দিন দিন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা সবাই জেনেছেন। কিন্তু এর মূলোৎপাটনের ব্যাপারে সরকার অগ্রসর হন নাই। সরকার স্বীকার করেছেন, কিন্তু স্বীকার করার পর এই অব্যবস্থার মূলোৎপাটনের জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। যদি তা করতেন, তাহলে সকালে একরকম, আর বিকালে আর একরকম হতো না। এর ফলে এক শ্রেণীর মানুষ প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে এবং টাকা পয়সা পাহাড় প্রমাণ পুঞ্জিভূত করে জমা করে রাখার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে।

জনাব স্পিকার : আপনি বলুন। You are allowed by the chair to speak.

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই অবস্থায় আমি বলতে পারি না। আমার নিজস্ব কিছু অসুবিধা আছে।

জনাব স্পিকার : আপনি বলুন।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পিকার সাহেব, সুতরাং সরকার জেনেশুনে এক শ্রেণীর মানুষকে ধনী করার পথ প্রশস্ত করেছেন। এটা সরকারের পক্ষে একটা অশুভ লক্ষণ। সরকার যদি আদর্শ মেনে চলতেন, তাহলে এটা করতেন না। সবকিছু জানা সত্ত্বেও trading of licences-এর ব্যাপারে সরকারের দুর্নীতিমুক্ত হওয়া উচিত ছিল। পরিষ্কারভাবে সরকারের উচিত ছিল এইসব দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা। দুর্নীতি সব কিছুর মধ্যে রয়েছে। দুর্নীতি দমন করার ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি সরকারকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকার বলব না। তবে দুর্নীতিপরায়ণ লোক সরকারকে ঘিরে রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে আরম্ভ করে সেক্রেটারিয়েট লেভেল পর্যন্ত খোঁজ করলে দেখা যাবে তার মধ্যে বহুলোক দুর্নীতির সাথে জড়িত। সাধারণভাবে যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত আছে, তাদেরকে ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথাঃ (১) ব্যবসায়ী, (২) এক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী এবং (৩) এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী।

সমাজের এই তিন শ্রেণীর মানুষকে শায়েস্তা করতে না পারলে বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে না। যদি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চান, তাহলে দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আজকে ডি.সি.-র অফিস বা জজ-এর অফিস, যেখানেই যান, ঘুষ ছাড়া কিছু দেখতে পাবেন না। এই ঘুষ বিভিন্ন আকারে চলছে। সরকার আইন করেছেন "ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া দুইটাই আইন বিরোধী"। কিন্তু এই প্রকার আইনের কোন মূল্য নাই। সুতরাং আজকে এই অবস্থা যদি সরকার জারী রাখেন, তাহলে এই সরকার, আগের সরকার যেভাবে মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে নিন্দিত হয়েছেন, সেইভাবে নিন্দিত হবেন। এটা সরকারের বুঝা উচিত। নিন্দা ভাজন হওয়ার চেয়ে জনগণের প্রশংসা পাওয়ার জন্য জনগণের উন্নতির ব্যবস্থা করা কি ভালো নয়? সরকার জনগণের উন্নতির জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করতে হবে। যদি তা পালন করা না হয়, তাহলে জনগণ তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মাননীয় স্পিকার, স্যার, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। যে কোন মঙ্গলজনক কাজই আমরা দেশের জন্য করতে যাই না কেন, সর্বপ্রথমেই আমরা মনে মনে ঠিক করে নেই যে, দুর্নীতিপরায়ণ হবে। "দুর্নীতিপরায়ণ হব না" এটা আমরা চিন্তাও করি না। এই দুর্নীতিকে আকঁড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়।

জনাব স্পিকার : সংসদের অধিবেশন আধ ঘন্টার জন্য মূলতবী হইল।

.....(অপরাহ্ন ৪টা ৫৭ মিনিট হতে অপরাহ্ন ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতি থাকার পর সংসদের কাজ আবার আরম্ভ হয়)....

শ্রী লারমা : জনাব ডেপুটি স্পিকার সাহেব, বিরতির আগে আমার যে বক্তব্য রেখেছিলাম, বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলাম দুর্নীতি দমন করতে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু এটা ছিল সরকারের সবচেয়ে বড় পবিত্র দায়িত্ব। এই সরকার এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। সরকার যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সেই সরকারের গদিতে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত নয়। তাই আজকে যে দুর্নীতির রাজত্ব চলছে, সেই দুর্নীতি আমাদের সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে আজকে আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলকাঠামো, তথা আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে শুভ পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

তাই প্রশ্ন উঠে, যেখানে দুর্নীতি বেশি সেখানে আইন-শৃঙ্খলা ঠিকমত থাকতে পারে কিনা? আমি বলব যেখানে দুর্নীতি এত প্রকট, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা ঠিকমত থাকতে পারে না।

তাই আজকে বাংলাদেশের মানুষ সরকারের নিকট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যে দাবি করে আসছেন, সরকার তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আজকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারের সাথে জড়িত। তাই আইন যারা অমান্য করে, তাদের শাস্তির বিধান করা উচিত। আজকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কারা? যারা দুষ্কৃতিকারী, যারা দুর্নীতির পথ অবলম্বন করে সমাজকে ধ্বংস করে দিতে চায়,

তারাই আজকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে। আজ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি কারা? চোরাচালানী, মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোর যারা, তারাই বাংলাদেশের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। এই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রশ্রয় দিচ্ছে কারা? আমি এর আগে উল্লেখ করেছি যে, সরকার যদি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের কঠোর হস্তে দমন করতে না পারে, তাহলে সরকারের প্রকাশ্য ঘোষণা করা উচিত যে দুর্নীতি দমন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন—

"যৌথ অভিযান ও সংশ্লিষ্ট সাধারণ প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং পুলিশবাহিনী বাবদ অতিরিক্ত ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে হিসাব করা হয়েছে।"

অর্থাৎ যৌথ অভিযানের জন্য দেশে সেনাবাহিনী ডাকা হয়েছে। কিন্তু যারা দুষ্কৃতিকারী, মজুতদারী, কালোবাজারী, চোরাচালানী, তারা কি এতে উৎখাত হয়েছে? তারা উৎখাত হয় নাই। সরকার এদের উৎখাত করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই ব্যর্থতার পরে আর এটা ঘোষণা করা উচিত হয় নাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেনাবাহিনী বা কোন বাহিনী ডেকে এটার সমাধান হবে না। কারণ সরকার সংবিধানের সেই নির্দেশনামা গ্রহণ না করায় আজকে আমাদের দেশের যে দুর্নীতি, সেই দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের দেশের ভাগ্যোন্নয়ন করবে, সেখানে মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা স্বীকৃতি আছে। সেই স্বীকৃতিটাকে দেখান হয়েছে। কিন্তু দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে যে কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কারণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে সেটাকে দূর করার জন্য সরকার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি? সরকার সেটা গ্রহণ করেন নাই। যদি সরকার সেটা গ্রহণ করতেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন, তাহলে দেখা যেত যে আমাদের সমাজে আস্তে আস্তে অর্থনীতির যে একটা সাবলীল গতি সেটা আজকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু সরকার সেটা করতে পারেন নাই। এ ব্যাপারে সরকারের একটা অহীনা ভাব রয়েছে। সেই অহীনা ভাব থাকার জন্য আজকে সমাজের এই দুরবস্থা। সেটার জন্য সরকার কি দায়ী নন? সরকারের কি উচিত নয় এ বিষয়ে তার অক্ষমতার কথা জনগণের নিকট ঘোষণা করে দেওয়া?

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, সরকার এটা বলতে পারেন, স্বীকার করতে পারেন যে, 'হ্যাঁ' আমরা এটা দেখেছি। কিন্তু সেটা কেন সরকার কার্যকর করতে চাচ্ছেন না, তা কেন তারা ঘোষণা করবেন না? তাই আজকে আপনি জানেন, আমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছি, সবাই জানি যে আজকে আইন-শৃঙ্খলার কি অবনতি হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আজকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি যা হয়েছে, সেদিকে যদি সরকার দৃষ্টি না দেন, তাহলে কে সে কাজ করবে? আমি করতে পারি

Dhaka University Institutional Repository

না, আপনি করতে পারেন না, সেখানে সরকারের প্রশাসনিক শক্তিকে নিয়ে আসতে হবে। তখন আমরা সহায়ক শক্তি হিসেবে সেটাকে কার্যকর করতে পারি।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ আইন নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছে। মানুষ যখন কোন দুষ্কৃতিকারী ধরে কিংবা দুস্কৃতিকারীর নামে যদি ভালো মানুষও ধরে, তাহলে আইন রক্ষাকারী সংস্থার হাতে সোপর্দ না করে নিজেরাই বিচার করে হত্যা করে। রাত্রের অন্ধকারে অনেক সময় শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়। হঠাৎ এসে গুলি করে হত্যা করে যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আমাদের জন্মভূমিতে আগে তো এরকম ছিল না তৎকালীন পাকিস্তানের তো এরকম হয়নি। হত্যাকাণ্ড যে হয়নি, তা নয়। হয়তো ২/১টি হয়েছে। কিন্তু এইরকমভাবে শত্রুতা সাধন বা প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল না। এই প্রবণতা কোথা থেকে আসে। সরকারের উচিত ছিল সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করে প্রচারনার মাধ্যমে এটাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকার সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আজকে আমাদের সমাজ জীবনে এত হতাশা কেন? সরকার যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, সেই কার্যক্রম ঠিকমতো হচ্ছে না। এদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, আর একদিকে শোষণ পদ্ধতি রাখা হয়। মানুষ মানুষকে শোষণ করবে। কোনদিন এটি হতে পারে না। সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি পথ, একটি হল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, আর একটি হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। পৃথিবী দুইটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যে কোন একটি পথ অনুসরণ করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক পথেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, The First Five Years Plan-এ বিভিন্নভাবে এই সমাজতন্ত্রের কথা সুন্দরভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্র কিভাবে হবে, কিভাবে হওয়া দরকার তা বিভিন্নভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে আহ্বান জানানো হয়নি। আহ্বানের কথা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। আমি আজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে চাই যে, সক্রিয়ভাবে সমাজতন্ত্রের কোন আহ্বান জানানো হয়নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আমাদের দেশে উন্নয়ন কাজের জন্য সার্কেল অফিসারদের নিকট প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে সরকার কোনদিন তদন্ত করে দেখে না যে, তারা সেই টাকা ঠিকভাবে ব্যয় করছে কিনা। আমি একথা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে, উন্নয়নমূলক কাজে প্রতি বৎসর যে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে, সেই টাকার প্রায় ৭০ ভাগ স্বার্থান্বেষী মানুষের নিজস্ব পকেটে চলে যায়, আর বাকি ৩০ ভাগ মাত্র অন্যান্যদের ভাগে পড়ে। যে সরকারের মধ্যে এমন দুর্নীতি, সেই সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে কি করে।

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আজকে মানুষের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। আমরা সংসদ-সদস্য যাঁরা আছি, আমাদেরও কোন নিরাপত্তা নাই। আর যাঁরা রিক্সা চালায়, ঠেলা গাড়ি চালায়, গরুর গাড়ি চালায়, রেলগাড়ি চালায় অর্থাৎ এক কথায় জনসাধারণের কারো জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। এই নিশ্চয়তার জন্য সরকারের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পুরাপুরি দিতে না পারলেও শতকরা ৮০ ভাগ নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত। আমাদের জানার অধিকার আছে এই নিশ্চয়তা সরকার কেন দিতে পারছেন না। আমরা চাইনি যে, আমাদের ঘরবাড়ি সুন্দর হোক, আমাদেরকে ভালো খাবার দেওয়া হোক। আমরা শুধু দুই বেলা পেট ভরে ভাত খেতে চাই, নির্বিঘ্নে ঘুমাতে চাই, আর রোগের জন্য একটু ঔষধ চাই। সরকার যদি এটা দিতে পারেন তাহলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি কখনো হবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অবনতি এসেছে। এই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকারি কোন পরিকল্পনা নাই। আমি যদিও অর্থনীতিবিদ নই, অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমার তেমন গভীর জ্ঞান নাই। তবু আমি মানুষ। তাই আমার জিজ্ঞাসা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জিজ্ঞাসা, "আমাদের দুইবেলা অন্নের সংস্থান কিভাবে হবে"। এ কথাটি আজ আমিও বুঝতে পারছি না। এই The First Five Years Plan-এ মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কোন কথাই পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, The First Five Years Plan সঠিকভাবে প্রণীত হয় নাই, যার জন্য আজকে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে এবং একই কারণে বাজেটের অবস্থাও এই রকম হয়েছে। তাই যদি না হবে তাহলে বাজেটে এই কথা কেমন করে এলো যে—

"বিদ্যমান কর ও অন্যান্য প্রাপ্তির সমকালীন হার অনুযায়ী আগামী অর্থ-বৎসরে রাজস্ব আয় ৪৭০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ৪৭০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।"

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, সেটা যদি আমরা যোগ-বিয়োগ করি, তাহলে ফল পাব শূণ্য। অর্থনীতিকে কিভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলব, তার কোন সদিচ্ছা নাই। সদিচ্ছা নাই বলে আজকে আমাদের এই অবস্থা। যদি আমাদের সদিচ্ছা থাকত, তাহলে এই রকম হত না। তাই আমি অত্যন্ত দুঃখভরে এই কথা বলতে চাই যে, সরকারের এই যে ব্যর্থতা, এই ব্যর্থতা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজমান। এটা আমরা কৃষিতে দেখতে পাব, শিল্পে দেখতে পাব, বন বিভাগে দেখতে পাব, প্রত্যেকটি বিভাগেই আমরা এই ব্যর্থতা দেখতে পাব। যেখানে আমাদের উন্নতির জন্য আজ একটা শক্তিশালী ও সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, সেখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার ব্যর্থ হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আপনি দেখবেন বন বিভাগ আজকে উজার হয়ে গেছে। শিল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, কলকারখানার আজ কি দুরবস্থা। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যারা জমি চাষ করি, ধান, পাট উৎপাদন করি, তাদেরও সেই একই দুরবস্থা। এই জন্যই আজ আমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। কিভাবে আজ দেশের উন্নতি হবে এই ব্যাপারে সরকার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নাই। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারকে আজ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা যে সমস্ত বিভাগ এদেশে আছে, সবকিছুই যেন আজ মেশিনে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে যে একটা মানসিক অনুভূতি থাকা দরকার, সেই মানসিক অনুভূতির কোন চিহ্নই আজ কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আমরা জানি যারা জমি চাষ করে, তাদের আজ কি দুরবস্থা। সরকার কৃষিকে উন্নতির পথে না নিয়ে এই অবস্থায় কেন যে রেখেছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না। সরকারের বুঝা উচিত যে, তারা আজ জাতির প্রতি তাদের সঠিক কর্তব্য পালন করতে পারছেন না। যারা এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন, তাদের আজ আহ্বান করা দরকার। কৃষি এবং শিল্প একটি আর একটির পরিপূরক। এই দুইটি পাশাপাশি চলে। কৃষি এবং শিল্পকে সরকার কোনদিনই ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য দৃষ্টি দেন নাই। দেশে আজ যেসব কল-কারখানা আছে, সেগুলি পরিচালনা করার জন্য সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? এদেশে পাকিস্তানীদের বহু কলকারখানা ছিল। তারা যখন চলে যায়, তখন এগুলিকে পরিচালনা করার ভার সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করে রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেয়। ব্যাংক, বীমা কোম্পানিগুলিকেও রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর প্রথম বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমরা সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আমরা এই সব জাতীয়করণ করেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, এইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব হয়না, এভাবে সাফল্য অর্জন করা যায় না। এই সব রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানাকে ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে এইসব রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যতা মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে স্বীকার করেছিলেন। তারপর বর্তমান বাজেটেও তিনি এই কথা স্বীকার করেছেন। স্বীকার করার পরে সেই "(a) Inadequacy of management and (b) inability to motivate labour for diciplined and efficient work" দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আমরা অদ্যাবধি জানতে পারলাম না।

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, যে শ্রমিকের পরিশ্রমের ফলে কত কি জিনিস তৈরি হয়, সেই কারখানার শ্রমিকদের কি দুরবস্থা। এই দুরবস্থার মধ্য থেকে শ্রমিকরা কোনদিন মনেপ্রাণে কাজ করতে পারে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আজ শিল্পের ও কৃষির দিকে দেখেই এই কথা বলতে চাচ্ছি যে, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সরকার কেন ব্যর্থ হয়েছে? কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে সরকার যদি উপযুক্তভাবে নেতৃত্ব দিয়ে সুচারুরূপে কার্যকর করতে পারতেন, তাহলে আস্তে আস্তে কালোবাজারের দল, মজুতদারের দল, চোরাকারবারীর দল, মুনাফাখোরের দল, তারা পিছু হটতে বাধ্য হতো। আজকে তারাই সমাজের মালিক। আজকে যারা সাধু পুরুষ তাদের কোন মূল্য নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, যাঁরা মুনাফা করে, যারা কালোবাজারী করে, তাদের মূল্য বেশি, যেহেতু তাদের কাছে টাকা আছে। টাকা দিয়ে তারা সবই কিনে ফেলে, অফিসারদের কিনে ফেলে, এমন কি মাননীয় মন্ত্রীদেরও কিনে ফেলে, এটা অপ্রিয় কথা হলেও সত্য। সরকারের কাছে আমার আবেদন এটাকে দূর করতে হবে। আমি এই প্রসঙ্গে আর বেশি দূর যাব না।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে কিছু বলতে হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই হানাহানি থাকবে। আজকে যে থানা লুট হয়, থানা আক্রান্ত হয়, কেন হয়? আজকে যারা বাংলাদেশ মানে না, তাদের কথা বলছি না। যারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাদের কথা আলাদা। তাদের বাদ দিয়েও সমাজে আর একশ্রেণী রয়েছে, তাদের হাতে রয়েছে illegal arms। তারা নানা রকম জঘন্য কাজ করে যাচ্ছে। যখন মানুষের সুষম অর্থনৈতিক বন্টন করে, তখন এগুলি থাকবে না। যারা দুষ্কৃতিকারী, যারা দেশকে বিকিয়ে দিতে চায় তারা পুরাপুরি উৎখাত হতে বাধ্য। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, এটা বাস্তব, এটা পৃথিবীর ইতিহাসের কথা।

জনাব ডেপুটি স্পিকার : মি. লারমা, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রী লারমা : মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ করব।

জনাব ডেপুটি স্পিকার : Order please.

শ্রী লারমা : মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আজ সেনাবাহিনী ডাকা হয়েছে। এখানে দুঃখ করে একটা কথা বলতে হচ্ছে, যাদের ডাকা হয়েছে, তাদের কাজ ছিল দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেদেরকে ব্রতী করা, জীবনকে উৎসর্গ করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, সেনাবাহিনীর যে সুনাম ছিল সেনাবাহিনীর একাংশ লোকের দ্বারা সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, খবরের কাগজে উঠেছে এবং আমরা বাস্তব চোখেও দেখেছি, বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা দুষ্কৃতিকারী ও সমাজবিরোধীদের দমন করতে গিয়ে পাইকারীহারে মানুষকে মারপিট করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীঘিনালায় এমনি একটা বাস্তব ঘটনা হয়েছে। সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুষ্ট ধরনের কিছু লোক সেখানে সাত জন মেয়ের উপর অত্যাচার করেছে। সুতরাং আজকে, যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের বিচার হতে পারে। কিন্তু যারা নিরীহ লোক, তাদের উপর কেন এই অত্যাচার। এমনকি তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার খাগড়াছড়ি মহকুমা হাকিমের কোর্টের ভিতরে গিয়ে কর্মচারীদেরকে নির্দয়ভাবে মারধর করেছে। কোন বিচার নাই, কে দোষী কে নির্দোষ। সিলেট শহরেও এরকমভাবে সেনাবাহিনীর লোকেরা রাস্তায়, দোকানে যাকে পেয়েছে, তাকে নির্দয়ভাবে মেরেছে। সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, এটাতো আমরা কামনা করি নাই। আমরা কামনা করেছিলাম সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দুষ্কৃতিকারী দমন হবে। একবার আমি রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। যাবার পথে একটা চেকপোষ্ট-এ দেখলাম সেনাবাহিনীর লোকেরা যতজন লম্বা চুলওয়ালা লোক যাচ্ছে, তাদের সাবাইকে চুল কেটে ফেলার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

আমার কথা হল, যাদের যে কাজ, তারা সেটা করবে, এসব কাজ তারা কেন করবে? এসব করলে তো জনগণের মন সরকারের বিরুদ্ধে যায়। সরকারের তো আরও বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। ইন্টেলিজেনস্ বিভাগ রয়েছে, প্রশাসনিক বিভাগে লোক রয়েছে। কোন জায়গায় কেউ কোন দুষ্কর্ম করেছে কিনা সেটা তারা দেখবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আইন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমার আর একটি কথা রয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে আমি রাঙ্গামাটির এস.পি. সাহেবের নিকট থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি যে, সরকার নির্দেশ দিয়েছেন এম.পি.-দের প্রয়োজন হলে নিরাপত্তার জন্য তাঁরা বাসায় গার্ড হিসেবে পুলিশ রিকুইজিশন দিতে পারবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আমরা জনগণের প্রতিনিধি। পুলিশ যদি আমাদের ঘরের চারদিকে পাহাড়ায় নিযুক্ত থাকে, তাহলে আমরা কি রকম প্রতিনিধি? তাহলে এটা পরিষ্কার যে, আমাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নাই। পুলিশ রেখে যদি ঘরে থাকতে হয়, তাহলে এরকম প্রতিনিধি থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। কারণ এগুলি জনগণ শুনবে যে, সরকারের কাছ থেকে এরকম নির্দেশ যায় দেশের জনপ্রতিনিধিদের কাছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আজকে এইভাবে যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, সেজন্য সরকারের সচেতন হওয়া একান্ত উচিত। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আমাকে আর একটি কথা বলতে হয়। যারা যুগ যুগ ধরে, আবহমান কাল

Dhaka University Institutional Repository

ধরে সমাজে অবহেলিত, সেই বেদের দল, যাদের ঘর-বাড়ি নেই, নৌকার উপর যারা জীবনযাপন করে, তাদের কথাই বলতে চাই। এদের প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু সেই বেদের মত যারা মেথর, তাদেরও আজকে কোন অস্তিত্ব নাই। তারা মানুষের মত স্বাধীনভাবে বসবাস করার কি কোনদিন স্বীকৃতি পাবে না? অতীতের সরকার তাদেরকে স্বীকৃতি দেয় নাই। কিন্তু বর্তমান সরকার রাষ্ট্রের মূল আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। অথচ এইসব লোকদের কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, যারা মেথর তারা তো মানুষ। সমাজের উন্নত জীবন ব্যবস্থায় তাদের টেনে তোলা কি সরকারের উচিত নয়? তাদের তোলা কি সরকারের কর্তব্য নয়? তাদের খাওয়া-পরা, এমন কি জীবন ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আজকে যারা সমাজে অবহেলিত, তাদের স্থান সমাজে কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না? সমাজে আর এক শ্রেণীর মেয়ে আছে যারা পুরুষের ভোগের শিকারে পরিণত হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকটের যাঁতাকলে পড়ে যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে পড়ে আছে, তাদেরকে মুক্ত করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কোনও প্রচেষ্টা আজও গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু আমি বলতে চাই, এইসব মেয়েরা চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি শহর ও বন্দরে অনেক নিষিদ্ধ পল্লীতে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। তাদের পুনর্বাসন করা কি সরকারের উচিত নয়?

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার সাহেব, আমাদের এইবার সংসদে একটা বিল আনা হয়েছে, পাক হানাদারদের দ্বারা যে সমস্ত মেয়ে নির্যাতিতা হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন করার জন্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা এই দেশেরই মানুষের দ্বারা নির্যাতিতা হচ্ছে, তাদের পুনর্বাসন করা কি সরকারের উচিত নয়? আজকে তাই আমি প্রস্তাব করছি সমাজের এই তিন শ্রেণীর লোক বেদে, মেথর এবং নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে তাদের সমস্যা সমাধান যদি সরকার না করতে পারে, তাহলে সরকারের পদত্যাগ করা উচিৎ।

কারণ বর্তমান সরকার মানবতার মূল্য, মানুষের মূল্য দিতে অক্ষম। তাই আজ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে দারুণ অসমতা। সংবিধান আমাদের পবিত্র দলিল, অথচ সংবিধানকে মানা হচ্ছে না। সংবিধানকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

জনাব আব্দুর রশিদ : অন এ্যা পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় স্পিকার, স্যার, শ্রী লারমাকে নিয়ে হাউস একটু অসুবিধার মধ্যে আছে। তিনি একটু ধীরে ধীরে বললে তাঁর বক্তব্য আমাদের বুঝার পক্ষে সুবিধা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী লারমা : বর্তমানে দেশের দুরবস্থা প্রতিটি স্তরে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সবকিছুর মূলে রয়েছে অবহেলা। এই অবহেলার কথা কি সরকারের জানা নেই? আইন-শৃঙ্খলার নামে, অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করার নামে, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার নামে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে। তাই আজ চারিদিকে হতাশার ভাব বিরাজ করছে। মানুষের এই দিশেহারা ভাব আওয়ামী লীগ সরকারকে দূর করতে হবে। সরকার দূর করতে না পারলে মানুষকে যারা আশার বাণী শোনাতে পারবে, অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করে যারা মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারবে, তাঁদের হাতে নিজ থেকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে এবং ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সংবিধানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, বাংলাদেশ হবে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, রাজনৈতিকভাবে কোন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবে না। মানুষের মনে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিনা। তাই আমি অনুরোধ করছি, সরকার যেন এই প্রশ্ন নিরসনের ব্যবস্থা করেন। সরকারের নিকট বিনীত আবেদন হল বাংলাদেশ লাহোরে যে ইসলামী রাষ্ট্রীয় শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে, তাতেও অংশগ্রহণ করেছ, কুয়ালালামপুর ইসলামিক দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছে, তাতেও অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও কোন ধর্মে প্রতিনিধি হয়ে কোন সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারে কিনা তার ব্যাখ্যা যেন দেওয়া হয়। আমরা এইভাবে আমাদের সংবিধানকে অবমাননা করছি। বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমরা পরিষ্কার ব্যাখ্যা আশা করছি। আমাদের সবাইকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমরা কেউ সংবিধানের অবমাননা না করি, আমরা যাতে সংবিধানকে খাট না করি।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আজকে আর একটা কথা বলতে চাই, সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, "বাংলাদেশ একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র"। এখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, এক অঞ্চলের সহিত অন্য অঞ্চলের কোন বৈষম্য থাকবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যে কোনও পৃথক শাসিত এলাকা excluded or tribal area থাকবে না, বাংলাদেশ একক হিসেবে শাসিত হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, আমি যে এলাকা থেকে এসেছি, আপনি জানেন, সেটা হল পার্বত্য চট্টগ্রাম। এটাকে বৃটিশ শাসন করেছে এবং পাকিস্তানও শাসন করেছে excluded area হিসেবে। বৃটিশ সরকার ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করার জন্য একটা আইন পাস করে। এই আইনের নাম হলো ১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন। তারা সেই আইনের বিধান মতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শোষণ করেছে, পাকিস্তানও তাই করেছে। সেই আইন এখনও বলবৎ আছে। বাংলাদেশ সরকার এখনও সেই আইন বলবৎ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করছে। সেই আইন যদি

Dhaka University Institutional Repository

বলবৎ থাকে তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনও excluded area থেকে যাচ্ছে। অথচ সেইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করা হচ্ছে না। Excluded area status থাকলে সেইভাবেই এই এলাকাকে শাসন করতে হবে। Excluded area উপজাতি জনগণের জন্যই হয়ে থাকে। সংবিধানে excluded বা tribal area status স্বীকৃত হয়নি। তাই সংবিধান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের রেগুলেশন অচল হয়ে পড়েছে। অথচ এই রেগুলেশনকে সংবিধানের ১৪৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে। এই অনুচ্ছেদে আছে—"এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।"

বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত এলাকা অর্থাৎ excluded area হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে নামমাত্রভাবে এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, কিন্তু সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" এবং "মৌলিক অধিকারের" অধ্যায়ের স্বীকৃতি দেননি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম excluded area status পেলেও তার প্রকৃত মর্যাদা বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে না। এই অন্তঃসারশূন্য স্বীকৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামের "কাল অধ্যায়ের" সূচনা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তাদের সত্তা হারাতে বসেছে।

সরকারের এই নীতি কি ধরনের। একদিকে সরকার ঘোষণা করেন excluded area বা tribal area দেওয়া হবে না। আবার অন্য দিকে প্রচলিত আইনের ১৪৯নং অনুচ্ছেদ দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে excluded area হিসেবে সরকার কর্তৃক গণ্য করা হচ্ছে। তাই একটা contradiction-এর সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই অধ্যুষিত এলাকায় ছোট ছোট দশটি উপজাতি আছে। যেমন—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং ও চাক।

মাননীয় স্পিকার, এখানে আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে মাননীয় সংসদ-সদস্যদের নিকট উপজাতীয়দের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরছি। লেখাপড়া শিক্ষার কথা তো দূরের কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোট ছোট জাতির মধ্যে মুরুং, খুমি, পাংখো এবং খিয়াং জাতি এখনও আদিম যুগের অবস্থায় আছে। তাদেরকে না দেখলে আপনারা বুঝবেন না। আর চাকমা, মগ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্যরাও কি উন্নত হতে পেরেছে? আপনারা না দেখলে কখনও বুঝবেন না, আমাদের পিছিয়ে পড়া জীবনের করুণ অবস্থা।

বেগম তসলিমা আবেদ : জনাব স্পিকার সাহেব, মাননীয় সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি জাতির নাম করলেন, বাংলাদেশে মোট একটা জাতি, বাঙালি।

জনাব শওকত আলী খান : মাননীয় স্পিকার, দুইটি জাতি—পুরুষ ও নারী।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী লারমা : মাননীয় সদস্যের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। তাঁকে শুধু জানাচ্ছি যে, সরকারের আইন-কানুনগুলো একটু কষ্ট করে পড়ে দেখার জন্য। এই অধিবেশনে আনীত একটি বিলেও একটি 'উপজাতি'র জমি সংক্রান্ত অধিকার বিষয়ে লেখা আছে। ভূমি প্রশাসন বিভাগের মন্ত্রী কর্তৃক আনীত The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Bill, 1974-এ ময়মনসিংহের বানাই উপজাতিদের জমি সংক্রান্ত অধিকার সম্বন্ধে Aim and object-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে "Tribe" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ...

"The Bill seeks to include "Banais", an aboriginal tribe, inhabiting certain areas in the district of Mymensingh in the list of aboriginal so that they may derive the benefit of special provisions relating to the transfer of property by aboriginals by amending section 97 of the said Act i.e. the State Acquisition and Tenancy Act, 1950."

সুতরাং এটা খুব পরিষ্কার। এই নিয়ে গণপরিষদে সংবিধান তৈরির সময় তর্কাতর্কি হয়েছিল। আমরা উপজাতীয়রা বাঙালি নই, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক - আমরা বাংলাদেশী। আজকে সরকারকে আমি জানাতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের excluded area status এমনভাবে রাখার কোন অর্থ হয় না। হয় আমাদেরকে পুরাপুরিভাবে বঞ্চিত করুন, পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দিন, আর না হয় অধিকতর অধিকার দিন। মানবতার অধিকার দিন। একদিকে অধিকার অধিক লিখে দিয়েছেন আর অন্যদিকে অধিকার হরণ করে নিচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঁচ লাখ মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে আদিম পর্যায়ে রয়েছে। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত উপজাতিগণের সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধা করে ফেলছে, তাদেরকে স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার দিয়ে উন্নত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। আমি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তার ১২৭টি ছোট বড় জাতির রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করেছে প্রত্যেকের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে। তাই আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগণের মনের কথা সংসদে এসে সরকারের কাছে জানাচ্ছি। সংবিধানে এক রকম লেখা হবে, আর একদিকে অন্যরকম করবেন। আমাদের মানুষ হবার পথ উন্মুক্ত করে দিন। আমি সংবিধানকে খাট করা বা বিকৃত করার জন্য বলছি না। তাই সরকারের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন আমাদেরকে মানবতার পথ দেখিয়ে দিন। আমরা ধনী হতে চাই না, লাখপতি হতে চাই না। যে যুগে পৃথিবীর লোক চাঁদে গিয়ে অবতরণ করেছে, সে যুগে আমরা অর্ধ-উলঙ্গ আদিম মানুষ হয়ে পড়ে থাকব কেন?

মাননীয় স্পিকার, স্যার, সরকারের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, আপনারা দেখুন পার্বত্য চট্টগ্রামের লোক কিভাবে জীবন-যাপন করছে। এটা যদি আপনারা করতে না পারেন তাহলে সরকারের দায়িত্ব কেন নিয়েছেন? মানুষকে খেয়ে-পরে

Dhaka University Institutional Repository

বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে বলব আপনারা অত্যাচারী সরকার, গণবিরোধী সরকার। আপনারা যদি সরকার হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।

মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জায়গা-দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদমে তিনটি সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে এবং বান্দরবনের সোয়ালকে আরও একটি তৈরি করা হবে। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে ও খাগড়াছড়িতে বি.ডি.আর উইং হেড কোয়ার্টার তৈরি করা হবে। জানিনা কিসের জন্য সেখানে এত সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি মাত্র ৪৮ মাইল দূরে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনানিবাস তৈরি করার কোন যুক্তি আমি দেখি না। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, সেখানে চাষাবাদ করার মত জমি খুব কম, অথচ সেই জমি দখল করে নিয়ে সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে। এমনি তো কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৫৬ হাজার একর ধান্য জমি ডুবে গিয়েছে। এই সমস্ত জমি দখল করার ব্যাপারে সরকারের নিকট আমার আবেদন এই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু খাস পাহাড়ী জমি আছে, যেগুলো সেনানিবাসের জন্য বিনা পয়সায় নিতে পারেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সবই তো পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়। সেই সব পাহাড়ে বন্য জন্তুর সাথে লড়াই করে যে সামান্য জমি আমরা আবাদ করেছি, সেই জমি কেন সরকার নিয়ে নিবে? তাই আমি নিবেদন করব যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের লোককে আপনারা এইভাবে দেখবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম মানুষকে টেনে নিন। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে নিপীড়িত ও নিগৃহীতদের পক্ষ থেকে আমার করুণ আবেদন এই যে, সবচেয়ে পিছনে যারা পড়ে আছে, তাদেরকে পাশে টেনে নিন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে তাদেরকে বিলুপ্ত হতে দিবেন না। বিলুপ্ত হওয়ার যুগ ছিল মধ্য যুগ। তাদের মানুষ হওয়ার সুযোগ দিন। মাননীয় স্পিকার, স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

....

শ্রী লারমা : অন এ্যা পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় স্পিকার, আমি কার্যপ্রণালী-বিধির ২৭২নং বিধির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোরামের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সুতরাং এভাবে কোরামহীন অবস্থায় হাউজ চলতে পারে না। এই বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

........(বাধা প্রদান).......

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৭

An Urgent Statement of Jana Samhati Samiti

পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার মানুষ অর্ধনগ্ন পরিবেশ বাস করছে, এখনও হাজার হাজার মানুষ আদিম যুগের পরিবেশে বাস করছে।

এখন নিপীড়নকারী স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের দিন আর নেই। আমরা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সর্ব রকমের সর্বরকমের নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়েছি। আমাদের বংলাদেশ এখন মুক্ত। উপনিবেশিক শাসনের জোয়াল ভেঙে গেছে। এখন আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ চারটি মূলনীতি-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়বাদকে উর্ধ্বে তুলে ধরে উজ্জ্বল ভবিষ্য নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ যুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষনের অধিকার দেবেন।

তারিখ: রাঙ্গামাটি

২৪ এপ্রিল ১৯৭২ সন

জয় বাংলা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
গণ পরিষদ সদস্য
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ এবং
আহবায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

PARBATTYA CHATTAGRAM JANA SAMHATI SAMITI
CHITTAGONG HILL TRACTS
BANGLADESH

Dhaka University Institutional Repository

AN URGENT STATEMENT OF JANA SAMHATI SAMITI ON THE PARBATTYA ZILLA PARISHAD ELECTION (HILL DISTRICT COUNCIL ELECTION) AND DECLARATION OF GENERAL AMNESTY BY BANGLADESH GOVERNMENT.

Dear Countrymen,

The fascist and Islamic expansionist government of Bangladesh has declared Sunday the 25th June, 1989 as a date for the election of Parbattya Zilla Parishad (Hill District Council) based on its unrealistic, undemocratic, defective and conspiratorial 9 (Nine) point Rupa Rekha against the will of the Jumma people and the Jana Samhati Samiti (JSS) unilaterally. With a view to misleading the people of Bangladesh and the World conscience President Ershad has also declared his socalled general amnesty by keeping consistency with the declaration of Zilla Parishad election.

It requires on further mention that—this Parbattya Zilla Parishad formation and election is nothing but a conspiracy to give a final shape to the blue print of the then Pakistan government since 1947—" To turn the Jumma populated Chittagong Hill Tracts (CHT) into a muslim populated Chittagong Hill Tracts.

[1]

Dhaka University Institutional Repository

Dear Countrymen,

You are aware that the then East Pakistan emerged as Bangladesh in 1971 through a bloody struggle based on the principles of nationalism, democracy, secularism and socialism. Many governments have come to power in Bangladesh till now, but the conspiratorial policy to turn the Jumma populated CHT into a muslim populated CHT always remained unchanged. Various governments have indulged in different dirty policies and heinous tactics for the implementation of this blue print. The present Ershad government is also following the footsteps of his predecessors with heinous and anti-humanity policies. But the freedom loving Jumma people who have always stood against the heinous conspiracies of all successive governments in the past are also struggling unitedly against the present government's policy of liquidating the national entity of the Jumma people. It is needless to say that the JSS and the Jumma people have rejected with much aversion the 9 (Nine) point Rupa Rekha declared by Bangladesh government in the last year. But the extreme nationalist and fanatic military junta, being proud of its power, passed the much hated and anti-democratic Parbattya Zilla Parishad bill and made it into an Act and declared the date for the election of the Zilla Parishad by trampling down the will and opinion of the JSS and the Jumma people. Heinous

Dhaka University Institutional Repository

activities such as — military terrorism, illegal infiltration, artifical economic crisis, arbitrary arrests and imprisonment, rape, genocide, inhuman tortures, illegal land occupation, looting, arsoning, communal riots, Jukta Gram (Collective village) and Guccha Gram (Cluster Village) programmes, conversion into Islam etc. — When all these anti-humanity and antidemocratic activities failed to destroy the movement of self-determination, that is, the national entity of the Jumma people, it is then the Islamic expansionist Ershad government has taken a dirty step through the implementation of this Zilla Parishad to turn CHT into a muslim populated area.

Dear Countrymen,

Parbattya Zilla Parishad (9 point Rupa Rekha) means the liquidation of the Jumma national entity ; Implementation of Zilla Parishad means the recognition of more than 400,000 (Four hundred thousand) illegal Bengali muslim infiltrators as permanent residents of CHT ; Zilla Parishad election means to open doors for infiltration in CHT , Zilla Parishad means denial of fundamental rights to the Jumma people ; Implementation of Zilla Parishad means the destruction of homeland and total eviction of the Jumma people from their homesteads for ever. Infact, not only voting rights have been conferred to the infiltrators

Dhaka University Institutional Repository

but also majority seats have been reserved for them in each Zilla Parished by Bangladesh government. On the other hand, military and civil officials posted in CHT and members of the national committee on CHT led by A.K Khondokar are busy campaigning with lies infavour of this conspiratoriol Zilla Parishad and glorifying its socalled merits day and night inorder to turn the dreams of general Ershad into reality. Taxes and revenue received from the exploited and oppressed people of Banladesh and also crores of taka received as foreign aid for the development of the people of Bangladesh are being spent on the programme of Islamic expansion in CHT. More over, Bangladesh Biman Bahini (Air force) helicopters are used off and on in the name of keeping law and order in CHT including holding of government sponsored socalled public meetings and conferences — all these are being carried out inorder to reject the 5 (Five) point charter of demands and to implement the conspiratorial Zilla Parishad. On 22nd April, 1989 President Ershad's visit at Khagrachari and his address to the people of Khagrachari was nothing but a propaganda infavour of Zilla Parishad. At the same time the declaration of socalled "General Amnesty" by general Ershad only exposes the ulterior motives of his government. Today, it is no more unknown to any one that this declaration of general amnesty is nothing but only a repetition of

Dhaka University Institutional Repository

an old political hoax. It is needless to say that the patriotic and the struggling members of the JSS were not perturbed at all by the declaration of this general amnesty. Similarly, awakened Jumma people can not be perturbed by this misguiding declaration of Bangladesh government and there could be no serious obstacle in the way of self-determination movement out of this conspiratorial declaration.

Bangladesh government has strangled the freedom of speech of the Jumma people on the one hand and on the other it has applied all its resources for making propaganda that Zilla Parishad is the only and genuine solution of CHT problem. At public meetings and through state controlled news papers and other news media Bangladesh government has been making propaganda that in this Zilla Parishad the Jumma people have been conferred land rights, autonomy, democratic rights, rights relating to religion, education, culture and safeguard of heritage, two-thirds majority seats, office of chairman has been reserved for the Jumma people, more powers and rights have been conferred to Parbattya Zilla Parishad than rest of the districts in Bangladesh etc. Although the propaganda made by Bangladesh Government may be nice to hear but these are nothing but political bluff. Therefore, it has become, very necessary to bring before the Jumma people and the world at large how the Jumma people

২

Dhaka University Institutional Repository

have been deprived of their fundamental rights through this Parbattya Zilla Parishad Act.

Previously, statement was made in detail by the JSS about this Zilla Parishad (9 point Rupa Rekha) which can not protect the homeland and the national entity of the Jumma people, rather it will expedite the early destruction of the Jumma national entity. Bangladesh government has been making propaganda that

1. Land fights have been given to the Jumma people in the Parbattya Zilla Parishad but in reality under Rule 64 of the Parbattya Zilla Parishad Act it is mentioned that--

   "Within the jurisdiction of the Zilla Parishad no land shall be given for settlement without prior approval of the Zilla Parishad and without similar approval such land shall not be transfered to any such person who is not a resident of the District. But there is a condition that this Rule shall not be applicable in case of protected and reserved forests, Kaptai hydel project area, Bet Bunia Earth sattelite station area, State industrial area, land transfered or settled in the interest of the government or people or any land or forest which may be requeird in the interest of the State. Therefore, it is clear that maximum land of CHT has been kept under the direct control of the government. So, the total area which would remain within the jurisdiction and control of the three Zilla Parishads under Rule 64 will be less than one-tenth of the total

Dhaka University Institutional Repository

area of CHT, Besides, population has increased to a large extent due to the recognition of more than 400,000 (Four hundred thousand) illegal Bengali muslim infiltrators as permanent residents of CHT. Above all, the government under Rule 64 can acquire any land in the interest of the State within the jurisdiction of the Zilla Parishad. Therefore, it is clear as broad day light that the Jumma people who used to enjoy special land rights under the Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 (I of 1900), have been deprived through this Zilla Parishad and the quantity of land per person has been reduced due to large scale infiltration. As a result, 90·/. (Ninety percent) of the Jumma people have been made landless due to the Zilla Parishad Act. So, illegal Bengali muslim infiltrators are given settlement by government in proteted and reserved forest area or in the areas controlled by Bangladesh government in that case the Zilla Parishad shall have no power to take any legal measure against this settlement.

2. Autonomy has been granted to the Jumma people through the Zilla Parishad — this statement of the government is totally baseless. As because, Rules 22, 53, 56, 62, 66, 69, 77, 78, and 79 of the Zilla Parishad Act clearly proves that this Zilla Parishad is mainly

Dhaka University Institutional Repository

a developmental institution. It has been stated under Rule 62 of the Zilla Parishad Act that police personnel from constable to the rank of Assistant Sub-Inspector of police in the District shall be appointed by the Zilla Parishad and all police officials shall be liable to the Zilla Parishad in discharging their duties and responsibilities. But the subject contained in this Rule regarding the control of police administration in the Zilla Parishad is quite self contradictory because the Zilla Parishad practically has not been conferred any administrative power with regard to maintenance of law and order in the District. There is a provision in this Zilla Parishad Act that recruitment of police personnel shall be made on ethnic population basis. As the infiltrators are from the single largest majority and automatically police force would be dominated dy the infiltrators. Under Rules 67, 68 and 69 of the Zilla Parishad Act the power as conferred on the subjects, the Zilla Parishad has no power to make Rules, Regulations, Bye-laws independently in the interest of the Jumma people. Besides, Bangladesh government retains the absolute power to dismiss the elected Zilla Parishad at any time on the pretex of being failure to dispense with duties and responsiiblties or working against the interest of the people or misuse of power as conferred under Rule 53 of the Zilla Parishad Act. If Bangladesh

government dismisses the Zilla Parishad before the completion of the Zilla Parishad's term, in that case, the Zilla Parishad has no right to move for legal step against this order. It is remarkable that Rule 64 of the Zilla Parishad Act has reinstated the undemocratic, reactionary and feudalistic leadership which makes the Zilla Parishad a self-contradictory. As a result, more complications have been created on the Jumma national life.

3. With regard to the office end powers of the chairman of the Parbattya Zilla Parishad, although Bangladesh government has given mouthful statements but in reality the Zilla Parishad chairman is totally incapable in the discharge of his duties and responsibilities without being free of influence of the government under Rules 7, 11, 12, 13 and 14 of the Zilla Parishad Act. Therefore, the chairman shall be compelled to obey and carry out anti-Jumma policy and programme of the government although the chairman is elected from the Jumma people. Since the illegal infiltrators from almost half of the total number of voters in the Zilla Parishad, so a candidate supported by the government is sure to be elected as chairman.

Dhaka University Institutional Repository

Therefore the elected chairman can not serve the interest of the Jumma people.

4. Above all, it has been witnessed and experienced in election that there has never been free and fair election in CHT and also in rest of Bangladesh whether it is Union Parishad, Upa Zilla Parishad or Parliamentary election. It is found that the government supported candidate or nominated candidate of the ruling party is always elected in CHT. Therefore, there is no hope for the deserving candidates of the Jumma people of being elected in the ensuing Zilla Parishad election. The government supported candidate, whatever he might be hooted and hated by the mass people, is sure to be elected with the administrative machinary through every unfair means. Thus, it is taken for granted— only the reactionary Dulas and opportunists who are government stooges from top to bottom are going to be elected in the ensuing Zilla Parishad election. Above all, the number of members from the infiltrators in the Zilla Parishad are majority. Obviously, the Zilla Parishad will be controlled by the non Jumma members in CHT. It is particularly mentionable that majority Jumma members in each Zilla Parishad shall not be able to withstand the influence exerted by the government and the non-Jumma members. The number of seats in the Parbattya Zilla Parishad are mentioned below :

Dhaka University Institutional Repository

Name of ethnic Group	Rangamati District No. of seats	Khagrachari District No. of seats	Bandarban District No of seats		TOTAL
Non-Jumma	10	9	11	... ...	30
Chakma	10	9	1		20
Marma	4	6	10	Khiyang & Marma	20
Tripura	1	6	1		8
Tangchangya	2	×	1		3
ng	×	×	3		3
Lushai	1	×	×		1
Bawm	×	×	1		1
Pankho	1	×	×		1
Khiyang	1	×	×		1
Khumi	×	×	1		1
Chak	×	X	1		1
Chairman (Jumma)	1	1	1		3
TOTAL—	31	31	31		93

As the Zilla Parishad shall have function according to the sweet will of the government bureaucrats, so the members of the Zilla Parishad shall be under compulsion to give their consent to any plan, programmes or decision of the government. Therefore, even

Dhaka University Institutional Repository

if, two-thirds majority seats are reserved for the Zilla Parishad, in reality this majority will not serve the interest of the Jumma people.

5. Besides, the fanatic Bangladesh government widely propagates that there are provisions for the protection and ~~developent~~ development of religion, education, culture, language, heritage of the ten linguistically different ethnic Jumma nationalities in this Zilla Parishad but virtually no such provision has been made in this Zilla Parishad Act which can protect and develop the rights of the Jumma people. Because Islam has been made as the [State religion in Bangladesh and the country is muslim dominated. It is specifically remarkable that the fundamental rights of the Jumma people have heen curtailed under Articles 9 (1), 25 (2), 26, 27 of Bangladesh constitution. More over, as the Jumma people are a microscopic population, so their culture, religion, language etc, is bound to be influenced directly by the majority Bengali muslim culture, religion and language. Above all, the Islamic expansionist Bangladesh government has been conspiring to materialise the blue print of 1947. Therefore, as regard to religion, culture and

Dhaka University Institutional Repository

language of the Jumma people, whatever rigths have been conferred in the Zilla Parishad Act, in reality the Jumma people would not be able to enjoy these rights due to the reasons as stated above. Hence, it is easily understood from the above brief analysis that Parbattya Zilla Parishad is a conspiracy of Bengladesh government and is nothing but a vile motive for establishment of more than 400,000 (Four hundred thousand) Bengali muslim infiltrators in CHT. That is why fanatic Prime Minister Maudud Ahmed remarked on the bill in the Parliament as a historic event. Similarly, President Al-Haj Muhamed Ershad on 22nd April, 1989 at Khagrachari, CHT during his speech termed the Zilla Parishad Act as a historic step. It is to be mentioned that during the partition of India in 1947, the muslim population in CHT was less than 1·50·/. (one and half percent). At present the percentage of Bengali muslim has increased to 45·/. (Forty five percent). It is also extremely alarming that the Rules have been framed in the Zilla Parishad Act in such a way that the over all controlling power of the Zilla Parishad would remain in the hands of the government and muslim infiltrators. The hidden objectives of the Parbattya Zilla Parishad is to destroy the Jumma national entity and to turn the Jumma populated CHT into a muslim populated CHT.

Dhaka University Institutional Repository

Dear Countrymen,

The Parbattya Zilla Parishad Act is anti people and anti-democratic. So this Act can not bring peace, happiness and development in CHT and it carries no national interest of the Jumma people. The JSS and the Jumma people have already rejected this anti-democratic and anti-humanity Act with much aversion. Even then the fanatic Er had government has declared 25th June, 1989 as the date for election of three Zilla Parishads in CHT. For the election Ershad government by letting loose its armed forces and by using the administration in every sphere and above all through various dirty tactics the Jumma people are being compelled to support the government. It is well known to all that President Ershad and his government is world famous for election rigging. That is why it can be remarked without any hesitation that in the ensuing Zilla Pari had the government will set a new record in rigging. The method of rigging in CHT adopted by Bangladesh government is different from rest of Bangladesh. In CHT usually the civil and military officials remain present at the polling centre and influence and compel the voters to cast their votes in favour of the goverment supported candidate. If necessary, inorder to make the government supported candidate win they resort to unfair means such as— casting votes, driving away the

voters at gun point from the polling centre. Jumma people are threatened by the army authorities that if the government supported candidate is not elected by them, then the army would destroy and burn their villages etc. In case, the government supported candidate fails to win majority votes, then the army and civil officials declare any other candidate of their choice as elected. In a nut shell, election in CHT is nothing but a farce. It is needless to say that the government has already selected the candidates in the ensuing three Zilla Parishad election in CHT through the high ranking army officials in the meantime. But on the other hand, fascist Ershad and his government advocate for democracy. So it is easily assumed how far the ensuing Zilla Parishad election would be free and fair.

Dear Countrymen,

The Parbattya Zilla Parishad which will accelerate the early destruction of the Jumma national entity and the homeland and the Zilla Parishad which will not bring any welfare for the Jumma people, the JSS firmly believes the Jumma paeple will come forward wholeheartedly to foil the Zilla Parishad election. Only a few national traitors, Dulas and upstarts who are bribed and planted by the government to foil the 5 (Five) point charter of

Dhaka University Institutional Repository

demands") as well as the movement of self-determination, are in praise of the Zilla Parishad Act. These opportunists have assembled around the government sponsored organisations like— Pahari Jana Kalyan Samiti, Marma Unnayan Sangsad, Tripura Unnayan Sangsad, Tribal Convention etc. to misguide the world and to compel the Jumma people to accept the Parbattya Zilla Parishad Act. Besides this, at this moment these national traitors and government boot lickers are supporting the Zilla Parishad Act to fulfil their self interest through the Zilla Parishad election with the blessings of the government and under the protection of Bangladesh army posted in CHT. It is needless to say that the Jumma people shall not show any magnanimity to the contestants and to those persons who will play leading roles in the ensuing conspiratorial Zilla Parishad election under any circumstances. Similarly, the JSS also in the greater interest of the Jumma people, if necessary, shall be compelled to take drastic action against these national traitors.

Dear Countrymen,

Today the homeland and national entity of the Jumma people are in the face of extreme crisis. Particularly, it is to be mentioned with much regret that when all preparations were made for the 7th formal dialogue betwen the Bangladesh government and the JSS, at that moment Bangladesh government unilaterally and

Dhaka University Institutional Repository

without any communication with the JSS, brought the conspiratorial Parbattya Zilla Parishad bill in the Bangladesh parliament (Jatiya Sangsad), As such, doors for hold ing the 7th formal dialogue were closed. Inorder to foil the 5 (Five) point charter of demands, the government engineered a conspiracy by passing the Zilla Parishad bill without taking the opinion of the Jumma people and the JSS. Undoubtedly, this Parbattya Zilla Parishad is going to expedite the early destruction of the Jumma national entity. This conspiracy must be foiled. The JSS is prepared to face this crisis and to foil the conspiracy at the cost of any sacrifice. The JSS also firmly rejects with much aversion the socalled general amnesty declared by fascist Ershad government on 22nd April, 1989. Simultaneously the JSS states that Bangladesh government shall be responsible for any situation arising out of this heinous Zilla Parishad election.

Dear Countrymen,

Jumma people are exploited and oppressed. The Jumma people have the right to live with their entity like the people in other parts of Bangladesh. The moverment of self-determination of the Jumma people is only to achieve freedom from all sorts of oppression and exploitation. But the Islamic expantionist Bangladesh government is determined to destroy the Jumma national entity for ever. Therefore, come, let us build more unity and solidarity and foil the conspiracy of Islamic expansionism — Parbattya Zilla Parishad Act and election including all other conspiracies. Let us establish Jumma nation-

Dhaka University Institutional Repository

alism through the realisation of self-determination in CHT. with this in view the JSS makes an ardent call for —

- ★ Oppose and foil Parbattya Zilla Parishad election ;
- ★ Extend more co-operation and support to the programmes of JSS ;
- ★ Be more united and militant in driving out the illegal infiltrators from CHT ;
- ★ Materialise 5 (Five) point charter of demands ;
- ★ Liquidate national traitors, government-puppets, agents, upstart leaders and reactionary Dulas ;
- ★ Oppose and foil Guccha Gram and Jukta Gram programmes and Gana Pratirodh committee ;
- ★ Foil the activities and programmes of Pahari Jana Kalyan Samiti, Marma Unnayan Sangsad, Tripura Unnayan Sangsad, Tribal Convention including all other puppet organisation;
- ★ Oppose strongly infiltration, illegal occupation of land, communal riots and Islamic expansionism.
- ★ Accelerate the Jumma national unity and solidarity.

Date—1st May, 1989

Central Committee
Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti
(United Peoples' Party)

Dhaka University Institutional Repository

Published and circulated by tbe Department of Information and Publicity of Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti (United Peoples' Party)

পরিশিষ্ট ৮

Office copy

৭/৩/৯৭

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পার্বত্য উপজাতীয় শরণার্থীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত

যৌথ ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির একটি প্রতিনিধিদল ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ এবং ৬ই মার্চ থেকে ৭ই মার্চ পর্যন্ত দুইদফায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল এবং ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যেসকল সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১/ সংবিধান ও আইনানুযায়ী উপজাতীয় শরণার্থীসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে;

২/ প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি উপজাতীয় শরণার্থী পরিবারকে গৃহনির্মাণ ও কৃষি অনুদান বাবদ এককালীন পূর্বপ্রদত্ত ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার স্থলে ১৪-২-১৯৯৪ তারিখে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের দাবী অনুযায়ী আরও

Office copy

৭।৩।৯৭

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পার্বত্য উপজাতীয় শরণার্থীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত

যৌথ ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির একটি প্রতিনিধিদল ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ এবং ৬ই মার্চ থেকে ৭ই মার্চ পর্যন্ত দুইদফায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদল এবং ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যেসকল সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। সংবিধান ও আইনানুযায়ী উপজাতীয় শরণার্থীসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে;

২। প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি উপজাতীয় শরণার্থী পরিবারকে গৃহনির্মাণ ও কৃষি অনুদান বাবদ এককালীন পূর্ব প্রদত্ত ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার স্থলে ১৪-২-১৯৯৪ তারিখে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের দাবী অনুযায়ী আরও

Dhaka University Institutional Repository

৭/৩/৯৭ ②

৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা যোগ করে মোট ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। ত্রিপুরা এলাকায় শরণার্থী কেন্দ্র কর্তৃক অস্বীকারকৃত তালিকাভুক্ত পরিবারের বিগত মাসগুলোর রেশন পালনের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে।

৩। প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে সপ্তাহে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ক ৫ (পাঁচ) কেজি এবং প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ) কেজি হিসাবে ৯ (নয়) মাস চাউল এবং পরিবার প্রতি মাসিক ৪ (চার) কেজি ডাল, ২ (দুই) কেজি সয়াবিন তেল ও ২ (দুই) কেজি লবন হিসাবে ৯ (নয়) মাস প্রদান করা হবে।

৪। গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে ২ (দুই) বান্ডিল সি. আই. সীট (ঢেউ টিন) প্রদান করা হবে।

৫। যে সকল শরণার্থী কৃষক পরিবারের চাষযোগ্য জমি রয়েছে তারা ফেরার পর যথাযথ যাচাই সাপেক্ষে তাদের প্রতিটি পরিবারকে এক জোড়া হালের গরু বাবদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। যে সকল ছেলে শরণার্থীরা পিতা বা পিতামহের জমি নিজেদের নামে নামজারী করতে পারেনাই অথচ তারা ওয়ারিশ হিসেবে জমি জমা ভোগ করছে তারা হেডম্যানের কাছ থেকে প্রদত্ত ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই সুবিধা পাবে।

৬। ভূমিহীন প্রতি পরিবারকে একটি অনুদান বাবদ ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা প্রদান করা হবে এবং প্রতি পরিবারের জন্য সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭/৩/৯৭ ৬

৭/ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ এবং তাহা সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

৮/ অন্যান্য সরকারী ব্যাংক ঋণ বাবদ পাওনা টাকা প্রত্যাবর্তনরত সকল উপজাতীয় শরণার্থী পরিবারের স্বদেশে ফেরার পর যথাযথ যাচাই সাপেক্ষে মওকুফ করা হবে।

৯/ ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ করা হইবে।

১০/ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা বলবৎ থাকবে। ইনসার্জেন্সি সংক্রান্ত সকল মামলার (গ্রেফতারী পরোয়ানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে) ইহা প্রযোজ্য হইবে।

১১/ প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করা হবে এবং ধর্মীয় স্থানসমূহ পুনর্স্থাপন করা হবে। উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করা হবে না।

১২/ দেশ ত্যাগের পূর্বে যেসব শরণার্থী সরকারী/আধা-সরকারী চাকুরীতে ছিলেন, প্রত্যাবর্তনের পর চাকুরীতে পুনর্বহালের ব্যাপারে তাদের বিষয়ে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে এবং বিদ্যমান চাকুরী বিধি অনুযায়ী তাদেরকে জ্যেষ্ঠতা প্রদান ও চাকুরীচ্যুতিকালীন পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনগ্রসর এবং অনুন্নত জাতি হিসেবে উপজাতীয়দের জন্য চাকুরীতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭/৩/৯৭

১৩/ ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে স্থাপিত উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্র/ছাত্রী এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষার সার্টিফিকেট আছে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে "বিশেষ পরীক্ষা" গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪/ প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থী পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পুন: ভর্তি হওয়ার সুবিধাদি দেয়া হবে।

১৫/ প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য ২ (দুই) বান্ডিল ঢেউটিন প্রদান ছাড়াও একটি গৃহ নির্মাণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঠের যোগানটি প্রদান করা হবে।

১৬/ যথাযথ যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় তরুণ-তরুণীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদ সমূহের আওতাধীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৭/ যেসব বাংলাদেশী শরণার্থী ত্রিপুরায় অবস্থানকালে বাংলাদেশে সরকারী নিয়োগের নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

১৮/ যেসকল উপজাতীয় শরণার্থীদের বিরুদ্ধে পূর্বতন সরকারের আমলে এ যাবৎ দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা/মামলাদি রুজু হয়েছে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করা হবে।

পরিশিষ্ট ৯

শরণার্থী প্রত্যাগমন প্রতিনিধিদলের কাছে সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের চিঠি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ: ২০/০১/১৯৯৪ ইং।

বরাবর
কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ (বীর বিক্রম)
মাননীয় মন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি।

বিষয়: ১৬-১-৯৪ তারিখ রামগড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক প্রসংগে।

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

সালাম জানবেন।

আপনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, গত ১৬-১-৯৪ তারিখ খাগড়াছড়ির রামগড়ে ভারতের ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরের প্রতিনিধিদলের সাথে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে। শরণার্থী নেতা শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ২৩-১-৯৪ তারিখ ইতিবাচক ঘোষণা দেবার কথা বলেছেন। তবে আলোচনায় তারা শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্য ইতিপূর্বে সরকার যে ৭ দফা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন সে ক্ষেত্রে আরও কিছু ইম্প্রুভমেন্টের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তা'ছাড়া শরণার্থীদের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নে বেশ কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করে তার নিরসনে আশু ব্যবস্থা নেয়ার কথাও তিনি বলেছেন। তিনি জানান যে, তাদের অনুরোধ অনুযায়ী আরও কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাদের ২৩ তারিখ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার মারফত যেন জানিয়ে দেয়া হয় - যাতে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করা যায়।

বাবু উপেন্দ্র লাল চাকমা যে বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন তা'হোল:

১। সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর থেকে বর্ধিত করা- যাতে শরণার্থীরা নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারেন;

২। গৃহ নির্মাণ অনুদানের সাথে আরও ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সাবসিসটেন্স অনুদান প্রদান ও গৃহ নির্মাণের জন্য কাঠ ও বাঁশের বিশেষ পারমিট প্রদান;

Dhaka University Institutional Repository

৩। চাষাবাদ শুরু করার জন্য যাদের জমি আছে তাদের একজোড়া গরু প্রদান;

৪। শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ (যার পরিমাণ আনুমানিক ৬৯২ জনের মূল অংক সাড়ে বিশ লক্ষ টাকা হবে) তা সুদে-আসলে মওকুফ;

৫। শরণার্থী বেকারদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরী প্রদান ও বয়স সীমা শিথিল করণ;

৬। শরণার্থী শিবিরে তাদের পরিচালিত স্কুলসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ স্কুলের ছাড়পত্র অনুযায়ী দেশের স্কুলের সমমানে ভর্তি ও বোর্ড পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঐ ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ করে সার্টিফিকেট প্রদান;

৭। শরণার্থী হেডম্যানের পুনঃনিয়োগ, ইত্যাদি।

শরণার্থী প্রতিনিধিদলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও পোস্ট সরিয়ে নেয়ার কথা থাকলেও বরাদাম বুদ্ধ মন্দির, মিলন বিহার, আসলঙ বৌদ্ধ বিহার, কামুকছড়া, ধনাইসা বৌদ্ধ বিহারের অংগন ও এলাকা থেকে ঐ সকল ক্যাম্প প্রকৃত অর্থে সরিয়ে নেয়া হয়নি। এছাড়া তারা দাবী করেন, উপজাতীয়দের নিরাপত্তার জন্য তাদের গ্রাম সংলগ্ন সামরিক ক্যাম্প ও পোস্টসমূহ তুলে নেয়া প্রয়োজন - যাতে যে কোন সংঘাত-সংঘর্ষের সময় নিরীহ গ্রামবাসীরা বন্দুকের লক্ষ্যবস্তু না হন।

আমি মনে করি, শরণার্থী প্রত্যাবর্তনকে নিশ্চিত, নিরুপদ্রব ও পরিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য এর প্রতিটি বিষয় সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে পারেন। আর বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহে যে সকল সামরিক ক্যাম্প এখনও রয়ে গেছে, তা এখনই প্রকৃত অর্থেই সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। তা'ছাড়া স্থানীয় জনগণের সাথে অনাবশ্যক বিরোধ এড়াবার জন্য গ্রাম সংলগ্ন সামরিক ক্যাম্প ও পোস্ট সমূহ সম্পর্কে একই রকম সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

আমার মনে হয়, এ ধরনের পদক্ষেপসমূহ দ্রুত গ্রহণ করে ২৩-১-৯৪ তারিখের পূর্বেই অথবা তার পর পরই শরণার্থীদের জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-
(রাশেদ খান মেনন) ২০/০১/৯৪
সংসদ সদস্য
বাখরগঞ্জ - ২, ও
সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চার খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন:

ক-খণ্ড: সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ এবংএই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতি সমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষন করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করাহইবে:

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য: আহবায়ক

(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান: সদস্য

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি: সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এইচুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ-খণ্ড : পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৯৮, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৯৮,

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৯৮) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন :

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে অভিহিতহইবে।

৩। অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনিপার্বত্য জেলায় সুনিদিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত: বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ডেপুটি কমিশনার এবং ডেপুটি কমিমনারের শব্দগুলিরপরিবর্তে যথাক্রমে সার্কেল চীফ এবং সার্কেল চীফের শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোনসম্প্রদায়ের সদস্য, তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ব সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেরের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতেপ্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসেবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রামবিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার-এরপরিবর্তে হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন অংশটুকু সন্নিবেশ করাহইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট শব্দগুলির পরিবর্তে নির্বাচন বিধি অনুসারেশব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত তিন বৎসর শব্দগুলির পরিবর্তে পাঁচ বৎসর শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যন্য সদস্যদের দ্বারানির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লিখিত বাক্যগুরি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে: আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটের তালিকাভুক্তহওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরেরকম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ্য ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারায় উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃকনির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বরধারায় বর্ণিত খাগড়াছড়ি মং চীফ এর পরিবর্তে মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করাহইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখাহইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদেরসভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারায় উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসচিব হিসেবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে,বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে : পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয়চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কান প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকর কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারায় (১) উপ-ধারার চতুর্থত: এর মুল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে: কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে-কোনো সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে: পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমুহেরউন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত সরকার শব্দটির পরিবর্তে পরিষদ শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে: এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিতপরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে শব্দগুলি বাতিল করিয়া, তদ্‌পরিবর্তে এই আইন শব্দটিরপূর্বে পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারায় তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত সরকারে শব্দটির পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ের শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে: আপাতত বলবৎঅন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষেশব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত সহায়তা দান করা শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্যখাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পুর্বানুমোদন ব্যতিরেখে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করাযাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (রিজার্ভড) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্টীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোনপ্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেখে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্বাবধান ওনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (ফ্রিন্জ ল্যান্ড) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুইথাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত করপরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ পরিষদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে শব্দগুলি বিলুপ্ত এবংতৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত করিতে পারিবে এই শব্দগুলির পরে, নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত

প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে। খ) ৬৯ নম্বর উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লিখিত পরিষদের কোনকর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্লোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগশিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর শৃংখলা শব্দটির পরে তত্বাবধান শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্লোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে : (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষারমাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬ (খ) উপ-ধারায় সংক্ষিপ্ত বা শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ) পুলিশ (স্থানীয়); গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ; ঘ) যুব কল্যাণ; ঙ) পরবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ) স্থানীয় পর্যটন; ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ) স্থানীয় শিল্প-বানিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতিত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট) মহাজনী কারবার; ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিশের মধ্যে নিম্নেবর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে; ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি; খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর; গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিংকর; ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; চ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর; ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ; জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পুরক কর; ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্রা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ; ঞ) ব্যবসার উপর কর; লটারীর উপর কর; ঠ) মৎস ধরার উপর কর।

১। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহারপদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যান সহ পরিষদ ২২(বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে:

চেয়ারম্যান	১জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১জন মুরং ও তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিনটি) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয়সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্বাবধানকরিতে পারিবে।

ঘ) পরিষদ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যানের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্লোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে :

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ; (খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পতি হইতেপ্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত রঅনুদান; (ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিযোগ হইতে মুনাফা; (চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে-কোনো অর্থ; (ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ-খণ্ড : পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবংবিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন :

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থীনেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ ৯৭ তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যেজনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরিণ উদ্বাস্তুদের নিদিষ্ট করণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিজরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করত: উপজাতীয় জনগণের ভূমিমালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিতহইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এইকমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে :

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। (খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট)। (গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি। (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার। (ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ : যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার
করেন নাই, সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দকরিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন
করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ওবিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান : চাকুরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকুরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ওগোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০, ০০০/= টাকাপ্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, আত্মসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রতাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিত কালীন সময়ে প্রদত্ব সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত ছিলেন তাহাদেরকেস্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুঠির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমুলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগসুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর, এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিকজীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতিত সামরিকবাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এইক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিকবাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবাপার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্নশ্রেণির কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা

হইবে। তবেকোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নিদিষ্টসম মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নেবর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী (২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ (৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্যজেলা পরিষদ (৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি (৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি (৮) সাংসদ, বান্দরবান (৯) চাকমা রাজা (১০) বোমাং রাজা (১১) মং রাজা (১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন অ- উপজাতীয় সদস্য। এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)
আহবায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের পক্ষে
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৭, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ই জুলাই, ২০০১/ ২রা শ্রাবণ, ১৪০৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ই জুলাই, ২০০১ (২রা শ্রাবণ, ১৪০৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০১ সনের ৫৩ নং আইন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয়; এবং

যেহেতু এ অঞ্চলের উপজাতীয় অধিবাসীগণসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জায়গাজমি সংক্রান্ত কতিপয় বিরোধের দ্রুত নিস্পত্তির জন্য একটি কমিশন গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**। - এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা। - **বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-**

(ক) "আঞ্চলিক পরিষদ" অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদ;

(খ) "কমিশন" অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীনে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "পার্বত্য চট্টগ্রাম" অর্থ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহ;

(ঙ) "পার্বত্য জেলা" অর্থ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা;

(চ) "পুনর্বাসিত শরণার্থী" অর্থ ৯ই মার্চ ১৯৯৭ ইং তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভুক্ত শরণার্থী;

(ছ) "প্রচলিত আইন" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেইগুলিকে বুঝাইবে;

(জ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) "ভূমি" বলিতে পার্বত্য জেলাধীন পাহাড় এবং জলে ভাসাসহ সমুদয় জমি বুঝাইবে;

(ঞ) "সচিব" অর্থ কমিশনের সচিব;

(ট) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য;

(ঠ) "সার্কেল চীফ" অর্থ চাকমা চীফ বা বোমাং চীফ বা মং চীফ।

৩। **কমিশনের গঠন**। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন নামে একটি কমিশন থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন সদস্য;

(গ) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকার বলে;

(ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

ব্যাখ্যা- দফা (গ) এবং (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সংশ্লিষ্ট" অর্থ বিরোধীয় ভূমি যথাক্রমে যে পার্বত্য জেলা এবং যে সার্কেলেরঅন্তর্ভুক্ত সেই পার্বত্য জেলা এবং সেই সার্কেল।

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চেয়ারম্যান গুরুতর অসদাচরন কিংবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে তাঁহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে সরকার যে-কোনো সময়ে চেয়ারম্যানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে য, শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীনে চেয়ারম্যানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

৪। **কমিশনের কার্যালয়**। - (১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি জেলা সদরে থাকিবে;

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, যে-কোনো পার্বত্য জেলায় কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কমিশনের মেয়াদ**। - কমিশনের মেয়াদ হইবে চেয়ারম্যান নিয়োগের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৬। **কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা**। - (১) কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ-

(ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা;

(খ) আবেদনে উলে-খিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে দখল পুনর্বহাল;

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বহির্ভুতভাবে কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং

উক্ত বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত থাকিবে।

(৩) উক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন যে-কোনো সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত বা কাগজপত্র সরবরাহের এবং প্রয়োজনে উক্ত কর্তৃপক্ষের যে-কোনো কর্মকর্তাকে স্থানীয় তদন্ত, পরিদর্শন বা জরিপের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা উহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কমিশন বা চেয়ারম্যান বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন সদস্য যে-কোনো বিরোধীয় ভূমি সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৭। **কমিশনের বৈঠক, কোরাম ও কার্যপদ্ধতি**। - (১) এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, কমিশন উহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) চেয়ারম্যানের নির্দেশে সচিব কমিশনের বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সদস্যগণকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তীযে-কোনো বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে এবং এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

(৫) চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কমিশন ধারা ৬(১) এ উলি-খিত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে উহার সকল সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রদান করিবে।

৮। **কমিশনের বৈঠকে সদস্যগণের যোগদানের নিমিত্ত প্রাপ্য ভাতা**। - কমিশনের বৈঠকে যোগদানের জন্য সরকার কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্যদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে উক্ত সদস্য উক্ত ভাতা পাইবেন।

৯। **কমিশনের আবেদন দাখিল**। - এই আইনের অধীনে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী তাঁহার দস্তখত বা টিপসহিযুক্ত দরখাস্ত সাদা কাগজে বাংলা ভাষায় লিখিয়া কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন।

১০। **আবেদনের প্রতিপক্ষ**। - (১) ধারা ৯ এর অধীনে দায়েরকৃত প্রতিটি আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, অবৈধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা এবং ক্ষেত্রমত আবেদনকারীর জানামতে দাবিকৃত ভূমির বর্তমান দখলকার এর নাম ও ঠিকানা উলে-খ করিতে হইবে।

(২) উক্ত আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসাবে উলি-খিত সকল ব্যক্তির উপর কমিশন নোটিশ জারী করিবে এবং নোটিশের সহিত আবেদনপত্রের একটি কপিও সংযুক্ত করিবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রতিপক্ষ হিসাবে উলে-খ করা হয় নাই এমন কোন ব্যক্তিও সংশ্লিষ্ট কারণ উলে-খ পূর্বক প্রতিপক্ষ হওয়ার আবেদন করিতে পারিবেন এবং কমিশন উক্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষভুক্ত করিতে পারিবে।

১১। **কমিশন কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ**। - (১) ধারা ৬(১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশনের কোন কার্যক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)এর বিধানাবলী অনুসরণে বাধ্য থাকিবে না, বরং সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে কমিশন যেইরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিতে পারে।

(২) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিলে কমিশন একজন অনুবাদকের সহায়তা গ্রহণ করিতে এবং অনুবাদকের অনুবাদ অনুসারে উক্ত সাক্ষ্য বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন লিখিত নোটিশ দ্বারা যে-কোনো ব্যক্তিকে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান এবং সকল প্রকার তথ্য ও দলিল-পত্রাদি দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক কোন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্য হুবহু লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নহে, বরং উহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলেই চলিবে।

(৫) কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে Oaths Act, 1883 (Act X of 1883)প্রযোজ্য হইবে।

১২। **কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ**। - কমিশন, প্রয়োজনবোধে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে উহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে লিখিত আদেশ দ্বারা, এই ধারা এবং ধারা ৬(১) এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন ব্যতীত, কমিশনের অন্য যে-কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। **কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**। - (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন এবং তিনি আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারের উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) কমিশনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিমিত্তে, সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

১৪। **আর্থিক ব্যবস্থা**। - (১) কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার থোক বরাদ্দ হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য আর্থিক বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) সচিব, চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে, কমিশনের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) কমিশনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সচিব সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও সরকারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করিবেন।

১৫। **হিসাব ও নিরীক্ষা**। - (১) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের যে-কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৬। **কমিশনের সিদ্ধান্তের আইনগত প্রকৃতি এবং চূড়ান্ততা**। - ধারা ৬(১)-এ বর্ণিত কোন বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনের উপর কমিশন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল বা রিভিশন দায়ের বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৭। **কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন**। - (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনের সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, বা ক্ষেত্রমত, আদেশের ন্যায় কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনবোধে সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে বা করাইতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল কর্তৃপক্ষ কমিশনের নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।

১৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**। - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।

১৯। **কমিশনের অবমাননা আদালত অবমাননার শামিল**। - Penal Code, 1860 (Act XXV of 1860)এর Section 220 এবংCode of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর Section 480এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন উক্ত ধারাসমূহের উলি-খিত দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে কমিশন উহার অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ-কর্ম সংরক্ষণ**। - এই আইন বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্যকোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ

সচিব।

পরিশিষ্ট ১২

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধন সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও করণীয়

৩০ এপ্রিল ২০১৩ ইং।

১। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' প্রণীত হয়।

২। ০৭/০৫/ ২০০৯ ইং উক্ত আইন সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদমোট ২৩ টি সুপারিশ পেশ করে।

৩। ২৬/৮/২০০৯ ও ০৬/১২/২০০৯ ইং ভূমি মন্ত্রণালয় সভা করে। আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে কর্মকর্তাগণের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কতিপয় বিষয়ে মতামত ও সিদ্ধান্ত পাবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন। বিষয়টি প্রায় ৯ (নয়) মাসের অধিক ঝুলে থাকে।

৪। ২২/৯/২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পার্বত্য মন্ত্রণালয় সভা করে। আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনাক্রমে ১৪ টি সুপারিশ গৃহীত হয়। ঐ সভার কার্যবিবরণী ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়। বিষয়টি আরও প্রায় ৮ (আট) মাস ঝুলে থাকে।

৫। ১৩/৫/২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করেন। ঐ আলোচনা মোতাবেক পার্বত্য মন্ত্রণালয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১১' প্রস্তত করে। ২০/৬/২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তা অবলোকনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

৬। ভূমি মন্ত্রণালয় ১১/৮/২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সভা করে। বিষয়টি কার্যবিধিমালা অনুযায়ী পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত বিধায় বিলটি দেখার পর সেখানে ফেরৎ পাঠাবার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধি দল অভিমত তুলে ধরে। কর্মকর্তাগণ কার্যবিধিমালা বিষয়ে অপব্যাখা দিয়ে তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। সভায় পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের বিলটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিতে প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। ২২/১/২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে এবং ১৪ টি সংশোধনী সম্বলিত বিল-এর অনুকুলে দফাওয়ারী অনুকুল মতামত ও সিদ্ধান্ত দেয়। ভূমি মন্ত্রণালয় ২৮/০৩/২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সভা করে। ঐ সভায় আঞ্চরিক পরিষদ প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনাক্রমে ১৪ টি সুপারিশের মধ্যে ১০ টি গৃহীত হয়। অবশিষ্ট ৪ টি বিষয়ে মতামত ও সিদ্ধান্ত পাবার জন্য চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির নিকট পুনরায় পত্র প্রেরণ করে।

৮। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ২৫/৫/২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সভা করে। ১টি সুপারিশ বাতিল করে অপর ৩টি সুপারিশ গ্রহণ করবার অনুকুলে মতামত ও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে। পার্বত্য মন্ত্রণালয় গৃহীত ১৩ টি সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধিত আকারে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১২' প্রস্তুত করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৯। ৩০/৭/২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মাননীয় আইন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা হয়। ঐ সভায় পূর্বে গৃহীত ১০ টি সুপারিশ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশিষ্ট ৩ টি সুপারিশ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৩ (তের) টি সুপারিশ ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের জন্য গৃহীত হয়। **কিন্তু ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে ঐ সভার কার্যবিবরণী আজো লিপিবদ্ধ করা হয় নি। এতে চরম অগণতান্ত্রিকতার নজীর সৃষ্টি হতে চলেছে।**

১০। পরিবর্তে চলিত এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাননীয় আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অন্য একটি সভা করা হয়। ঐ সভায় আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি রাখা হয় নি। উক্ত সভায় ১৩ টি সুপারিশের মধ্যে কতিপয় সুপারিশ সংশোধন করা হয়েছে। এ সংশোধিত সুপারিশমালার আলোকে ভূমি মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩ প্রস্তুত করবার উদ্‌যোগ গ্রহণ করেছে।

১১। উলে-খ্য যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বরবারই ভূমি কমিশন আইন যথাযথভাবে সংশোধন বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করে চলেছেন। এ প্রেক্ষিতে যে সকল ধারা সংশোধন ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ হল ঃ

(ক) **ভূমি কমিশন আইনের ৬(১)(গ)-এর শর্তাংশ অর্থাৎ কতিপয় এলাকা ভূমি কমিশনের আওতা বহিভূতকরণসম্পর্কিত** - পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ৬৪ ধারা অনুযায়ী ভূমি হস্তান্তর ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন প্রদান বিষয়ে কতিপয় এলাকা যেমন – কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, রিজার্ভড ফরেস্ট ইত্যাদি ইহার আওতা বহির্ভূত রাখা হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট উক্ত একই শর্তাংশ ভূমি কমিশন আইনে জুড়ে দেওয়া হয়। তা বিলুপ্ত করবার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ সুপারিশ পেশ করে এবং সে বিষয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি অনুকুল মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ যাবৎ তা বিরোধিতা করে এসেছেন। তারা বরাবরই যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকেন যে, উক্ত শর্তাংশটি চুক্তিতে রয়েছে। অথচ, উক্ত শর্তাংশটি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির খ খণ্ডে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারা সংশোধনের সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত শর্তাংশটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮-এ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অপরপক্ষে, চুক্তির ঘ খণ্ডের ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধসহ সমস্ত ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করার বিধান রাখা হয়। কোন এলাকা কমিশনের আওতাবহির্ভূত থাকবে বলে কোন বিধান চুক্তির ঘ খণ্ডে নেই।

প্রসঙ্গত উলে-খ্য যে, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পানির উচ্চতা ১২০ ফুট হিসাবে রেখে নির্ধারণ করা হয় এবং আইন অনুযায়ী সমতল জমি ও পাহাড় অধিগ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্প এলাকায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার১০ টি উপজেলার মধ্যে ৫ (পাঁচ) টি উপজেলা (বিলাইছড়ি, জুরছড়ি, বরকল, লংগদু ওনানিয়ারচর উপজেলা) এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ২ টি উপজেলার অর্ধেকাংশ (দীঘিনালা উপজেলার ছোট মেরুং ইউনিয়ন ও খাগড়াছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়ন) অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সকল উদ্বাস্তুকে অন্য এলাকায় সমতল চাষযোগ্য কৃষি

Dhaka University Institutional Repository

জমি দিয়ে পুনর্বাসন করা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি কমিশনারের এক আদেশ বলে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকার যে সব জমি শীত মৌসুমে পানি কমার ফলে চাষ করা যায় তা ফ্রিঞ্জল্যান্ড বা জলেভাসা জমি হিসাবে পরিচিহ্নিত করে ব্যক্তি মালিকানাধীনে বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ১৯৮০ দশক থেকে ঐ সব জলেভাসা জমি ও জমি সংলগ্ন পাহাড় নিয়ে উলে-খযোগ্য পরিমাণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে কেবল ফ্রিঞ্জল্যান্ড সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি হলেই তা সমাধান করা যাবে না। সমগ্র কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় কমিশন কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে। তাই, কমিশন আইন হতে উক্ত প্রকল্প এলাকা সংশ্লিষ্ট শর্তাংশটি বিলুপ্ত করা আবশ্যক।

বন আইন, ১৯২৭ অনুযায়ী বন মন্ত্রণালয় কেবল রিজার্ভড ফরেস্ট এলাকার বনজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এর বাইরের সকল ভূমি ও সম্পদ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনার ও ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সার্কেল চীফ, মৌজার হেডম্যান ও গ্রামের কার্বারীর আওতাধীন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এর আওতায় প্রণীত আইন অনুযায়ী ঐ সব ভূমি ও সম্পদ ডেপুটি কমিশনারের পরিবর্তে এখন সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাভূক্ত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে হাজার একর পাহাড় (কিছু কিছু সমতল ভুমিসহ) বন বিভাগ বিধি বহির্ভূতভাবে রিজার্ভড ফরেস্ট হিসাবে ঘোষণা দেয়। উদাহরণ দেওয়া যায় যে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বন বিভাগ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার তিন্দু মৌজায় ৭০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। অথচ, উক্ত মৌজায় যুগ যুগ ধরে গ্রাম গড়ে উঠেছে , চাষযোগ্য কৃষি জমি চাষ চলে আসছে এবং উক্ত মৌজার আয়তন মাত্র ৫৬০ একর। অর্থাৎ মৌজার সকল গ্রাম, সমতল কৃষি জমি ও পাহাড়ের জুম চাষের ভূমির পরিমাণের চেয়ে অধিক ভূমি বন বিভাগ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন লংঘন করে অধিগ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। ভূমি কমিশন কর্তৃক এ সব বিরোধ নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। কিন্তু সংরক্ষিত বন বা তথাকথিত ঘোষিত সংরক্ষিত বন যাতে কমিশনের আওতাবর্হিভূত থাকে সে জন্য বন বিভাগ নানাভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ দরিদ্র। তাদের পক্ষে কোন বিচার আদালতে গিয়ে সুবিচার পাওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই, রিজার্ভড ফরেস্ট এলাকায় যাতে কমিশন কাজ করতে পারে সে ধরণের বিধান অপরিহার্য। কমিশন তা নিষ্পত্তি না করে থাকলে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বন বিভাগের সংঘাত-সংঘর্ষ অবধারিত।

অপরপক্ষে যে সব এলাকায় বা স্থানে ভূমি বিরোধ নেই (যেমন– বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা) তা কমিশনের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা কিংবা উলে-খ করা নিষ্প্রয়োজন।

এতদ্‌প্রেক্ষিতে আইনের ৬(১)(গ)-এর শর্তাংশটি আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির অনুকুল মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিলুপ্ত করা আবশ্যক। তা অপরিবর্তিতভাবে কিংবা পরিবর্তন বা সংশোধনকরে বহাল রাখা অনুচিত।

(খ)আইনের ৭(৩) ধারা বা কোরাম সম্পর্কিত –পার্বত্য জেলার ভূমি সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পর্কে কার্যত সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সার্কেল চীফই অবহিত থাকেন। তাদের মধ্যেকার কোনো কোনোজনের উপস্থিতি থাকলে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে। এ নিশ্চয়তা বিধানের জন্য চেয়ারম্যান ও অপর তিনজন

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য নিয়ে কমিশনের বৈঠকের কোরাম হবে মর্মে সুপারিশ আঞ্চলিক পরিষদ পেশ করে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এটির অনুকুলে মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১২। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং সদস্য হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে অন্যতম চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি। এক কথায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতামতের ভিত্তিতে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যাতে সঠিকভাবে চলমান রাখা যায় তদুদ্দেশ্যে চুক্তিতে উক্ত কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন ক্ষেত্রে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তকে বিশেষত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেছুর রহমানসহ কতিপয় কর্মকর্তার বিরোধিতার কারণে পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে পরিচালিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তে কতিপয় কর্মকর্তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। **এতে একদিকে, ভূমি বিরোধ যথাযথভাবে নিষ্পত্তির উপযোগীভাবে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের পথ রুদ্ধ হয়েছে ; অপরদিকে, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতামত ও সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু তা নয়, এ প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবার যথাযথ প্রক্রিয়াকে অকার্যকর করবার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। ৩০ জুলাই ২০১২ সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ না করার মাধ্যমে চরম অগণতান্ত্রিকতার নজীর সৃষ্টি হতে চলেছে।** ফলে পরবর্তীতে যথাযথভাবেচুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

১৩। আরও উলে-খ্য যে, **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০ একটি বিশেষ বিধান। এ বিধান অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পাদন করে চলেছে।** এ কার্যবিধিমালার ১৮ নং এন্ট্রিতে বর্ণিত বিধান অনুসারে এ মন্ত্রণালয় এটির অধীনে ন্যস্ত বিষয়াবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করতে পারে। পার্বত্য জেলা পরিষদ এ মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং আইন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত। তদ্‌প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করবার প্রক্রিয়া এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যবিধিমালা জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন করা যেতে পারে কিংবা ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত না হলেও জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে পার্বত্য মন্ত্রণালয় সম্পাদন করবে মর্মে কোন আদেশ দ্বারা স্পষ্টীকরণ করা যেতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করেছে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে অনুলিপি দেওয়া হয়েছে।

১৪। ভূমি মন্ত্রণালয়ে যে সব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সকল সভার কার্যবিবরণী কখনো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। সভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি মন্ত্রণালয় হতে হস্তান্তরিত হয় নিবিধায় ভূমি কমিশন আইন সংশোধন প্রক্রিয়া পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপর ছেড়ে দিতে রাজী হন নি। অপরদিকে, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী হস্তান্তর করবার জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয় পত্র লিখলে ভূমি কর্মকর্তাগণ উত্তর দেন যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন বিষয় অর্পণের জন্য অবশিষ্ট নেই। ভূমি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কোন অবস্থাতেই সঠিকভাবে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন হতে পারে না। **এমনকি ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ সরকারের মেয়াদকালে উক্ত আইন সংশোধন করা যাবে বলে মনে হয় না। তাই, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা সঙ্গত হতে পারে।**

১৫। **করণীয় :** উপর্যুক্ত বিষয়াদির আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তদারকিতে বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(১) ৩০/৭/২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী যথাশীঘ্র লিপিবদ্ধ করা এবং তাতে আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ ও চুক্তির বিধান অনুসরণে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মতামত ও সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ১৩ টি সংশোধনী প্রস্তাব সঠিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব জরুরি ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ আগামী জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পাশ করবার ব্যবস্থা করা।

******